প্রথম খণ্ড

দীপক চৌধুরী

রীডার্স কর্ণার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

সেই বুড়ো ভদ্রলোকটির কাছে প্রেরণা
না পেলে এ-বই লেখা সম্ভব হ'ত না

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা আপাতত কাল্পনিক

...মি অনেক লোকের মধ্যেই থাকব। এ-বাড়িতে বড্ড একা-একা ...াদু।"

... পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুরদা চাইলেন বাবার দিকে, বললেন, ... ধ দেব ভাবছি। কেউ যেন আজকাল আর মিলেমিশে থাকতে চাইছে ...একটু ভেবে তারপর পুনরায় বললেন, "অনীতা চলুক আমার সংগে। ... র আসবে।"

... বললেন, "তুমি না হয় কদিন পরেই যাবে—।" অনীতা চেঁচিয়ে ..., আমি—কাকীমার কোলে বসব, কাকার কাঁধে উঠব, ঝুকুর সংগে ...র। দাদু, আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসি?"

... জিজ্ঞাসা করলেন, "জিনিসপত্র কেন রে?"

...র কাপড় নিতে হবে, মার জন্য কখানা সাড়ি চাই, দাদার— ...কে চাইল অনীতা।

... দাঁড়িয়ে মা হাসতে লাগলেন। বাবা অনীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ...এ-বাড়িতে কে থাকবে?"

...া দিয়ে দাও বাবা। তারপর চল মার্কেটে। ঝুকুর জন্য একটা পুতুল ...কা তো বই পড়তে ভালবাসেন, তাঁর জন্যে একটা বই চাই—" ...জ্ঞাসা করলেন, "কি বই?" ঠাকুরদার কানের কাছে মুখ ... ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এলিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড!" সবাই একসংগে ...ন।

...া তারপর গোয়াবাগানের ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে এলিসের মত কুইনস্ ...ড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

...দিন ঘুম থেকে উঠে অনীতা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল যে, সে কুইনস্ ...ড়িতেই ঘুমিয়েছে। ঝুকুর সংগে খেলা করতে করতে সে কখন ...ড়েছিল। বাবা রাত্রিতে গোয়াবাগান থেকে কোলে করে তাকে ...ন। অনীতা তা টের পায়নি।

আমার বড়কাকার নাম ভবশংকর চৌধুরী। ঠাকুরদা তাঁকে ব্যারিষ্টারি পড়িয়েছেন। ব্যারিষ্টারি পাশ করবার পর কাকা দু'বছর অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন। তারপর হাইডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন-শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ইচ্ছে করলেই বড়কাকা হাইকোর্টে বসতে পারতেন। পসারও তাঁর হত প্রচুর। ঠাকুরদা তাই একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভবশংকর, কি করবে ভাবছ? হাইকোর্টে বসবে না?"

বড়কাকা বললেন, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে লেখাপড়া করতে চাই।"

"লেখাপড়া—? শেষ হয়নি এখনো?"

"এই তো সবে সুরু করেছি বাবা। ভারতীয় দর্শন আমার আগা থেকে শেষ অবধি সবই পড়তে হবে। ভাবছি কাশীতে গিয়ে ভাল করে সংস্কৃত শিখব।"

ঠাকুরদা একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশ ও দশের তাতে উপকার হবে তো ভবশংকর?"

"আমার মনে হয় হবে। আজকাল সবাই ভাবছেন যে, আমাদের উন্নতির একমাত্র রাস্তা ভারতবর্ষকে শিল্পায়িত করা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অভাবের সবটুকুই টাকার অভাব নয়।"

"তবে?" প্রশ্ন করলেন ঠাকুরদা।

"আমাদের জীবনে সংস্কৃতির অভাব ঘটেছে। আমরা তাই কলকারখানার বাইরে কোন উন্নতির রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। তোমার কি মনে হয় বাবা?"

"ভবশংকর, দর্শনের পথ দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল আনতে পার তো ভালই। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। সংসার প্রতিপালনের জন্য তোমায় আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারব।"

...তে পারে না দর্শন তা পারে। দর্শনের সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের ঘাড়ের ওপর ...চাপানো হয়েছে। ডায়ালেকটিকাল জড়বাদ এবার সেই নিয়মটিকে ...করে দিল।

...টপট দাদাকে ফেরৎ পাঠাও। তার আত্মা এবং ভগবানটিকে গোয়া ...র অন্ধকারে রেখে আসতে ব'ল। আরও একটা কথা মনে পড়েছে বাবা। আসছে মাসে আমায় শ'দুয়েক পাউণ্ড বেশি পাঠিয়ো।'

চিঠি পড়বার সময় বড়কাকা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। পড়া ...শেষ হ'ল, তখন ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কিছু বুঝলে?"

পিসেমশাই বললেন, "আমার তো মনে হয় ও অঞ্চলে আবার একটা 'গদর আন্দোলন' শুরু হয়েছে।"

ঠাকুরদা প্রশ্ন করলেন, "তার মানে?"

"মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রিটিশসাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য ভবশংকর কোন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। টেররিস্ট মুভমেন্ট।"

"না, তুমি ঠিক বুঝতে পারনি রণদা। ভবশংকর হয়ত বোঝাতে পারবে।"

বড়কাকা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরদার সামনে।

ঠাকুরদা বললেন, "তুমি তো শুনলে ভবশংকর। আত্মা নেই তার মানে

বড়কাকা চিঠিখানা পিসেমশায়ের হাত থেকে নিয়ে নিলেন। দার্জিলিকের দিকে চিঠিখানা তিনি পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আত্মা এ কথাটা খুব ভয়ের নয় বাবা।"

"কেন?" ঠাকুরদা একেবারে মুখোমুখি হয়ে ঘুরে বসলেন। কাকা বললেন, ...ণ আত্মা আছে। ভয়ের কথা হচ্ছে, জীবন ও জগৎকে বৈজ্ঞানিকরা ...লকটিকের মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। আর এ-দেখাটা ...বারে সমগ্রভাবে দেখা, 'টোটাল'!"

ঠাকুরদা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি সব মাথামুণ্ড বলছ তার মানে হয় না।

টাকা পয়সা খরচ করে বিলেতে গেলে লেখাপড়া শিখতে—অথচ যা বলছ তার আগা-মাথা ঠিক নেই।"

সবাই মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন একটা শতাব্দীর ব্যবধান সৃষ্টি হ'ল বলে ঠাকুরদা মনে করলেন। বড়কাকার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আমার বয়সে নতুন করে শিক্ষিত হওয়া আর সম্ভব নয়। দুনিয়ার সব রকম শিক্ষা থেকে যদি ভগবানের বিলোপ সাধন ঘটে না হলে গোয়াবাগানের অন্ধকার নিয়েই আমি থাকব। ভবশংকর, এ চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পারতো তুমিই দিও।"

এরপর কেউ কোন কথা বললেন না। আমার মনে হ'ল, ছোটকাকার চিঠিখানা কারো কাছে পুরোপুরিভাবে বোধগম্য হয়নি। অথবা চিঠিখানা সবারই চিন্তাজগতে এমন একটা ভূমিকম্প ঘটিয়েছে যে, প্রত্যেকেই বাক্‌রহিত হয়ে রইলেন। ঠাকুরদা পরপর সবারই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছে, তিনি সব আজ নতুন মানুষ দেখছেন।

ছোটকাকার চিঠিখানাতে নতুন মানুষের প্রতিচ্ছবি নিশ্চয়ই ছিল। নইলে ঠাকুরদা নিশ্চয়ই অতটা বিচলিত হয়ে পড়তেন না।

তারপর ঠাকুরদা, বড়কাকা আর আমি একসংগেই গোয়াবাগানের বাড়িতে সেই রাত্রিতে ফিরে গেলাম। এ-বাড়ির সংগে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক, তাই এখানে এলেই মনে হ'ত, আমি যেন আমার সেই শৈশবের খেলাঘরে ফিরে এসেছি। আমি গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলাম। কাকীমা ভুকুর পাশে বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই ভুকু খাওয়া ফেলে উঠে দাড়াল। সে বলল, "মা, দীপুদাকে খাবার দিতে বল। আমি কেবল মাছভাজা খেয়েছি দীপুদা!"

"বেশ তো, তারপরের আইটেম সুরু করে দাও।"

"না দীপুদা, তোমার মাছভাজা খাওয়া হ'লে, তবে আমি পরের আইটেম নেব।"

কাকীমা হেসে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। হ্যারে দীপক্, তোর মা কেমন আছেন? অনীতার চিঠি পেয়েছিস?"

"মা ভালই আছেন। অনীতার চিঠি পেয়েছি প্রায় দু'দিন আগে। কেন, তুকুকে চিঠি দেয়নি?"

তুকু বলল, "আগের চিঠির জবাব দিতে পারিনি যে। জানো দীপুদা, অনীতা এমন শক্ত ইংরেজি লেখে আজকাল যে আমি সব কথা বুঝতে পারি না।"

হঠাৎ সে কি মনে করে বলে বসল আবার, "আচ্ছা মা, দীপুদা কেন আমাদের বাড়িতে থাকে না? আমাদের ক্লাসের সব মেয়েরই ভাই আছে, আমার নেই কেন?"

কাকীমা বললেন, "কেন থাকবে না, এই যে দীপক রয়েছে।"

"তা হ'লে তোমায় আর ছাড়ব না।" তুকু খাওয়া ফেলে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কানে কানে বলল, "জানো, ক্লাসের মেয়েরা কি বলে?"

"কি বলে?"

"বলে যে দীপুদা তোর আপন ভাই নয়।" তুকুর চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুরদা বললেন, "বৌমা, দীপক আমার কাছেই শোবে।" তুকু সংগে সংগে চিৎকার করে উঠল, "দাদু, আমিও দীপুদার কাছে শোব। তুমি আর দীপুদা দুদিকে, আমি মাঝখানে।" ঠাকুরদা বললেন, "বেশ ভাল। আমরা তোমাকে পাহারা দেব।"

তারপর আমি আর তুকু ঠাকুরদার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। সাবেক কালের মেহগনি খাট। আজকালকার দুটো খাটের সমান।

কমরেড, আজকে ভারতবর্ষের বাইরে বসে কেবলই মনে হচ্ছে ঠাকুরদার সেই খাটখানায় শুধু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থই ছিল না, তাতে বেঁচে থাকবার আভিজাত্যও ছিল। তোমাদের পরিচালিত ভারতরাষ্ট্রে আজকাল তো বুর্জোয়া আভিজাত্যনি পরিত্যক্ত। অংকের হিসেবে দুটো দেহের মাপ নিয়ে খাট তৈরি

হচ্ছে একই রকমের। এক রত্তি কাঠের অতিরিক্ত ব্যবহার সম্ভব নয়। তোমরা তো খাটে শুয়ে কোন রকমে রাত কাটাও; তোমাদের শয্যার সবটুকুই তো স্থূল প্রয়োজন। কিন্তু ঠাকুরদা তাঁর খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন।

তারপর আরও ক'টা বছর কাটল। আমি প্রেসিডেন্সিতেই পড়তে লাগলাম। অনীতা এই সময়ে সিনিয়ার দিয়ে কারসিয়ং কনভেণ্ট থেকে চলে এল কলকাতায়।

মা একদিন বললেন, "অনীতা খুব গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। অনাবশ্যক সরলতায় নিজেকে সে হালকা করে নি।"

অনীতা কথা কয় কম, ভাবে বেশি। কলকাতায় ফিরে আসবার পর, মা ওর জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করেছেন। অধিকাংশ সময় সে এই ঘরেই থাকে। পার্ক স্ট্রীটের দোকান থেকে ছোট্ট একটা ভাল ডিজাইনের লিখবার টেবিল মা নিজেই কিনে এনেছেন ওর জন্য। অনীতা সংগে যায় নি। সে বলেছিল, "লেখবার এবং পড়বার জন্য টেবিল দরকার। ডিজাইনের জন্য আমার কোন অসুবিধা হবে না মা।"

অনীতার কথায় মা খুব খুসি হয়েছেন। স্বল্পভাষী মেয়ের উপর তাঁর আস্থা এসেছে, ভবিষ্যতে সে কেবল সন্তান জন্ম দেবে না, সন্তানের উপযুক্ত মা হবে। কনভেণ্টের শিক্ষার প্রতি মায়ের শ্রদ্ধা আগের চেয়ে আরও বাড়ল। টাকা খরচ-করা সার্থক হয়েছে। কারসিয়ং কেবল হিল্-ষ্টেশন নয়, কারসিয়ং শিক্ষা-কেন্দ্র। কলকাতার গরম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যারা শুধু পাহাড়ের উচ্চতা দেখল, তারা ঠাণ্ডা পেল বটে, কিন্তু অনীতার মত আদর্শ পেল না। মাঝে মাঝে মা ভাবতেন, 'অনীতা যদি ভগবানের ও মানুষের সেবা করতে পারে তা হ'লে তিনি অনীতাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।' চোখ বন্ধ করে তিনি নিজেই ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, 'অনীতা যেন কোনদিনও পথের নির্দেশ না হারায়।'

সন্ধ্যার আগেই অনীতার লিখবার টেবিল এলো। অনীতার কাছে বইএর সংখ্যা খুবই কম। টেবিলে সাজাবার জন্য মা বললেন, "তোর সব বই নিয়ে আয়।" কারসিয়ং থেকে যে বাক্সটা ওর সংগে এসেছিল সেটা অনীতা খুলে ফেলল। কাপড় চোপড় সব ওলটপালট করে খুঁজতে লাগল, দুচারখানা বই পাওয়া যায় কি না। শেষ পর্যন্ত কোন বই পাওয়া গেল না। বাক্স খুলেই যে বইটা একেবারে ওপরে ছিল, সেই বইখানা নিয়ে অনীতা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে টেবিলের মাঝখানে সাজিয়ে রাখল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর সব বই কোথায়?"

"পুরনো বলে সংগে আনিনি।"

"মাত্র একখানা বই?"

"হ্যাঁ মা, এ বইখানা পুরনো নয়।"

"কিন্তু টেবিলটায় একখানা বই মানাচ্ছে না যে।"

মার কাছে এগিয়ে এসে অনীতা বলল, "টেবিলের পক্ষে বইখানা বেমানান নয় মা।"

"বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।"

"না, সমস্ত বিশ্বের ফাক এবং ফাঁকি এ বইটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়।"

মা এবার টেবিলের সন্নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন। বইটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন। তিনি ভাবলেন, অনীতার শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয়েছে।

ঠাকুরদা প্রতিদিনই একবার করে আসেন আমাদের বাড়িতে। আমরা সবাই ভাল আছি জেনে তিনি নিশ্চিন্ত মনে গোয়াবাগানে ফিরে যান। আগের মত অনীতা আর ঠাকুরদার সংগে গোয়াবাগানে গিয়ে থাকতে চায় না। নুকুর জন্য পুতুল কেনবার প্রয়োজনও বোধ করে না। বড়কাকার জন্য একদা সে একটা টিন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড কিনতে চেয়েছিল, কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে অনীতা লজ্জা পায়। শৈশবের ফেলে-আসা দিনগুলোর প্রতি তেমন আর আগ্রহ নেই।

অনীতা কলকাতায় ফিরেছে শুনেই নুকু ছুটে এসেছে আমাদের বাড়িতে।

ছোট বেলাকার মত জড়িয়ে ধরেছে অনীতাকে। প্রশ্ন করেছে এক সংগে অনেকগুলো। অনীতা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে কিনা তার জন্য সে অপেক্ষা করেনি। কিন্তু নুকু লক্ষ্য করেছে, অনীতার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, বিস্ময়কর পরিবর্তন। আমার কাছে ছুটে এসে নুকু জিজ্ঞাসা করল, "দীপুদা, দিদি অনেক বদলে গেছে, না?"

"কি করে বুঝলি?"

"ওমা চোখে দেখলেই তো বোঝা যায়। তুমি তো এখন বড় হয়েছ দীপুদা, এবার থেকে তুমিই যাবে আমাকে দেখতে।"

অনীতাকে যেমন করে জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক তেমনি ভাবে নুকু আমাকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। শুনবার জন্য আমি মাথা নীচু করলাম।

"দীপুদা, কাউকে যেন কিছু ব'লো না।"

প্রতিজ্ঞা করলাম, "না, বলব না।"

"মা বলেছেন আমার যেখানে সেখানে যাওয়া চলবে না। ...আর...এখন থেকে যাকে তাকে আমি আর জড়িয়ে ধরতে পারব না।"

"কেন রে?"

ফিস্‌ফিস্ করে নুকু বলল, "প্রতিজ্ঞা করো, কাউকে বলবে না?"

"না রে।"

"আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নুক বলল, "মা বলেছেন আমি বড় হয়েছি। আমি কেন বড় হলাম দীপুদা?"

আমার বয়েসে অনুভব করা অসম্ভব হ'ল না যে, নুকু সত্যিই বড় হয়েছে। বাড়ন্ত গড়নের বাস্তবতায় নুকুর এই প্রথম লজ্জা।

ছোটকাকার জন্য বাবার এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের উদ্বেগ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। এঁরা সবাই ভেবে রেখেছিলেন, ছোটকাকা ভারতবর্ষে

আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু ঠাকুরদা তাঁ নিয়ে আর কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নি। বিন্দুমাত্র মনোবিক্ষোভের যে কোন কারণ থাকতে পারে ঠাকুরদাকে দেখে তা বোঝাই যেত না। উপরন্তু ছোট-কাকার ক্রমবর্দ্ধমান টাকার চাহিদা তিনি মেটাতে লাগলেন বিনা প্রতিবাদে। কিন্তু বাবা একদিন প্রতিবাদ করে বসলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যথারীতি ঠাকুরদা এলেন আমাদের বাড়িতে। খবর নিলেন মার কাছে কে কেমন আছে। গোরাচাঁদ আমাদের বাড়িতে কাজ করত অনেক দিন থেকে। মা বললেন, "গোরার শরীরটা ভাল নেই।"

"কেন? ঐ যে নীচে কাজ করছে দেখলাম। ওকে বারণ কর বৌমা।"

"এত করে বলি কিছুতেই কথা শোনে না।" একটু থেমে মা আবার বললেন, "দিনকাল সব হঠাৎ বদলে গেছে বাবা। কেউ কারো কথা শুনতে চায় না।"

ঠাকুরদা মুখ তুলে চাইলেন মার দিকে। তারপর সহসা যেন তাঁর দৃষ্টিতে কুয়াসা ঘনিয়ে এলো। কি যেন খুঁজছেন অথচ খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর কণ্ঠে যেন আর্তনাদ তুলে তিনি ডাকলেন, "দীপক, দীপক কোথায়? বৌমা, চৌধুরী পরিবারে আর তো কারও ছেলে হ'ল না? দীপক যদি কথা না শোনে? সে যদি স্বার্থপর হয়?"

মায়ের চোখে ত্রাসের আভাস পাওয়া গেল। অনাগত দিনের কমরেড দীপক চৌধুরী তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

•

তারপর বাবা এলেন ঘরে। মা গেলেন ঠাকুরদার জন্য ফলের রস তৈরি করতে। এবার বড়কাকার সংগে সংগে পিসেমশাইও ঘরে ঢুকলেন। পিসিমা আসেননি। ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্যামলী কই, আসেনি?"

"আমি ডিউটি থেকে আসছি।"

উনিশ-শ' বিয়াল্লিশের রাজনৈতিক আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। গান্ধিজির সংগে ইংরেজের সহযোগিতা হ'ল না। ইংরেজরা 'ডিপ্লোমাসির' দর কষাকষি করছে, কিন্তু নগ্ন ফকিরের কাছে কোন দরই মনঃপূত হচ্ছে না। তিনি ঘোষণা করেছেন, "কুইট্ ইণ্ডিয়া।"

ইংল্যাণ্ডে সেদিন মহাদুর্যোগ। বিরামহীন বিমান আক্রমণে গোটা দেশটাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরদা বললেন, "তা যাক, ইংরেজের মেরুদণ্ড ভাঙতে পারবে না।"

বাবা প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

"তুমি শারীরিক মৃত্যুর কথা হয়তো ভাবছ। কিন্তু আমি ভাবছি জাতি হিসেবে ইংরেজের চারিত্রিক কাঠাম। সে-কাঠাম যদি ভেঙ্গে পড়ে তবে সমগ্র জগতের বিপর্যয় আসতে এক মুহূর্তও লাগবে না। কিন্তু আমি জানি ভগবানের বিধানে শৈথিল্য আসা সম্ভব নয়।"

ঠাকুরদার মুখনিঃসৃত শব্দগুলোর মধ্যে গভীর বিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। বড়কাকা চোখ বন্ধ করে নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ঠাকুরদার কথাগুলো অনুধাবন করছিলেন। বাড়ি ফিরে রোমন্থন করবার বস্তু পেলেন তিনি। কিন্তু বাবা বললেন, "ইংরেজের কাঠাম না ভাঙলে, ভারতবর্ষ কি চিরদিনই তার কাছে হাত জোড় করে থাকবে?" পিসেমশাই উঠে গিয়ে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। ঠাকুরদা বললেন, "তা থাকবে না। মহাত্মাজি তাঁর জীবিত কালেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু গোটা ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জের মৃত্যুর বিনিময়ে তিনিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে চাইবেন না। আর তেমন দুর্দিন যদি আসে তবে আমাদের স্বাধীনতা যে কত ক্ষণস্থায়ী হবে সে-কথা ভাবতেও আমার ভয় হয় গৌরীশংকর। কিন্তু এসব আলোচনার দরকার কি?"

ঠাকুরদার দরকার না থাকলেও বাবার দরকার ছিল। বাবা ফস্ করে বলে বসলেন, "আমি গান্ধিজির 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি।"

[illegible]বদ্ধ ঘরটিতে সবারই ভাবভংগীতে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা [illegible] পেল। বড়কাকা শেষ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত বাবার দিকে চেয়ে [illegible]। উনিশ-শ' বিয়াল্লিশে কুইট ইণ্ডিয়া ভারতবাসীর কাছে সত্য [illegible] মহামন্ত্র ছিল। ঠাকুরদাও তা জানতেন। কিন্তু বাবার মুখ থেকে [illegible] কোনদিন উচ্চারিত হতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। [illegible] অসম্ভব। তাছাড়া ঠাকুরদা হয়ত ভাবলেন যে, বাবার সদ্য-অর্জিত রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে স্বার্থসিদ্ধির মতলব ছাড়া আর কিছুই নেই।

ঠাকুরদা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ তুমি গান্ধিজির আন্দোলনে যোগ দিচ্ছ কেন?"

বাবা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে এদেশে ইংরেজ আর খুব বেশি দিন থাকতে পারবে না। বিশেষ করে 'কুইট-ইণ্ডিয়া' আন্দোলন হয়ত গান্ধিজির [illegible] শেষ রাজনৈতিক আন্দোলন। এ-সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না।"

"আমার খুবই অবাক লাগছে গৌরীশংকর—" এই পর্যন্ত বলে ঠাকুরদা মাথা [illegible] করে ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে দেখলেন। তারপর ধীরস্থির ভাবেই [illegible], "তা বেশ। বৌমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে দু-চার মাস জেলে কাটিয়ে এসো। অতঃপর চেনা বামুনের আর পৈতে লাগবে না।"

"কিন্তু আমার যে কিছু টাকা লাগবে।"

"টাকা? কত টাকা?" ঠাকুরদা যেন সহসা একটা ধাক্কা খেলেন।

"[illegible]রা, লাখ পাঁচেক।"

[illegible]কাকার উৎসাহ বাড়ল। তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত টাকার [illegible] কেন দাদা? অর্থাৎ কুইট্ ইণ্ডিয়া আন্দোলনের সংগে টাকার কি [illegible]"

বাবা বললেন, "কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের সংগে সম্পর্ক নেই বটে তবে [illegible]তির বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমি টাকা ছাড়া দাঁড়াতে পারব না।"

ঠাকুরদা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। মাত্র পাঁচলাখ টাকার হাতুড়ি দিয়ে বাবা ভারতমাতার শৃঙ্খল ভাঙতে যাচ্ছেন ভেবে ঠাকুরদার হাসি পেল। তিনি হয়ত ভাবছিলেন যে, গৌরীশংকর এখনও আদর্শের হাতুড়ির সন্ধান পায়নি। ঠাকুরদা বললেন, "আমার টাকা নেই।"

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? জ্ঞানশংকরের নামে যে পাঁচলাখ টাকা রেখেছিলে?"

"সে-টাকাতে হাত দেওয়া যাবে না।"

ঠাকুরদার কপালে বেশ কয়েকটা রেখা ভেসে উঠল। পঁয়ষট্টি বছর বয়স ঠাকুরদার পক্ষে বেশি বয়স ছিল না। আজ যেন মনে হ'ল ঠাকুরদা ক'বছরে বেশ খানিকটা বুড়িয়ে গেছেন। সে-যুগের প্রাচীনতার মধ্যে বলিষ্ঠতাও ছিল প্রচুর। এ-বলিষ্ঠতা কেবল নির্ভেজাল খাদ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নয়, পরিচ্ছন্ন মানসিকতার চারিত্রিক নির্যাস। মুখ দেখে চরিত্র বোঝা অসম্ভব হত না।

বাবা বললেন, "ইংরেজের শোষণের ফলে আমরা তো অতি দরিদ্র হয়ে রইলাম। যা পাচ্ছে তাই লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর আমরাও যদি লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে রপ্তানি করি তা হ'লে ভারতবর্ষের অর্থভাণ্ডারে আর থাকবে কি? রাষ্ট্রের শাসনভার আমাদের হাতে এলে আমরা এর একটা ব্যবস্থা করব।"

"রাষ্ট্রের শাসনভার তোমাদের হাতে গেলেও আমার টাকার ব্যবস্থা করবার অধিকার আমারই থাকবে।"

বাবা এগিয়ে গেলেন ঠাকুরদার দিকে। বললেন, বেশ জোর দিয়েই বললেন, "একটা কথা হয়ত তুমি ভাবছ না।"

"কি কথা?"

"জ্ঞানশংকর কোন দিনও আর দেশে ফিরে আসবে না।"

"আমি কিন্তু জ্ঞানশংকরের কথা একটুও ভাবছি না।"

"তবে?"

সবাই চেয়ে রইলেন ঠাকুরদার দিকে। ঠাকুরদা জবাব দিলেন, "এ টাকা পাবে জ্ঞানশংকরের দুটি মেয়ে।"

সমস্ত ঘরখানায় এমন একটা নৈঃশব্দ নেমে এলো যে, হাত থেকে একটা আলপিন পড়ে গেলেও তার আওয়াজ শোনা যেত।

বাবাই প্রথম কথা বললেন, "জ্ঞানশংকর বিয়ে করেছে আমি তা জানতাম না।"

ঠাকুরদা বললেন, "আমিও জানতুম না। আমায় সে জানিয়েছে প্রথম সন্তান হওয়ার পর। উপস্থিত জ্ঞানশংকরের দুটি মেয়ে, এবং আর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

বড়কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সে বিয়ে করল? রক্তের মৌলিকতার ওপর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সূক্ষ্ম বিভিন্নতা আজও ধরা যায়। বৌমা নিশ্চয়ই ইংরেজ?"

"না, শ্লাভ। আদি বাড়ি লিথুয়েনিয়া। সেখান থেকে ওরা কিছুকালের জন্য জার্মানিতে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর মেয়েটি লণ্ডনে পালিয়ে আসে।"

"শ্লাভ! শ্লাভ!" কথাটা বড়কাকা বার কয়েক উচ্চারণ করলেন। ঠাকুরদা বললেন, "গৌরীশংকর, আমি আমার সম্পত্তির উইল করে ফেলেছি এবং তাতে যা ব্যবস্থা করে গেলাম সেই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। আমার সন্তানদের কাছে আমি কোন কথাই গোপন করিনি, আজও করব না। তোমরা দু'ভাই তিন লাখ করে আগেই পেয়ে গেছ।"

বড়কাকা বললেন, "ও-টাকায় আমি এখনও হাত দেইনি, বাবা।" সে কথায় কান না দিয়ে ঠাকুরদা বললেন, "জ্ঞানশংকরকে আমি একটা পয়সাও দিয়ে গেলাম না। ওর গবেষণাগারের জন্য যে পাঁচলাখ টাকা রেখেছিলাম তার প্রতিটি টাকা খরচ হবে জ্ঞানশংকরের মেয়েদের জন্য যদি ওরা ভারতবর্ষে ফিরে আসে। গৌরীশংকর, এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে, দেশের টাকা

দেশেই থাকবে।" ফস করে পিসেমশাই বলে বসলেন, "লগ্নি নিরাপদ নয়।" ঠাকুরদা বললেন, "লগ্নি নিরাপদ করবার জন্যই তোমাকে আর গৌরীশংকরকে আমি ট্রাষ্টি নিযুক্ত করে গেলাম।" বাবা একরকম চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না। এ সব দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। জ্ঞানশংকরের মেয়েদের ভার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"এত বড় রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে চাইছ, আর এতে এত ভয় কেন? তাছাড়া জ্ঞানশংকরের মেয়েদের সুশিক্ষিত করা রাষ্ট্রের ও সমাজের পক্ষে ভালই হবে। বৌমা, বৌমা—"

মা কিছু দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। মাকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বললেন, "গোয়াবাগানের বাড়ি আর তার সংলগ্ন জমিটা দীপকের নামেই উইল করে গেলাম।" পিসেমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "গৌরীশংকরের রাজনীতির জন্য কোন সম্পত্তি তবে রইল না?"

"রইল—রইল দীপক। সবচেয়ে সেরা সম্পত্তি—যাকে আশ্রয় করে চৌধুরী পরিবার একদিন মহিমান্বিত হবে।"

ঠাকুরদা চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। মাকে বললেন, "বৌমা, সব সময় মনে রেখো, বংশ রক্ষার জন্য দীপক ছাড়া আমাদের আর কেউ রইল না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন ওকে রক্ষা করেন। দীপকের মধ্যেই চৌধুরী পরিবারের বাঁচবার একমাত্র ভরসা রইল।"

বড়কাকা হঠাৎ বাবার সামনে এসে বললেন, "দাদা, রাজনীতি আমি বুঝি না। আমার তিনলাখ টাকায় যদি তোমার কোন উপকার হয় তবে টাকাটা কালই তোমাকে দিয়ে দেব।"

চুপকেটের মধ্যে দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সটান্ ভাবে দাঁড়িয়ে পিসেমশাই ঘোষণা করলেন, "লগ্নি নিরাপদ।"

সেই রাত্রিতে ঠাকুরদা আমায় সংগে করে গোয়াবাগানে নিয়ে গেলেন।

শোবার আগে ঠাকুরদা আমায় বললেন, "দীপু, এখানে তুই ফিরে আয়। গোয়াবাগানের অতীত খুব বড। অতএব ভবিষ্যতের মধ্যেও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও যদি ভেঙেচুরে গিয়ে থাকে মেরামত করে নিস। কিন্তু একে পরিত্যাগ করিস না। অতীত ভারতের সভ্যতার মধ্যেই গোয়াবাগানের ভবিষ্যৎও মহিমান্বিত হবে।"

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। খাটের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত হাত দিয়ে অনুভব করলাম, ঠাকুরদা নেই। খুবই অবাক লাগল, এমন সময় ঠাকুরদা কোথায় গেলেন! ঘরের এবং বাইরের সব বাতি নিভে গেছে।

এতো বড় বাড়ির সব রাস্তাই আমার জানা ছিল। বিছানা ছেড়ে আমি সামনের দরজা দিয়ে বারান্দায় এলাম। বড়কাকার লাইব্রেরি ঘরে দেখলাম তখনও আলো জ্বলছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম সেইদিকে। পেছনের দিকের জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম বড়কাকার সামনে একটা খোলা বই পড়ে রয়েছে। গোয়াবাগানের বাড়ির সবটুকুই আমার চেনা ছিল বলে জানতাম, কিন্তু মধ্যরাত্রির অবগুণ্ঠনের মধ্যে এ-বাড়ির রূপ আমার জানা ছিল না। কৌতূহল হ'ল দেখবার যে, বড়কাকা রাত জেগে কি বই পড়ছেন। আমার সন্দেহ হলো, বড়কাকা রাত জেগে অনুতাপ করছেন, তিনলাখ টাকা বাবাকে দিয়ে দিতে হবে বলে। বাবার ওপর আমার ভারি রাগ হ'ল। আরো বেশি রাগ হ'ল বাবার রাজনীতির ওপর। পরের টাকায় রাজনীতি করবার কি দরকার ছিল!

আমি জানলার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। টেবিলের চারদিকে ছ'সাতখানা বই পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু খোলা বইটার নাম পড়তে পারলাম না। ডান দিকের বড় বইটা হেগেল, তার পাশে বাঁদিকে সদম্ভে মাথা উঁচু করে রয়েছে কার্ল মার্কস। আমি এবার মরিয়া হয়ে উঠলাম, খোলা বইটা দেখবার জন্য। পা টিপে টিপে ডান দিকের জানলাটার খুব কাছে গিয়ে

দাঁড়ালাম। আমি স্পষ্ট দেখলাম বড়কাকা গভীর মনোযোগ দিয়ে শঙ্করাচার্য পড়ছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর অন্ধকার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। মনে হ'ল আমি যেন কয়েকটা অন্ধকার শতাব্দী পার হয়ে একেবারে নবম শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছে গেছি। দক্ষিণ ভারতের শ্রীংগেরি মঠে শঙ্করাচার্যের পদতলে বসে বড়কাকা যেন দীক্ষা নিচ্ছেন—কর্মের দীক্ষা, সত্যের দীক্ষা, মুক্তির দীক্ষা। আমি ভাবলাম ভগবানের আশীর্বাদ থেকে বড়কাকা বঞ্চিত হবেন না। জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি উপনীত হয়েছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেদিন তার অপরাহ্নের শৈথিল্য আসবে সেদিনও ভগবান তাঁকে শক্তি যোগাবেন। মিথ্যা জগতের মোহ তাঁকে কোনদিনও পঙ্গু করতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, তিনলাখ টাকার মায়া তিনি কাটিয়ে উঠবেন রাত শেষ হওয়ার আগেই।

আমি শোবার ঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম। হঠাং যেন রেডিওর আওয়াজ কানে এলো। আওয়াজ শুনে মনে পড়ল আমি ঠাকুরদাকে খুঁজতেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। শোবার ঘরের সংলগ্ন একটা আলাদা ঘর ছিল। ঠাকুরদা বলতেন, "এটা হ'ল চৌধুরী পরিবারের আর্ট-গেলারি।" আমাদের সব পূর্ব-পুরুষদের বড় বড় ছবি অতি যত্ন সহকারে এই ঘরে টাঙানো ছিল। বংশপরম্পরায় এই আর্ট-গেলারির সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ঠাকুরদা প্রতিদিন কোন না কোন সময় এই ঘরটাতে প্রবেশ করতেন এবং কিছু সময় অতিবাহিতও করতেন। আজও দেখলাম তিনি এই আর্ট-গেলারিতে বসে মধ্যরাত্রিতে রেডিও শুনছেন। বিগত পুরুষের সবাই কি আজ তাঁর সংগে বসে বেতার যন্ত্রের বার্তা শুনছেন? আমার মনে হ'ল বেতার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কার যেন এক করুণ আর্তনাদ প্রচারিত হচ্ছে। এ-আর্তনাদ আর কারো নয়, যন্ত্রদানব আজ আকাশ থেকে আগুনের শর নিক্ষেপ করছে। সভ্যতার আর্তনাদ তাই গোয়াবাগানের এক নির্জন কক্ষে মুমূর্ষ আলোয় যেন ক্রমশই করুণতর হয়ে উঠতে লাগল।

আমি দেখতে পেলাম রেডিওর ঠিক বাঁ পাশে নতুন একটা ফটো রয়েছে। আর্ট-গেলারির জন্য ঠাকুরদার এটা নতুন সংগ্রহ। তিনি এই ফটোখানার দিকে চেয়েছিলেন, চোখে মুখে তাঁর উৎকণ্ঠার ছায়া। ফটোখানা ছোটকাকা, কাকীমা, আর তাঁদের দুটি মেয়ের।

আমি গিয়ে ঠাকুরদার গা ঘেঁসে দাঁড়ালাম। চমকে উঠে ঠাকুরদা আমার দিকে চাইলেন। বললেন, "একটু আগেই লণ্ডনের ওপর ভীষণ বিমান আক্রমণ হয়ে গেল!" বি-বি-সি থেকে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। তিনি আদর করে আমাকে তাঁর কোলে টেনে নিলেন। ফটোর দিকে চেয়ে বললেন, "দীপক, সমস্ত চৌধুরী পরিবারকে বাচিয়ে রাখবার দায়িত্ব একদিন তোমায় নিতে হবে। বিমান আক্রমণ থেকে ওরা যদি বেঁচে আসতে পারে, তবে তোমার ঐ ছোট্ট বোন দুটির কথা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।" আমি বললাম, "তুমি কিছু ভেব না দাদু। তুমি যা আদেশ করে যাবে আমি কখনও তা অমান্য করব না।"

ঠাকুরদা হঠাৎ পেছন দিকে চাইলেন। বড়কাকা দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে তার একখানা চেক। তিনি বললেন, "বাবা, তোমারই টাকা, দাদাকে দিয়ে দিয়ো।" তারপর আর কোন কথা না বলে, বড়কাকা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুরদা দেখলেন ঠিক তিনলাখ টাকাই আছে, একটা টাকাও কম নেই। দার্শনিক বড়কাকাকে ঠাকুরদা আবার নতুন করে দর্শন করলেন।

স্তিমিত আলোর নীচে আধো-অন্ধকারের মধ্যে সেদিন গোয়াবাগানের বাড়িতে যে-মানুষটিকে দেখতে পেয়েছিলাম তিনি আজো আমার কাছে চির-জ্যোতিষ্মান! তুমি হয়ত জানতে চাইবে কে সেই মানুষ? ঠাকুরদা, বড়-কাকা, না আর কেউ? তুমি হয়ত প্রশ্ন করছ, 'এমন জ্যোতিষ্মানকে দেখতে পেয়েও এত বড় অন্ধকারে ডুব দিলাম কি করে?' এ প্রশ্নের জবাব তুমি পরে পাবে।

উনিশ-শ' বিয়াল্লিশের তোড়জোড় চলেছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ঠাকুরদার হাত দিয়ে বাবা বড়কাকার চেক পেয়েছিলেন গত বুধবার সাড়ে ন'টায়। বাবা অতিরিক্ত খরচা দিয়ে, নিজে ব্যাঙ্কে উপস্থিত থেকে বুধবার দিনই বেলা দুটোর মধ্যে প্রথম ক্লিয়ারিং থেকে চেকখানা ভাঙ্গিয়েছিলেন। কোনরকম গোলযোগ হয়নি। বড়কাকার স্বাক্ষর অনেক সময়ই ব্যাঙ্কে-রাখা নমুনার সংগে মিলত না। বাবা বললেন, "ভবশংকর অনেক দিন পর চেকের পাতায় স্বাক্ষর করতে শিখেছে।" পিসেমশাই বললেন "আবার ভুলে যেতে কতদিন লাগবে?" "কেন?" বাবার প্রশ্নে কৌতূহল ছিল। পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে পিসেমশাই জবাব দিলেন, "পৃথিবীর কোন ব্যাঙ্কেই ওর আর একাউণ্ট রইল না।" পিসেমশাই যেন খুব বড় রকমের একটা রসিকতা করলেন এমন ভাব দেখিয়ে বাবা খুব হাসতে লাগলেন। আসলে হাসির আলো দিয়ে বাবা তাঁর নিজের মনের অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি যে বড়-কাকাকে পথে বসিয়েছেন সে-কথা বাবা খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু এ-জানাটাও বাবার যে কতবড় ভুল সে-কথা কেবল আমিই জানতাম। সেদিন সেই নিদ্রাহীন রজনীর কোন এক মুহূর্তে বড়কাকা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, তিনলাখ টাকার চেক এক টুকরো কাগজ বই আর কিছু নয়।

উনিশ-শ' বিয়াল্লিশের আগষ্ট মাস আগতপ্রায়। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় অফিসে বাবা দু'বেলাই যাতায়াত করছেন। খবরের কাগজে বাবার বিবৃতি বেরুচ্ছে দু'একদিন পরপর।

সন্ধ্যাবেলা পিসেমশাই এলেন। বললেন, "কাল যে বিশেষ-প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দিলে তার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে। ছাপার ভুল নয়, তথ্যের ভুল।" বাবা জবাব দিলেন, "কাল আমি কোন বিশেষ-প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দেইনি, অতএব পুলিসের খবর ভুল।"

"দুঃখের বিষয় পুলিস এখন পর্যন্ত তোমার কোন বিবৃতি [illegible] না। আমি

আজ নিজেই খবরের কাগজে পড়ছিলুম।" বাবা সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর রাজনীতির মেকি টাকা পিসেমশাইর কাছে ধরা পড়ায় বাবা খুবই লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি বড় ব্যারিষ্টার, তাই সামলে নিয়ে বললেন, "জেলে যাওয়ার আগে কতগুলো বিবৃতি না দিলে জনসাধারণ আমায় চিনবে কি করে, রণদা ?"

"তোমার কি ধারণা জনসাধারণ তোমায় চেনে না ?"

বাবা বললেন, "কেন্দ্রীয় অফিসের কৃতিত্বও দেখছি বড় কম নয়। এত তাড়াতাড়ি চেনালো কি করে ?"

"নেতা হওয়ার ঐ তো সুবিধা, গৌরীশংকর। নীচু ক্লাস থেকে ওপরে উঠতে হয় না, ওপর থেকে নীচে নামতে হয়।" এবার খোঁচাটা বাবা বুঝতে পারলেন। সংগে সংগে তিনি খুবই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। ঘরের এ-কোণ থেকে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে টেবিলের সামনে বসতে যাবেন এমন সময় কোঁচার প্রান্তদেশে নিজের পা লেগে বাবা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আজ ক'দিন থেকে বাবা ধুতি পরা অভ্যাস করছিলেন। বড়কাকার চেক ভাঙ্গিয়ে তিনি কলেজ ষ্ট্রিটের দোকান থেকে বারো জোড়া ধুতি কিনে এনেছেন। কলেজ ষ্ট্রিটে সওদা করা বাবার জীবনে এই প্রথম।

বাবা এবার গোটা পাঁচেক ব্যাঙ্কের পাশ-বই বার করে লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজে যোগ-বিয়োগ অংক কষতে লাগলেন। পিসেমশাই আরাম কেদারায় শুয়ে পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে পড়ায় মনোযোগ দিলেন। একটু পর অংক কষা শেষ করে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি পড়ছ, রণদা ? আমার বিবৃতি নাকি ?"

"না, পড়ছি 'জনযুদ্ধ'।"

"কেন ?"

"পুলিসের লোক, খবর না রাখলে ওদের শায়েস্তা করব কি করে ?"

"আচ্ছা, [illegible] কম্যুনিষ্টরা তো শুনছি আজকাল ইংরেজদের বন্ধু। ওদের

রাজনীতি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ব্যাপারটা তুমি কিছু বোঝ?"

"পুরোপুরি বুঝি তা আমি বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, দেখেশুনে ওরা ভালই আছে। কেন, ওদের দলে যোগ দেবে না কি?"

"বল কি হে? ওরা তো সব পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছে!"

পিসেমশাই হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আমরা যাদের আজ পঞ্চমবাহিনী বলে গাল দিচ্ছি তারা কেবল পঞ্চমবাহিনী নয়।"

"তবে?" ব্যাঙ্কের পাশ-বইগুলো ড্রয়ারে রেখে বাবা চেয়ে রইলেন পিসেমশাইয়ের দিকে, উত্তর শোনবার জন্য। 'জনযুদ্ধ'-খানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে পিসেমশাই ঘোষণা করলেন, "ওরা সব বিশ্ববিপ্লবের স্কন্ধকাটা ফৌজ।"

"বিশ্ব বিপ্লব? কোন্ বিশ্ব? তাতে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ নেই?" তারপর তিনি একটু হেসেই বললেন, "না, না, ওরা তাহলে স্বপ্ন দেখছে, রণদা। পৃথিবীর মানুষ ঘাস খায় না।"

অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে সংবাদ প্রচারের সময় হয়েছে। সংগে সংগে বাবা রেডিও খুললেন। পিসেমশাই একটু দাড়িয়ে গেলেন। রেডিও থেকে প্রথম খবর ঘোষণা করা হ'ল: 'আজ বোম্বাই শহরে এক বিরাট জনতা পুলিসের ওপর আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ফলে ২৫ জন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আমি অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলছি। দিল্লিতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন রাজকর্মচারীর গাড়িতে আগুন লাগায়। ১৪৪ ধারা ভাঙবার জন্য কানপুরে একদল মিলশ্রমিক শোভাযাত্রা নিয়ে মিটিং করতে যাচ্ছিল। মাঝপথে পুলিস বাধা দেয়। জনতা যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে লাগল তখন স্থানীয় কম্যানিষ্ট. নেতাদের অনুরোধে শোভাযাত্রা গন্তব্যস্থলে আর পৌছতে পারেনি। আমি অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলছি।'

পিসেমশাই বললেন, "তোমাদের আন্দোলন সুরু হয়েছে।" এই সময়

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বাবা তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে নিলেন। বাবার রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে টেলিফোন এসেছে। বাবা, "হ্যালো?" ওপাশ থেকে, "ধর-পাকড় সুরু হয়েছে! একটু অপেক্ষা করুন, মিঃ চৌধুরী— হ্যালো—হাঁ, আপনার নামে একটা বিবৃতি এইমাত্র কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যালো হাঁ— কিছু টাকা আজ রাত্রেই পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকুন। যে-কোন মুহূর্তে আপনাকেও রওনা হতে হবে। হাঁ, হাঁ, নমস্কার।" বাবা টেলিফোন রেখে পিছন দিকে চেয়ে দেখেন পিসেমশাই চলে গেছেন। বাবা ডাকতে লাগলেন, "দীপক,—।" আমি সাড়া দিলাম না। বাবা উত্তেজিত ভাবে স্বর চড়িয়ে আবার ডাকলেন, "মীরা, মীরা—।" এবার আমরা এক সংগে ঘরে ঢুকলাম। কুইনস পার্কের অন্যান্য বাড়িগুলোতে সবাই যখন ডিনার খেতে বসেছে, বাবা তখন এ-অঞ্চলে ভারতমাতার একমাত্র সন্তান যার ডিনার খাওয়া হয় নি। তিনি উত্তেজিত হয়ে মাকে বললেন, "আমার বোধহয় যাওয়ার সময় হ'ল।"

মা স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়?"

"ইংরেজের কারাগারে। পিগ্‌স্কিনের ছোট স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও, মীরা।" মা যেন মনে করলেন, জেলে যেতে হবে বলে বাবার ভীষণ ভয় হয়েছে। তাই মা সাহস দিয়ে বললেন "ঠাকুরজামাইকে বলো না। তিনি তো পুলিসের বড় কর্মচারী। তিনি চেষ্টা করলে তোমাকে হয়ত আর জেলে যেতে হবে না।" বাবার সমস্ত মুখের ওপর যেন নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল। একটু পর বাবা বললেন, "বাঁদিকের ড্রয়ারে সবগুলো পাশ-বই রইল। প্রায় সব টাকাই তোমার নামে রেখে গেলাম। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকেই সংসার খরচের টাকা তুলবে। অন্য ব্যাঙ্কে হাত দেওয়ার দরকার নেই। জেলে আমি ছমাস কি একবছরের বেশি থাকব না।" আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যেমন প্রেসিডেন্সিতে পড়ছ তেমনি পড়তে থাকবে। কলকাতায় যদি খুব বেশি গণ্ডগোল হয়, তবে তোমরা দাদুকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে

যেও। মীরা, আমার স্যুটকেসগুলো গুছিয়ে দাও। সামনে শীত আসছে। অস্ট্রেলিয়ান উলের গরম মোজাটা দিতে যেন ভুলে যেয়ো না।"

এই সময় আবার টেলিফোন এলো কেন্দ্রীয় অফিস থেকে। বাবা, "হ্যালো? স্পিকিং—।" ওপাশ থেকে, "আপনি তৈরি হয়ে থাকুন।" বাবা, "পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি। দেখুন, বিবৃতির মধ্যে আজে-বাজে কথা লেখেননি তো?" ওপাশ থেকে, "পাগল নাকি! যিনি বিবৃতি লেখেন তিনি তো আজীবন কেবল ভারতীয় ফৌজদারি আইন মুখস্থ করে আসছেন! হ্যালো—হঁ্যা. আপনি কতদিন জেলে থাকবেন ঠিক নেই। তাই উনি বলছিলেন, অন্ততঃ বছর খানেকের জন্য ওঁর টাকার সংস্থান করে যাবেন। হ্যালো, আচ্ছা, আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

অশান্ত মনে বাবা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে আমার মামা বিশ্বনাথ রায় টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে এসে ঘরে ঢুকলেন। বাবা ছুটে এসে মামার হাত চেপে ধরলেন।

"তোমার অফিসে খবর দিয়েছিলাম একবার আসবার জন্য! এত দেরি করলে কেন?" মামা টুথপিকটা দাঁতের ফাঁকে আটকে রেখে বললেন, "গ্রেট ইষ্টার্ন থেকে একেবারে ডিনার শেষ করেই এলাম। তা বলো, ব্যাপার কি?" মামা পুনরায় দাঁত পরিষ্কার করতে লাগলেন। সে-যুগে কলকাতায় আমার মামার নাম ছিল খুব। নিঃসন্তান আচার্য প্রফুল্ল রায়ের ঘে-ক'টি 'ইনডাষ্ট্রিয়াল সন্তান' বাংলা দেশের উন্নতি করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার মামা, বিশ্বনাথ রায়, ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাস করবার পর তিনি একদিনে তিনটে যৌথ কোম্পানির প্রসপেকটাস খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেন। অনুমোদিত মূলধনের মোট অংক ছিল প্রায় বিশ লাখ টাকা। দশ বৎসর সাধনার পর শেয়ার বিক্রির ফলে আদায়ীকৃত মূলধন উঠল প্রায় পনর লাখ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কটন মিলের জন্য শ'পাঁচেক তাঁত কিনলেন,

বাকি দুটো কোম্পানির দরজা বন্ধ হ'ল। যৌথ কোম্পানির ভারতীয় আইন অনুসারে এবং বাবার আইন-প্রয়োগের কৌশলে মামার অঙ্গে একটুও দাগ লাগল না। কিন্তু বাংলা দেশের অনেক লোকের আর্থিক অঙ্গ পুড়ে গেল চিরদিনের জন্য।

তারপর তাঁর শিল্পসাধনা আরও পাঁচ বছর চলল। পাঁচ শ' তাঁত থেকে লাভ তিনি কিছুতেই করতে পারছিলেন না। এমন সময় হিটলার গ্রহ তাঁর ভাগ্যাকাশে তুঙ্গে উঠে বসল।

বিশুমামা শিল্পজগতে কৌলীন্য অর্জন করলেন। কটনমিল থেকে তাঁর কৌলীন্য এল না, এল কনট্রাক্ট থেকে। ওয়র সাপ্লাই! বহু টাকা রোজগার করলেন তিনি। আসলে যুদ্ধের সময় রোজগার করবার দরকার হ'ল না, টাকা এমনিতেই আসতে লাগল। টাকা যত বাড়তে লাগল, তিনি নতুন কল-কারখানা গড়বার কল্পনা কমাতে লাগলেন তত বেশি। শেষ পর্যন্ত কল্পনার শেষবিন্দু মুছে দিয়ে তিনি পরিকল্পনায় মনোযোগ দিলেন। দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বড় বড় হোটেলে ব'সে তিনি বিরাট পরিকল্পনার খসড়া অপরকে শোনাতে লাগলেন এবং অপরের খসড়া তিনি নিজেও শুনতে লাগলেন।

মামা যখন আরাম কেদারায় বেশ আঁটসাঁট হয়ে বসলেন, বাবার ছোট সুটকেস গোছান তখন প্রায় শেষ হয়েছে। বাবা বললেন, "দেখো বিশু, আমার এই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মূলে কিন্তু তুমি?" চোখ না খুলেই মামা বললেন, "অস্বীকার করব না। এর পেছনে যে পরিকল্পনা রয়েছে যুদ্ধ থেমে গেলে তার মর্ম বুঝবে।"

"কিন্তু তুমি নিজে কেন জেলে যাচ্ছ না বিশু?"

মামা পকেট থেকে টুথপিক বার করলেন। গ্রেট ইষ্টার্ন থেকে আসবার সময় প্রতিদিনই তিনি অনেকগুলো টুথপিক নিয়ে আসতেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধে ইংরেজ জিতবেই! কিন্তু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব ইংরেজ নিজের থেকেই স্বাধীনতা আমাদের দিয়ে যাবে। এবার ব্যাপারটা বোঝ।" বলেই

আবার তিনি মাংসের টুকরোগুলো দাঁত থেকে বার করতে লাগলেন। বাবা বললেন, "ব্যাপারটা তুমিই তো বোঝ। সুতরাং জেলে যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকেই আবার একবার শুনতে চাই।" মামার ঘুম আসছিল, তবু তিনি বললেন, "ইংরেজ চলে গেলে এদেশ শাসনের ভার আমাদের হাতেই থাকবে। জেল-খাটার টিকিট যদি তোমার আগে থেকেই নেয়া থাকে তবে ভারতবর্ষের না হোক বাংলা দেশের মন্ত্রী তুমি হবেই।" মামা হাই তুলতে লাগলেন। ক্রমাগত হাই তোলবার মাঝখানের সময়টুকুতে তিনি কথা বলছিলেন। "গৌরীশংকর, তোমার কাছে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে। সুতরাং তোমাকে আমি কোনদিনও বিপদে ফেলব না।"- আবার হাই তুলবার পর বললেন, "হাঁ, কি বলছিলাম? ও, মন্ত্রী তুমি হবেই।" এরপর মামার তন্দ্রা এলো। তারপর হোঁচট খাওয়ার মত সমস্ত দেহটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ওপরের দিকে তুলে বললেন, "হাঁ, আর আমি নিজে কেন জেলে যাচ্ছি না, সে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—।" কথাটা অসমাপ্ত রেখে টুথপিকটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, "—উত্তর হচ্ছে, আমি রাজনীতি বুঝি না।"

মামা যাওয়ার জন্য উঠলেন। যেতে যেতে বললেন, "কোন ভয় নেই। বছর খানেক ঘুরে এস। এদিকে সবই আমি দেখাশোনা করব। যাই বল, তুমি আমার বোনের স্বামী তো।" দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। নতুন একটা টুথপিক বাবার দিকে তুলে ধরলেন। বাবা বললেন, "আমার এখনও ডিনার খাওয়া হয় নি।"

"বড্ড বেশি রাত হয়ে গেছে, বড্ড বেশি রাত হয়ে গেছে। খেয়ে নাও।" বিশুমামা সে-রাত্রির জন্য আমাদের বাড়ি থেকে অন্তর্হিত হলেন।

কলকাতার রাস্তায় ট্রাম পুড়ছে। ট্রাম কোম্পানির আদায়ীকৃত মূলধনের পুঁজি অনেক। মুনাফা ও মুরুব্বির জোরে এ-লোকসান কোম্পানি নিশ্চয়ই

পুষিয়ে নেবে। টিকিট প্রতি এক পয়সা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে উনিশ-শ' বিয়াল্লিশের পুরো লোকসান ট্রেনে তুলে নিতে এক বছরও লাগবে না। বাড়তি ভাড়া আমাদেরই দিতে হবে।

সকালবেলা সাইকেল নিয়ে রাসবিহারী এভিনুর দিকে সফর করতে বেরিয়েছিলাম। ত্রিকোণ পার্কের পাশে ছেলেদের ট্রাম আক্রমণের পূর্বাভাস দেখতে পেলাম। পেট্রলের টিন নিয়ে ওরা অপেক্ষা করছে প্রথম ট্রামের জন্য। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে কালোবাজারে এক গ্যালন পেট্রল পাঁচটাকায় পাওয়া যেত।

পূবদিক থেকে একটা পুরনো ট্রাম হেলেদুলে গদাই-লস্করি চালে এদিকেই আসছিল। বাচ্চা ছেলেরা তৈরি হচ্ছিল। কে একজন হঠাৎ বলল, "এটা পুরনো ট্রাম--যেতে দে। পুরনোর গায়ে আগুন দিয়ে সুখ হবে না মনে করেই ওরা দাঁড়িয়ে রইল নিষ্ক্রিয় হয়ে। এই সময়ে একটা ট্যাক্সি থেকে এক ভদ্রমহিলা নেমে এলেন। বংকিমবাবুর কপালকুণ্ডলার সংগে দেখলাম মহিলাটির বেশভূষার সাদৃশ্য আছে। ভাড়া গুণে নিয়ে সাবধানী ট্যাক্সিওলা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। মহিলাটি এসে বাচ্চা ছেলেগুলোকে উত্তেজিত করতে লাগলেন, "ইংরেজের ট্রামে আগুন লাগিয়ে দাও!"

পুরনো ট্রাম নিশ্চিন্ত মনে এসে দাঁড়াল ত্রিকোণ পার্কের পূব দিকের কোনায়। ছেলেরা পেট্রল দিয়ে আগুন লাগাল। চারদিকে হৈচৈ সুরু হয়ে গেছে। পেছনদিকে চেয়ে দেখি মহিলাটি একটি ট্যাক্সি চেপে পুনরায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। একজন বৃদ্ধ আরোহী আগুন দেখে দ্বিতীয়শ্রেণীতে বসে চিৎকার করতে লাগলেন। আমি আমার সাইকেলটাকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বৃদ্ধকে নামিয়ে নিয়ে এলাম। তিনি যাচ্ছিলেন কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে।

পাশের রাস্তায়, বেশ খানিকটা দূরে, একজন যুবক নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে সিগ্যারেট টানছিলেন। যে-কোন মুহূর্তে পুলিস আসতে পারে মনে করে

আমিও সেই পাশের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। যুবকটিকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ পলাতকা সন্ন্যাসিনীটি কে যিনি ট্যাক্সি করে এসে আবার ট্যাক্সি চেপেই চলে গেলেন?" প্রাণপণে সিগারেটে টান দিয়ে তিনি বললেন, "কোন্ এক রাজনৈতিক দলের মহিষমর্দিনী। অনেকদিন থেকে পুলিস ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভারতবর্ষের ভাগ্য ভাল, তিনি নিঃসন্তান।"

কোন কথাই আমার মাথায় ঢুকল না। সাইকেলে চেপে আমি রাসবিহারী এভিনু পার হয়ে চলে গেলাম লেকের দিকটায়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, কোন্ সময় বাবা গ্রেপ্তার হন তার ঠিক নেই।

আজ তিন চার দিন হ'ল কলকাতার চারদিক থেকে অরাজকতার খবর আসছিল। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়ে কেউ বা ভয়ে আঁৎকে উঠেছে, কেউ বা ভেবেছে স্বাধীনতা আসতে আর কয়েক ঘণ্টা বাকি।

কিন্তু সেই রাত থেকে মামা চলে যাওয়ার পর বাবা ক্রমাগত ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চলেছেন, তার যেন বিরাম নেই। তিনচারদিন থেকে আন্দোলন সুরু হয়েছে অথচ আজো পুলিস এলো না বাবাকে গ্রেপ্তার করতে। মাঝে মাঝে তিনি রেগে গিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে টেলিফোন করছেন। ওপাশ থেকে বলে পাঠাচ্ছে যে, আগামীকালের বিবৃতি বেশ কড়া রকমের হবে তখন পুলিস গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে।

এদিকে মা বাবাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছেন। গোছানো সুটকেস সামনে পড়ে রয়েছে আজ চারদিন থেকে। শেষ পর্যন্ত মাও বাবার সংগে সংগে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।

হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, "বিশুর ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও ফাঁক আছে। অনর্থক চারটে দিন নষ্ট হ'ল। গুটি পাঁচেক মক্কেল ফিরিয়ে দিয়েছি।" মা বললেন, "এক কাজ করলে হয় না? ঠাকুরজামাইকে ডাকো। তিনি তো পুলিসের ডেপুটি কমিশনর, চেষ্টা করলে তিনি হয়ত তোমায় জেলে

পাঠাতে পারবেন। নইলে রাস্তায় গিয়ে তোমাকেও ট্রাম পোড়াতে হয়।” বাবা রেগে গিয়ে বললেন, “অসম্ভব! ফৌজদারি আইনের মারপ্যাচ তুমি তো বুঝবে না, মীরা। সে থাক, রণদাকেই একবার ডেকে পাঠাচ্ছি।”

ঠিক এই সময় পিসেমশাই এসে উপস্থিত। একটু বিশ্রাম করবার জন্য মা বাবাকে পিসেমশায়ের হাতে তুলে দিয়ে বাইরে গেলেন। পিসেমশাইকে পেয়ে বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন! বাবা বললেন, “রণদা, তোমাদের পুলিশ বিভাগের কাজ ঠিক মত হচ্ছে না।” পিসেমশাই তার জবাব দিলেন, “কাল ভোরের দিক থেকে সব ঠিক মতই হবে। বিশু রায় সব ম্যানেজ করেছে। তোমার বিবৃতিতে কোন ফল হয়নি।” হাত দিয়ে আকাশ ছোঁয়ার মত আশা নিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, “তার মানে?”

“কাল ভোরেই আমরা আসব তোমায় গ্রেপ্তার করতে। রাসবিহারী এভিন্যুতে ত্রিকোণ পার্কের কাছে আজ যারা ট্রামে আগুন লাগিয়েছে তারা সব তোমার কাছ থেকেই আদেশ পেয়েছিল।”

“বাজে কথা ব'ল না। ট্রাম পোড়াবার নির্দেশ গান্ধিজির নেই। আর তাছাড়া আজ চারদিন থেকে আমি এক মিনিটের জন্যও এ-ঘরের বাইরে যাইনি।”

“কিন্তু বিশু তোমাকে দিয়ে যে কোন্-দেশ উদ্ধার করাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, গৌরীশংকর।”

বাবা এবার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। অন্তত হাতপাগুলোর জড়তা যেন তাঁর অনেকটা কাটল। পিসেমশাই আসবার আগে দরজার বুকে [illegible] বাবাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, রাজশেখর বসু কোনোদিন হয়ত বাবাকে চিনতে [illegible] একটা ছোটগল্প লিখে ফেলবেন। বাবা অত্যন্ত যে তাঁর মুখের পরি[illegible]শাইকে বললেন, “ব্যারিষ্টারিতে আমার আর মন নেই। হয়েছে। দুঃখী মক্কেলরা আমায় এত বেশি টাকা দিয়েছে যে, তারা অসুবিধে হ'ল না করবার সুযোগ দেয়নি। টাকায় টাকার নেশা বাড়ায়,

কিন্তু আমার বাড়িয়েছে একঘেয়েমি। কোন রকমের একটা এডভেঞ্চার না হলে আমার বাঁচবার কোন অর্থ হয় না।" পিসেমশাই সহসা কোন মন্তব্য করলেন না। প্রত্যেকটা কথা হয়ত তিনি ভেবে দেখছিলেন। রাজনীতির মধ্যে বাবা এডভেঞ্চার খুঁজছেন এ-কথা ভেবে তিনি খুসীই হলেন। পিসেমশাই ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশু নিজে কেন জেলে যাচ্ছে না?"

"বিশু বলেছে সে রাজনীতি বোঝে না।"

বাবার কথা শুনে ডেপুটি কমিশনার হো হো করে হেসে উঠলেন।

সারা রাত বাবা ঘুমতে পারলেন না। ভোর হওয়ার দু'তিন ঘণ্টা আগে মা বললেন, "এক ঘণ্টা অন্তত ঘুমিয়ে নাও। ওরা এলে আমি ডেকে দেব।" বাবা বললেন, "একেবারে জেলে গিয়েই ঘুমব।" ডানকার্কের পর বিলেতের প্রধানমন্ত্রীও দু'এক ঘণ্টা ঘুমতে পেরেছিলেন বোধ হয়।

ভোররাত্রেই পুলিস এলো। পূব আকাশে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছিল। ওরা আসবার আগেই বাবার দাঁতমাজা ও চান করা শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে টেলিফোনযোগে তিনি খবর পেয়েছিলেন, আগামীকালের খবরের কাগজে তাঁর ফটো বেরবে। 'বোর্ন এণ্ড শেফার্ড' থেকে ফটো তুলে তিনি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুলিস যখন যথারীতি খানাতল্লাশি আরম্ভ করল, বাবার তখন চুল আঁচড়ান শেষ। দরজার পাশ থেকে মা চেয়ে দেখলেন ধুতির সংগে মানানসই করবার জন্য বাবা মাথার মাঝখান দিয়ে সোজাভাবে সিঁথি কাটছেন। মা দেখলেন বাবার চেহারা বদলে গেল!

তাড়াতাড়ি টেলিফোন করে মা ঠাকুরদাকে খবর দিলেন [illegible] বলেছিলেন খবরটা দিতে। কুইনস্ পার্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় কোথাও ফাঁক সমারোহ না থাকলে, বাবার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মকেল [illegible] হওয়ার পর পুলিসের খানাতল্লাশি এ-অঞ্চলে এই প্রথম। [illegible] ডাকো। 'প্রথমে'র মধ্যে খানিকটা উন্মাদনা থাকে। ভালমন্দ [illegible] তোমায় ডেকে

সবাই যেন খানিকটা চমকে যায়। কুইনস্ পার্কের মানুষরাও চমকে গেল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব কিছু তল্লাশি শেষ হয়ে গেল। বাবার 'ব্রেকফাষ্ট' খাওয়াও আর বাকি রইল না।

কেন্দ্রীয় অফিস থেকে লোক এসেছে প্রায় পঞ্চাশজন। তারা সব ট্রামে চেপেই এসেছিল। বিড়লা পার্কের কাছে ভুল করে নেমে পড়েছে ওরা। এ-পাড়ায় এদের কোন দিনই আসতে হয়নি—তাই সঠিক করে রাস্তাটা খুঁজে বার করতে পারেনি। নইলে, ট্রামে চেপে ওরা আরও খানিকটা এগুতে পারত।

রাস্তার মোড় থেকেই জনতা জয়ধ্বনি করতে আরম্ভ করল। বাবা তখন চায়ে শেষ চুমুক দিয়েছেন। মুখ মুছে তিনি ঘোষণা করলেন, "চলুন, আমি প্রস্তুত।" এর মধ্যেই ঠাকুরদা এসে গিয়েছিলেন। তিনি খুব অবাক হয়েই এ-দৃশ্য দেখছিলেন। পুলিশ-পরিবেষ্টিত হয়ে বাবা বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কেন্দ্রীয় অফিসের জনতা তখন ক্রমাগত জয়ধ্বনি করছে। জনতার মধ্যে থেকে কে-একজন বাবার ছবি তুলতে গিয়ে হঠাৎ ঠাকুরদার দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে নিল ঠাকুরদার দিকে। ঠাকুরদার মুখ নিশ্চয়ই 'ফটোজেনিক'। বাবা এসে অপেক্ষমান মোটরগাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে থেকে একটি বিগতযৌবনা মহিলা বাবার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। ফুলগুলো খুব টাটকা নয়।

মানুষ যে কত বেশি অবাক হতে পারে ঠাকুরদাকে দেখে সেদিন আমি বুঝেছিলাম। তিনি ধীরে ধীরে এসে বাগানে নামলেন। মনে হ'ল তিনি যেন বাবাকে চিনতে পারছেন না। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটেছেন বলেই যে তাঁর মুখের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। বাবার বোধ হয় সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে। দুঃখী ভারতমাতার অনুগত সন্তান বলে বাবাকে চিনতে আর অসুবিধে হ'ল না। চিরদিনের চেনা মানুষকেও অনেক সময় চেনা যায় না।

বাবা গাড়িতে উঠলেন। বিরামহীন জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে পুলিশের গাড়িগুলো গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল। আমার চোখে জল এলো। কেবল শেষ মুহূর্তে বাবাকে দেখে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন জেল থেকে রাজনীতির সীমা উত্তীর্ণ হয়ে আসেন।

ঠাকুরদার যখন বিস্ময় কাটল, আমার ঘাড়ে হাত রেখে সামনের দিকেই চেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপু, ও কে গেল রে?" শেষ মুহূর্তে ঠাকুরদাও তাঁর সন্তানকে চিনতে পারেননি।

আমি মনে মনে বললাম, "হে ভগবান, মুহূর্তের এই না-চেনাটাই যেন বাবার জীবনে চিরদিন সত্য হয়ে থাকে।"

বাবা জেলে যাওয়ার পর মাস তিনেক পর্যন্ত বড়কাকা কুইনস্ পার্কে আর আসেননি। তিনলাখ টাকার চেক লিখে দেওয়ার পর তিনি হয়ত আর এদিকে আসবার প্রয়োজন বোধ করেন না। গত ক'মাসে তাঁর চেহারা বদলে গেছে। অনেক রোগা হয়ে গেছেন, দৃষ্টি গভীর হয়েছে। বড়কাকা দাড়ি রেখেছেন। কাকীমার সংগে পরামর্শ না করে কেন তিনি দাড়ি রাখলেন তাই নিয়ে দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে—সে-খবর নুকু আমাদের দিয়ে গেছে। সাংসারিক মনোমালিন্য মিটে যেতে অবশ্য বেশি দিন লাগেনি। বড়কাকার নতুন চেহারা পুরনো হতে কেবল কয়েকটা দিনই লাগল। কিন্তু নুকু তার বাবাকে ক্ষমা করেনি। বড়কাকাকে দাড়িতে একেবারে মানায় না, এ-কথা নুকু সবার কাছে প্রতিদিনই সুযোগ পেলে একবার করে ঘোষণা করে। বাইরের সৌন্দর্যের প্রতি নুকুর গভীর অনুরাগ, একথা প্রচার করতে ওর সুযোগের দরকার হয় না। তাই নিজের সাজসজ্জার প্রতি ওর নিজের আয়োজন বড় কম নয়।

নুকু প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছে। বড়কাকা ট্রামে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে ও পড়তে আসেন। দু'এক ঘণ্টার বেশি ছাত্রদের পড়াতে হয় না। বাকি সময়টা তিনি লাইব্রেরিতে কাটান। বড়কাকা নুকুকেও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করেছেন। ঠাকুরদা বড়কাকাকে বলেছিলেন একটা গাড়ি কিনে নেওয়ার জন্য। বড়কাকা রাজি হননি। তিনি বললেন, "নুকু আমার সংগে এক-ট্রামেই যাবে, আবার এক-ট্রামেই ফিরে আসবে। তাছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। ট্রামে করে যাওয়া-আসা করা নুকু অভ্যাস করুক।"

অনীতা আই. এস-সি. পড়ছিল। প্রথম প্রথম সে গাড়ি করেই কলেজে যেত। তারপর হঠাৎ অনীতা একদিন বলে বসল, "আমি ট্রামে করে কলেজে যাব মা।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কষ্ট হবে না?"

"নুকুর যখন হয় না তখন আমারও হওয়া উচিত নয়।"

অনীতার কথা শুনে মা মনে মনে গর্ব বোধ করেন। তিনি ভাবেন, আজকালকার সমাজে অনীতার মত মেয়ে সত্যিই দুর্লভ।

মার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচীতেও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর মনে ধর্মানুষ্ঠানের আবেগ এসেছে। তিনি তিনতলার ঘরখানা নিজের হাতে পরিষ্কার করেছেন। বালতিতে করে জল তুলেছেন তিনি একলাই। বাজার থেকে ঝাড়ন কিনে এনেছেন, তাই দিয়ে মেজেটা পরিষ্কার করেছেন আয়নার মত ঝকঝক করে।

ঠাকুরদার সংগে দু'দিন পরামর্শের পর ঠিক হ'ল, মা ছাদের ঘরে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। ঠাকুরদা বললেন, "বৌমা, বিগ্রহ যদি প্রতিষ্ঠা কর তবে যত ঝড়ই আসুক, বিগ্রহ ফেলে কোনদিনও পালাতে পারবে না।" মা বললেন, "না, তা পালাব না বাবা।" ঠাকুরদা মাকে আশীর্বাদ করলেন। জগদ্ধাত্রী-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হ'ল আমাদের বাড়ির তিন তলার ছাদে।

ঠাকুরদা নিজেই বড়কাকার লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে খবরটা তাঁকে জানালেন। বড়কাকা তখন একটা চাদর জড়িয়ে চেয়ারের ওপরে জোড়আসন কেটে দর্শনের বই পড়ছিলেন। কথাটা শুনে বড়কাকা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "জগদ্ধাত্রী কোন্ শতাব্দীর বিগ্রহ বাবা?"

"ভবশংকর, মানুষের বিশ্বাসের ওপর শতাব্দীর মর্যাদা নির্ভর করে। কিন্তু কোন বিশেষ শতাব্দীর ওপর মানুষের বিশ্বাস নির্ভরশীল নয়।"

বড়কাকা যেন এতক্ষণ ঘুমচ্ছিলেন। মাথাটা হঠাৎ ঠাকুরদার দিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তোমার যদি অসুবিধা না হয় তবে এই মাত্র যা বললে সেটা আর একবার বলবে কি?" বৃদ্ধ ঠাকুরদা মনে মনে কথাগুলো গুছতে লাগলেন। এমন সময় বড়কাকাই আবার বললেন, "বাবা, অনাদি ও অনন্ত সত্যকে তো দর্শনের মধ্য দিয়েই দেখতে হবে। শঙ্করাচার্য তাই দর্শনশাস্ত্রকে সেই সত্য পরখের শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্যে তিনি সেই পরম সত্যের সন্ধান

পেয়েছিলেন। অথচ হিন্দুসমাজ আজ আদর্শভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট। ঘাসের চাপড়ার মত মাটি থেকে আলগা হয়ে আছে। অতএব দর্শনের আলো দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে আমাদের জগদ্ধাত্রী পূজা খাঁটি কি না এবং সর্বশক্তিমানের সংগে তার যোগাযোগ কতটুকু। আমাদের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে বাবা।"

"এ-কথা কেন বলছ ভবশংকর ?"

"মাঝে মাঝে জ্ঞানশংকরের চিঠিখানা আমি পড়ি। আমার কি মনে হয় জানো বাবা ? আমরা আবার সত্যের পথ হারিয়ে অন্ধকার যুগের দিকে পা বাড়িয়েছি। ইউরোপে এই যে যুদ্ধবিগ্রহ ও আদর্শের উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু হয়েছে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।" ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ভাবছ হিটলার কিংবা মুসলিনি জয়ী হবেন ?"

"না বাবা। আমি ভাবছি উনিশ-শ' সতেরো খৃষ্টাব্দের রুস-বিপ্লবের কথা। এই বিপ্লবের আগুন রুসিয়ার সীমা অতিক্রম করবে।" এই পর্যন্ত বলে বড়-কাকা চুপ করে রইলেন। ঠাকুরদা বললেন, "সোভিয়েট রাষ্ট্রে শুনেছি ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা নেই। ওরা ভগবান বিশ্বাস করেন না। ভয় পাওয়ার সত্যিই কারণ আছে ভবশংকর।"

"ওরা ভগবান বিশ্বাস করেন না বলে আমি খুব ভয় পাচ্ছি না। আসল ভয় হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেও শৈথিল্য এসেছে। বাবা, তোমার কি মনে হয় না যে, ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা যদি রাষ্ট্র গড়তে যাই, তা হ'লে প্রকৃতপক্ষে আমরা আবার বর্বর যুগেই ফিরে যাব ?"

"সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। তেমন রাষ্ট্রে আমি অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও বাঁচতে চাইব না। তা ছাড়া জীবনের তবে অর্থ রইল কি ? ভবশংকর, তেমন দিন আসবে বলে কি তুমি কল্পনা করছ ?"

"কল্পনা ?" প্রশ্নটা যেন বড়কাকা নিজের কাছেই উপস্থাপিত করলেন। তারপর বললেন, "কল্পনা নয় বাবা। সভ্যতার প্রথম দিকে আমরা দেখতে

পাই যে, যুদ্ধবিগ্রহের মূলে আদর্শের চাইতে অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সুবিধার অন্বেষণ থাকত বেশি। সেইজন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যে অস্ত্রের সংঘর্ষটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম। এখনকার দিনে বিশেষ কোন আদর্শের বীজ স্বদেশের মাটিতে রোপণ করার চেষ্টাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রদূত বলে ধরা যেতে পারে। অস্ত্রের প্রয়োজন খুব বেশি নয়। জাতীয় কৃষ্টির মাটি ভেদ করে যখন বীজ থেকে গাছ জন্মাবে তখন দেখবে আমরা সব দুর্বল হয়ে বসে আছি। এ এক অদ্ভুত পদ্ধতি বাবা! পৃথিবীর বুকে এর নতুন প্রয়োগ চলেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতাকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করার ভয়াবহ টেকনিক!"

"তোমার কথা শুনে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম ভবশংকর।"

"বিচলিত হওয়ার কারণ আছে। আমাদের সামাজিক জীবনে আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এত বেশি অভাব ঘটেছে যে, আমার বিশ্বাস, রুস-বিপ্লবের মার্কসীয় আদর্শ আমাদের গ্রাস করবে। করবে এই জন্য যে, আমাদের জীবন থেকে ধর্ম লোপ পেয়েছে। আমরা ধর্মচ্যুত, কিন্তু উপধর্মে বিশ্বাসী।" ঠাকুরদা বললেন, "জ্ঞানশংকরের চিঠিখানার মর্মার্থ আজ আমি বুঝতে পারছি।"

"হাঁ বাবা, ঐ চিঠিতে মার্কসীয় আদর্শের কিঞ্চিৎ নমুনা আছে। জড়বাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা ভরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে, পদার্থের পরে আর কিছু নেই। সেই জন্যই জ্ঞানশংকর মেটাফিজিক্সকে ভাঁওতা বলেছে এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছে যে, আমি যেন আমার ভগবান ও আত্মাটিকে গোয়াবাগানের অন্ধকারে ফেলে যাই। বাবা, আমাদের দুঃখের দিন সত্যই সমাগত।"

এই সময় কুকু ছুটে এলো লাইব্রেরি ঘরে। বলল, "বাবা, শিগ্‌গীর এস, মার বোধহয় অসুখ বেড়েছে।" আজ প্রায় এক মাস থেকে কাকীমা শয্যাগত। বাবা আর ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন কাকীমার ঘরে। কাকীমা সংজ্ঞা হারিয়েছেন। ঠাকুরদা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে

রইলেন। ডাক্তারের চিরপরিচিত টেলিফোন-নম্বর কিছুতেই তিনি মনে করতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই সব গুলিয়ে গেল।

কাকীমা যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন ঠাকুরদা তখনও টেলিফোন হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আসলে বোধহয় টেলিফোন হাতে নিয়ে ঠাকুরদা কোন এক অদৃশ্য জগতের নম্বর স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলেন। ভগবানের তো কোন নম্বর নেই! কথাটা ভাবতে গিয়ে ঠাকুরদা খুবই আশ্চর্যবোধ করলেন। তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি ঠিক করতে পারলেন না এখন তাঁর কি করা উচিত। দু'পা কাকীমার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার তিন'পা পিছিয়ে আসছেন। মন তাঁর কি চাইছে তিনি যেন কিছুতেই সঠিক করে বুঝে উঠতে পারছেন না। মুকুর কান্না তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি অনেক রকমের কান্না শুনেছেন, অনেক রকমের সুর। বৌমা নেই, সবই যেন ফাঁকাফাঁকা লাগছে তাঁর। কিন্তু জগতটা তো ফাঁকা নয়, ভাবলেন ঠাকুরদা।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা ঐখানেই বসে পড়লেন। বসে পড়ে চোখ মুদ্রিত করে জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, কাকীমার আত্মার যেন কল্যাণ হয়। মা আর অনীতা যখন এলেন তখনও ঠাকুরদার চোখ মুদ্রিত। কেবল চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছে।

মাঝে মাঝে আমি গোয়াবাগানের বাড়িতে এসে থাকি। বাবাকে কাকীমার মৃত্যু-সংবাদ জানানো হয়েছে। ঠাকুরদার কাছে বাবা তার জবাব দিয়েছেন। ঠাকুরদার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে অনেক। লেখাপড়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। রেডিওর সামনে বসে জগতের খবর রাখবার চেষ্টা করেন। বাবার চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "তুই পড় তো দীপু।" বাবা বাংলাতে চিঠি লিখেছেন।

বাবা লিখেছেন, "মর্মাহত হবার মত খবর। তুমি যখন কাছেই রয়েছ তখন মুকু ও ভবশংকরকে সান্ত্বনা নিশ্চয়ই তুমি দেবে।

"এ যাবৎ কাল গোয়াবাগানের বাড়িতে অসময়ে কোনরকম বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেনি। বৌমার মৃত্যু সে-নিয়মের ব্যতিক্রম। ভবশংকর দার্শনিক। এ-মৃত্যু সে কিভাবে নিয়েছে কলকাতায় গিয়ে আমি তা বঝবার চেষ্টা করব। শুনলাম হুকু গায়ে পায়ে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওর বিয়ের বন্দোবস্ত করলে ভালই হয়। তুমি বেঁচে থাকতে যদি হুকুর বিয়েটা শেষ করে যেতে পার তবে ভবশংকরের পক্ষে খুব সুবিধে হবে। ভবশংকর দার্শনিক, টাকা পয়সার গোলমাল থেকে ওর একেবারে আলাদা থাকাই ভাল।"

এতবড় বাড়িতে হুকু একলা পড়ে গেল। ঠাকুরদা তাঁর আর্ট-গ্যালারিতে দিনরাত বসে থাকেন। বড়কাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে তাঁর লাইব্রেরিতে বই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

ক্রমে ক্রমে গোয়াবাগানের পারিবারিক স্পর্শ থেকে হুকু আলাদা হয়ে যেতে লাগল। ঠাকুরদা অনেকদিন ভেবেছেন মাঁ হুয়ত হুকুকে কুইনস পার্কের বাড়িতে নিয়ে যাবেন। স্ত্রীলোকশূন্য নির্জনতায় হুকুর মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। মা এবং আমি ক'বারই বলেছিলাম ওকে কুইনস পার্কে এসে থাকবার জন্য। কিন্তু হুকু তাতে রাজি হয়নি।

কালক্রমে হুকুর গোছানো জীবন এলোমেলো হয়ে আসতে লাগল। বড়-কাকা যত বেশি পড়া নিয়ে ডুবতে লাগলেন হুকু তত বেশি লেখাপড়া ছেড়ে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গোয়াবাগানের সংসার ঠাকুর-চাকরের হাতে গিয়ে উঠল। কলেজ থেকে ফিরে এসে হুকু তার জলখাবার পায় না। কাকীমার মত কেউ আর অপেক্ষা করে না দুধের গেলাস হাতে নিয়ে। রান্না শেষ হওয়ার আগে ঘুমিয়ে পড়লে কেউ আর ডেকে নিয়ে যায় না খাওয়ার টেবিলে। গোয়াবাগানের আকর্ষণ শিথিল হতে খুব বেশি দিন লাগল না। গোয়াবাগানের বাড়িতে যত ঐতিহ্যই থাক, ইটের সংগে আত্মীয়তা হওয়া সম্ভব নয়, হুকুরও হল না।

কলেজের ছুটির পর রুকু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। এযাবৎকাল বাড়ি থেকে বেরবার আগে ঠাকুরদাকে বলে যেতে হত। কিন্তু উপস্থিত রুকু ঠাকুরদাকে জানিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। কখন সে বাইরে যায় এবং কখন সে ফিরে আসে ঠাকুরদা তা জানতেও পারেন না। রুকু হয়ত গোয়াবাগানের বাইরে নতুন আত্মীয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সেদিন রুকুর জন্মদিন। আমি জানতাম প্রতিবারের মত এবার আর সমারোহ হবে না। বড়কাকার হয়ত মনেই নেই। রুকু আসে না আমাদের বাড়িতে। নেমন্তন্নর আশা আমরা কেউ করিনি।

সন্ধ্যেবেলা মা আমার হাতে একখানা সাড়ি দিয়ে বললেন, "রুকুকে দিস।" জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি যাবে না মা?"

"আমার পূজো কে করবে?"

"অনীতা আমার সংগেই যাবে তো?"

"কিন্তু আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"অনীতা হয়ত জানেই না যে আজ রুকুর জন্মদিন। আমি চললাম। আজ গোয়াবাগানেই থাকব।"

মা অমনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "রোজ রোজ তোর গোয়াবাগানে দরকার কি?"

"রুকুর একা একা লাগে ভাই।"

"না দীপক, রুকুর ভাবনা ভাববার জন্য ওর বাবা আছেন, দাদুও আছেন। গোয়াবাগানে বার বার করে থাকা চলবে না।"

"মা, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে গোয়াবাগানের বাড়ি আমার।"

"তোর? নাবালকের?"

আমি হেসে বললুম, "মা, আমি সাবালক হয়েছি। আজ আমি বি. এ. পাস করেছি। সাবালক হইনি?"

"বলিস কি দীপু! তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখে দে। জগদ্ধাত্রী আমার কথা রেখেছেন। এই যা, দেরি হয়ে গেল। আমি পূজো করতে চললাম।"

সন্ধ্যার একটু পরেই আমি গোয়াবাগানে এলাম। ঠাকুরদা আর্ট-গ্যালারিতেই ছিলেন। রেডিও খুলে বসে আছেন। ঠাকুরদার মাথার ওপরে আমার প্রপিতামহের প্রকাণ্ড একটা অয়েলপেন্টিং, আর তাঁর পায়ের কাছে ছোট্ট একটা মোড়ায় বসে আছে অনীতা। অনীতার হাতে একখানা বই। আমি ঘরে ঢুকতেই অনীতা বলল, "দাদা, রাত প্রায় আটটা বাজে, নুকু এখনও ফিরল না। বইখানা ওকে দিও।" আমার হাতে কাগজ দিয়ে মোড়ানো বইখানা দিয়ে অনীতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটু থেমে সে যাওয়ার সময় বলে গেল, "দাদা, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, তুমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছ।"

অর্দ্ধশায়িত ঠাকুরদা একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। আমার উত্তর শোনবার জন্য অনীতা আর অপেক্ষা করল না। ঠাকুরদা বললেন, "কাছে আয় দীপু।" আমি ঠাকুরদার আরাম কেদারার হাতলের ওপরে উঠে বসলাম। আমার গায়ে তিনি হাত বুলতে লাগলেন। তিনি বললেন, "দীপু, আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না। চৌধুরী পরিবারের বোঝা এবার থেকে তোকেই বইতে হবে।" ঠাকুরদা উঠলেন চেয়ার থেকে। পাঞ্জাবির তলায় ফতুয়ার পকেট থেকে অনেকগুলো চাবির মধ্যে একটা চাবি বেছে নিয়ে তিনি বাঁ দিকের কোণার একটা সিন্দুক খুললেন। তা থেকে একটা দলিল বার করে নিয়ে আমায় বললেন, "চৌধুরী পরিবারের বাস্তু এই গোয়াবাগান, এটা তার দলিল। এর মধ্যে কারও অংশ নেই। সম্পূর্ণ অধিকার তোমার। দীপু, আমাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় যে-কোন পরিবারের বাস্তু অক্ষমের আশ্রয়স্থল ছিল। স্বল্প পরিসর আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির স্বার্থপরতা তাতে ছিল না। গোয়াবাগানের বাড়ির পরিধি

বিরাট। পাঁচপুরুষের আশীর্বাদ এতে রইল। দলিলটার বাজার দর কয়েক লক্ষ টাকা, কিন্তু আমাদের গৃহরচনার আদর্শের দাম তো কেউ দিতে পারবে না ভাই! এটা কেবল মাথা গুঁজবার স্থান নয়। গৃহীর সংসারধর্ম পালনের পরিচ্ছন্ন আশ্রয়। পাওয়ার গর্ব এতে নেই।" আমার হাতে চাবিটা দিয়ে দাদু নিশ্চিন্ত মনে আরাম কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঝুকু কখন যে বাড়ি ফিরেছে তা নিয়ে ওকে আমি কোন প্রশ্নই করিনি। ওর ঘরে গিয়ে দেখলাম ঝুকু চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে। ঝুকু কোনদিন গম্ভীর হতে পারে একথা আমি ভাবতেই পারিনি। বললাম, "আয় তোকে আশীর্বাদ করি।" চমকে উঠল ঝুকু। জিজ্ঞাসা করল, "আশীর্বাদ কেন?"

"আজ তোর জন্মদিন। আমি কেবল তোর দাদা নই, অভিভাবকও বটে।"

হাসতে হাসতে ঝুকু উঠে এসে টিপ্ করে আমায় একটা প্রণাম করে ফেলল। বলল, "দীপুদা, আমার বোধহয় একজন অভিভাবকের দরকার ছিল। অভিভাবকত্ব যদি নাও তবে এক মুহূর্তও আমায় একা থাকতে দিও না। নির্জনতা আমি সহ্য করতে পারি না দীপুদা।" ঝুকুর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব সে নিজেই আমার কাছে ব্যক্ত করল। সেদিন অবশ্য আমি কথাটা খুব গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। হাজার রকম ছেলেমানুষির মধ্যে এটাও ওর একটা হালকা ছেলেমানুষি বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমি যদি সেদিন থেকে ঝুকুর এই নির্দেশ মেনে চলতাম তা হ'লে হয়ত উত্তরকালে ওর এতবড় সর্বনাশ হত না। নির্জনতা অসহ্য বলে সে খুঁজেছে নতুন আত্মীয়, ভেবেছে জনতার মধ্যে ওর বিক্ষিপ্ত মনের পরমায়ু বাড়বে।

জনতার কোলাহল থেকে উদ্ধার করে যেদিন তুমি ওকে গোপন ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি দিলে কমরেড, সেদিন থেকেই ওর দারিদ্র্যের সুরু। ঝুকু মরতে আরম্ভ করল। গুপ্ত ষড়যন্ত্র-প্রয়াসী মনের বাঁধন ওর কোনদিনই ছিল না।

কাগজে মোড়ানো বইখানা ওর হাতে দিয়ে বললাম, "অনীতা এসেছিল। মা এই সাড়ি পাঠিয়েছেন। আমি তোর জন্য বিশেষ কিছু আনতে পারিনি।

কেবল ছোট্ট এই মূর্তিখানা এনেছি, বুদ্ধের মূর্তি। আমি শুনেছি দুর্বল মুহূর্তে অনেক মানুষ এঁর থেকে শক্তি সঞ্চয় করে।"

তুকু বইখানা টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখল। বুদ্ধমূর্তিও রইল টেবিলের ডানদিকে। মার সাড়িখানা সে সরিয়ে রাখল আলনার উপরে। আমি লক্ষ্য করলাম তুকু একটা কাগজের প্যাকেট খুলছে। আমাকে দেখাবার জন্যই যেন সে তাড়াহুড়ো করে দাঁত দিয়ে প্যাকেটের সুতোটা কেটে ফেলল। তারপর একটি সুন্দর বাঁধান বই বুদ্ধের মূর্তির পাশে সাজিয়ে রাখল। বইখানার নাম পড়লাম, 'মার্কস ও এংগেলসের পত্রাবলী।'

এই সময় বড়কাকা ঘরে ঢুকলেন। খানিকটা এসেই তিনি টেবিলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে পুনরায় দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছিলেন। তুকু ডাকল, "বাবা, দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করব।" বড়কাকা দাঁড়ালেন, তুকু প্রণাম করল। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি চলে যাচ্ছিলে কেন?"

"আমাকে তো যেতেই হবে মা। কেউ আমায় থাকতে দেবে না—দুর্দিন আসছে।"

"আমার ঘরে তুমি দুর্দিনের কি দেখলে বাবা?"

বড়কাকা আবার ঘুরে দাড়ালেন। বুদ্ধমূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ, তারপর ও-পাশের বইটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-বইটা কেন?"

"উপহার পেয়েছি বাবা।"

বড়কাকার মনে অকস্মাৎ ঝড় বইতে লাগল। বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ালেন। যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। তুকু ছুটে গিয়ে বড়কাকার সামনে পথ আগলে দাঁড়াল, বলল, "ঐ বইটা সরিয়ে ফেলব বাবা?"

"না, না, ও সরিয়ে ফেলতে হবে না! নিজে থেকেই সরে যাবে, আজ হোক, কাল হোক, এক শতাব্দী পরে হোক!" বড়কাকা বেরিয়ে গেলেন। তুকু পেছন থেকে ডাকল, "বাবা!"

বড়কাকার ঘরের দরজায় খিল পড়ল।

তারপর মুকু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমি বুঝতে পেরেছি যে মুকু ঐ বইখানার রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য ছটফট করছে। ও চাইছিল ওকে আমি জিজ্ঞাসা করি এই উপহার কে দিয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে আলোচনা আমি এড়িয়ে গেলাম। কোনরকম কৌতূহলই দেখালাম না। মুকু বলল, "উপহারের জিনিস তাই ঘরে রেখেছি। নইলে ফেলে দিয়ে আসতাম।"

"ফেলে দিয়ে আসবি কেন? দরকার না থাকলে ফিরিয়ে দিয়ে আসিস।"

এই পর্যন্ত বলেই আমি থামলাম। না থামলে বিপদ হত; বিপদ তবু হ'লই। মুকু আমায় জিজ্ঞাসা করল, "বইটা কে আমায় দিয়েছে তার নাম তো তুমি জানতে চাইলে না দীপুদা?" আমি বললাম, "তুই নিজে যদি ভাল করে মানুষটাকে জানতে পারিস তবেই আমি খুসি হব।"

"ওকে আমি ভাল করেই জানি দীপুদা।" মুকু আমাকে সেই ছোট-বেলাকার মত জড়িয়ে ধরে পুনরায় বলল, "ওর নাম বিনয়প্রকাশ। এম. এ. পাস করেছে। আমার জন্মদিনে সবচেয়ে বড় খবর পেলে, না দীপুদা?"

মামা সেই যে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে আমাদের বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন তারপর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে। তিনি এদিকে আর আসেননি। মাঝে মাঝে টেলিফোন করে খবর নেন। সেদিন সকালবেলা টেলিফোন আমিই ধরলাম। মামা জিজ্ঞাসা করলেন: "হ্যালো? কে? দীপক? মা কোথায়?"

আমি: পূজো করছেন।

মামা: কি পূজো? মানে আজকে কোন পূজো আছে নাকি? একটু দাঁড়া—

আমি টেলিফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে ফিরে এসে তিনি বললেন: যাক বাঁচা গেছে। ক্যালেণ্ডার দেখে এলাম। পূজো শুনে ভেবেছিলাম আজ বুঝি ব্যাঙ্ক বন্ধ।

আমি : মামা, এত টাকা দিয়ে কি করবে ?

মামা : টাকা ? টাকা কোথায় দেখলি দীপু ? যা মা, বড়বাজার ঘুরে আয়। মাড়োয়ারিদের কথা শুনলে তোরও লুটের প্রবৃত্তি জাগবে।"

আমি : কি কথা মামা ?

মামা : কেবল লাখ আর কোটি। হ্যাঁরে দীপক, কোটির পরে কত হয় ?

আমি : অর্বুদ।

মামা : অর্বুদ ! তা হ'লে ওরা অর্বুদের খেলাই খেলছে।

আমি : তবে বাংলা দেশের অবস্থা কি মামা ?

মামা : সে তো অনেকদিন আগেই নস্যি হয়ে গেছে রে পাগলা ! পরশুরামের সেই পাঁঠার কথা পড়িসনি ? সেই যে নব্বুই টাকার নোট খেল, [illegible]ার, তার খেল, এট্‌সেট্‌রা। শোন্, মাকে বলিস, দেউলিতে তোর বাবা ভালই আছেন। ওজন বেড়েছে। বুঝলি ?

আমি : বুঝেছি।

মামা : হাঁরে দীপক, কোটির পর কত হয় বললি ?

আমি : অর্বুদ।

মামা : হাঁ অর্বুদ। মাকে বলিস। ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি : মামা, এই যে মা এসে গেছেন।

মামা : কে, মীরা ? গৌরীশংকর দেউলিতে ভাল আছে। আত্মজীবনী লিখছে। আর লিখছে খুব ভালই। শোন্, অনীতা শুনলাম বি. এস-সি. পড়ছে। আমার শালা হরিপ্রসাদকে জানিস তো ? বি. এ. ফেল করেছে। তা করুক। আমার কাপড়ের কলে ভর্তি করে দিয়েছি। অনীতার সংগে বিয়ে হলে কেমন হয় ? বিয়ে যদি সত্যিই দিস, তবে লাখ দশেক দিয়ে যাব অনীতাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ্। না, না, তাড়াতাড়ির কিছুই নেই অনীতার বয়সটাই বা কি ?

মা : কিন্তু হরিপ্রসাদ যে বি. এ. ফেল দাদা ?

মামা : কি যে বলিস বোন! নলিনী সরকার কি পাস? তিনি বড় হননি? হরিপ্রসাদ একদিন কারখানার মালিক হবে। ছেড়ে দিলাম।

ছই

দেখতে দেখতে উনিশ-শ' পঁয়তাল্লিশ সাল এসে গেল। মামা বলেছিলেন, ছ'মাস কি এক বছর বাবাকে জেলে থাকতে হবে। কিন্তু তিন বছর প্রায় পুরো হতে চলল। গেল বার আমার এম. এ. পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার প্রতি আমার তেমন অনুরাগ নেই। উৎসাহ নেই রাত জেগে অর্থনীতির বই মুখস্থ করার।

প্রথম প্রথম আমি খাতা বার করে অধ্যাপকদের বক্তৃতার সারাংশ লিখে নিতাম। সহপাঠী রমেন বটব্যাল একদিন আমায় এই অহেতুক জ্ঞান আহরণের পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিল। ক্লাসের পর সে আমায় নিয়ে এলো বটকের বাইরে। ডানপাশে ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটির জুতো বিভাগের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। রমেন বলল, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনকালের গুরুগৃহ নয়।" প্রশ্ন করলাম, "কেন?" রমেন জবাব দিল, "কলেজ ষ্ট্রিটে কেউ জ্ঞানের ভাণ্ডার আগলে বসে নেই। সবাই নোট বইএর ভেণ্ডার। এমন কি কোন কোন অধ্যাপকের নোট লিখবারও দরকার নেই। কারণ উনি আগামী দু'বছর যা বলবেন তার পুরোটাই তোমায় আমি দিতে পারি। নেবে?" এই বলে রমেন তার পকেট থেকে খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। দাঁড়ি, কমা পর্যন্ত বদলায়নি। মহাপুরুষ আশুতোষের আমল থেকে এই 'নোট' চলছে।" রমেনের দৃষ্টির সামনে আমার মাথা নীচু হয়ে এলো।

মাঝে মাঝে ভাবতাম ছেলেরাই বা কেন যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ট্রাম থেকে ওরা নামে কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়ে। রাস্তা পার হয় অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে। এ-পারে এসে একটু যেন থামে। না থেমে উপায় নেই। আশুতোষ-বিল্ডিংসের নীচের তলায় অনেকগুলো দোকান। অনেকরকমের জিনিস

সো-কেসে সাজানো রয়েছে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। ছেলেদের একটু দাঁড়াতে হয়। ক্লাসে যাওয়ার তাড়া নেই।

লিফ্‌টের ঠিক পাশেই, সিঁড়িতে উঠতে গেলেই বাঁদিকের দেওয়ালে পড়ে। লাল ও কালো কালি দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে লেখা কতগুলো পোস্টার লাগানো রয়েছে। দেয়ালের গায়ে লেখাটুকু অভ্যাস না করলে আমরা বোধ হয় কাগজ আর কালির সংগে কোন সম্পর্কই রাখতাম না। 'আশুতোষ' আর 'দ্বারভাঙ্গায়' সবচেয়ে বড় অভাব কাগজ আর কালির।

অভাববোধ আমারও ক্রমশ বাড়তে লাগল। সময় মত মাইনে দিতে পারলেই যেন কোন রকমে সম্মান বাঁচিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারি। আমি শিখতেই এসেছিলাম। শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এসেছিলাম জ্ঞানগুরুর পদতলে বসে। আমার শ্রদ্ধাবনত শিরে জ্ঞানের স্পর্শ লাগল না। আমি তাই তারিখ মত মাইনে দিয়ে পালিয়ে গেছি কুইনস্ পার্কে। মা এবং ঠাকুরদা দুজনেই খুব দুঃখিত হয়েছেন আমার লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা দেখে। সেদিন রাত্রে ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপু, এবারও কি পরীক্ষা দিবি না?"

"ভাল লাগে না দাদু।"

"তা হ'লে বিলেত চলে যা। যুদ্ধ তো প্রায় থেমে এলো।"

ঠাকুরদা হাত বাড়িয়ে রেডিওর বোতামটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন। সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, যুদ্ধের খবরাখবর। হিটলারের পরাজয় তখন একরকম সুনিশ্চিত হয়েছে। কোন্ সময় খবরটা সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হবে পৃথিবীর লোক কেবল সেইজন্য বসে আছে। হঠাৎ ঠাকুরদা সোজা হয়ে বসলেন।

"দীপু, শোন্, হিটলার আত্মহত্যা করেছে! মিত্রপক্ষ ও রুসিয়া বার্লিন দখল করেছে। দীপু, ইউরোপের যুদ্ধ থামল।" ঠাকুরদা রেডিও বন্ধ করে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। চোখ মুখ উত্তেজনায় কাঁপছে! কি যেন বলতে

চাইছেন, স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। দরজার দিকে ছুটলেন, আবার ফিরে এলেন টেবিলের কাছে।' বললেন, "জ্ঞানশংকরের মেয়ে ছুটির কত বয়স হ'ল রে দীপু? ভবশংকর? ভবশংকর কোথায়? ডাক তাকে—"

বড়কাকা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ লম্বা লম্বা দাড়ি, গায়ে একখানা অতি সাধারণ আলোয়ান জড়ানো। তিনি ঘরে ঢুকতেই ঠাকুরদা ঘোষণা করলেন, "হিটলার আত্মহত্যা করেছে· বার্লিন দখলে এসে গেছে।" গম্ভীর ভাবে বড়কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার দখলে?" জবাব দিতে ঠাকুরদা একটুও দেরি করলেন না, "মিত্রপক্ষ আর রুসিয়া।"

এই মুহূর্তে ঠাকুরদার কাছে মিত্রপক্ষ আর রুসিয়ার মধ্যে কোন ভেদাভেদ রইল না। হিটলার হেরেছে, সেইটাই আসল কথা। ছোটকাকা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ থেমেছে এবং তারা দেশে আসবেন। এ ছাড়া ঠাকুরদার ভাববার আর কিছুই ছিল না। ঠাকুরদা বড়কাকাকে বললেন, "ভবশংকর, কালকেই একটা তার পাঠিয়ে দাও। উড়োজাহাজে আসুক। টাকা আমি দেব। উপস্থিত তারের জন্য কতটাকা লাগবে?"

বড়কাকা কোন কথারই জবাব দিলেন না বলে ঠাকুরদা যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি গলার স্বর চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জবাব দিচ্ছ না যে? যুদ্ধ থেমে যাওয়াটা কি তোমার মতে ভাল হয় নি?"

বড়কাকা বললেন, "আমার মতে যুদ্ধ হওয়াই উচিত ছিল না। সে যাক। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম বাবা।"

"কি কথা?"

"আমি কালই গোয়াবাগানের বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি।" মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া একেবারে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ যেন সহসা তাঁর শেষ শক্তিটুকু হারিয়ে বসলেন। ঠাকুরদা একেবারে ভেঙে পড়ার মত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"একটা ছোট্ট বাড়ি পেয়েছি। গঙ্গার ধারে। ভাড়াও বেশি নয়।"

"কেন যাচ্ছ ভবশংকর ?"

"আমার অধ্যয়নের পক্ষে জায়গাটা ভাল। কয়েকটা বৎসর সবার সংগে একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে থাকতে চাই।" ঠাকুরদার শক্তিহীন দেহটা কাঁপতে লাগল। কোন রকমে ধীরে ধীরে চেয়ারের দিকে সরে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বকুর জন্য কি ব্যবস্থা করলে ?"

বড়কাকা জবাব দিলেন, একটু দেরি করে, "স্বকুর কথাই ভাবছি। এখানে যদি জায়গা না হয় তবে হোস্টেলে রেখে দেব। তুমি কি বলো বাবা ?"

"আমার মতামতের ওপর আর তো কিছু নির্ভর করছে না।"

"স্বকুর ব্যবস্থা তোমার মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। কারণ, স্বকুর তো একটা সাংসারিক ভবিষ্যৎ আছে।" ঠাকুরদা বললেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, স্বকুর দায়িত্ব কি আমি নিতে পারব ভবশংকর ?"

"তা হ'লে কোন একটা হোস্টেলে পাঠিয়ে দি।"

আমি বললাম, "কাকা, স্বকুর দেখাশোনার ভার আমিই নিলাম।" ঠাকুরদা চাইলেন আমার দিকে। বড়কাকা অল্প একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম তিনি তাঁর ঘরে নেই। কেবল ক'খানা প্রয়োজনীয় বই নিয়ে তিনি গোয়াবাগান ত্যাগ করেছেন ভোর রাত্রেই। স্বকু আমায় বলল, "মার ফটোখানা বাবা সংগে নিয়ে গেছেন।"

সকালের দিকেই মামা টেলিফোন করলেন।

মামা : হ্যালো, কে দীপক ?

আমি : হাঁ মামা।

মামা : দীপু, এসব কি হচ্ছে ? শুনলাম এবারও তুই পরীক্ষা দিবি না ? চটপট পাস করে আমার অফিসে চলে আয়।

আমি : আমার সংগে তোমার অফিসের কি সম্পর্ক ?

মামা : বলিস কি ! একদিন এই অফিসের সব দায়িত্ব তোকেই নিতে হবে যে।

আমি : কেন, তোমার শালা হরিপ্রসাদবাবু কোথায় গেলেন ? মামা চুপ করে রইলেন। আমি তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম : হরিপ্রসাদ বাবুর কি হ'ল ?

মামা : না, তাকে আমি কিছুই দেব না।

আমি : কেন মামা ?

মামা : হরিপ্রসাদ রাজনীতি করছে।

আমি : এখন তো রাজনীতির যুগ। আর তুমি নিজেও রাজনীতি করো।

মামা : হরিপ্রসাদের রাজনীতি আমাদের মত সরল নয়।

আমি : তবে ?

মামা : হরিপ্রসাদ কম্যুনিষ্ট। —দীপু, ইউরোপের যুদ্ধটা খুব তাড়াতাড়ি থেমে গেল। না রে ?

আমি : তাড়াতাড়ি ?

মামা : এখনও তো উনিশ-শ' পয়তাল্লিশ শেষ হয় নি। মনে হচ্ছে যুদ্ধ যেন সেদিন আরম্ভ হ'ল !

আমি : তাতো তুমি বলবেই মামা। তোমার গায়ে তো ফোস্কা পড়েনি। কেবল চেক পেলে আর চেক কাটলে।

মামা : হাঁরে দীপু, তোর মা কি করছেন ?

আমি : পূজো করছেন।

মামা : কি পূজো ?

আমি : জগদ্ধাত্রী।

মামা : তুই পূজো করিস না দীপু ?

আমি : কি পূজো করব মামা ?

মামা : কেন, জগদ্ধাত্রী ?

আমি : আচ্ছা মামা।

মামা : হাঁ, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবি, তিনি যেন সত্যই জগৎকে ধারণ করেন। জীবনের সবটুকুই গণেশপূজো নয় দীপু। ভাল কথা। তোর বাবা ছাড়া পেয়েছেন। আজ বেলা বারটার সময় হাওড়ায় পৌছবেন। মাকে বলিস।

মামা টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

তিন তলার ছাদে পূজোর ঘরে গিয়ে মাকে খবরটা দিয়ে এলাম। মা বললেন, "বাজারে বোধহয় গলদা চিংড়ি উঠেছে। তোর বাবা গলদা চিংড়ি খুব ভালবাসেন। একটু দাড়া। পূজো আমার শেষ হয়নি। শেষ লাইন দুটো বাকি।" আমি মার পেছনে দাঁড়িয়ে জগদ্ধাত্রীর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রায় দু'মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম; কথাগুলো বোধহয় মনে মনে ভাবছিলাম। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, "পেছনে এমনি করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?"

"তোমার পূজো দেখছি মা।"

"পূজো কি দেখা যায় দীপু ? পূজো করতে হয়।" মা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "এত ভোরে উঠতে বড্ড কষ্ট হয়। আর কী শীতই না পড়েছে এবার ! ক'টা বাজল রে ?"

"প্রায় আটটা।"

"সর্বনাশ ! তা হ'লে বোধহয় গলদা চিংড়ি পাওয়া যাবে না !"

এগারটার সময় আমরা রওনা হলাম হাওড়া স্টেসনের দিকে। মা বললেন, "বলা যায় না, গাড়ি হয়ত আগেই এসে যাবে।" অনীতা তার [illegible] দশটার আগেই কলেজে চলে গেছে। বাবা যে আজ আসছেন। আ[illegible]
জানে [illegible] [illegible]কা দিবি
ট্রেন থেকে নেমেই হয়ত বাবা চা খেতে চাইবেন। আ[illegible]

ফ্লাস্কে ভর্তি করে চা নিয়েছেন। গোরাচাঁদ বলল, "সাহেব তো কফি খেতে ভালবাসেন।" "কফি? ও হ্যাঁ......তুই ঠিকই বলেছিস।" মা ছুটলেন ওপরের ঘরে; দু'নম্বর ফ্লাস্ক ভর্তি করে কফি নিলেন। মামা অনেকদিন আগে টেলিফোন করে খবর দিয়েছিলেন দেউলিতে খাঁটি দুধের বড্ড অসুবিধা হচ্ছে। তাই কেভেণ্টার কোম্পানির বিজ্ঞাপিত খাঁটি দুধ নিলেন তিন নম্বর ফ্লাস্কে।

আমি বললাম, "মা, কেভেণ্টারের দুধ খাঁটি তা তুমি কি করে বুঝলে?"

"বলিস কি দীপক? কেভেণ্টার খাঁটি হবে না তো তোদের ওই দেশী গয়লার দুধ খাঁটি হবে? ইংরেজ কোম্পানি খাবার জিনিসে ভেজাল মেশাবে না।"

"ইংরেজ চলে গেলে কি করবে মা?"

"ইংরেজ যাবে, তার মানে কি দীপু? যাবে তো বড়লাট, আর তাঁর সৈন্য সামন্ত। ইংরেজের যেমন সেক্সপিয়ার রইল তেমনি কেভেণ্টারও থাকবে।"

শেষ পর্যন্ত আমরা যখন লটবহর নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব মা বললেন, "এই যা! জগদ্ধাত্রীর প্রসাদ কই? প্রসাদ না নিয়ে উনি তো জলগ্রহণ করতে পারবেন না।" মা আবার ছুটলেন তিন তলার ঘরে।

সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে জনতা। কলকাতার অনেক গণ্যমান্য স্বদেশসেবক এসেছেন বাবাকে অভিনন্দন জানাতে। সাড়ে এগারটার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড় এত বাড়ল যে রেলকর্মচারীদেরও চলা ফেরা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। একটিমাত্র সেপাই। সে আর ডিউটি দেওয়ার দরকার বোধ করল না। ক্যাব রোডের দিকে দুটো পানওয়ালা গলায় বাক্স ঝুলিয়ে পান বিক্রি করছিল। অনেকেই পান সিগারেট কিনছিল। তারপর এলো ফলওয়ালা।

আমি তন্ময় হয়ে জনতার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এতগুলো লোকের মধ্যে কি যেন নেই। কোথায় যেন মস্তবড় একটা কৌতুকের অভিনয় হচ্ছে। বারটা পাঁচমিনিটের সময় প্ল্যাটফর্মের গুঞ্জন

থেমে গিয়ে সুরু হ'ল কলরব। ভিড়ের মধ্যে থেকে মামা বলে উঠলেন, "গাড়ি আসছে! গাড়ি আসছে!" আমাকে সামনে দেখে তিনি হেসে বললেন, "কি দেখছিস দীপু?"

বললাম, "কৌতুক!"

ঠিক এই সময় মামা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "গাড়ি আসছে। ভলান্টিয়ার্স! ভলান্টিয়ার্সরা সব কোথায় গেল?" তিনি ছুটলেন সামনের দিকে।

গাড়ি এসে থামল। চারদিক থেকে সবাই বাবার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগলেন। মা দূর থেকে বাবাকে আবার নতুন করে দেখলেন। তারপর বাবাকে নিয়ে সবাই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। মামা মার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, "ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেলা তিনটের সময় মিটিং আছে। গ্রেটইষ্টার্নে লাঞ্চ খেয়ে নেবে। দুঃখ করিস না বোন। এ বেলা আর বাড়ির ভাত খাওয়া হ'ল না।"

মামা ছুটলেন সামনের দিকে। ভলান্টিয়ার পরিবেষ্টিত হয়ে বাবা বেরিয়ে গেছেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। আমি মাকে বললাম, "চলো, আমরা এবার যাই মা।"

বাবা বাড়ি ফিরলেন প্রায় পাঁচটার সময়। নীচে বসবার ঘরে অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি হাত জোড় করে দাঁড়ালেন সবার সামনে। পরিচিতদের সংগে দু'একটা কথা বললেন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, "জেলে খুব কষ্ট হয় নি তো?" বাবা হেসে বললেন, "ভালই ছিলাম।" এমন স্পষ্ট সত্যভাষণের মধ্যে একটা গাঢ় আন্তরিকতার আভাস পেলাম। অত বড় ব্যারিষ্টার যেন আসামী কিংবা ফরিয়াদি কারো পক্ষ নিয়েই কথা বলছেন না। যা সত্য, আদালতের আইন বিরুদ্ধ হ'লেও তা সত্য।

এমন সময় মামা এলেন। সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "আজ আর নয়। গৌরীশংকর এখন পর্যন্ত বাড়ির ভেতরে পা দেয় নি।"

মা দাঁড়িয়েছিলেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। বাবা এলেন। মা চেয়ে রইলেন

এক দৃষ্টিতে। মামা পেছন থেকে সরে গেছেন আড়ালে। মামার দেখাদেখি আমিও দরজার ও-পাশে লুকিয়ে রইলাম।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা সব ভাল আছ তো? অনীতা বি. এস-সি. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, খুবই সুখের কথা। তোমরা চিঠিতে সবই লিখতে, কিন্তু কুকুর কথা তাতে থাকত না। অনীতা বুঝি স্টেশনে যায় নি?"

এবার দরজার ও-পাশ থেকে বেরিয়ে এসে আমি বাবার সামনে দাঁড়ালাম। আমি প্রণাম করতেই বাবা বললেন, "কেমন আছিস দীপু?"

"ভাল আছি বাবা।"

মা বললেন, "আমি জগদ্ধাত্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি। চলো প্রণাম করে আসবে।"

• •

একটু বিশ্রাম করার পর বাবা বললেন যে গোয়াবাগান যাবেন। গতকাল গোয়াবাগান থেকে আসবার সময় ঠাকুরদাকে বলে আসতে পারিনি। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি খুব ভোরেই ওঠেন। কিন্তু কাল বেলা আটটা পর্যন্তও তিনি শয্যা ত্যাগ করেন নি। তারপর এই পযন্ত তাঁর খোঁজ নেওয়া সম্ভব হ'ল না।

এদিকে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে। অনীতা বাড়ি ফেরেনি। আমরা সবাই খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। বাবা পুনঃ পুনঃ অনীতার খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছেন। প্রতিবারই গোরাচাঁদ খবর দিয়ে যাচ্ছে দিদিমণি আসেননি।

শেষে বাবা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। আমাকে বললেন, "দীপু, চল্ আমরা যাই।" যাওয়ার সময় মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "গৌরীশংকর, কাগজে কোন বিবৃতি পাঠিয়েছ নাকি?"

"না, বিশু। শুধু শুধু বিবৃতি আর আমি দেব না।"

"খুব ভাল কথা বলেছ। ফস করে বিবৃতি দেওয়া তোমার উচিত হবে না।"

"কেন ব'ল তো বিশু?"

"আমরা ভাবছি প্রাদেশিক রাজনীতির বাইরে তোমায় পাঠাব।"

বাবা একটু হাসলেন। তারপর আমাকে সংগে নিয়ে গোয়াবাগানের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

গোয়াবাগানের বাড়িতে ঢুকতেই খবর পেলাম ঠাকুরদা কাল থেকে অসুস্থ। বাবাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। ঘরে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেছি। বাবা বোধহয় আমার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছেন। অনীতাকে যেন তিনি চিনতেই পারেননি। অনীতা বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই মহিলাটি কে?" বাবা অনীতাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি হয়েছে দাদু?"

"কাল সকাল থেকেই একটু জ্বর হয়েছে। বিশেষ কিছু না। অনীতা কলেজ যাওয়ার আগে দেখতে এসেছিল। কলেজে আর যায়নি। সমস্ত দিন আমার শুশ্রূষা করেছে। তুমি কেমন আছ গৌরীশংকর?"

"আমি ভালই আছি বাবা। শুনলাম জ্ঞানশংকর শীঘ্রই দেশে ফিরবে? হুকু, হুকু কোথায়?"

হুকু কোথায় তা কেউ বলতে পারল না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভবশংকর কোথায় গেছে? সে ঠিকানা দেয় নি?" ঠাকুরদা বললেন, "সে যাবে এইটুকুই শুধু আমাদের জানিয়েছিল। কখন গেল আর কোথায় গেল আমরা তা জানি না।"

এর মধ্যেই অনীতা একবার ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল। যখন আবার ফিরে এলো তখন ও নিজে হাতে ঠাকুরদার জন্য হরলিকস তৈরি করে নিয়ে এসেছে। বিছানার এক পাশে ছোট্ট টিপয়টা ঘরের অপর কোণা থেকে টেনে নিয়ে এলো। তার ওপরে রাখল গ্লাসে ভর্তি হরলিকস। অনীতা বলল, "এখন ধোঁয়া বেরুচ্ছে, একটু ঠাণ্ডা হোক, তারপর খাবে।

এই ফ্লাস্কে আরও হরলিক্স রইল, দরকার হ'লে দাদাকে ব'ল। তোমার ডান দিকে বিস্কুটের টিন রইল দাদু। ঘুমবার আগে দাদা একবার তোমার টেম্পারেচার নেবে।" তারপর নিজের হাত ঘড়িটায় সময় দেখে নিয়ে অনীতা বলল, "রাত প্রায় আটটা বাজল, তুকু এখনও ফেরেনি।"

বাবার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। গত তিন বছরের মধ্যে অনীতা ট্রামবাসে চেপে গোয়াবাগানে আসবে এ-কথা ভাবা বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি নিঃশব্দে অনীতার দিকে চেয়ে রইলেন, ওর প্রত্যেকটী কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। ঠাকুরদার ব্যবস্থা শেষ করে বাবার দিকে চাইল অনীতা। বলল, "বাবা, আর নয়। এবার চলো। মা একা একা হাঁপিয়ে উঠবেন।" বাবা উঠলেন। আমি বললাম, "এখন তো তুমি এসে গেছ বাবা, এবার থেকে আমি গোয়াবাগানেই থাকব।" বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বাবা ঠাকুরদার দিকে চেয়ে বললেন, "মাস তিনেক আগে দেউলির ঠিকানায় ভবশংকর আমায় একটা চিঠি লিখেছিল।"

"কি চিঠি?" ঠাকুরদা প্রশ্ন করলেন।

"চিঠির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। কারণ সাংসারিক চিঠি এ নয়।"

"তবে?"

"চিঠি পড়ে আমার অস্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে যে, ভবশংকর বলতে চায়, একটা বিরাট সুযোগ আসছে। ইংরেজের কাছ থেকে যে-স্বাধীনতা আমরা পাব তা ক্ষণস্থায়ী হবে যদি না আমরা সাবধান হই। খামের উপরে যদিও আমার নাম ঠিকানা লেখা ছিল কিন্তু আসলে এটা উড়ো চিঠি। দেশের ও দশের জন্য লেখা।"

ঠাকুরদা বললেন, "দেশ ও দশের জন্য ভবশংকর চিঠি লিখছে। কিন্তু ঐ তো একটা মাত্র মেয়ে, তার জন্য সে কোন ব্যবস্থাই করে গেল না। আমি বুড়ো মানুষ, আমার দৃষ্টিশক্তি গেছে কমে। তুকু কি করছে আমি

দেখতে পাই না। যদি পার তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ওর সংগে একবার দেখা ক'র।"

ঠাকুরদার খাটের দিকে এগিয়ে এসে অনীতা বলল, "দাদু, বড়কাকা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।" ঠাকুরদার গলা থেকে কি রকম একটা কর্কশ আওয়াজ বেরল। টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দীপু, বড্ড দুর্বল বোধ করছি। হরলিক্সটা দে তো। এবার বোধহয় ঠাণ্ডা হয়েছে।"

জেল থেকে ফিরে আসবার পর বাবার মধ্যে আমরা অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কারাজীবনের নিঃসঙ্গতায় তাঁর দৃষ্টিকোণ বদলেছে এবং তিনি বুঝেছেন, দেশ ও দশের সেবার মধ্যেই সত্যকারের রাজনীতির বীজ নিহিত আছে। মামা ইচ্ছা করলেই বাবার নামে খবরের কাগজে আর বিবৃতি ছাপতে পারেন না। হয়ত মামা চেষ্টা করেও বাবাকে আর জেলে পাঠাতে পারবেন না। গত দু'বছরের মধ্যে বাবা সত্যসত্যই দশের সেবার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করলেন। মামার তাতে পেছন থেকে রাজনীতির কলকাঠি নাড়ার অসুবিধা হয়ে পড়ল।

মামার অসুবিধা অন্য দিক থেকেও বাড়ল। যুদ্ধ থামার পর ভারতবর্ষের শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিল। ধর্মঘটের সংখ্যা হ'ল অনেক। মামার ভারতমাতা কটন মিলেও ধর্মঘট চলেছে। ধর্মঘট পরিচালনা করছে হরিপ্রসাদ।

জেলে যাওয়ার সময় বাবা যে চাদরপরা অভ্যেস করেছিলেন আজও তিনি সেই অভ্যেস পরিত্যাগ করেননি। বাবা যখন চাদর জড়িয়ে বাইরের ঘরে পা গুটিয়ে বসেন তখন তাঁর চোখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন আসে। সরল, স্বাভাবিক ও স্বপ্নবিলাসী সাধারণ বাঙালীর সংগে বাবার যেন অদ্ভুত মিল! রাজনীতির মধ্যে এতটুকু রাজনীতি নেই, সবটুকুই যেন সোজা, সরল ও স্বচ্ছ। কোন রকম কূটনৈতিক পঙ্কিলতা মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা গান্ধিজি স্বীকার করেন না। যা দিবালোকের স্বচ্ছতায় প্রতিভাত নয় তার মধ্যে কোন রাজনীতি নেই।

মামার কারখানায় ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর তিনি একদিন এলেন আমাদের বাড়িতে। বাবা বললেন, "বিশু, দিনকাল বদলেছে। মিলের মালিক তুমি বটে, কিন্তু মিল চালু রাখার ক্ষমতা মজুরদেরই।" মামা বললেন, "হরিপ্রসাদ তো মজুর নয়।"

"তবে তাকে ছাঁটাই করলে কেন?"

"বড্ড বেশি গোলমাল করছিল, তাই।"

"অনেক টাকা তো জমিয়েছ। ওদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে দাও না?"

"কত টাকা বাড়ালে হরিপ্রসাদরা সন্তুষ্ট হবে বলে তোমার মনে হয়, গৌরীশংকর?"

"যদি পার তবে একেবারে ডবল করে দাও।"

মামা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "ডবল মাইনের প্রশ্ন এ নয় গৌরীশংকর। আসলে এটা মাইনের প্রশ্নই নয়।"

দু'চারদিন পরে শুনতে পেলাম মামার কারখানার সামনে গোলমাল ভীষণ বেড়ে গেছে। প্রতিদিন কারখানার আশেপাশে কোথাও না কোথাও হরিপ্রসাদ সভা করছে। মামা পুলিশ ডেকেছেন। যে-কোন মুহূর্তে গুলি চলতে পারে। মাঝে মাঝে মামার উপর আমার রাগ হয়। রাগ হয় এই জন্য যে, কোটি টাকা অর্জন করবার পরও তাঁর লাভের নেশা কাটল না। অবাক হয়ে ভাবি, তাঁর মত যাঁরা পয়সার জোরে সামাজিক অকল্যাণের পথ তৈরী করছেন তাঁদের জন্য ভগবানের অভিশাপ কোথায়? পাপপুণ্যের নিক্তিতে মামার মত কোটিপতিরা পুণ্যের পাল্লায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন, আর পাপের ভারে শ্রমিকদের পাল্লা মাটি পর্যন্ত নুইয়ে পড়বে চিরদিন! তা হ'লে কি নিক্তির গঠনকৌশলে কোথাও ভুল আছে? অথবা পাপপুণ্যের প্রাক্তন বিচারবোধের সবটুকুই ফাঁকি?

বাবার জেল থেকে ফিরে আসবার উপলক্ষে মা সেদিন খুব বড় করে তিন-তলার ছাদে পূজোর আয়োজন করলেন। সকালবেলা থেকে ছুটোছুটির অন্ত নেই। বাবা সকালবেলাই তাঁর রাজনীতির কাজে বেরিয়ে গেছেন। তাই সব কাজ প্রায় আমাকেই করতে হ'ল। মা বল্লেন, "দীপু, মার্কেটে একবার ছুটে যা। ফলওয়ালা আমায় বলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তরমুজ আসবার কথা আছে। যদি এসে থাকে তবে-সের দশেক তরমুজ নিয়ে আসবি। আর,

আর শোন্, দাদুকে বলে আসিস প্রসাদ পাঠিয়ে দেব। নুকুকে সংগে করে নিয়ে আসবি। শুনলাম সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকলে নুকুর ভালই হবে। তোর মামাকেও খবর দিয়েছি। হরিপ্রসাদকে সংগে আনতে বলেছি।"

"ভালই করেছ মা। বিয়ের আগে অনীতার সংগে হরিপ্রসাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া উচিত।"

"বিয়ে? দাদা বলেছেন অনীতার সংগে হরিপ্রসাদের বিয়ে হবে না।"

"কেন মা?"

"হরিপ্রসাদ কোন ধর্ম মানে না।"

আমি বললাম, "মা, পেট ভরে খেয়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবন কাটাতে পারলেই তো ধর্ম মানা হ'ল।"

"না দীপু, তুই ঠিক বলিসনি। অনীতা, অনীতা কই…" মা চারদিকে চাইতে লাগলেন। অনীতা মার সব কথাই শুনছিল। এবার সে সামনে এলো। বলল, "দাদা, তুমি তো জানো মানুষের অস্তিত্ব কেবল রুটির ওপর নির্ভর করে না। তা ছাড়া ধর্মহীন জীবনে পরিচ্ছন্নতা থাকা সম্ভব নয়। আজকাল কেউ কেউ বলছেন যে, কাশীর ধর্মমন্দিরগুলোতে কলকারখানা চালু করলে লোকের খুব সুবিধা হবে।"

"জগতের কোথাও সুবিধা হয়নি, তেমন সংশয়হীন প্রমাণও তো হাতের কাছে নেই অনীতা।"

"প্রমাণ নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় দাদা, যদি চোখ বুজে নিজের মনের দিকে তাকাও, ভগবানকে স্মরণ করো। রুসিয়ার ভাঙা গির্জাগুলোর দিকে চেয়ে কথা বললে হবে না। জনসাধারণের অন্তরে কান দিয়ে শোন, টের পাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এর মধ্যে রুসিয়া এলো কোথা থেকে?" হাসতে হাসতে অনীতা বলল, "তোমার বালিসের তলা থেকে। বিছানা পরিষ্কার

করবার সময় গোরাচাঁদ বই দু'খানা তোমার টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছে। লেনিনের লেখা বই।"

দক্ষিণ আফ্রিকার তরমুজ কিনে কুইনস্পার্কে পৌছে দিয়ে গোয়াবাগানে এলাম নুকুর খোঁজে।

নুকু বাইরে বেরচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাচ্ছিস রে?"

গম্ভীর ভাবে নুকু জবাব দিল, "লিলুয়া।"

"লিলুয়া? লিলুয়া কেন?"

"ট্রেড-ইউনিয়নের একটা মিটিং আছে আমাদের। দুটো লোহার কারখানায় পনরো দিন থেকে ধর্মঘট চলেছে।" একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "দু'চার ঘণ্টা পরে গেলে হয় না নুকু?"

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে নুকু বলল, "আমাদের রাজনীতি কংগ্রেসের মত অফিসিয়াল নয় দীপুদা। দশটা থেকে পাচটা পর্যন্ত অফিসের কাজ করে তুমি সিনেমায় যাবে, কি তাস খেলবে, কিংবা বৌকে নিয়ে বাজার করতে যাবে সে রকম সময়-বাঁধা আংশিক রাজনীতি আমরা করি না। সে যাক। আমাকে দিয়ে তোমার কোন দরকার আছে কি দীপুদা?"

"না, আমার কোন দরকার নেই। মা বলছিলেন তোকে কুইনস্পার্কে যাওয়ার জন্য।"

"কেন?"

"মা আজকে খুব জাঁকজমক করে পুজো করছেন। সকালে তোকে খবর দিতে পারিনি। আমি তাই নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম।" নুকু মিনিট পাঁচেক চুপ করে রইল। তারপর বলল, "দীপুদা, জ্যেঠাইমার তেত্রিশ কোটি দেবতা আর দিদির কনভেণ্টের জনৈক ভগবানের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস নেই। আমার ধারণা, ভারতবর্ষের ভ্রান্ত মানুষগুলো ধর্মের নেশা থেকে

একদিন মুক্তি পাবেই। কারণ কার্ল মার্কসের কথা সত্যি, ধর্ম আফিমের নেশা ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু রুকু আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হাওড়া থেকে ওকে লিলুয়ার ট্রেন ধরতে হবে। ওর হাতে আর সময় ছিল না।

রাত্রিতে মামা এলেন প্রসাদ নিতে। আমার মনে হ'ল তিনি খুব চিন্তান্বিত ও বিমর্ষ। তাঁর কারখানায় অনেকদিন থেকে ধর্মঘট চলেছে। হয়ত মামার চিন্তার মূলে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নেই। পুঁজিবাদীর পুঁজিতে হাত পড়লে দুশ্চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। দুর্ভিক্ষের দিনে যারা টাকা কুড়িয়েছে তারা শবদেহের সংখ্যাগুলোর হিসাব কখনও করেনি।

প্রসাদ নেওয়ার পর মামা নিঃশব্দে বাগান পর্যন্ত এলেন। আমি তাঁর সংগেই ছিলাম। বললাম, "তোমাদের দেখে আমার সন্দেহ যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে মামা।"

"কিসের সন্দেহ দীপু?"

"সবসময় তোমরা চলাফেরা করছ যেন একটা মারাত্মক রকমের অভিসন্ধি নিয়ে। ভাল করে যেন ঘুমতেও পার না। এতো অশান্তি কেন মামা?"

"আততায়ী যদি পেছন থেকে আঘাত করে?"

"গৃহস্থের বাড়িতে কখন কখন চুরি ডাকাতি হয়। তাই বলে কি গৃহস্থেরা রাত্রিতে ঘুময় না? এতো টাকায় যদি এতো অশান্তি হয় তবে টাকার পরিমাণ কমাও। মজুরদের অভাব ঘুচুক।"

মামা গাড়ির পাদানিতে একটা পা তুলে দিয়ে বললেন, "অভাব ঘুচলেও ওদের দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করাবে। একটা বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্ত হাত যেন আমি দেখতে পাচ্ছি দীপু।" আমি হেসে বললাম, "বুঝেছি পেরেছি। তোমাদের অস্থিরতার মূল কারণ রুসিয়া-ভীতি।" গাড়িতে উঠে

মামা বললেন, "ভীতি অমূলক নয়। আমার অফিসের সব ছেলেরা মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে বেশ ভালই পায়। অন্তত গত দশ বৎসরের মধ্যে এমন আর্থিক উন্নতি কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু ওরা আজকাল বাংলায় তর্জমা করা রুসিয়ার কম্যুনিষ্ট কাহিনী লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। রুসিয়ার বই পড়া বে-আইনী নয় দীপু। তবু ওরা গোপন ও গুপ্ত থাকতে ভালবাসে।"

গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে তিনি বললেন, "গান্ধিজির মত খোলা নয়, কি বলিস?"

উনিশ-শ' ছেচল্লিশ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ সাম্প্রদায়িক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো। গান্ধিজি নোয়াখালিতে গেছেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য। ঠাকুরদা বললেন, "শংকরাচার্যের পর ভারতবর্ষে মহাত্মার মত এতো বড় বিরাট পুরুষের আর আবির্ভাব হয়নি। মানুষের জীবনে তিনি এমন একটা নৈতিকতার বাঁধন ফিরিয়ে এনেছেন যে, তাঁর সংস্পর্শে এসে ক্লিষ্ট মানুষ তার কষ্ট ভুলে যায়, আশাহীনের মনে আশা ফিরে আসে। নোয়াখালির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষও তাই তাদের ক্ষতির কথা স্মরণ করতে পারে না। দীপু, ভগবান যাঁকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করলেন জগতের লোক তো তাঁর কাছে ছুটে আসবেই। তিনি দিলেন উজাড় করে, রিক্তের দল তাদের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে নিয়ে গেল।"

আমি কোন মতামত প্রকাশ করিনি। ক'রে কোন লাভ নেই। ঠাকুরদার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণতর। গোয়াবাগানের বাইরে তাঁর কণ্ঠ পৌছয় না। গোয়াবাগানের বাইরে তিনি দেখতেও পান না।

এদিকে মা তো মহাত্মার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে বসে আছেন। নোয়াখালির কাজ যেন সুসম্পন্ন হয় সেই জন্য মা মহাত্মাজির নামে দিনরাত জগদ্ধাত্রীর কাছে পূজো দিচ্ছেন। ভীমনাগের দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে নিজেই

গিয়ে সন্দেশ কিনে এনেছেন। সন্দেশের এত বিরাট আয়োজন দেখে কলকাতার অসংখ্য কাক আমাদের ছাদে এসে ভিড় জমিয়েছে।

মা বললেন, "দীপু, চেয়ে দেখ্, মহাত্মা চলেছেন নোয়াখালির রাস্তায় শুধু পায়ে। পা ফেটে রক্ত পড়ছে তবু তাঁর চলার শেষ নেই। যারা ভেঙ্গে পড়েছিল তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।" আমি বললাম, "খবরের কাগজে পড়লাম বটে। কিন্তু তুমি তিনতলার ছাদে কোন্ ঐশ্বর্য বিতরণ করছ মা?"

"দীপু, ঐশ্বর্য কি কেবল বড়বাজারে পাওয়া যায়? তাই যদি হবে তাহ'লে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না। বড়বাজারের বাইরে যাঁরা ঐশ্বর্যের সন্ধান করবেন তাঁদের আসতে হবে জগদ্ধাত্রীর কাছে, বুঝলি?"

"বুঝেছি। কিছু সন্দেশ ছাদের ওপর ছড়িয়ে দিয়ো। নইলে এই লক্ষ লক্ষ কাকের চিৎকারে এ-বাড়িতে আর টিকতে পারব না।"

রাত্রিতে এলাম গোয়াবাগানে নুকুর খোঁজে। নুকু তখনও বাড়ি ফেরেনি। রাত নটার পর চৌধুরী পরিবারের যুবতী মেয়ে ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরবে—এ-কথা এক সময় কল্পনা করা অসাধ্য ছিল। কিন্তু নুকু যেদিন ট্রামে ওঠা অভ্যাস্ করল সেদিন থেকে ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ফিরবার নিয়মে ভাঙ্গন ধরেছে। তাই বংশপরম্পরায় কেবল ঠাকুরদার চোখ দিয়ে চৌধুরী বাড়ির ভাঙ্গা ঘড়িতে সময় দেখলে তো নুকুর সংগে তা মিলবে না।

ঠাকুরদার ঘরে এসে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। জানালা দিয়ে চেয়ে রইলাম আমাদের বাগানের দিকে। বাগানের ওপাশে গোয়াবাগানের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের বাতিটা দেখা যায়, নিভু নিভু করছে। যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটের ব্যবস্থা আজও বদলায়নি। এবার হয়তো বদলাবে। স্বাধীন ভারতের রাস্তায় আবার নতুন করে বাতি জ্বলবে।

কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই বাতি বিংশ শতাব্দীতে আমরা দু'বার করে নিভিয়েছি, দু'বার করে জ্বালিয়েছি। বার বার করে বাতি কেন নেভাতে হয়? ইউরোপের বুকে দু'বার করে আগুন জ্বলল, কিন্তু কেন জ্বলল?

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোকে গোটা পৃথিবীটাই অল্পবিস্তর ভাবে প্রভাবিত। আমরা পশ্চিমের ওপর নির্ভর করেছি, আশা করেছি। কিন্তু পরিশেষে আমরা কি পেলাম? মানবসমাজের কল্যাণ এলো কই? আজও তাই লুব্ধ মানুষের লেলিহান জিহ্বা ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে শুধু ইউরোপের বুকে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে।

ঠাকুরদা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আমি তো এমন নিরাপদ নির্ভাবনায় ঘুমতে পারি না! ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর চিন্তাধারা প্রাচীন, তাঁর দৃষ্টিকোণ উদারনৈতিক মতবাদের ধোঁয়ায় ধূমায়িত। তিনি তাই জেগে থাকার প্রয়োজন বোধ করেন না। আমার মনে হ'ল একটা অকর্মণ্য অপদার্থতা গোটা 'লিবারেল' সমাজের দেহে মারি গুটিকার মতো ফুটে বেরিয়েছে। পচনশীল গুটিকাগুলো সংক্রামক-ব্যাধির ভয়াবহতা আজও বহন করে চলেছে। রাত প্রায় দশটা। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। পাশেই বড়কাকার ঘর। অনেকদিন হ'ল এ-ঘরের প্রতি কারও আর দৃষ্টি নেই। যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। বড়কাকা যাওয়ার পর দরজায় কেউ তালা লাগায়নি, খোলাই পড়ে আছে। ভাবলাম বড়-কাকা তো কোন ঐশ্বর্য ফেলে যাননি, গুপ্তধনের সন্ধান এখানে নেই। কিন্তু কেবল ঘরখানাই তো সম্পত্তি। চারটে দেওয়ালের ওপর যখন সিলিং আছে তখন এর বাজারদর একটা আছেই। এই দর নির্ধারিত করব আমি, কারণ গোয়াবাগানের সম্পত্তির মধ্যে কোন অংশীদার নেই। বড়কাকা নেই বলে অযত্ন হবে কেন? তিনি সমস্যা এড়িয়ে গেছেন, পালিয়ে গেছেন সত্যের সম্মুখ থেকে, আশ্রয় নিয়েছেন শংকরাচার্যের মায়াকাননে। কিন্তু হুকু তো মায়া নয়। সরল, শুভ্র, ছোট্ট হুকু হেসে খেলে মানুষ হচ্ছিল। ঊর্ধ্বমুখী লতার মত হুকু অবলম্বন চেয়েছিল, বাড়তে চেয়েছিল—অগ্রসর হতে চেয়েছিল। সার্থকও হতে পারত হয়তো বা বেদ-বেদান্তের ফুল ও ফল ধারণের মধ্যে। কিন্তু বড়কাকা পালিয়ে গেলেন। পরিত্যাগ করে গেলেন

ঝুকুকে। ঝুকু তাই নিজের অবলম্বন নিজেই খুঁজে পেয়েছে। অবলম্বন যদি সত্য হয় তাহ'লে তা শক্তও হবে। মার্কসবাদের সত্য সত্য নয়, এ-কথা বড়কাকা কিংবা ঠাকুরদার মুখ থেকে শোনাও সত্য নয়।

ঝুকুর ঘরে এলাম। টেবিলের ওপর লেনিনের একটা জীবনী পড়ে রয়েছে দেখলাম। বইটার মাঝামাঝি জায়গায় পেন্সিল দিয়ে ভাগ করা, যেন বাড়ি ফিরেই পরের পৃষ্ঠাটা খুঁজে বার করতে ঝুকুর সময় নষ্ট না হয়। বইটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দাগ দেওয়া পৃষ্ঠাটা পড়তে লাগলাম :

'১৮৮৯ সাল। ক্রিমিয়ায় মন্বন্তর সুরু হয়েছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে সেবা সমিতির মিটিং হচ্ছিল। সাহায্যের জন্য অনেকেই অনেক রকমের উপায় উদ্ভাবনের কথা বললেন। হঠাৎ সেই সময় একজন অপরিচিত যুবক ঘোষণা করলেন, "বুভুক্ষু মানুষদের সাহায্য করা অপরাধ।" যুবকটির নাম লেনিন। লেনিনের বয়স তখন উনিশ। লেনিনের কথা শুনে সভাস্থ সবাই হতবাক হয়ে রইলেন। কে-একজন একটু পরে লেনিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করা অপরাধ কেন?"

"ওদের সাহায্য করা মানে 'জারকে' সমর্থন করা। মন্বন্তর যদি দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তবে দেশময় বিক্ষোভ আর অশান্তি বাড়বে। ফলে, জারের শাসন-তন্ত্র ভেঙ্গে পড়বে। এই স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের যদি উচ্ছেদ করা যায় তবে ভবিষ্যতে আর কখনও মন্বন্তর হবে না। অতএব অন্নহীনের মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নেওয়াই উচিত।"

এইটুকু পড়বার পর হরিপ্রসাদের কথা মনে পড়ল। মামা একদিন বলেছিলেন যে, হরিপ্রসাদরা ধর্মঘট করে কেবল মাইনে বাড়াবার জন্য নয়। সর্বহারাদের মধ্যে বিক্ষোভ আর অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলা ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সময় ঝুকু এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "রাত প্রায় বারটা বাজে, কোথায় গিয়েছিলি রে?"

"দীপুদা, তুমি একটু উল্টো দিকে ঘুরে বসো। আমি কাপড় ছেড়েনি, তারপর তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।"

ভ্লাডিমির লেনিনের জীবনীখানা হাতে নিয়েই ঘুরে বসলাম। তাঁর কথাগুলো পুনরায় পড়ে নিলাম। নুকু এবার আমার সামনের চেয়ারে এসে বসল। বলল, "তোমার মামার কটনমিলের সামনে আজ গুলি চলেছে, দীপুদা।"

"বলিস কি? মারা গেছে না কি কেউ?"

"একজন মজুর মারা গেছে।"

"প্রায় একবছর থেকে তো মামা মিল্‌টা বন্ধ করে দিয়েছেন। হঠাৎ কেন এমন হ'ল রে?"

"ভেতরে ঢুকে ওরা একটা সভা করতে চেয়েছিল।"

বললাম, "সভাটা বাইরে কোথাও করলেই তো হ'তো। একটা জীবন হয়তো এমনভাবে নষ্ট হ'তো না।"

"দীপুদা, ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে একটা জীবন নষ্ট হওয়া খুব মস্ত লোকসান নয়। দু'দশ লক্ষ জীবন নষ্ট না হ'লে ত্রিশ কোটির ভবিষ্যৎ তুমি ভাল করবে কি করে? তাছাড়া গোলা-গুলির আঘাত না খেলে শ্রমিকেরা সচেতন হবে কেন? শ্রমিকদের লাভের জন্যই শ্রমিকদের লোকসান হবে।"

"ত্রিশ কোটির ভবিষ্যৎ ভাল করবার অন্য কোন পথ নেই নুকু?"

"শ্রেণী-সংগ্রামের বাইরে আমরা কোন পথের সন্ধান রাখি না। তুমি রাখো নাকি দীপুদা?"

বললাম, "আমি ভাবছি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সমস্যা সমাধান করা অনেক সহজ হবে।"

মধ্যরাত্রির নির্জনতা ভেদ করে নুকু হো হো করে হেসে উঠে বলল, "তুমি সোশ্যালিসমের কথা বলছ? স্বপ্ন-দিয়ে-ঘেরা সমাজতান্ত্রিক দেশ? কিন্তু দীপুদা, এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে নাকো খুঁজে। মার্কসবাদের রাস্তা

ফেলে তুমি এসব ইউটোপিয়ার কল্পনা করছ কেন? তোমার দৃষ্টিতে যদি অস্পষ্টতা থাকে আমরা তা দূর করে দেব। তুমি আমাদের পার্টিতে যোগ দাও। আমার পাশে এসে দাঁড়াও দীপুদা। আমি জানি প্রথমে একটু বাধোবাধো ঠেকবে।"

"ন্তকু, অনেক রাত হয়েছে—টেবিলে খাবার পড়ে আছে, খেয়ে নে।"

"আমি বিনয়প্রকাশের ওখানে খেয়ে এসেছি।"

"এত রাত অবধি বাইরে থাকিস তোর ভয় করে না ন্তকু?"

"না দীপুদা, আমি যে বিনয়প্রকাশকে ভালবাসি।"

ভোররাত্রেই বেরিয়ে এলাম গোয়াবাগান থেকে। ট্রাম কিংবা বাসের চলাচল স্বরু হয়নি। উড়ে কুলিরা এরই মধ্যে কাজে বেরিয়েছে। রাস্তায় জল দিচ্ছে। সকাল থেকে রাস্তাগুলোয় আবার নোংরা জমতে থাকবে। রাস্তার এক কোণায় একটা ডাষ্টবিন। সেই ডাষ্টবিনের পেছনে একটা রিক্সা রয়েছে। ডাষ্টবিনের পাশে গিয়ে দাড়ালাম। রিক্সাওয়ালা ঘুমচ্ছে। ওকে ঘুম থেকে তুলতে বড্ড মায়া হতে লাগল। বড়কাকার শংকরাচার্যকে কোন দিন রিক্সা টানতে হয়নি। এমন কি তাঁর দেখার পর্যন্ত স্বযোগ মেলেনি যে, বিংশ শতাব্দীর রিক্সাওয়ালারা কেমন করে ঘুময়। দেখলে হয়তো 'মায়াবাদের' রাস্তায় কেউ আর রিক্সা টানত না। কলকাতার রাস্তায় সত্যিই কোন মায়া নেই। বড়কাকা নিজের চোখে দেখেছেন সেদিনের মন্বন্তর। 'একটু ফেন দাও' বলে চিৎকার করতে করতে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরে গেল। বড়কাকার চোখের সামনে মরেছে। বড়কাকা কি সমাধান দিলেন এর? আমি দেখলাম চাদর গায়ে দিয়ে তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে চোখ বুজে বসে রইলেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—তাঁর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কোন আদেশ এলো না। একটা লোকেরও জীবন তিনি রক্ষা করতে পারলেন না।

সেদিনের ছবিগুলো যেন ভোররাত্রে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে

উঠল। ঠাকুরদা ঘরে বসে কেঁদেছেন। ওপরের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেছেন, "এদের বাঁচাও, বাঁচাও।"

লিবারেল ঠাকুরদার বাঁচাবার টেকনিক্ আজ মনে পড়লে হাসি পায় না, রাগ হয়। তোমাদের ক্ষিধে পেলে ঘড়ি মিলিয়ে ঠিক একটার সময় হাইকোর্ট থেকে ছুটে আসো লাঞ্চ খেতে, আর অপরের ক্ষিধে পেলে ওপরের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করো, 'ওদের বাঁচাও'! যদিও মন্বন্তরের দিনে বিভিন্ন সেবা-সমিতির চাঁদার খাতায় ঠাকুরদার নাম পাওয়া যাবে পাতায় পাতায় এবং যদিও বড়কাকার মত চোখ বুজে তিনি ধ্যান করেননি তবুও সমস্যার সমাধান-কল্পে লিবারেল ঠাকুরদার ব্যবস্থা কই? সমগ্রভাবে সমস্যাটা বুঝবার বোধশক্তির স্পষ্টতা কোথাও নেই। ব্যাঙ্কে জমানো টাকার থেকে পাঁচহাজার টাকা দান করা ঠাকুরদার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কীর্তিটাও যথার্থ কিনা তাও ঠাকুরদা ভেবে দেখেন নি। সেবা-সমিতি থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে কত টাকা উধাও হয়েছে আর কতটাকা কেন কিনতে গেল তাও তিনি খোঁজ করেন নি—তিনি দিয়েই সন্তুষ্ট। লিবারেল সমাজের পচনশীল সামাজিক ও নৈতিক মনোবৃত্তির মধ্যে এই পাঁচ হাজার টাকার দানটা কেবল দেওয়ার গৌরবই তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে এলো।

কুইনস্ পার্কে যখন ফিরলাম তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। মা এর মধ্যেই চান করে তিনতলায় গিয়ে উঠেছেন। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে মা কখনও বেলা আটটার আগে শয্যাত্যাগ করতেন না। বিছানায়-শুয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে বেশি দিন লাগেনি। আমরা হিন্দু, আমরা তো মূর্তি পূজো করবই। কিন্তু এযাবৎকাল আমরা মূর্তি পূজোও করিনি, এমনকি কালীঘাটের রাস্তায় গিয়ে চুপি দিয়ে দেখে আসিনি সেখানে কি হচ্ছে। পণ্ডিতের কাছে মন্ত্র লিখবার প্রয়োজন না হ'লে কালীঘাটের রাস্তায় মাকেও যেতে হত না। কালীঘাটের পণ্ডিতের কাছ থেকে মা জগদ্ধাত্রী-পূজো করবেন বলে মন্ত্র লিখে নিয়ে এসেছেন। লাইনগুলোর মধ্যে মন্ত্র কোথায়? ব্যাকরণ আর বানান-

ভুলের জগাখিচুড়ি জগদ্ধাত্রী গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস হ'ল না। একথা একদিন মাকে বলেছিলাম। মা তার জবাব দিয়েছিলেন, "তোর বিশ্বাস দিয়ে আমি পূজো করি না।" আমি বললাম, "মা, তোমার নিজেরই বা তেমন বিশ্বাস কই ?"

"ওরে হতভাগা, আমার বিশ্বাসের মাথায় পাগড়ি বেঁধে তোর সামনে প্যারেড করাব নাকি ? আমি মনে মনে কি বলছি সেইটাই মা জগদ্ধাত্রী কান খাড়া করে শুনছেন।"

কুইনস্ পার্কের বাড়িতে ঢুকে আজ আমার সেদিনের কথাগুলোই মনে পড়ল। তিনতলার ছাদে মা দরজা বন্ধ করে পূজো করছেন। অনীতার ঘরেরও দরজা বন্ধ। আমি জানি, রাত চারটার পর অনীতা আর বিছানায় থাকে না। আমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে একদিন নয় অনেকদিন রাত চারটার সময় আমি লক্ষ্য করেছি অনীতার ঘরে বাতি জ্বলছে। কি করে অনীতা ? পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সে এম. এস-সি পাশ করেছে। অথচ ওর মুখ থেকে আমি কখনও বিজ্ঞানের আলোচনা শুনতে পাই না। তবে কি দরজা বন্ধ করে অনীতাও পূজো করে ? তিনতলা থেকে জগদ্ধাত্রী কি অনীতার ঘরেও আলো বিকিরণ করছেন ? আজও আমি বাড়িতে ঢুকবার সময় ওর ঘরে আলো দেখেছি। অনীতার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রবল ইচ্ছা হ'ল আমি ওকে দেখব। হাঁ, লুকিয়েই দেখব। দেখা দরকার ওর ভেতরেও কোন কিছু সত্য নিহিত আছে কিনা। পার্থিব-জগতের মধ্যে ধর্মের অঙ্গীকার কতটুকু সত্য তার বিচার আমি করব। সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর প্রবেশদ্বারে ধর্মই কেবল জাগ্রত প্রহরী। ওটাকে না সরাতে পারলে আমার প্রবেশের রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে না।

হঠাৎ দরজার দিকে নজর দিতেই দেখলাম দুটো দরজার মাঝখানে প্রায় তিন ইঞ্চির মত ফাঁক রয়েছে। আমি তা হ'লে এতক্ষণ দেখতে পেলাম না কেন ? আমি দরজার আরো কাছে গিয়ে ঘেঁসে দাঁড়ালাম। মাথাটা নীচু করে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখলাম অনীতা প্রার্থনা করছে! মাকেও পূজো

করতে দেখেছি। অনীতার মুদ্রিত চোখের অন্তরালে কি হচ্ছে আমি জানি না। কিন্তু বাইরে থেকে যতটা দেখতে পেলাম তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। মায়ের পূজার মধ্যে যে শূন্যতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম অনীতা তা যেন পূরণ করেছে। এ কোন্ অনীতা? পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে অনীতা এম. এস-সি. পাশ করেছে বটে, কিন্তু মনে হ'ল সব কিছু পদার্থের উর্ধ্বে উঠেছে অনীতা। পদার্থ-বিজ্ঞান বুঝি অনীতার প্রার্থনার লেবরেটারিতে লোকোত্তরিত হ'ল!

মাউণ্টব্যাটেন দিল্লিতে এসেছেন। কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মধ্যে যখন কোনরকম সহযোগিতা হ'ল না তখন আমরা ধরেই রেখেছিলাম যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে। ঠাকুরদার ধারণা, বিভক্ত ভারতের ক্ষতচিহ্ন চিরস্থায়ী হবে না।

আজ ক'দিন হয় পণ্ডিতজি বাবাকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গেছেন।

হঠাৎ ঠাকুরদা একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি জানতাম তিনি অসুস্থ। সমাজ, সংসার এবং জগতের সঙ্গে তাঁর বাইরের যোগাযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এমন করে কেন যে তিনি সকলের সম্পর্ক থেকে সরে এলেন সে কথা আমি অনেকদিন ভেবেছি। হয়তো বা তাঁর এই বিচ্ছিন্ন মনো-ভাব ইচ্ছাকৃত নয়। বয়স বেড়েছে বলেই বাণপ্রস্থের শূন্যতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়েছে।

গোয়াবাগানে আসবার পর ঠাকুরদা বললেন, "জ্ঞানশংকরের একখানা চিঠি এসেছে। চিঠিখানা পড় তো দীপু।" চিঠি পড়তে আরম্ভ করলাম:

'বাবা, আমরা বিলেত থেকে চলে এসেছি প্রায় একমাস হ'ল। উপস্থিত প্যারিসে আছি। শীঘ্রই আমরা দেশে ফিরব।

'ইউরোপের অবস্থা দেখে দুঃখ হয় বাবা। এই তো সেদিন হিটলার গোটা মহাদেশটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছেন। কোটি কোটি লোক এখনও তাদের ভাঙ্গা সংসার জোড়া দিতে পারে নি। এরই মধ্যে পুঁজিবাদীরা আবার তৃতীয়

মহাযুদ্ধের প্ল্যান করছে। আমেরিকা তার ডলার-সাম্রাজ্য গড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'বাবা, তুমি কল্পনা করতে পারবে না গতযুদ্ধে রুসিয়া কতটা দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে! আমেরিকানরা ইউরোপে এলো বহুকোটি ডলার সংগে নিয়ে। মূল্যবান লটবহরের ক্যারাভান চলল আগে পিছে। সাধনা না করেও সিদ্ধির ফলটা লুফে নিল ওরাই।

'এ-যেন সেই উড়িষ্যার হোঁৎকা রাজার ব্যাঘ্র-শিকার কাহিনী! জঙ্গলের একপাশে তাঁবু পড়ল। তিনি তাঁবুর মধ্যে বসে হুইস্কি পান করতে লাগলেন বোতলের পর বোতল। পাইক বরকন্দাজ যারা সংগে এসেছিল রাত্রিতে তারাই বাঘ শিকার করল। কিন্তু ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে হোঁৎকা রাজা দেখলেন তাঁর পায়ের কাছে দুটো মরা বাঘ! ছবি তুলবার জন্য ফটোগ্রাফার সামনেই ছিল। পরদিন খবরের কাগজে ছবি বেরল—হোঁৎকা রাজা বড় শিকারী।

'বাবা, ভারতবর্ষ শীঘ্রই হয়তো স্বাধীন হবে। ইংরেজ তার সৈন্য-সামন্ত আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ে সরে আসবে সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে আরও দেরি আছে। আমরা চাইছি কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসুক। কয়েকজন বুড়ো বুর্জোয়ার অধীনে ভারতবর্ষের বিক্ষোভ বাড়বে বই কমবে না। ইতি

জ্ঞানশংকর।'

আমি ঠাকুরদার দিকে চাইলাম। তিনি আজকাল সহজে কথা কইতে চান না। রেডিওর দিকে চেয়েছিলেন। রাত আটটা প্রায় বাজে। রেডিওর খবর প্রচারিত হতে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কিছু বললে না দাদু?"

মাথা নীচু করে তিনি বললেন, "বড্ড লজ্জা হয় দীপু তোদের সংগে কথা বলতে।"

"কেন দাদু?"

"মনে হয় কিছুই যেন জানি না, কিছুই যেন বুঝতে পারি না। নিজের কাছেই নিজেকে মূর্খ মনে হয়। আমার মনে শঙ্কা এসেছে দীপু।"

বললাম, "দাদু, যুগ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন জ্ঞানালোকের পরিব্যাপ্তি বাড়বে না? সত্যমিথ্যা বিচার করে দেখবে না?"

"দীপু, জ্ঞানালোকের পরিব্যাপ্তি যতই বাড়ুক মিথ্যা ভাষণের মধ্যে কোন নৈতিক সমর্থন থাকতেই পারে না। এই যে জ্ঞানশংকর লিখেছে আমেরিকানরা উড়িষ্যার হোঁৎকা রাজার মত ইউরোপে যুদ্ধ করে এলো, কথাটা কি সত্যি? ডলার বেশি আছে বলেই ওরা অপরাধী? ডলার বেশি না থাকলে মার্শাল স্টালিনের কাছে জাহাজ ভর্তি রসদ পৌঁছত কি করে?"

"দাদু, আমেরিকার রসদ ছাড়াই রুশিয়ার সৈনিকরা স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ জিতেছে।"

"স্টালিনগ্রাডই একমাত্র এবং শেষ যুদ্ধ নয়। তাদের আরও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। কয়েক হাজার মাইল আরও ছুটতে হয়েছে এবং ছুটেছে আমেরিকার ডলার-গাড়িতে চেপে। কই, যুদ্ধ যতদিন চলল কখনও তো জ্ঞানশংকর লেখেনি যে, ইউরোপে কেবল রুশিয়াই যুদ্ধ করছে? দীপু, মানব-চরিত্রের সবচেয়ে পোক্ত খুঁটি সত্যভাষণ।"

এই সময় দিল্লি বেতারকেন্দ্র থেকে বিশেষ খবর ঘোষণা করা হ'ল। খবর শুনে বোঝা গেল কংগ্রেস পাকিস্তানরাষ্ট্র গঠনে সম্মতি দিয়েছে। ঠাকুরদা কোন মন্তব্য করলেন না। আমি বুঝলাম খণ্ডিত ভারতের ক্ষতচিহ্ন তাঁকেও যেন পীড়িত করে তুলেছে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠাকুরদা অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "দীপু, আমি নিশ্চয় করে জানি, ভারতবর্ষের এই অঙ্গহানির মহাযজ্ঞে মহাত্মাজি পৌরোহিত্য করেন নি।"

রমেনের সংগে অনেক দিন দেখা হয় না। পরীক্ষা দিলে পাশ করে ফেলবে

এই ভয়ে রমেন এম.এ. পরীক্ষা দেয় নি। হাজার হাজার পাশ করা বেকার ছেলেদের দেখে রমেনও তার ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারছে না। সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ তো আর জীবনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। এমন কি ওরা বিদ্যা-অর্জনের প্রেরণা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

আমি আজ এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেনের খোঁজে। শুনেছি সে দুপুরবেলা বাড়ি থাকে না। এই অঞ্চলেই সে ঘোরাফেরা করে। বগলে বই নিয়ে কফিঘরে বসে কফি খায়। রমেনের বোন গীতা আমায় বলেছে রমেন বাংলা মাসিকে ছোটগল্প লেখে।

কলেজ ষ্ট্রিট অঞ্চলের সব জায়গায়ই খুঁজলাম। কিন্তু রমেনকে কোথাও পাওয়া গেল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে হঠাৎ মামার গাড়ী এসে থামল। গাড়ি থেকে মুখ বার করে তিনি বললেন, "উঠে আয়।" আমি উঠলাম। গাড়িতে অনেকগুলো বই রয়েছে, নতুন বই। মামা বললেন, "বই কিনতে এসেছিলাম এ-পাড়ায়।"

"কি বই কিনলে মামা?"

মামার হাতে দেখলাম লেনিনের সিলেক্টেড ওয়ার্কস।

"এ সব বই তুমি পড়ো নাকি?"

একটু হেসে তিনি বললেন, "গীতা-পাঠের মত যত্ন নিয়ে পড়ি। অনেক-গুলো লাইন মুখস্থ করে ফেলেছি।" গাড়ি তখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে চৌরংগির দিকে ছুটেছে। বইটার মাঝখানে মামার আঙ্গুল ঢোকানো ছিল। বইটাকে এবার তিনি প্যাকেটের মধ্যে ভাল করে বেঁধে রাখলেন।

বললাম, "মামা, তুমি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছ কেন বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাদের এই পুঁজিবাদসর্বস্ব সামাজিক ব্যবস্থায় লজ্জা বোধ কর না? তুমি নিজে কোটি টাকার সংস্থান করলে অথচ তোমার ঐ ছোট্ট কারখানায় পাঁচশ' মজুরের পেটে আজ অন্ন নেই!"

"দীপক, কেউ উপোষ করে থাকে তা আমরাও চাইনা। কিন্তু রুশিয়ায় কেউ উপোষ করে না একথা একমাত্র মার্কসিষ্ট মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাস করে না। আসল কথা তা নয়। ওরা খানিকটা চাল আর আটার সংস্থান করবার জন্য বিনাপয়সায় বড় বড় বই আর বিজ্ঞাপন বিলি করে না।" এই পর্যন্ত বলে মামা প্যাকেট থেকে একটা মস্ত বড় বই বার করে বললেন, "রুশিয়ায় ছাপা হয়েছে, দাম জানিস? একটাকা আট আনা। বইটা কেবল বাঁধাতে খরচ হয় একটাকা। এত ক্ষতি স্বীকার করে ওরা কেবল চাল আর আটার উৎপাদন বাড়াবে তেমন কথা বিশ্বনাথ রায়কে বোঝাবে কে? ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ গেল, রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ সুরু হয়েছে। পলাশির আমবাগানে ক্লাইভসাহেব লুকিয়েছিলেন, আমরাই তাকে জিতিয়েছি। তাঁরই প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেন আমাদের লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। হারজিতের খেলায় উভয়পক্ষ করমর্দন করে উভয়ের শুভকামনা করেছে। কিন্তু এই নতুন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে করমর্দন নেই। সমগ্র পৃথিবীতে আজ অসংখ্য আমবাগান, অসংখ্য গুপ্তঘাতক সেখানে লুকিয়ে আছে—সুযোগের অপেক্ষায়। আমরা সতর্ক না থাকলে ওরা আঘাত করবেই।"

কারখানার সামনে গাড়ি থেকে নেমে তিনি বললেন, "আমাদের একমাত্র ভরসা গান্ধিজি। তিনি বেঁচে থাকলে চাল আটার ব্যবস্থা তিনিই করে যাবেন।" আমি হেসে বললাম, "জোর করে কিছুই বলা যায় না। বিড়লার প্রাসাদে চাল কিংবা আটার দৈন্য কোনদিনই ছিল না। মামা, এবার তোমার কারখানা খুব ভাল ভাবে চলবে। দিশী মন্ত্রীরা সবাই তোমার বন্ধু।" মামা বললেন, "কারখানা আমার আর নেই, বেচে দিয়েছি।"

"সেকি! কেন?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, "ভাল কথা মনে পড়েছে! তোর বাবা মন্ত্রী হয়েছেন। কাল-পরশুর মধ্যে খবর বেরুবে। তোরা এবার সব দিল্লিতে বসে রাজত্ব করতে পারবি।"

আমি রাত আটটার সময় গোয়াবাগানে এলাম। ক'দিন থেকে ঠাকুরদার একটু ঘুষঘুষে জর হচ্ছিল। সেবাযত্নের জন্য অনীতাই কেবল আসে গোয়াবাগানে। সবারই বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে কোথা থেকে উড়ে এসে অনীতা তাদের পাশে দাঁড়ায়। ওর মঙ্গলহস্তের স্পর্শে ব্যথা-বেদনার উপশম হয়। এগুলো আমার কথা নয়। ঠাকুরদা থেকে আরম্ভ করে অনেকেই অনীতার মঙ্গলহস্তের প্রতি প্রশংসামুখর। আমি অনেকদিন ভেবেছি অনীতার এই গাম্ভীর্য কৃত্রিম কি না। ওর প্রার্থনার মহৌষধি হাস্যকর ছেলেমানুষি কিনা। অনীতা পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে সে অবৈজ্ঞানিক কাজ করে প্রতি মুহূর্তে। তবে কি অনীতা বিজ্ঞান পড়ছে কেবল বিজ্ঞানকে খেলো করবার জন্য ?

ঠাকুরদার ঘরে ঢুকে দেখলাম অনীতা বসে আছে তাঁরই পাশে। মাথা টিপে দিচ্ছে। অনীতা বলল, "দাদা, মাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দাও, আজ রাতের মত আমি এখানেই রইলাম।" আমি টেলিফোন করবার আগেই মা টেলিফোন করে আমায় বললেন, "কাল তোর বাবা কলকাতায় আসবেন। তিনি এলাহাবাদে আজ সকালে এসে পৌচেছেন। দীপু, তোর বাবা মন্ত্রী হয়েছেন, অতএব ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর নাম উঠল।"

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরদার ঘরেই আবার ফিরে এলাম। তা হ'লে মামা মিথ্যা বলেননি। মা বললেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাবার নাম উঠল। কংগ্রেসের ও অন্যান্য বহু লোকের সংগ্রাম ও দুঃখভোগের পর ইংরেজ পরাজিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের নতুন ইতিহাস সত্যই এবার রচিত হবে। শস্তায় বাজিমাতের ইতিহাস এ নয়। বড়-ছোট জানা-অজানা অসংখ্য শহিদের রক্তে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় লেখা হবে, লিখব আমরাই। কিন্তু গোড়া থেকেই যেন একটা সত্যনিষ্ঠার অভাব বোধ করতে লাগলাম। একটা প্ল্যান করে যেন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় লিখবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। নইলে বাবার নাম ইতিহাসে উঠবে কেন ? হয়তো বাবার মত অনেক মন্ত্রীর ভিড়

হবে প্রথম অধ্যায়ে। সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে বিগত দিনের বহু শহিদের স্মৃতিচিহ্ন। বিকৃত ইতিহাসের কলঙ্ক ঘোচাতে প্রয়োজন হবে নতুন সংগ্রামের। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে নুকু, হাতে তার মার্কসিষ্ট অস্ত্র।

ঠাকুরদা বললেন, "দীপু, কাল সকালে তোর ছোটকাকা আসছেন, টেলিগ্রাম এসেছে বোম্বে থেকে। আমি তো স্টেশনে যেতে পারব না, তুই ওদের নিয়ে আসিস। তোর কাকীমা আর বোনরা থাকবে দক্ষিণ-খোলা বড় ঘরটায়। আমি সব গুছিয়ে রাখব।" এক গ্লাস জল খেয়ে ঠাকুরদা অনীতাকে বললেন, "জ্ঞানশংকরের স্ত্রী নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী। দিদি, ভারতবর্ষে কেউ যেন কোনদিন ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয়। স্বাধীন ভারতে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশি হ'ল বলেই আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।"

অনীতা বলল, "প্রাচীন ভারতেও ধর্মের স্বাধীনতা হিন্দুরা স্বীকার করতেন দাদু।"

"করতেন সে-কথা ঠিক। কিন্তু আজকের মানুষের রাজনীতি-বোধ এত প্রবল যে রাজনীতির সংগে ওরা ধর্ম মিলিয়ে ফেলছেন সুযোগ ও সুবিধা বুঝে।"

"কিন্তু—" শব্দটা উচ্চারণ করে অনীতা পরের কথাগুলো ভাবতে লাগল। ঠাকুরদা অনীতার দিকে চেয়ে রইলেন। বেশিক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল না। অনীতা বলল, "একটা কথা প্রায়ই ভাবি। কি ভাবি জানো দাদু?"

"তুই বল, আমি শুনি।"

"আজ বিগত কয়েকশ' বছর ধরে মানুষের পার্থিব সুখসুবিধা অনেক বেড়েছে। স্টিম্-ইঞ্জিন থেকে আণবিক বোমার অগ্রগতিতে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে বটে কিন্তু তাতে সত্যিকারের অগ্রগতি নেই।"

"কেন?"

"প্রত্যেকটা অগ্রগতির প্রেরণার মূলে তুমি দেখবে ভগবানের অনুগ্রহ

নেই। তাই তথাকথিত অগ্রগতির মধ্যে কল্যাণের চেয়ে ধ্বংসের সংকেত বেশি।" চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "অণু এবং পরমাণুকে আজ আমরা বিচ্ছেদ করতে পারছি—সেটা অগ্রগতি নয় কেন?"

"তোমাদের বিচ্ছেদ-অনুপ্রেরণা ভগবানের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত। অণু এবং পরমাণুকে বিচ্ছেদ করে কি পেলে? আণবিক বোমা? কি করবে তা' দিয়ে? তৃতীয় মহাযুদ্ধ জিতবে? তৃতীয় শেষ না হতে হতেই চতুর্থের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তোমাদের রাজনীতির অবস্থাও তাই। একটা বিষাক্ত বৃত্তের মধ্যে পাক খাচ্ছে।"

আমি বললাম, "আমরা এবার যে-রাজনীতি করব তার চতুর্দিক থেকে ধর্মের আগাছাগুলো আগেই সমূলে উৎপাটিত করে রেখে আসব তোদের মন্দির, মসজিদ, আর গির্জেগুলোতে। বুর্জোয়া ধর্মযাজকদের অত্যাচার তো অনেকদিন চলল, আর কেন?" এরই মধ্যে ঠাকুরদা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাইনি। ভাবলাম লিবারেল লোকগুনো চিরকাল প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্য সুযোগ বুঝে এমনি করে ঘুমিয়ে পড়ে। ঠাকুরদাকে আর বিরক্ত করলাম না। অনীতা ভাবছিল। আমি ওকে যেন আঘাত দেওয়ার জন্যই বললাম, "আমাদের লোকায়ত রাষ্ট্রে ধর্ম থাকবে না।"

অনীতা বলল, "ভালমন্দ মানুষের মধ্যে সবসময়ই থাকবে। কিন্তু তাই বলে ধর্ম একেবারে তুলে দেবে কেন দাদা?"

"ধর্মযাজকদের অত্যাচার আর সহ্য করব না।"

"একটা গল্প বলি শোন। তুমি সেদিন 'আমি নেভি'র দোকানে গিয়েছিলে গরম কাপড় কিনবার জন্য। আমিও তো তোমার সংগে ছিলাম। ভেতরে গিয়ে এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে বললে গরম কাপড় আনবার জন্য। সে ছুটে গিয়ে অনেকগুলো কাপড়ের থান তোমার জন্য নিয়ে এলো। তোমার সামনেই সে খুলে দিল প্রত্যেকটা থান। তুমি বাছাই করে মনের মত কাপড় কিনে পয়সা দিয়ে

চলে এলে বাড়িতে। কই একবারও তো খোঁজ নেবার চেষ্টা করলে না যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ভাল না খারাপ? মেয়েটি যদি সত্যিসত্যিই খারাপ হয় তাতে তোমার কাপড় কেনা বন্ধ হত না। ধর্মযাজকের ওপর রাগ করে ভগবানকে অস্বীকার করবে কেন? দাদা, কার্ল মার্কসের রাষ্ট্র কেবল লোকায়ত নয় ধর্মবিরুদ্ধ এবং ভগবানবিরুদ্ধ।"

"অনীতা, ধর্মের ধাপ্পাবাজি আমরা অনেকদিন সহ্য করলাম। এবার আমাদের মুক্তি দে, একটু কাজ করবার সুবিধা দে। এখন অনুরোধ করছি, পরে অনুযোগ দিসনি যদি রাষ্ট্র, শাসন, সমাজ, ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বের সবটুকুই আমরা জবরদস্তি দখল করে নি। ধর্মের গর্জনের সবটুকুই শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদীর আর্থিক আড়ম্বরের ঝংকার। আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই—কিন্তু মন্দিরের সিন্দুকে সোনা আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে পাহারা রেখেছে। অন্নহীনের সাধ্য নেই এক রত্তি সোনা সেখান থেকে বার করবার। ভগবানের রাজ্যে আমরা সব না খেয়ে মরব আর তোমরা সব সিন্দুক আগলে বসে থাকবে?"

মাথা উঁচু করে ঘর থেকে চলে গেল অনীতা। যাওয়ার সময় বলে গেল, "দাদা তুমি দুঃখ কোরো না। জুডাসের নজর খুব বড় নয়—মাত্র তিরিশটা রূপোর টাকা। আমরা অপেক্ষা করব জুডাসের অনুশোচনার জন্য। তিরিশ-টাকার মোহ তাদের একদিন কাটবেই।"

হাওড়া স্টেশনে বেশ ভিড় জমেছে। বাবা যেদিন দেউলি থেকে কারামুক্ত হয়ে আসেন সেদিনকার ভিড়ের সংগে আজকের ভিড়ের অনেক তফাৎ। আজকের ভিড়ের মধ্যে কেবল পুঁজিবাদী, পুলিস্ আর সুবিধাবাদীদের সংখ্যাই বেশি। চারদিকে চেয়ে দেখলাম মামা আজ উপস্থিত নেই।

প্ল্যাটফর্মের কোথাও একটুও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করলাম না। পুলিসের খুব কড়া ব্যবস্থা রয়েছে। ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খলার মূলগত বাঁধুনি কোথাও

আলগা হয়ে যায়নি। অনেকের হাতেই ফুলের মালা, কিন্তু সেদিনের মত একটা ফুলও বাসি নয়, শস্তা নয় এবং সহজপ্রাপ্য নয়। নিউ মার্কেটের আভিজাত্যে ফুলগুলো মূল্যের মাত্রা ঘোষণা করছে গর্বোন্নত শিরে। পিসেমশাই আজ উপস্থিত আছেন। সরকারী পোষাক পরেছেন তিনি। তাঁর আরদালির হাতে সবচেয়ে বড় ফুলের মালা, কটিবন্ধে রিভলভার।

বাবা আর ছোটকাকা একই গাড়িতে আসছেন। হয়তো কেউ কাউকে এখন পর্যন্ত দেখতে পাননি। বাবার সম্বর্দ্ধনায় ছোটকাকা গাড়ি থেকে নেমে হয়তো খুবই অবাক হয়ে যাবেন। পিসেমশাইকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত বড় ফুলের মালা কার জন্য ?" তিনি যেন একটু চমকে উঠলেন, তারপর বললেন, "কেন, তোর বাবার জন্য ?"

"আমি ভাবছিলাম ছোটকাকার জন্য কি না।"

"কেন তোর ছোটকাকা এমন কি কাজ করে এলেন যে, তার জন্য আমি ফুলের মালা নিয়ে আসব ?"

"তুমি শুধু শুধু রাগ করছ পিসেমশাই, আমি কিছু ভেবে বলিনি।"

গাড়ি এলো প্ল্যাটফর্মে। কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারদল সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। বাবা আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—তিনি প্রথম শ্রেণীতে নেই। ইঞ্জিনের কাছাকাছি একটা তৃতীয়-শ্রেণীর জানলা দিয়ে তিনি মুখ বার করে রয়েছেন।

প্রথম শ্রেণী থেকে নামলেন ছোটকাকা। দেখতে ঠিক বাবার মত। ভলাণ্টিয়ার দল সংগে সংগে কপালে হাত ঠেকিয়ে 'সেলিউট' করল। দু'একজন এসে ছোটকাকার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। তাঁরা কে আমি চিনতে পারলাম না। ছোটকাকা মিনিটখানেক সময় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন কামরার সামনে। পিসেমশাই দেখলাম মুখ টিপে যেন হাসছেন। আমার কি রকম সন্দেহ হ'ল পিসেমশাই ছোটকাকার সম্বর্দ্ধনার জন্যই আজ প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? পিসেমশাইকে দেখে

ছোটকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "অভিনন্দনের এত ঘটা কেন?" পিসেমশাই হেসে বললেন, "গৌরীশংকর এসেছে এই গাড়িতে। সে ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হয়েছে।"

ইত্যবসরে ইঞ্জিনের দিকে ভিড় জমেছে। পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব প্ল্যাটফর্মের খানিকটা জায়গা ঘিরে ফেললেন লাঠিধারী ও বন্দুকধারী সেপাই দিয়ে। এংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টরা চারিদিকে এমনভাবে বূ্যহ রচনা করেছে যে, আমিও বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। আমি ছোটকাকার দিকে চেয়ে ছিলাম। তিনি সামনের দিকে এগুতে পারছেন না বলে বিশেষ বিরক্তি-বোধ করছিলেন। পিসেমশাই ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। ছোটকাকার সংবাদটা তিনি বাবার কানে এখনও দিতে পারেননি।

ছোটকাকা সামনের দিকে এগুতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন একটা পুলিশ সার্জেন্টের সংগে। সার্জেন্ট তাঁকে বাধা দিল। ছোটকাকা রাগ করে বললেন, "তোমাদের মন্ত্রী আমার বড় ভাই। আমি দেখা করব।" সার্জেন্ট বলল, "আমাদের অর্ডার নেই।" ছোটকাকা যেন শারীরিক বল প্রয়োগ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এবার আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমার নাম দীপক। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য দাদু আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"বড়দা মন্ত্রী হয়েছেন বলে আমরা সব তাঁর কাছে অস্পৃশ্য না কি?"

বুঝলাম রাগ তাঁর কমেনি। বললাম, "কাকা, কাকীমার সংগে পরিচয় করিয়ে দাও। আমার বোনরা কোথায়?" ছোটকাকা আমার কথার জবাব না দিয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। বাবা বিবৃতি দিচ্ছিলেন অনেকটা বক্তৃতার মত করে। বাংলায় সুরু করে শেষ পর্যন্ত ইংরাজিতেই বলতে লাগলেন। ছোটকাকা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন বাবার বক্তৃতা। বাবা বলছিলেন, "ইংরেজের সংগে আর আমাদের দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের রাষ্ট্র আমরাই এবার শাসন করব। গান্ধিজির অহিংস নীতির কাছে ইংরেজের গোলাবারুদ ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন বড় কাজ হিংসার দ্বারা সম্পন্ন

করা যায় না।" ছোটকাকা অর্ধবৃত্তাকারে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিকে। বললেন, "মন্ত্রী হওয়ার আগে বড়দার উচিত ছিল পৃথিবীর ইতিহাসটা ভাল-ভাবে জেনে নেওয়া।" আমি বললাম, "তুমি চলো কাকীমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেবে।" ছোটকাকা বললেন, "ওরা তো চলে গেছে।"

"চলে গেছে? কোথায়?"

"দারজিলিং।"

"কবে?"

"কাল।"

"কার সংগে?"

"আমার এক বন্ধু ক্যাপটেন মালহোত্রার সংগে। কলকাতার গরম ওদের সহ্য হবে না দীপক।"

"আমাদের জানাও নি কেন, কাকা?"

"সময় পেলাম কোথায়? হঠাৎ দেখা হ'ল মালহোত্রার সংগে বোম্বেতে। সে ছুটি নিয়ে দারজিলিং যাচ্ছিল। একটা প্লেন পাওয়া গেল।"

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় ঝড় বইতে লাগল। কেমন করে আমি গোয়াবাগানে ফিরে যাব? অসুস্থ শরীর নিয়ে ভোরবেলা থেকেই তিনি কত রকমের খাবারের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। অনীতা আজ নিজের হাতে রান্না করেছে। ওরা কেউ আজ ঠাকুর চাকরের ওপর নির্ভর করেনি। ঠাকুরদাকে গিয়ে আমি কি বলব? ছোটকাকা বললেন "আমার একটু কাজ আছে। শেষ করে সন্ধ্যের দিকে যাব বাবার সংগে দেখা করতে।" আমি বললাম, "আমি তোমার সংগে যাই কাকা। কলকাতার রাস্তাঘাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।"

"কিছু দরকার নেই দীপক। আমি নিজেই ম্যানেজ করে নিতে পারব।"

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি বাবা আসছেন এই দিকে। খুব দ্রুত পদেই আসছেন। এসে ছোটকাকাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বৌমা কোথায়?

মেয়েরা? কেমন আছিস, জ্ঞানশংকর?" বাবার আলিঙ্গন থেকে ছোটকাকা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "পাঁচলক্ষ টাকার ট্রাস্টি তুমি। টাকাটা যাতে তাড়াতাড়ি পাই তার ব্যবস্থা করে দিয়ো দাদা। আমার হাতে একটা পয়সাও নেই।" বাবা যেন সহসা একটা পাথরের গায়ে ধাক্কা খেলেন। নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা। ছোটকাকা কামরা থেকে ষোল-ইঞ্চি মাপের বিলাতি সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। বললেন বাবাকে, "এখন তোমার সংগে গেলে কোন সুবিধা হবে, দাদা? টাকাটা তো আমার মেয়েদের জন্যই। তোমার গাড়িতে জায়গা হবে কি?" বাবার গলা থেকে একটা আওয়াজ বেরল, "হবে। চল্।"

প্রথমে ভেবেছিলাম গোয়াবাগানে আজ আর ফিরব না। ছোটকাকা সন্ধ্যার দিকে নিশ্চয়ই একবার যাবেন ঠাকুরদার সংগে দেখা করতে। তখন তিনি সব কথাই জানতে পারবেন। কিন্তু সমস্তটা দিন ঠাকুরদার তা হ'লে উৎকণ্ঠায় কাটবে মনে করেই আমি শেষ পর্যন্ত গোয়াবাগানেই ফিরে এলাম। আমাকে দেখেই ঠাকুরদা ছুটে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "জ্ঞানশংকর কই? বৌমা? মেয়েরা কোথায়?" আমি বললাম, "কাকীমা আর মেয়েরা কালই দারজিলিং চলে গেছেন। কলকাতার গরম ওঁরা সহ্য করতে পারবেন না। ছোটকাকা গেছেন বাবার কাছে।"

ঠাকুরদা যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলেন। আমি ঘর থেকে চলে আসব ভাবছিলাম। ঠাকুরদা বারান্দায় আসবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন। আমি আর অনীতা মাটি থেকে তাঁকে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। অনীতা ছুটে গেল আর্ট গ্যালারিতে। মালাক্কা বেতের যে লাঠিটা ঠাকুরদার বাবা শেষজীবনে ব্যবহার করতেন অনীতা সেটা নিয়ে এসে ঠাকুরদার হাতে তুলে দিল। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠাকুরদা একা একা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। মাথা নীচু করে পেছন থেকে অনীতা ঠাকুরদাকে প্রণাম করল, অনেকটা শেষ প্রণামের মত।

প্রতিরূপ

সাতদিনের মধ্যে চৌধুরী পরিবারের ভেতর-বাইরে খানিকটা পরিবর্তন এলো। পরিবর্তন প্রথম দেখেছি বাবা যেদিন আলাদা হয়ে কুইনস্ পার্কে চলে আসেন। তারপর অনেকগুলো বছর অতীত হয়েছে। ঠাকুরদা এ নিয়ে আর কোনদিন বাবার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি। যা ভাঙ্গল তা নিয়ে আর দুঃখ করেননি। জোড়া দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। চৌধুরী পরিবারের দ্বিতীয় পরিবর্তন এলো বড়কাকা যেদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তাঁর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েকটা বছর চলে গেছে।

এবার চৌধুরী পরিবারে তৃতীয় পরিবর্তন এলো। ছোটকাকা দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু গোয়াবাগানের সংগে কোন সম্পর্ক রাখলেন না। কাকীমা রইলেন দারজিলিং-এ, ছোটকাকা শুনলাম দারজিলিং-এ থাকবেন না, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবেন। ইউরোপের অনেকগুলো বড় বড় কারখানার এজেন্সি নিয়ে এসেছেন। তাদের তৈরি জিনিস ভারতবর্ষের বাজারে বেচবার ব্যবস্থা করবে 'পামীর এণ্ড কোম্পানি' এবং ছোটকাকা এই কোম্পানির একমাত্র মালিক। মূলধনের অভাব হ'ল না। পাচলক্ষ টাকা তিনি পেয়ে গেছেন। বাবা কোন আপত্তি করেন নি।

বাবা আজ চলে গেলেন দিল্লিতে। ইতিহাসে বাবার নাম যখন উঠেই গেছে তখন মা তাঁর সংগে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অনীতা গেছে বাবার সংগে, দিল্লির সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে সে ফিরে আসবে।

ঝুকু একদিন আমায় প্রশ্ন করেছিল, "দীপুদা, তুমি পার্টিতে আসবে?" সে দিন ওকে জবাবটা দিতে পারিনি। আজ দেব। রাত সাড়ে-দশটার সময় ঝুকু ফিরল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত দেরি হ'ল যে?"

"দেরি? ক'টা বেজেছে?"

"সাড়ে-দশটা।"

"দীপুদা, আমার ঘড়ি নেই। বিশ্ববিপ্লব কার্যকরী হওয়ার পর আমরা সময় দেখব।" দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে নুকু বলল, "জেঠামশাই আর অনীতাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।"

"হঠাৎ? মন্ত্রী হয়েছেন বলে বুঝি বাবাকে খাতির করছিস?"

"ঠিক তা নয় দীপুদা। নেহেরুকে আমরা সমর্থন করছি।"

"কেন?"

"কংগ্রেসের আমলে অন্নবস্ত্রের অভাব হবে, বেকারের সংখ্যা বাড়বে, ক্রমশই জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাবে। তার ফলে ওরা কম্যুনিষ্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কম্যুনিষ্ট পার্টি কেন? দেশে কি অন্য কোন দল নেই? হিন্দুমহাসভা কিংবা সোসালিষ্ট পার্টি?"

নুকু এরই মধ্যে বার বার করে খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার বাগানের দিকে কি যেন দেখছিল। আমার কথার জবাব দিচ্ছে বটে কিন্তু খানিকটা অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলাম নুকুর মধ্যে। নুকু বলল, "আমরা নেহেরু-ঢিল দিয়ে চারটে পাখী মারব। প্রথম হিন্দু মহাসভা, দ্বিতীয় সোসালিষ্ট পার্টি, তৃতীয় কংগ্রেস, এবং চতুর্থ নেহেরু নিজে।"

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করে নুকু এগিয়ে এলো আমার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "দীপুদা, তুমি পার্টিতে আসবে? বিনয়প্রকাশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"অপেক্ষা করছে কোথায়?"

নুকু বলল, "অপেক্ষা করছে কবে তুমি মার্কসবাদের রাজ্যে প্রবেশ করবে। তোমার স্বপ্নাবৃত সমাজতন্ত্রের বেলুন, হয় আকাশে উড়িয়ে দাও, নয় জয়প্রকাশের কাছে রেখে এসো। অশোক আর রামমনোহর বেলুন নিয়ে খেলতে ভালবাসে।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার সমাজতন্ত্রের বেলুনের খবর বিনয়প্রকাশ জানল কি করে?"

"সে প্রশ্ন অবান্তর। তুমি আসবে দীপুদা?" ঝুকুর গলা শুকিয়ে গেল। সে কুঁজো থেকে জল ভরতে লাগল গেলাসে। এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম ভ্যানিটি-ব্যাগটা যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে রয়েছে। ঝুকু বুঝেছে যে, আমি ওর ভ্যানিটি-ব্যাগের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি। আমার চোখের দিকে চেয়ে দম্ দেওয়া গ্রামোফোনের মত ঝুকু পুনরায় জিজ্ঞাসা করল "দীপুদা, তুমি আসবে?"

এই সময় আমার মনে হ'ল দরজার বাইরে বারান্দায় যেন কোন লোক চলা-ফেরা করছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। জানলার বাইরে বাগানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখবার জন্য আমি ঝুকুর টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুকু ছুটে এসে ভ্যানিটি-ব্যাগটা নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করে বলল, "কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বার হ'তে গেলে এই ফর্মে সই করতে হয়।"

ফর্মটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "জানলার ও পাশে কে রে? বিনয়-প্রকাশ নয় ত?"

"হতেও বা পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর।"

"ব্যাপারটা এত সহজ ভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? বারান্দায় হাঁটা-হাঁটি করছে কে? মনে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আজ অনেক লোক?"

"দীপুদা, সত্যিই অনেক লোক।"

"কেন? ওরা কারা ঝুকু?" ঝুকু জবাব দিল না।

না-পড়েই ফর্মটা সই করে ঝুকুর হাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিলাম। ঝুকু বলল, "দীপুদা, আর দাঁড়াতে পারছি না। গোয়াবাগানে এই মুহূর্তে পলিট্-ব্যুরোর মিটিং বসেছে। দীপুদা, আমি একটু দেখে আসি। ফর্মটা বিনয়প্রকাশকে দিয়ে দেব।"

ঝুকু চলে যাওয়ার পর আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। মুহূর্তের মধ্যে যেন আমার চোখের অস্পষ্টতা কেটে গেল। এমন সহজ, সরল ও সংক্রামক আদর্শ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় নেবে না, নেওয়া

উচিত নয়। অনুশোচনা হ'ল, এতগুলো বছর কেন নষ্ট করলাম। ঙ্কু যা এত সহজে বুঝেছিল আমার তা বুঝতে এতগুলো বছর লাগল কেন? ঠাকুরদা, বাবা, বড়কাকা ও বিশুমামারা জীবন কাটাচ্ছেন একটা আদিম অস্পষ্টতার মধ্যে। বিশ্বাসের শেকড় মাটি থেকে আলগা হয়ে আছে তবু তাঁরা জল দিয়ে যাচ্ছেন গোড়ায় অন্ধ মানুষের মত। অন্ধ অনুকরণের সর্বনাশা মনোবৃত্তি আমাকেও পেয়ে বসেছিল। ঙ্কু আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে।

আমি চলে এলাম আউটহাউসের দিকে। চাকর-ঠাকুররা সব ঐখানেই ঘুমোয়। সদর দরজার দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমি এখন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমার সামনে নতুন জগৎ। মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করবার মহামন্ত্র আমি শিখেছি। আমার বিশ্বাসের শিকড় আলগা নয়। আমি নিজেকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করতে লাগলাম। বাইরে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নির্জন রাস্তা, রাস্তার বাতিগুলো থেকে পুরোপুরি আলো ব্ল্যাক-আউটের সময় থেকেই পাওয়া যায় না। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরেও বাতিগুলোর কালিমা ঘোচেনি। রাস্তার দিকেই চেয়েছিলাম। মনে মনে ভয়ও আমার কম নয়, পুলিস যদি কোন রকমে টের পায়! গোটা পলিটবুরো আজ গোয়াবাগানে। হঠাৎ দেখলাম সামনের দিকের রাস্তা দিয়ে একটা জিপ গাড়ি আসছে। পুলিসের গাড়ি বলেই মনে হ'ল। আমি সরে এলাম ভেতরের দিকে। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল। সর্বনাশ হয়েছে, পুলিস বোধহয় টের পেয়ে গেছে। আড়াল থেকে চুপি দিয়ে দেখলাম জিপ গাড়িটা থামল না, বেরিয়ে গেল। মনে হ'ল আমি যেন দেখলাম গাড়িতে বসে আছেন পিসেমশাই। ভোর রাত্রিতে পিসেমশাই ডিউটি দিতে বেরিয়েছেন কেন? আমি খবরটা ঙ্কুর কাছে পৌছে দেবার জন্য ছুটে এলাম অন্দরমহলের দিকে। রাস্তার মুখে কে-একজন দাঁড়িয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঙ্কু কই? শিগ্‌গির বলুন।" অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে তিনি বললেন, "ঙ্কু একটু ব্যস্ত আছে। তুমি এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

"ডেপুটি-কমিশনার রণদা ব্যানার্জি জিপ চালিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করছেন।"

"তিনি হয়তো ডিউটি দিচ্ছেন। ভয় নেই কমরেড।"

'কমরেড' শব্দটা উচ্চারণ করবার সংগে সংগে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। উত্তপ্ত করমর্দন! তিনি বললেন, "মিটিং শেষ হয়ে গেছে।" অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি ছুটলেন সামনের অন্ধকারের দিকে। ছুটবার আগে তিনি দুটো কাজ করলেন। প্রথমে, চকিতের মধ্যে হাতঘড়িতে সময় দেখলেন, দ্বিতীয়, বলে গেলেন, "আমার নাম বিনয়প্রকাশ। পরে দেখা হবে কমরেড।"

এবার আমার ইচ্ছা হ'ল পলিটবুরোর মেম্বারদের দেখতে। বারান্দা দিয়ে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই অন্ধকারে কে-একজন আমার রাস্তা আগলে দাঁড়াল। বলল, "ওদিকে যাবেন না।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

"রাস্তা বন্ধ। দু'জন এখনও বেরতে পারেননি।"

সরে এলাম ওখান থেকে। মনে মনে ভাবলাম ভাগ্যে থাকলে শেষ-দু'জনকেই আমি দেখব, লুকিয়েই দেখব। আমারই বাড়িতে চলবার স্বাধীনতা আমি মধ্যরাত্রিতে নুকুর হাতে সই করে তুলে দিয়ে এসেছি, সুতরাং প্রতিবাদ করতে পারলাম না। আমি বাড়ির পেছনদিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। সামনে চেয়ে দেখি একটা গাছের আড়ালে নুকু দাঁড়িয়ে আছে। নুকুকে বললাম, "আমায় একটু দেখা না?"

"চুপ দীপুদা, কথা ব'ল না!"

পূব আকাশ তখন ফরসা হয়ে আসছে। রাস্তায় লোকচলাচল আরম্ভ হয়েছে। একটু পরে দু'জন সাহেবী-পোষাক পরা ভারতীয় খুব নিশ্চিন্ত-ভাবে হেঁটে চলে গেলেন। দু'জনের মুখেই লম্বা পাইপ। তামাকের উগ্র গন্ধে মাথা আমার ঝিমঝিম করছিল। একটা জিপগাড়ি এসে থামল শুনতে পেলাম। তারপর গাড়িটা বেরিয়ে গেল গর্জন করতে করতে। মুহূর্তের

মধ্যে গোয়াবাগানের বাড়িতে আর কেউ রইল না। আমি আর নুকু গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। নুকুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শেষের দু'জনের মধ্যে একজন ছোটকাকা। আর একজন কে রে নুকু?" গভীর দৃষ্টি দিয়ে নুকু আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আশপাশটা ভাল করে পরখ করে নিয়ে বলল, "বর্মার কমরেড ঘোষাল। তিনি আজ এখানে মান্য অতিথি হয়ে এসেছিলেন ছোটকাকার সংগে দেখা করবার জন্য।"

বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসবার সময় নুকু আমার হাত চেপে ধরল। দাঁড়িয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। তারপর বলল, "আজ থেকে তুমি আমার শুধু দীপুদা নও, কমরেড।"

সাতদিন পর বিনয়প্রকাশের সংগে সাক্ষাৎ হ'ল। মাঝখানে আর নুকু নেই। সন্ধ্যার পর ময়দানে রুমাল বিছিয়ে দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসলাম আমরা। আমি বললাম, "আমায় এবার কাজ দিন।" চারদিকে ভাল করে চেয়ে নিয়ে বিনয়প্রকাশ বলল, "তোমার বিশুমামার একটা ডোসিয়ার তৈরী কর। কোন কথা বাদ দেবে না। তাঁর পুরো ইতিহাস আমরা চাই। সেই সংগে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অধ্যাপকদের তুমি জানো তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত লিখবার কাজও তোমাকে দিলাম। আচ্ছা দীপক, বিশুবাবু হঠাৎ কেন সব ব্যবসা ছেড়ে দিলেন?" বললাম, "আমার কাছেও খুব অবাক লাগছে। মনে হয় ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যই তিনি আগে থেকে সাবধান হয়ে গেলেন।"

"আমার তা মনে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ-কথা কেন বলছেন?"

"হরিপ্রসাদকে তিনি এক কোটি টাকার উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। হরিপ্রসাদ হয় নি।"

"বলেন কি! মামার ঐশ্বর্য পার্টির কাজে লাগত!"

"কিন্তু সর্ত ছিল যে, হরিপ্রসাদকে পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশুবাবুর আসল মতলবটা আমরা জানতে চাই।"

আমি বললাম, "আপনাকে আমি পরে জানাব।"

তারপর আমরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। রাত্রিতে বাড়ি ফিরেই মামার টেলিফোন পেলাম।

তিনি বললেন, "দীপু, গান্ধিজি আর নেই!" মামার গলা ভেজা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?"

"গড্‌সে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁকে খুন করেছে।"

"তুমি কোথা থেকে ফোন্ করছ মামা?"

"ফারপো থেকে। দীপু, এবার কম্যুনিষ্টদের পোয়া বারো। ভারতবর্ষের মত কাঁচা জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলতে খুব বেশি সময় নেবে না। বুঝলি?"

"হাঁ বুঝেছি। আর কিছু বলবে?"

"হাঁ রে, তোর কাকীমার খবর কি? কেউ দেখতে পেল না, অসূর্যম্পশ্যা না কি?"

"আমি কি করে বলব? আমিও তাঁকে দেখিনি।"

"ইংরেজ আমলে বাঙালীরা ইংরেজ, জার্মান কিংবা ফরাসি মেয়ে বিয়ে করত। তোর ছোটকাকার শ্বশুরবাড়ি লিথুয়েনিয়া। এবার লিথুয়েনিয়ার আমল সুরু হ'ল নাকি?"

"মামা, তুমি গান্ধিজির কথা বলছিলে।"

"তিনি আর নেই। প্রথম খৃষ্টাব্দের পর এত বড় শহিদ আর কে আছেন?"

"এবার তা হ'লে তুমি অনীতার সংগে কথা বল।"

"অনীতা কি করছে?"

"কাঁদছে। ছেড়ে দিচ্ছি।"

গান্ধিজির মৃত্যু হ'ল প্রায় এক মাস হয়ে গেছে। কান্নাকাটি যা করবার কংগ্রেসী নেতারা করেছেন। খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমার ডকুমেণ্টারি, এবং ময়দানের মাইক মারফৎ ভেজা গলায় অসংখ্য বক্তৃতা দিলেন কংগ্রেসী নেতারা। বাঙালীর তোড়জোড় আরও বেশি হ'ল। অমিয়-নিমাই চরিতের

দেশে ভাবপ্রবণতার ঢেউ উঠল। আমরাই ট্রামে বাসে বলাবলি করি কংগ্রেস বাঙালীদের চিরশত্রু। আমরাই আবার কংগ্রেসের জন্য সব চেয়ে বেশি কাঁদি। আসলে নদের নিমাই-এর সময় থেকে আমাদের কান্না থামেনি। মৃদঙ্গয় চাঁটি মারতে পারলেই কেউ আর চোখের জল রুখে রাখতে পারে না। এবার ভগবান সুযোগ দিলেন আমাদের। মহাত্মা-মৃদঙ্গে চাঁটি মারল গড্‌সে। ওমনি বাঙালীর চোখে বন্যা এলো, বন্যা থামতে চায় না, চলছে তো চলছেই।

অনীতা একদিন বলল, "পূর্ব-বাংলার রিফিউজিরা রাস্তাঘাটে মারা যাচ্ছে দাদা।"

আমি বললাম, "নাজারেথের দিকে চেয়ে থাকলেই করগেটেড্‌ সিট আর চাল আসবে।"

"কিন্তু তোমরা সব কোন্‌ দিকে চেয়ে আছ? নাজারেথ না মস্কো?"

আমি বললাম, "নাজারেথও নয়, মস্কোও নয়।"

"তবে?"

"চেয়ে আছি তোর দিকে। নবদ্বীপের নেড়ানেড়ীদেরও হার মানিয়েছিস তুই। কেবল হাত জোড় করে কার কাছে প্রার্থনা করিস? কিসের প্রার্থনা? ভগবান তো অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন। দেখিস না, ডালমিয়ার ঘরে আটটি বৌ? আটটি বউ কি করে যোগাড় হ'ল? ঐ মোড়ে বিড়লা পার্ক দেখেছিস? ওটা সত্যেন ঠাকুরের ছিল। সত্যেন ঠাকুরের মত ভগবান বিশ্বাসী সাধুব্যক্তি ক'টা ছিলেন কলকাতায়? তবে কি করে গেল? ভগবান মারা গেছেন, তাই। অনীতা, যীশুখৃষ্ট না কুষ্ঠরোগ সারাতেন? ভারতবর্ষের কুষ্ঠরোগ এই ধনিক-সম্প্রদায়। কই নাজারেথের সন্তান সেদিকে একটু দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন? আশা করি এর পর থেকে প্রার্থনা করার আর দরকার হবে না।"

মৃদু হেসে অনীতা বলল, "হবে।"

"হবে ? কার জন্য ?"

"রুসিয়ার জন্য। আর যারা ভগবানকে অস্বীকার করবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধছে, তাদের জন্য। দাদা তোমার জন্যও আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। মনের কুষ্ঠরোগ তো ধনিক সম্প্রদায়ের চেয়েও খারাপ।"

বুঝলাম অনীতার সংগে তর্ক করা বৃথা। ও কেবল মজে যায়নি, হেজেও গেছে। বিপ্লবের আগুনে এই সব পোকাগুলো একদিন নিজেরাই এসে উড়ে পড়বে।

সেদিন বিনয়প্রকাশ আমায় বলল, "হালিশহরে আমরা একটা রিফিউজি-কলোনি করেছি। সেই ফ্রণ্টে আমাদের কি রকম কাজ হচ্ছে একবার দেখে এসো।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কবে যাব ?"

"কমরেড সুদেব তোমার কাছে কাল সকালেই যাবে। সে তোমার সংগে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না।"

পরের দিন আমি আর কমরেড সুদেব শেয়ালদা স্টেশনে এলাম বেলা সাড়ে-দশটায়। কমরেড সুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ক্লাশের টিকিট কাটব ?"

"আমার কোন শ্রেণীতেই আপত্তি নেই। এই নিন টাকা।"

প্রথম শ্রেণীতে বসলাম আমরা। তৃতীয় যাত্রী কেউ নেই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা কথা কইলাম না। আমরা সাধারণত অসতর্কভাবে কথা কইনা। শত্রু আমাদের চারদিকে। দেওয়ালের কান থাকা অসম্ভব নয়। চারদিক দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "রিফিউজি ফ্রণ্টে কি রকম কাজ হচ্ছে ?"

"আমি তো সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। কমরেড অবনী মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন। কিংবা হালিশহর এলাকার নেতা কমরেড মন্নাফ বলতে পারবেন।"

"আপনি কি কাজ করেন ?"

"পার্টির জন্য চাঁদা তুলি। চাঁদা তোলার ফ্রণ্টে আমি প্রায় পাঁচবছর ধরে কাজ করছি।" কমরেড সুদেব কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। বাতাসের

গতির মধ্যে দু'একটা শব্দ যদি জড়িয়ে যায় তা হ'লে পেছনের কামরার জানলা দিয়ে দু'চারটে শব্দ শত্রুর কানে গিয়ে পৌছনো অসম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, "চাঁদা তোলার পদ্ধতি কি ?"

"পদ্ধতির আগে চাঁদার পরিমাণটা ওপর থেকে ঠিক হয়ে আসে। হালিশহর কেন্দ্রের সব খরচ আমাকে যোগাড় করতে হয়। তার উপর জিলা-কমিটিতে দু-শ' টাকা পাঠাতে হয় প্রতিমাসে।"

"সব খরচ বাদ দিয়ে দু-শ' টাকা যদি না বাঁচে ?"

"বাঁচাতেই হবে। দু'টাকা কম হ'লে দোষের ভাগ আমার।"

"হালিশহরের মেম্বার কত ?"

"তিন-শ'।"

"মাত্র তিন-শ' ?"

কমরেড সুদেব বললেন, "তিন-শ' মানে তিরিশ হাজারের সমান। ইচ্ছা করলে তিন ঘণ্টার মধ্যে হালিশহরকে আমরা স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারি। কিন্তু আমি চাঁদা তোলার পদ্ধতির কথা বলছিলাম।"

"হাঁ, বলুন।"

"তিন-শ' মেম্বারের কাছ থেকে প্রায় তিন-শ' টাকা ওঠে।"

"এদের মধ্যে প্রায় সবাই তো রিফিউজি ?"

"রিফিউজি বলেই তো তিন-শ' পাই। নইলে পঁচাত্তর টাকাও উঠত না। প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে এরা নিয়মিত টাকা পাচ্ছে। দেবে না কেন ? তাছাড়া পাইয়ে-দেওয়ার মূলেও তো আমরা। রিফিউজি অফিসে আমাদের কমরেডরা চাকরি করেন।"

"আপনাদের খরচ হয় কত, দু-শ' টাকা বাদ দিয়ে ?"

"চার-শ'।"

"সে টাকাটা তোলেন কি করে ?"

"যারা পার্টির মেম্বার নয় তাদের কাছ থেকে। প্রথমে খুবই অনুরোধ করতে

হয়। তারপর প্রথমবার যদি দেয় আমরা তার নাম লিখে রাখি। দ্বিতীয়বার নিজে ইচ্ছা করে দিলে ধরে রাখি। দু'এক বছর পরে তাকে আমরা পার্টির সদস্য করতে পারব। তবে খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হয়। তাছাড়া আমাদের অনেক রকমের ফাণ্ড আছে। যেমন 'শান্তিসেনা ফাণ্ড', 'বাস্তহারা স্বাস্থ্য সমিতি'। গেল বৈশাখে এমন ঝড় উঠল যে, অনেকের ঘরই পড়ে গেল। আমরা 'বাস্তহারা গৃহ সংস্কার সমিতি' বলে একটা ফাণ্ড খুললাম। আশেপাশে দু'চারজন স্কুলমাষ্টার আছেন। তাঁরাও গোপনে কিছু কিছু পাঠান। কম্যুনিষ্ট পার্টির চাঁদা তোলার পদ্ধতি পৃথিবীর সব জায়গাতেই এইরকম। নায়ক্রাগুয়াতে যদি কম্যুনিষ্ট পার্টি থাকে, আশা করি নিশ্চয়ই আছে, সেখানেও এই পদ্ধতি। কেবল সদস্যদের চাঁদা দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি চলতে পারে না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "চাঁদার পরিমাণ বাড়াবার আর কোন উপায় নেই?"

"তাও আছে। অনেক সময় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে মোটা টাকা আসে। সরস্বতী পূজার সময় আমরা একটা জলসা করেছিলাম।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কম্যুনিষ্টরা সরস্বতী পূজা করে নাকি?"

"না করলে, লোক জোটাব কি করে? তা ছাড়া এরা সব মূর্খ রিফিউজি। দেবদেবীকে ছাড়তে বললে কম্যুনিজম ছেড়ে দেবে। মার্কসবাদ শিক্ষা দেবার জন্য নাইট স্কুল আছে। কিন্তু ধর্ম কথাটা আমরা সহজে উচ্চারণ করি না। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মনটাকে তৈরি করে তুলতে পারলে তারপর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর খড় আর মাটি ধরে টান দেব। অতএব সবরকম পূজার সুযোগ নিয়ে আমরা নিয়মিত জলসার আয়োজন করি। এছাড়া অনেকে কংগ্রেসের ওপরে রাগ করেও আমাদের কাছে টাকা রেখে যান।"

বললাম, "পঞ্চম-বাহিনীর লোক যদি হয়?"

"তাঁদের নাম ঠিকানা সব আমরা সংগে সংগে কলকাতার পার্টি-অফিসে পাঠিয়ে দি। সেখান থেকে সব কিছু তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে খবর

পৌঁছতে প্রায় পনরোদিন লাগে। কমরেড মন্নাফ যোগ্য লোক। তিনি কখনও ভুল করবেন না।"

'আমরা হালিশহরে এলাম।

রিফিউজি কলোনিতে প্রবেশ করে আমার মনে হ'ল কম্যুনিষ্ট এলাকার কলোনি অন্যান্য কলোনি থেকে অনেক ভাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে। কমরেড মন্নাফের সংগে কলোনির সামনেই দেখা হ'ল। তিনি বললেন, "চলুন, কমরেড অবনী মণ্ডলের সংগে পরিচয় করিয়ে দেই।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কমরেড অবনী মণ্ডল কে?" কলোনির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কমরেড মন্নাফ অবনী মণ্ডলের জীবনী বর্ণনা করতে লাগলেন।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার সময় অবনী মণ্ডল বগুড়া জেলার পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতা এসেছিল। দেশের দু'খানা ঘর বেচে পেয়েছিল নগদ পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ বিঘা জমির দাম এক-শ'-পঞ্চাশ, তাও সে নগদ পেয়েছিল। কিন্তু দেশত্যাগের হিড়িকে সে যখন গ্রাম থেকে বগুড়া স্টেশনে এলো তখন তার পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেছে। গ্রামের চৌকিদার তার বৌকে নিরাপদে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে। অতএব পঞ্চাশ টাকা বখশিস না দিলে অবনী মণ্ডলের ইজ্জৎ বাঁচত না।

রওনা হওয়ার আগে চৌকিদার জিজ্ঞাসা করল, "ও অবনী, পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে তোর বৌকে ত পার করব। কিন্তু দিবি কত বল্ তো? একটু দরদস্তুর করবি না?"

বৌ তখন একটা বোঁচকা হাতে নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়েই সে বলল, "দরদস্তুর করে কি হবে চৌকিদার? অমন বৌ যার ঘরে, তার ঘরবেচা পয়সা সবই তোকে দিয়ে যাব। তোকে ঠকাব না।"

তারপর পাঁচক্রোশ রাস্তা ওরা নিঃশব্দে হেঁটে এলো। শহরের ইঁটের রাস্তায় পা দেওয়ার আগে মাঠ থেকে খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে অবনী মণ্ডল বলল, "দু-ঢেলা মাটি নিয়ে যাই। রাগ করবি না তো?"

"মাটি নিয়ে কি করবি? হাতের তালুতে আর কটা ধান জন্মাবে!"

"তা জন্মাবে না। কিন্তু সারা রাস্তাটা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যাব চৌকিদার। জন্মভূমির মাটিতে সুগন্ধ আছে। ঠিক কিনা বল্?"

"হাঁ, যথার্থ কথা। তবে বোঁচকা করে মাটি নিয়ে যাবি, শহরের বড় পুলিশরা যদি ধরে? রেখেই যা অবনী।"

"হাঁ, রেখেই যাই। শহরের লোকরা আমাদের মত নয়।"

দু'পা এগিয়ে গিয়ে অবনী মণ্ডল সহসা আবার জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু পুলিশ আমায় ধরবে কেন রে? আমি তো কিছু চুরি করিনি?"

"যদি বলে মাটি চুরি করেছিস্?"

"পুলিশরা তবে ভুল করবে চৌকিদার। সব কিছু চুরি করা যায় কিন্তু মাটি কেউ চুরি করতে পারে না।"

স্টেশনে পৌঁছে অবনী মণ্ডল চৌকিদারকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বেশ একটু হাসল। তৃপ্তির হাসি, প্রতিশ্রুতি রাখার হাসি। শেষে বলল, "রাগ করলি নাকি চৌকিদার?"

"রাগ একটু হয়েছে বৈকি!" এই বলে চৌকিদার তিনখানা দশটাকার নোট অবনী মণ্ডলের হাতের দিকে ধরে পুনরায় বলল, "এত টাকা দিস্না। সংগে কিছু বেশি রাখ। রাস্তায় কত আপদ-বিপদ আছে।"

"বৌ যখন সংগে আছে তখন আপদ-বিপদের ভয় করি না। তোকে আমি দিলাম। আর অত টাকা দিয়ে আমার দরকার কি চৌকিদার?"

এর পর চৌকিদার আর আপত্তি করেনি। চৌকিদার চলে যাচ্ছিল। অবনী মণ্ডল বলল, "এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাবি না? কবে আবার দেখা হবে মা কালী জানেন।"

"নারে তোর সময় নেই। ট্রেন এসে পড়বে।"

"তাহ'লে পরের গাড়িতে যাব।"

"দূর বোকা, কলকাতা যাওয়ার গাড়ি এই একটাই।"

"তবে কালকেই যাব। এত তাড়াতাড়ি কিসের? এক ছিলিম তামাক খেয়ে যা চৌকিদার।"

গাড়ি ছাড়ল।

বগুড়া থেকে শেয়ালদা পৌঁছতে ওদের দু'দিন লেগেছিল। সে অনেক কাহিনী। লোক যত বেশি উতলা হয়ে ছুটতে লাগল রেল-কর্মচারীরা তত বেশি ব্যগ্র হয়ে হাত বাড়াতে লাগল পয়সার জন্য। তিনবার ওদের গাড়ি থেকে নামতে হয়েছে। তিনবার ওরা গাড়ি ফেল করেছে। দশ সের ওজনের বোঁচকা খুলে পুলিশের লোক তন্নতন্ন করে খুঁজেছে নিষিদ্ধ বস্তুর সন্ধান পায় কিনা। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুস্থান এলাকায় যখন এলো অবনী মণ্ডলের বোঁচকার মধ্যে কেবল দু'ঢেলা মাটি ছিল—জন্মভূমির মাটি।

বৌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "পাছাপেড়ে সাড়িখানাও নিয়ে গেছে!' নেভা হুঁকো মুখের কাছে তুলে অবনী মণ্ডলও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অনেক ভেবে চিন্তে বলল, "শহরে সব উল্টো নিয়ম দেখছি বৌ। তা হোক, নিয়ম তো বটে। মানতেই হবে।"

"কেবল দু'ঢেলা মাটি আর একটা থালা আছে।"

"থালায় করে আমায় মাটি দিস্, খেয়ে মনের জ্বালা মিটবে। কিন্তু তুই যেন আর তর্ক করিস্ না। তোকে ওরা বোকা বলবে।"

"সব নিয়ে গেল! আমাদের তো বোকা বলবেই।"

"আমরা বোকা নই। আমরা চাষী।' চাষীর ইজ্জৎ তো কেড়ে নিতে পারবে না বৌ।"

শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন এসে ঘর বাঁধল তখন অবনী মণ্ডলের ট্যাঁকে পাঁচটাকা ছ'আনা ছিল। ছ'আনার তামাক, টিকে আর একটা দেশলাই কিনে ছ'দিন পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে ওর সময় খুব খারাপ কাটে নি।

কিন্তু সাতদিনের দিন সর্বনাশ হ'ল! বিহারী ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চার আনার আলুর তরকারি কিনে সে বৌকে সন্ধ্যার সময় খাইয়েছে। রাত আটটার সময় থেকে ভেদবমি, রাত বারটার মধ্যে সব শেষ। ভলান্টিয়াররা ডাক্তার ডাকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অত রাত্রে শেয়ালদা স্টেশনে কোন্ ডাক্তার আসবে? ভিজিট পেলেও অনেক ডাক্তার আসে না। রাত বারটা থেকে সেই যে অবনী মণ্ডল হুঁকোর মধ্যে মুখ লাগিয়ে বসেছিল পরের দিন বেলা বারটা পর্যন্ত সে আর মুখ নামায়নি। ভুড়ুং ভুড়ুং তামাক টেনেছে। একটানা বারঘণ্টা তামাক খেয়েছে বগুড়ার অবনী মণ্ডল। শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসেই খেয়েছে। এই বার ঘণ্টা পর্যন্ত মৃতদেহ ওখানেই ছিল। বত্রিশঘণ্টা থাকলে কলকাতার সব ক'টি নোংরা মাছি সব অঞ্চল থেকে উড়ে এসে অবনী মণ্ডলের বৌকে ঘিরে ফেলত।

যাক। সে সব কথা তো অতীত কাহিনী। জগতের বুকে ঘটনার স্রোত এত দ্রুতভাবে বইছে যে, কালকের ঘটনা আজকেই পুরনো হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতির কোন দাম নেই। দাম দেওয়ার আগেই আর একটা ঝড় আসে। সব ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যায়।

আমরা অবনী মণ্ডলকে নিয়ে কথা বলতে বলতে একেবারে মাঠের মধ্যে নেমে গেলাম। পশ্চিম বাংলার মাঠ। জিজ্ঞাসা করলাম, "এদেশের মাটি কেমন লাগছে কমরেড?"

"আজ্ঞে, চাষীর কাছে মাটি হচ্ছে দেব্‌তা।"

বললাম, "আজ্ঞে নয়। কমরেড বলবে।"

"কমরেড!"

"হাঁ। আত্মসম্মান না থাকলে বাঁচবে কি নিয়ে?"

"চাষী তো মাটি নিয়েই বাঁচে হুজুর।"

"হুজুর নয়, কমরেড।"

"কমরেড।"

"হাঁ। দেখো, তোমাদের অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্য আমরা সব দিনরাত চেষ্টা করছি। আমরা মানে কম্যুনিষ্ট পার্টি।"

"আমাদের নামে দু'চার বিঘে জমি লিখে দিন, আমরা আর কিছুই চাইব না মহারাজ।"

"মহারাজ নয়, কমরেড।"

"আজ্ঞে হাঁ, কমরেড।"

"জমি আমরা কারও নামেই লিখে দেব না। জমির মালিক সবাই। ফসল যা হবে সবাই ভাগ করে খাবে। কাউকে উপোষ থাকতে দেব না, আবার কাউকে মহারাজ হতেও দেব না।"

"যথার্থ কথা। শহরের নিয়মকানুন সব আলাদা।"

তারপর জমির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিঘা প্রতি কি রকম ধান হচ্ছে?"

"একবছর আগে তিন মণও হত না। এখন প্রায় আট মণ করে হচ্ছে। হচ্ছে, তাও কমরেড মণ্ডলের জমিতে।" কমরেড মন্নাফ বললেন।

"তা হ'লে এক কাজ করুন। 'মণ্ডল পুরস্কার' নামে কিছু ক্যাশ টাকা উপহার দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন। তাতে অন্যান্য কমরেডদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে।"

কমরেড মন্নাফকে পাশে ডেকে নিয়ে বললাম, "আপনারা প্রচার করতে থাকুন, আট মণ নয়, বার মণ। তাতে উৎসাহ আরও বেশি হবে।" কমরেড মন্নাফ বললেন, "হাঁ, বুঝেছি। স্টাখানোভের মত।"

কমরেড মন্নাফ অবনী মণ্ডলকে বললেন, "কমরেড, এক বছর আগে এই জমিতে বিঘা প্রতি মাত্র তিন মণ করে ধান জন্মাত। মাত্র তিন মণ।" অবনী

মণ্ডল বলল, "আমি আট মণ তুলেছি।" মন্নাফ যেন ধমকে উঠলেন, "আট মণ নয়, বার মণ।" অবনী মণ্ডল চাইল কমরেড মন্নাফের দিকে। দৃষ্টিতে তার মস্ত বড় প্রশ্ন ছিল বুঝলাম। মন্নাফ বললেন, "ধান মাপবার সময় আমার ভুল হয়েছিল।" এবার অবনী মণ্ডল হেসে উঠে বলল, "ধান মাপলাম তো আমি হুজুর।"

"হুজুর নয়, কমরেড।"

"আজ্ঞে হাঁ, কমরেড।"

অবনী মণ্ডল ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পারলাম। আমি জানি একটা মিথ্যাকে বার বার করে প্রচার করতে পারলে আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, সেটা সত্য হয়ে উঠবে। অবনী মণ্ডলের দিকে চেয়ে কমরেড মন্নাফ বললেন, "দাড়িপাল্লায় গোলমাল ছিল কমরেড। তাই তুমি বুঝতে পারনি। আসলে বার মণই ছিল। তোমাকে আমরা পুরস্কার দেব। পরের ফসলে অন্তত তের মণ চাই।"

অবনী মণ্ডল মাঠ থেকে খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে পাচ আঙুলে পিষতে লাগল। মাটির সংগে ওর আত্মার আত্মীয়তা। হাত দিয়ে চাপ দিলেই যেন বুঝতে পারে কোন্ মাটিতে কত ধান জন্মাবে। এরই মধ্যে আর সব কলোনির রিফিউজিরা এসে আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়েছে। সবাই আনন্দে অবনী মণ্ডলকে জড়িয়ে ধরল। কমরেড মন্নাফ ঘোষণা করলেন, "প্রত্যেক কৃষকের জীবনে অবনী মণ্ডল আজ মস্তবড় আদর্শ। আমরা তের মণ পেয়েই সন্তুষ্ট হব না। তের মণই শেষ নয়। তেরর পরেই চৌদ্দ। অতএব আসছে ফসলে প্রত্যেকেই যেন অন্তত বার মণ করে ধান তুলতে পারে। কমরেড মণ্ডল তুলবেন তের।"

আমি গর্ব বোধ করলাম। আমরা ইচ্ছা করলেই তিনঘণ্টার মধ্যে হালিশহরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে পারি। অন্তত শেয়ালদা স্টেশনের অবনী মণ্ডলকে একজন দেশী স্টাখানোভ তৈরি করতে পারব এতে

আর সন্দেহ নেই। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে মিথ্যার একটা অংশ রইল। তা থাক। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, সে সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। আমি বললাম, "কমরেড মন্নাফ, 'মণ্ডল পুরস্কার' প্রথমে অবনী মণ্ডলকেই দেওয়া হোক।"

জনতা হাততালি দিতে লাগল। আমি পকেট থেকে দুটো দশটাকার নোট কমরেড মন্নাফের হাতে দিয়ে বললাম, "একটা ভাল কোদাল কিনে দেবেন।" জনতার উল্লাস যেন সীমা হারিয়ে ফেলল। অবনী মণ্ডল মাথা নীচু করে রইল।

সবাই তখন অবনী মণ্ডলকে চ্যাংদোলা করে শূন্যে তুলে ফেলেছে। জনতার ঘাড়ের ওপরে বসে অবনী মণ্ডল আমার দিকে চাইল। তারপর বলল "হুজুর, শহরের নিয়মকানুনই আলাদা।"

ঝুকু একদিন আমায় খবর দিয়ে গেল, আগামী কাল বৈদ্যবাটিতে একটা ট্রেড ইউনিয়নের ঘরোয়া মিটিং আছে। আমায় সেখানে যেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদ সকাল বেলাতেই একটা জিপগাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে বৈদ্যবাটির দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদ ভাল বাংলা বলেন। তাঁর বাবা ছিলেন চটকলের কুলির সর্দার। 'ভদ্রলোক' করবার জন্য তিনি কৃষ্ণপ্রসাদকে ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। সর্দার বেঁচে থাকলে তিনি হয়ত দেখে যেতে পারতেন যে, তাঁর ছেলে সর্বহারাদের সর্দার হয়েছেন। আফশোস তিনি করতেন না।

কুলি-লাইনে এসে দেখলাম কমরেডদের। চটকলের মজদুর! মনে হ'ল, এরা মাছও নয় মাংসও নয়। কতগুলো নোংরা মাছি, বৈদ্যবাটির নর্দমা থেকে উঠে এসে কুলি-লাইনে জমায়েত হয়েছে। তারাশংকরের 'উপকথা'

এ নয়, অন্নদাশংকরের বাদলের মত বাপের পয়সা পকেটে নিয়ে এরা কুলি-লাইনে এসে গা-ঢাকা দেয়নি। এরা মাছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের চক্রান্তে এরা মাছি হয়েছে। এদের জন্য তোমরা নর্দমা তৈরি করেছ। তোমাদের হৃদয়হীনতার তুলনা পাওয়া ভার। মশাই আপনার বাদলকে পাঠিয়ে দিন, এই নর্দমায় এসে তিনি অজ্ঞাতবাস করুন। ছিঃ, আপনাদের লজ্জা হয় না ছাপাখানা থেকে বই বার করতে? কাদের জন্য বই লেখা হচ্ছে? গুটিকয়েক বাবুদের জন্য? ডেপুটি-গিন্নিরা পড়বে? ক'দিন পর ওরাও পড়বে না। বাস্তব জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে বুর্জোয়া সাহিত্য আজ মোহনবাগান রো আর বংগীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের বাড়িখানার বাজার দর কত? দশ টন্ রাজপুতানার ভইসা ঘির মুনাফা দিয়ে বাড়িখানা কিনে ফেলা যায় না? গোটা বাংলা দেশটাই যখন বিকিয়ে যেতে বসেছে তখন গুটি কয়েক সাহিত্যিকের সংসার প্রতিপালনের জন্য বুর্জোয়া সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন, "এবার চলুন আমার বাড়িতে। সেখানে মিটিং আছে।"

"চলুন।"

গ্রাণ্ডট্রাংক রোড ছেড়ে আমরা এবার কাঁচা রাস্তা ধরলাম। কাঁচা রাস্তার দু'ধারে শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ। কচি কচি ধান গাছগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে দুদিকে মাথা দোলাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে মাথা দোলাতে দোলাতে বড় হবে। কখন কেমন করে যৌবন পার হয়ে যাবে এরা তা জানতেও পারবে না। কৃষাণের কাস্তে উদ্যত হয়ে আছে। কোন্ এক পরিণত মুহূর্তে এরা উদ্ধার পাবে এ জীবনের মত। এরা উদ্ধার পাবে বটে, কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের উদ্ধারের রাস্তা কই?

কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ি কুলি-লাইনে নয়। দেখলাম বেশ সাজানো

গোছানো বাড়ি। মৃত সর্দারের একজীবনের কীর্তি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অন্যান্য কমরেডরা সব এসে গেলেন। একজন বাইরে পাহারা দিতে লাগলেন। মিটিং সুরু হ'ল। কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন, "এ অঞ্চলে দুটো ট্রেড ইউনিয়ন আছে। একটা আমাদের, অপরটা মালিকদের। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আদেশ এসেছে মালিকদের ইউনিয়নের বর্তমান সেক্রেটারি কল্যাণবাবুকে সরিয়ে আমাদের একজন গুপ্ত-সদস্যকে ওখানে বসাতে হবে। আপনারা উপায় উদ্ভাবন করুন।"

কমরেড ঘনশ্যাম দাস জিজ্ঞাসা করলেন, "কল্যাণবাবু কি রকম লোক?"

"খাঁটি বুর্জোয়া। টিকিতে ফুলবেলপাতা বাঁধেন, মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। তিনি স্তন্যপায়ী এবং তৃণভোজী।"

"ওদের নির্বাচনের সময় আসতে ক'মাস বাকি?"

"দু' মাস।"

কমরেড ঘনশ্যাম দাস উপস্থিত সভ্যদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোন উপায় বার করতে পারেন কি?"

কমরেড যাদব রায় বললেন, "গুম্ করবার আদেশ দিলে আমার পক্ষে কাজটা সহজ হত।"

কমরেড ঘনশ্যাম দাস বললেন, "না। কল্যাণবাবুর জীবন আমরা নষ্ট করব না, নির্বাচনের আগে আমরা তাঁর চরিত্র নষ্ট করব। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পার্টিতে আমাদের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, শত্রুদের চরিত্র নষ্ট করবার জন্য। 'ক্যারেকটার এসাসিনেশন স্কোয়াড্।' আমরা যদি তাদের সাহায্য নেই কারো আপত্তি আছে?"

অন্যান্য কমরেডরা সব চুপ করে রইলেন মিনিট দুয়েক। তারপর একে একে সবাই বললেন যে, কারোরই আপত্তি নেই।

"তা হ'লে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে, কল্যাণবাবুর আশেপাশে একজন মজুরের যুবতী বৌকে ভিড়িয়ে দেওয়া। নির্বাচনের কিছু আগে থেকে তাঁর

ভক্তদের কানে কানে প্রচার করতে হবে যে, তিনি কম্যুনিষ্ট স্ত্রীলোকের সংগে রাত্রিযাপন করেন ইত্যাদি। ঠিক কি ভাবে এগুতে হবে তার নির্দেশ আপনারা স্কোয়াডের কাছ থেকে নিয়ে আসবেন।" এই বলে কমরেড ঘনশ্যাম দাস একটা সিগারেট ধরালেন।

কমরেড যাদব রায় প্রস্তাবটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে বললেন, "কল্যাণবাবু ইংগ-মার্কিনের দালাল। নির্বাচনের পর পা দিয়ে মাড়িয়ে দেব।"

একটু পর কমরেড কৃষ্ণদাস বললেন "এবার আমি আপনাদের কাছে দ্বিতীয় সমস্যা উত্থাপন করছি। কলকাতা থেকে যে-সব খবরের কাগজ এ-অঞ্চলে বেশি বিক্রি হয় তার প্রায় সবগুলোই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী।" ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করলেন, "কাগজ বিক্রির এজেন্টরা কি পার্টির সভ্য নয়?"

"সবাই নয়।"

কমরেড যাদব রায় লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন, "দু'চারটে এজেন্টকে সরিয়ে দেব না কি?"

"না। আমাদের তাহ'লে সবাই গুণ্ডা বলবে।" ঘনশ্যাম দাস মন্তব্য করলেন। তারপর তিনিই আবার বললেন, "কলকাতার বুর্জোয়া কাগজগুলোতে আমাদের কমরেডরা ঢুকে পড়েছেন। ভেতর থেকে যদি আমরা দখল করতে পারি তবে কাজ অনেক সহজ হবে। মালিকরা মুনাফা পেলেই সন্তুষ্ট। আমরা প্রতিশ্রুতি দেব, মুনাফা তাঁদেরই থাকবে। এবং সুযোগ বুঝে প্রতিশ্রুতি ভাঙব। ভাঙতেই হবে। নইলে মুনাফাই থাকে, কম্যুনিজম থাকে না। আমাদের আদর্শের মধ্যে গুণ্ডামি নেই, আছে দখলের চেষ্টা। কোন্ আদর্শ না দখল করতে চায় বলুন? আপনারা প্রথমে কাগজের এজেন্টগুলোকে পার্টির সভ্য করে ফেলুন। তারপর কাজ অনেক সোজা হয়ে যাবে। দু'একটা 'কালো ভেড়া' থাকবেই। তারও ব্যবস্থা আমরা করব। গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডে দু'একটা একসিডেন্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মোটর লরির চাকা কোন একজন এজেন্টের পেটের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া এমন কি কষ্টকর?"

কমরেড যাদব রায় দ্বিতীয়বার লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, "এবার কাজ অনেক সহজ হ'ল।" মিটিং শেষ হওয়ার পর কমরেড কৃষ্ণপ্রসাদ আমায় কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সমস্তটা রাস্তা আমরা কোন আলোচনাই করলাম না। তিনি জানতেও চাইলেন না আমি কে এবং কেনই বা মিটিংএ যোগ দিতে গিয়েছিলাম।

পার্টির কাজ নিয়ে আমার সময় কাটতে লাগল অতি দ্রুত। দু'টো বছর চলে গেল। মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই। কাজ আর কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঁস্তোরা কিংবা বসন্ত কেবিনে বসে সময় নষ্ট করবার কথা মনে পড়লে আজ অনুশোচনা আসে। রমেনের কথা মনে হলে দুঃখ হয়। সে এখনও ভবিষ্যতের ভয়ে এম. এ. পরীক্ষা দেয়নি। পাশ করলে বেকার জীবনের বোঝা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে মনে করেই সে এখন কলেজ ষ্ট্রিটের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। হয়ত সে তার ছোটগল্পের খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে! মাসিকপত্রে রমেনের দু'একটা লেখা আমি পড়েছি। লেখায় একটা ওর স্বতন্ত্র স্টাইল আছে। কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু সেই বুর্জোয়া অবাস্তবতায় ভরপুর।

হুকু বলে, "রমেনবাবুর নায়ক বোধহয় সোসালিষ্ট পার্টির মেম্বার।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে বুঝলি?" নতুন একটা মাসিকপত্রের খোলা পাতার দিকে চেয়ে হুকু বলল, "এই দেখো। নায়ক তাঁর জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে বলছেন যে, পুঁজিবাদ-সর্বস্ব সমাজে মানুষের কল্যাণ নেই। অথচ শেষ পর্যন্ত নায়ক তাঁর ঠনঠনেতে লুটিয়ে পড়ে মা কালীর কাছে সমাজের কল্যাণ ভিক্ষা করছেন! দীপুদা, রমেনবাবুকে পার্টিতে টেনে নাও। তাঁকে বুঝিয়ে দাও যে, ঠনঠনের ঠুনকো কালীর কাছে কল্যাণ ভিক্ষা করলে সমাজের কল্যাণ আসবে না। একদা প্রাক্‌মার্কসীয় যুগে বুর্জোয়া জড়বাদে অবিদ্যমানতাসূচক জপতপের প্রয়াস ছিল। কিন্তু ডায়ালেকটিকাল বস্তুতন্ত্রের সবটুকুই প্রত্যক্ষ-

বাদ। আমার মনে হচ্ছে রমেনবাবুকে বোঝাতে পারলে তোমার মত তিনিও পার্টিতে যোগ দেবেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, সোসালিষ্ট পার্টির আদর্শের মত কম্যুনিজম গুণ্ডাকার আদর্শ নয়।"

এসব আলোচনার পরও ছ'মাস কেটে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রমেনের সংগে দেখা করা সম্ভব হয়নি।

মামার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করে রিপোর্ট নিয়ে বিনয়প্রকাশকে দিয়ে দিয়েছি। নুকুর কাছে শুনেছি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশেই ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ নিয়ে 'ডোসিয়ার' তৈরি হচ্ছে। আমাদের হাতে রাষ্ট্র আসবার আগেই শ্রেণী-সংগ্রামের শত্রুদের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে রাখা ভাল।

হঠাৎ একদিন বিনয়প্রকাশ বলে বসল, "আমাদের পার্টির প্রকাশ্য কাজে তুমি খুব অল্পই যোগ দিয়েছিলে বটে কিন্তু এখন থেকে তাও আর পারবে না।" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"তা তো বলতে পারব না। ওপর থেকে আদেশ এসেছে।"

কুইনস্ পার্কে এসে শুনলাম, দু'দিন আগে ছোটকাকা মাদ্রাজ থেকে ফিরেছেন। মা বললেন, "তোর ছোটকাকা দশ বছরের ওপর বিলেতে কাটিয়ে এসেছে, কিন্তু আমাদের দেবদেবীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।"

"কি করে বুঝলে মা?"

"কাল মাঝরাতে হঠাৎ তিনতলার ছাদে গিয়ে দেখি যে, সে আমার ঠাকুর-ঘরে চোখ বুজে বসে আছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়েই চোখ বুজেছে বুঝলাম। তা হোক। প্রথম প্রথম অমনি করেই চেষ্টা করতে হয়।" তারপর গলার সুরটা একটু নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ছোট একটা রেডিওর বাক্স মত দেখলাম জগদ্ধাত্রীর সামনে রয়েছে। কানে একটা তার যন্ত্র লাগানো। দীপু, ব্যাপারটা কি রে?"

"ছোটকাকাকে জিজ্ঞাসা করোনি ?"

"করেছিলাম। সে বলল যে, বিলেত থেকে নতুন রেডিও-সেট এসেছে। তাই জগদ্ধাত্রীর কাছে পূজো দিচ্ছে। কাল থেকে নাকি বাজারে বিক্রি হবে।"

"ছোটকাকা ঠিক কথাই বলেছেন মা।" এই আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "অনীতা হঠাৎ কারসিয়ং চলে গেল কেন ?"

"কনভেন্টে একটা চাকরির চেষ্টা করছে। কলকাতা ওর ভাল লাগে না।"

"মা, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না যে, অনীতা আমাদের বংশের নাম ডোবাবে।"

"কেন ?" মা চমকে উঠলেন।

বললাম, "খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ওর গভীর আকর্ষণ। সেখানে থেকে ও হয়ত কোনদিনই আর ফিরে আসবে না।"

"তুই কি করতে বলিস দীপু ?"

"ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

"পাত্র কোথায় ?"

"কেন হরিপ্রসাদ রয়েছে।"

"বলিস কি দীপু ? অনীতার পছন্দ হবে কেন ?"

"আমাদের সমাজে মেয়ের পছন্দ হবে না বলে পাত্র কেউ ফিরিয়ে দেয় না। তোমার যদি মত থাকে অনীতা আপত্তি করবে না।" মা দু'মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন, "না, আমার মত নেই। হরিপ্রসাদ কেবল বি. এ. ফেল নয়, সে একজন গুণ্ডা। দাদার মত লোকও ওকে ভয় করেন।"

"মা, বিয়ে দেওয়া, না-দেওয়া তোমার ইচ্ছা। তাই বলে লোককে শুধুশুধু গুণ্ডা বলবে কেন ?"

"দীপু, ব্যাপার কি ? ওসব দলে তুইও যোগ দিয়েছিস না কি ?"

একটু হেসে বললাম, "কি যে বল মা!"

"না। এ হাসির কথা নয়। তুকুর চিন্তায় তোর দাদুর রাত্রে ঘুম আসে

না। তাঁর ধারণা নুকু কম্যুনিষ্ট। নুকুর নীতি-জ্ঞানের অভাব ঘটেছে দীপু। আমার কাছে যতই গোপন করুক, আমার বুঝতে বাকি নেই যে, সে পুরুষ মানুষের সংগে খুব বেশি মেলামেশা করছে।"

"মা, নুকু অসৎ সংগে পড়ে নি। আমি জানি, সে একজনকে ভালবাসে। ওর মাও নেই, বাবাও নেই। থাকলে এত দিনে বিয়ে হয়ে যেত।"

"তা হ'লে ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আয়, আমরা দেখতে চাই। বাড়ির বাইরে গিয়ে চৌধুরী পরিবারের কেউ আজ পর্যন্ত ভালাবাসা জানায়নি।"

এরপর আমি আর মার সংগে তর্ক করিনি, করে লাভও নেই। পচনশীল সমাজের নীতি-জ্ঞানে আমরা কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। বুর্জোয়াদের নীতি-শাস্ত্র ও নৈতিকতা ভগবানের হুকুমনামা থেকে উদ্ভূত। এই ভগবানটি কে? পুরোহিত, ধর্মযাজক, ভূস্বামী ও ভাববাদী দার্শনিকদের সৃষ্ট এক শোষণসক্ষম কল্। কিন্তু কম্যুনিষ্টের নৈতিকতা শ্রেণী-সংগ্রামের অভাব অভিযোগ ও বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত। মানবসমাজের বাইরে থেকে সংগৃহীত নীতিশাস্ত্রের জুয়াচুরির কথা আমরা জানি। দেহ কিংবা মন দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে স্বর্গের আকস্মিকতা নেই। ভগবৎ-প্রেমের রোমাঞ্চ দিয়ে সমাচ্ছন্ন করবার অসাধু প্রয়াসও নেই। অতএব গোয়াবাগানের বাইরেই যদি নুকু বিনয়প্রকাশকে ভালবেসে থাকে তবে নীতিজ্ঞানের অভাব হবে কেন? ভালবাসার নৈবেদ্য থেকে নুকু বুর্জোয়া-নারায়ণকে বখরা দিতে চায়নি। ভালবাসার বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সানাই-বাদ্য কোথাও নেই। এই জন্যই ধর্মের সংগে কম্যুনিজমের আড়ি। আড়ি ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ, জগতের ধর্মাধিকরণরা কম্যুনিজমের বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করেন না। স্বীকার করলে পুঁজিবাদীর আফিমের ব্যবসা উঠে যায়। লেনিন তাই বার বার বলেছেন, 'ধর্ম আফিমের নেশা ছাড়া আর কিছু নয়।' ব্যবসা উঠে গেলে মুনাফা থাকে না। পুঁজিবাদী জগতের ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি প্রভৃতি সবই এই মুনাফা-কেন্দ্রিক। মুনাফায় যদি আমরা হাত দিতে যাই অমনি ঐ

শোষণ-অস্ত্রগুলো ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চেঁচিয়ে ওঠে: 'সর্বনাশ! কম্যুনিষ্টের নীতি-জ্ঞান নেই!'

নেই কেন? আমাদের নীতি-জ্ঞান লোকোত্তরিত নয়, লোকায়ত। ধাপ্পা নয়, সত্য। আর সন্তানের মত হুকুর সন্তানও হাত পা নাড়বে। রাষ্ট্রের শিশুরক্ষাগারে সে বড় হবে কম্যুনিজমের আদর্শে, সত্যের দুধ খেয়ে। আফিমের নেশামুক্ত হুকুর সন্তান আগামীদিনের ডিক্‌টেটার, প্রলেটারিয়েট-রাষ্ট্রের সর্বগুণসম্পন্ন অল্‌মাইটি!

সন্ধ্যের পর গোয়াবাগানে ফিরে এসে দেখি হুকু আজ বাড়িতেই আছে। এই সময় সে কোন দিনও বাড়ি থাকে না। ওর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে হুকু, বাইরে যাসনি?"

"একটু পরেই যাব। দীপুদা, তুমি আসবে আমার সংগে?"

"কোথায়?"

"ফিয়ার্স লেনে। সেখানে একটা আমাদের স্টাডি-সার্কেল আছে। বক্তৃতা দেবেন কমরেড লিন্‌ চাও।"

"পিকিং থেকে এসেছেন বুঝি?"

"না, বেন্টিক ষ্ট্রিট থেকে। মার্কসীয়-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। দীপুদা, যে দার্শনিক মতবাদ মেহনতকারীকে বাঁচবার খোরাক যোগায় তাকেই তো বলে মার্কসীয়-দর্শন।"

"হাঁ, সহজভাবে বলতে গেলে অনেকটা তাই বোঝায়। বিনয়প্রকাশ যাবে না?"

"বিনয়প্রকাশ? সে তো দারজিলিং চলে গেছে। আমিও কাল সকালের প্লেনে দিল্লি যাচ্ছি। কতদিন থাকতে হবে জানি না। বিনয়প্রকাশকে দেখতে পাব না। এই না-দেখার দুঃখ আমার সবচেয়ে বেশি দীপুদা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "হঠাৎ দিল্লি যাচ্ছিস যে?"

"কি করব বলো? দিদি কার্সিয়ং-এ গিয়ে বসে রইল। জ্যেঠাইমা তাঁর

জগদ্ধাত্রী নিয়ে মত্ত। জ্যেঠামশাইয়ের সংসার চলে কি করে? আর তা ছাড়া মন্ত্রীদের সংগে একটু আলাপ-পরিচয় থাকা ভাল। বিনয়প্রকাশ বলে, দরকার হ'লে মন্ত্রীদের সামনে আমরা মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের ন্যাড়া-নেড়ী সাজব। 'মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে দশায় পড়ব। বুর্জোয়া মনুষ্যত্বের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে পারলে আমাদের শক্তি বাড়বে।" খোপার মধ্যে একটা কাঁটা লাগাতে লাগাতে নুকু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি দারজিলিং যাবে, দীপুদা?" জবাব দেওয়ার আগে নুকুই আবার বলল, "তুমি দারজিলিং যাচ্ছ আসছে বুধবার। থাকবে মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের চোদ্দ নম্বর কামরায়। শুনেছি ঐ কামরায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী নাইজাম বাহাদুর সাতদিনের জন্য একবার ছিলেন। তুমি থাকবে এক মাস। মন্ত্রীর ছেলে, বড় হোটেলে থাকবে, সে তো স্বাভাবিক। কে তোমায় সন্দেহ করবে বলো?"

বললাম, "না, তা করবে না।"

"সবাই মনে করবে তুমি ভল্‌গা-কাকীমার সংগে দেখা করতে যাচ্ছ। দীপুদা, ভল্‌গার সংগে ভল্‌গার বেশ ছন্দমিল আছে, না? ভল্‌গা নদীতে ছোটকাকা তাঁর জীবনতরী ভাসিয়েছেন, এ কথা কাকীমা সম্ভবত জানেন না। তুমি কিন্তু কখনও তাঁর ধরা-ছোঁয়ায় মধ্যে যাবে না, বুঝলে?"

"বুঝেছি।"

"বড্ড মাথা ধরেছে। তোমার মাথা ধরলে কি করো দীপুদা?"

'এসপিরিন্ খাই।"

"আমিও খাই। কিন্তু অনেক সময় এসপিরিন্ সংগে থাকে না। তখন ইচ্ছা হয় দালানের গায়ে মাথা ঠুকে মরে যাই। এই যাঃ! তোমার টিকিটের কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।" এই বলে নুকু তার ব্যাগ থেকে একটা প্রথম-শ্রেণীর রেলটিকিট বার করে আমার হাতে দিল। তারপর বলল, "পরশু দিন তুমি রওনা হচ্ছ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টার সময় কাট রোডের কোনো এক জায়গায় তোমার সংগে বিনয়প্রকাশের দেখা হবে। এই ঠিকানাটা মুখস্থ করে নাও।"

হুকুর হাতে একটা টুকরো কাগজের মধ্যে বিনয়প্রকাশের ঠিকানাটা লেখা ছিল। বার কয়েক পড়লাম ঠিকানাটা। বললাম, "মুখস্থ হয়েছে।" কাগজের টুকরোটাতে হুকু দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে বলল, "হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—।"

"আবার কি কথা মনে পড়ল?"

"রি-ক্যাপিচুলেশন। তুমি পরশু দারজিলিং যাচ্ছ। থাকবে মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের চোদ্দ নম্বর কামরায়। কাকীমার সংগে আলাপ-পরিচয় করবে কিন্তু পার্টির কথা তিনি যেন কিছুই বুঝতে না পারেন। বিনয়প্রকাশের ঠিকানা তো তোমার মুখস্থ হয়েই গেল। আচ্ছা বলত ঠিকানাটা, আমি আবার শুনি?"

বিনয়প্রকাশের ঠিকানা আমি বললাম। হুকু বলল, "তুমি ঠিকানা অনুযায়ী যাবে। কার বাড়ি তা তোমার জানবার দরকার নেই। দীপুদা, আমার কথা তোমরা ভুলে যাবে না তো? কি মজাই না করবে তোমরা! এবার তা হ'লে আমি একটু ঘুমই? এই যাঃ! ফিয়ার্স লেনে যেতে হবে না?"

"আজ না হয় থাক হুকু। কাল গেলেই চলবে।"

"ওমা, এর মধেই ভুলে গেলে? কাল সকালেই এরপ্লেনে চেপে আমি দিল্লি চলে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের যত বড়াই না করো, প্লেনে চাপতে আমার বড্ড ভয় করে দীপুদা। হাঁ, কি বলছিলাম যেন?"

"ফিয়ার্স লেন।"

"হাঁ, ফিয়ার্স লেন। আসলে আমরা যাব কমরেড লিন্ চাওএর সংগে দেখা করতে। তাঁর কাছ থেকে একটা সুটকেস নিয়ে আসব। কমরেড লিন্ চাও কেবল জুতোর কারিগর নন, ভাল সুটকেসও তৈরি করতে পারেন।"

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "দীপুদা, খুব সাবধান। সুটকেসের মধ্যে আমাদের পার্টির সব মূল্যবান জিনিস আছে: স্টেনগান্।"

"তা হ'লে চল্, নিয়েই আসি।"

"তাই চলো দীপুদা।"

"স্যুটকেস কি গোয়াবাগানে থাকবে?"

"না, তোমার সংগে দারজিলিং যাবে। তোমার কি মজা দীপুদা! এবার দারজিলিং গিয়ে সামরিক-বিদ্যা শিখে আসতে পারবে। টাইগার হিলের তলায় আমাদের স্যাণ্ডহার্স্ট।" আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মুকু আমায় জড়িয়ে ধরল।

গাড়ি চালিয়ে চললাম ফিয়ার্স লেনের দিকে। রাত তখন প্রায় আটটা। মুকু আমার পাশেই বসেছিল। বৌবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ দিক দিয়ে ঢুকব?"

"এক্ষুনি ঢুকবার কি দরকার? চলো না একটু গংগার দিকটায় ঘুরে আসি।" এই বলে মুকু স্টিয়ারিংটা টান দিয়ে সোজা করে দিল। গাড়ি পার হয়ে এলো বৌবাজারের মোড়।

মুকু বলল, "দীপুদা, তোমার পাশে যদি আমার বদলে অন্য কেউ থাকত?"

"তার মানে?"

"এই ধরো যাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতে ভাল লাগত, গাড়িতে স্পীড উঠত?"

"তা উপস্থিত তেমন কেউ তো নেই।"

"নেই?" মুকু এমনভাবে চমকে উঠল যেন না-থাকটা ওর বিশ্বাসই হ'ল না।

"তা যদি না থাকে তবে উপস্থিত আমাকেই তুমি তেমন একজন বলে কল্পনা করে নাও দীপুদা। রাস্তার লোকদের খানিকটা ভাঁওতা দেওয়া যাক।"

এসপ্ল্যানেডের মোড় পার হতে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার কোন্ দিকে যাব?"

চট করে রাস্তার আলোয় নিজের হাত-ঘড়িটায় সময় দেখে নিয়ে মুকু বলল, "কেন, রেড রোড? ইংরেজরা আমাদের জন্য রাস্তা তো রেখেই গেছে। ঐ যে কার্জন পার্ক, ওটাকে রেড স্কোয়ার নাম দিলে কেমন হয় দীপুদা?"

তখন আমরা রেড রোডে এসে গেছি। নুকু যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আমায় প্রশ্ন করল, "হাঁ, কি যেন বলছিলাম? মনে পড়েছে। ভাঁওতা।" তারপর ফস করে নুকু জিজ্ঞাসা করে বসল, "দীপুদা, রমেনের বোন গীতার সংগে তোমার দেখা হয় না?"

"গীতাকে তুই চিনিস নাকি?"

"না, তবে খবর রাখি। বাধ্য হয়েই রাখতে হয়েছে।"

"কেন?"

"তুমি যখন পার্টির মেম্বার হ'লে তার আগেই তোমার জীবনের সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করে একটা রিপোর্ট পেশ করতে হয়েছে। আমরা তাকে বলি ডোসিয়ার। তুমি নিজেও তো অনেকের ডোসিয়ার তৈরি করেছ। তোমার তো না-জানার কথা নয় দীপুদা।" হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে নুকু বলল, "রাসেল ষ্ট্রিটের দিকে গাড়ি ঘোরাও।"

"ফিয়ার্স লেনে যাবি না?"

"না। কমরেড লিন্ চাও রাসেল ষ্ট্রিটে থাকেন।"

"এই যে বললি বেণ্টিক ষ্ট্রিটে?"

রাসেল ষ্ট্রিটে আসতেই নুকু বলল, "গাড়িটা এইখানে পার্ক করো। হাঁ ঠিক হয়েছে। তুমি একটু বসো। ও ভাল কথা, একটা সিগারেট দাও তো দীপুদা।"

"সিগারেট?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে প্যাকেট বার করে নুকুর হাতে দিলাম। নুকু একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। তারপর চলে যাওয়ার আগে আমায় বলে গেল, "ও ভাল কথা, মনে পড়েছে। তোমার পাশে এসে কেউ যদি একটা প্যাকার্ড গাড়ী পার্ক করে তুমি তাতে ভয় পেয়ো না।"

"ভয় পাব কেন?"

"না পেলেই মঙ্গল। প্যাকার্ড থেকে কেউ যদি তোমায় বলে, হ্যালো, মিঃ রয়। তুমি তাহ'লে জবাব দেবে, হ্যালো, মিঃ ওয়ালেস। বুঝলে?"

"বুঝলাম।"

"তারপর প্যাকার্ড থেকে ওরা একটা স্যুটকেস তোমার গাড়িতে তুলে দেবে। তুমি গাড়ি চালিয়ে সর্ট ষ্ট্রিটে আসবে। মোড়ের একটু আগেই আমি অন্য একটা ম্যানসন থেকে বেরিয়ে আসব।"

"বুঝলাম।"

"ভুল হবে না তো?"

"না।"

"রি-ক্যাপিচুলেশনের দরকার আছে?"

"দরকার নেই।"

"চট করে আর একবার বলেই নিচ্ছি দীপুদা। মিঃ রয়, মিঃ ওয়ালেস, স্যুটকেস। গাড়ি চালিয়ে সর্ট ষ্ট্রিটের মোড়ের একটু আগে। তারপর তো আমিই থাকব। ঠিক আছে?"

"ঠিক।"

সুকু চকিতের মধ্যে ওর হাত ঘড়িটায় সময় দেখে নিলো। তারপর বলল, "পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে প্যাকার্ড এসে যাবে। আমি এবার চলি।" সুকু চলে যাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টানতে লাগলাম। সহসা আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। একটা প্যাকার্ড গাড়ি ম্যানসনের ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে আমার ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল। প্যাকার্ড থেকে কে-একজন বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়।"

আমি বললাম, "হ্যালো, মিঃ ওয়ালেস।"

সংগে সংগে চল্লিশ ইঞ্চি মাপের স্যুটকেসটা আমার গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তারপর সর্ট ষ্ট্রিটে আসতে আর বেশি সময় নিল না। সুকুও ঠিক সময় বেরিয়ে এলো। আমি দূর থেকেই দেখেছি সুকু আসছে। গাড়ি থামালাম। সুকু এদিক-ওদিক একটু দেখে নিয়ে আমার পাশে এসে বসল। পেছন দিকে চেয়ে দেখল স্যুটকেস আছে।

গোয়াবাগানে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকবার আগে মুকু দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় বলল, "কাল সকালে আর তোমার সংগে আমার দেখা হবে না। ভোরবেলা দমদম গিয়ে প্লেন ধরব। দাদুকে বোলো, দিল্লিতে জ্যেঠামশাইয়ের কাছে নিরাপদে থাকব। আর ঐ সুটকেসটা খুব সাবধান। ভাল কথা মনে পড়েছে। দিদি কারসিয়ংএ আছে। দিদিকে পার্টিতে আনবার চেষ্টা কোরো না। বিনয়প্রকাশ যেন ভুল না করে। আমি তা হ'লে শুতে যাই। গুড নাইট, কমরেড।"

মুকু দরজা বন্ধ করল।

রওনা হবো, এমন সময় পিসেমশাই এসে উপস্থিত। সর্বনাশ, টের পেয়েছেন না কি! একেবারে পুলিসের পোষাক পরে এসেছেন। তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দারজিলিংএ গিয়ে কেবল টাইগার হিলে বসে সূর্যোদয় দেখলে চলবে না দীপক। লেখাপড়া করিস। শ্লাভ কাকীমার কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করবার দরকার নেই। হাজার হ'লেও বিদেশী লোক। আমাদের অনেকটা সয়ে যেতে হবে।"

"কিন্তু আমি তো কাকীমার সংগে থাকব না।"

"তাই নাকি? ভালই হয়েছে। ওখানে থাকলে কিছু লেখাপড়া হবে না। চল্ স্টেশনে পৌছে দিয়ে আসি।"

বুকের ভেতর আমার আবার কম্পন উঠল। বললাম, "তোমার গিয়ে কাজ নেই পিসেমশাই। তোমার শুধুশুধু কষ্ট হবে।"

"কষ্ট?" পিসেমশাই হেসে উঠলেন, "কষ্ট কিছুই নয় দীপক। আমার ডিউটি আজ ঐ-দিকটায় পড়েছে। কাল মুকুকে পৌছে দিয়ে এলাম দমদমে। প্লেনে চাপতে ওর নাকি ভীষণ ভয়। বিজ্ঞানের বাহাদুরিতে ওর নাকি বিশ্বাস নেই।"

"আমার সংগে তিনচারটা সুটকেস, তোমার জিপ-গাড়িতে জায়গা হবে না।"

"খুব হবে। সংগে আমার আঁরদালি নেই। নিজেই আমি গাড়ি চালাব। চল্, সময় আর বেশি নেই। হাঁরে, বার্থ রিজার্ভ করা আছে তো?"

"হ্যাঁ, পিসেমশাই।"

"চল্, দেখে আসি তোর সহযাত্রীদের। তুই যে ছেলেমানুষ তাঁদের বলে আসব।" আমি যে ভয় পেয়েছি পিসেমশাই তা বুঝে ফেলেছেন না কি? ভাবলাম সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। তাড়াতাড়ি এখন সরে পড়তে পারলেই রক্ষে।

শেয়ালদা এসে গাড়িতে উঠে বসলাম। প্রথম-শ্রেণীর কুপে কমপার্টমেণ্ট। দরজায় নাম দেখলাম আমার সংগে ডক্টর গুহ বলে আর একজন ভদ্রলোক যাচ্ছেন। একটু পর তিনি এলেন। কোথা থেকে পিসেমশাই ছুটে এসে বললেন, "হ্যালো, ডক্টর গুহ? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"দারজিলিং।"

"বেশ ভালই হ'ল। এই ছেলেটিকে একটু দেখবেন। দীপক, ডক্টর গুহ যাচ্ছেন দারজিলিং পর্যন্ত। আয় পরিচয় করিয়ে দি। ভারত সরকারের পুণায় যে এম্যুনিশন কারখানা আছে তার ইঞ্জিনিয়ার। বিস্ফোরক পদার্থ সম্বন্ধে ডাঃ গুহ মস্তবড় বিশেষজ্ঞ। আর এই আমার বড় শালা গৌরীশংকরের ছেলে দীপক।"

গাড়ি ছাড়ল। গাড়ি ছাড়বার পর ডক্টর গুহ একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি জেগে আছেন কি ঘুমিয়ে আছেন বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই বাঁচি। স্টেনগানের ঘ্রাণ নেই জানি। তবুও একটু ভয় করতে লাগল।

একটু পরেই তিনি চাদরের তলা থেকে মুখ বার করলেন। আমি অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাতিটা নিভিয়ে দি?" তিনি বললেন, "দিন। আমার কোন আপত্তি নেই।" আমার যেন মনে হ'ল তিনি ঐ সুটকেসটার দিকে দৃষ্টি দিলেন। নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কামরায় বাতিটা টিমটিম করে

জ্বলছিল। যুদ্ধ থেমেছে প্রায় আড়াই বছর হ'ল। তবু যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে [illegible]তির ডায়ালেকটিক ভাবতে লাগলাম। সময় কাটানো দরকার। হেগেল বলেছেন, দুটো বিপরীত অবস্থার সংঘাত থেকে জীবন ও জগতের উন্নতি হয়। যেমন আলোর উল্টো-অবস্থা অন্ধকার। এই দুয়ের বিপরীত অস্বীকৃতির মধ্যে উজ্জ্বলতর আলোর উদ্ভব হবে। এমন করে ক্রমশই বিপরীত অবস্থার ডায়লেকটিকের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সত্তার অবিমিশ্র পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। পৌঁছবে ঠিক, কিন্তু পৌঁছবার পথে বহুবার এই বিপরীত অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এইবার মার্কস এলেন তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিকাশের তল্পিতল্পা নিয়ে। তিনি বললেন, এই বিপরীত অস্বীকৃতি ইতিহাসগত। অতএব আমি এর নাম দিলাম ঐতিহাসিক জড়বাদ। কি রকম? তিনি দেখালেন মানব ইতিহাসের সবত্র এই বিপরীত অস্বীকৃতির খেলা চলেছে। জীবনের কথা উঠলেই মরণ এসে দাঁড়ায় উল্টো দিকে। উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে বৈপরীত্যের মিলন ঘটে। এই মিলন থেকে প্রতিটি বস্তুর এবং সত্তার উন্নততর প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক জীবনে এর উন্নততম পরিপূর্ণতা কম্যুনিজম, শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ। কিন্তু এই পরিপূর্ণতা-লাভের পথে আমাদের মাথায় গুরু দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ দুঃখ, অবিরাম সংগ্রাম ছাড়া আমরা এক পাও এগুতে পারব না। সংগ্রাম-স্পৃহা আমাদের মজ্জাগত। মার্কস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গরিবের সংগে বড় লোকের, পুঁজিবাদীর সংগে সর্বহারার, শাসকের সংগে শাসিতের, পুরনোর সংগে নতুনের সংঘাত লেগেই রয়েছে। এবং এই সংঘাতের ফলে আমাদের উন্নতি হবেই। অর্থাৎ সব উন্নতির মূলে এই শ্রেণী-সংগ্রাম। অন্ধকারে ট্রেনের কামরায় শুয়ে আমি যেন অনুভব করলাম, জয় আমাদের সুনিশ্চিত, হাতের মুঠোর মধ্যে যেন জয়ের নিশান লুকনো রয়েছে। সংগ্রামের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারলেই দিল্লির লাল কেল্লায়

লাল পতাকা উড়িয়ে দিতে আমরাই পারব। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি টের পাইনি। পরের দিনও ডক্টর গুহর সংগে আমার বিশেষ কিছু আলাপ পরিচয় হ'ল না।

শিলিগুড়িতে নামবার সময় আমি লক্ষ্য করলাম, ডক্টর গুহর সংগেও একটা হলদে রঙের স্যুটকেস আছে।

কমরেড, তারপর ডক্টর গুহর সংগে আমার যখন দ্বিতীয় বার দেখা হয় তখন আমরা দু'জনেই তোমাদের রাষ্ট্রের দাসবন্দী-শিবিরে বাস করছি, শ্লেভ লেবার ক্যাম্পে। কম্যুনিষ্ট ভারতের জংগল সাফ করেছি দু'জনেই এবং একই জংগল। ভাগ্যের চক্রান্তেই হোক, আর স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিসার বিনয়-প্রকাশের কারসাজিতেই হোক, আমরা দু'জনেই বিশ বছরের কারাদণ্ড উপহার পেয়েছিলাম। দু'বছর কারাভোগের পর ডক্টর গুহকে উন্মাদ-আশ্রমে পাঠান হয়। তিনি কেবলই বলতেন, "হলদে স্যুটকেসটায় কি ছিল জানেন মশাই?"

যাক, সে তো অনেক বছর পরের কথা। উপস্থিত আমি দারজিলিংএ মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের চোদ্দ নম্বর কামরায় এসে পৌঁছে গেলাম।

সন্ধ্যে ছ'টার একটু আগেই বিনয়প্রকাশের সংগে দেখা করতে গেলাম। খানিকটা দূর এগোতেই হঠাৎ দুটো হেড-লাইট ফেলে একটা জিপ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। জিপের ভেতরে বিনয়প্রকাশ নেই। হরিপ্রসাদ ছিল। গাড়ির স্টিয়ারিং হরিপ্রসাদের হাতে, তার পাশে একজন ভুটিয়া-গোছের লোক বসে ছিলেন। হরিপ্রসাদ বলল, "উঠে আসুন।"

উঠলাম। পেছন দিকে আমি বসলাম। গাড়ি কার্ট রোড ধরেই চলল। হরিপ্রসাদ পরিচয় করিয়ে দিল ভুটিয়ার সংগে, "কমরেড দীপক চৌধুরী আর কমরেড ডোরজি লোপোন।"

হরিপ্রসাদ মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের সামনে এলো। ভুটিয়া নামলেন গাড়ি থেকে। একটু দূরে সরে যেতেই হরিপ্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "সুটকেসটা দিয়ে দেবেন। কমরেড বিনয়প্রকাশের খবর কাল পাবেন।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কমরেড লোপোন বললেন, "বিশ্ব-বিপ্লবের সৈনিক আমরা। আমাদের সৌহার্দ্য আদর্শগত।" লাউঞ্জে এসে তিনি নিজেই হুইস্কি আনতে বললেন। দুটো বেয়ারা ছুটল তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য। তিনি ইংরিজিতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হুইস্কি না ব্রাণ্ডি?" আমি বললাম, "আমাদের মধ্যে আর ভেদাভেদ রেখে লাভ কি? সমতা রক্ষা করাই ভাল।" তারপর, হুইস্কি এলে, তিনি গেলাসটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—আমি বৌদ্ধ।" লক্ষ্য করলাম এক চুমুকে তিনি প্রায় অর্দ্ধেকটা হুইস্কি খেয়ে ফেললেন। আমি কোনদিনও মদ খাইনি, আজকে প্রথম খাচ্ছি। কিন্তু কমরেড লোপোন বললেন, এবার বাংলায়, "ভেবেছিলাম আপনি আনাড়ি।" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি বাংলা শিখলেন কোথায়?"

"অক্সফোর্ডে। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার জন্য ভাষাটা আমায় শিখতে হয়েছিল।"

গেলাসে আর একবার ঠোঁট লাগিয়ে তিনি বললেন, "শিখেছিলাম একজন মস্ত বড় ভাষাবিদের কাছে। রাসিয়ান।"

"রাশিয়ানের কাছে বাংলা ?"

"কেবল বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সব ক'টা বড় বড় ভাষা অনর্গল বলতে পারেন তিনি। আমি বলছি উনিশ-শ' পঁয়ত্রিশ সালের কথা। কমরেড প্লেখানভ সেই বছরই তিব্বতীয় ভাষা শিখেছিলেন। কম্যুনিষ্ট দ্রষ্টা কমরেড প্লেখানভের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সুদূর মানে কত দূর ?" তিনি হেসে বললেন, "ঐ টেবিলটা পর্যন্ত।"

কোণায় একটা টেবিলে ভারতীয় আর্মির তিনজন অফিসার ব'সে মদ্যপান করছিলেন। হুইস্কির শেষ বিন্দু নিঃশেষ করে কমরেড লোপোন বললেন, "আপনার প্রশ্নটার জবাব আরো এক রকমভাবে দেওয়া যায়।"

"কি রকম ?" আমার প্রশ্নের মধ্যে কৌতূহল ছিল।

"কমরেড প্লেখানভ গোপাল হালদারের উপন্যাস পর্যন্ত পড়েছেন। মানিক বাঁড়ুজ্জের পদ্মা নদীতে তাঁর সাঁতার কাটা শেষ। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মত প্রাচীন। ভুটিয়া ও নেপালি ভাষায় কাঁচা মাটির গন্ধ। কিন্তু কমরেড প্লেখানভ কাঁচা মাটিও খেয়েছেন। তিনি বলেন, ভাষা শেখবার নেশা যখন রয়েছে তখন তাড়ি খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। স্ট্রাটেজির দিক থেকে নেপাল ও ভুটান আমাদের এখন সীমান্ত। মানে, ম্যাক্‌মোহন লাইনের স্বপ্ন কমরেড প্লেখানভের আর নেই।" তিনি উঠলেন। আমার সংগে সংগে তিনি এলেন চোদ্দ নম্বর কামরায়। ঘরের চারদিকটা ভাল করে দেখলেন তিনি। তারপর সেই হলদে সুটকেসটা তাঁর নজরে পড়ল। আমি সুটকেসটা ওপরেই রেখেছিলাম। কমরেড লোপোন টেবিলের ড্রয়ারগুলো একটা একটা করে খুলে দেখতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, "কাল সকাল সাড়ে সাতটার সময় আপনি 'মেলে' যাবেন। যাওয়ার সময় যেটা ঠিক আপনার ডান দিক হবে সেই ডান দিকের প্রথম বেঞ্চিতে আপনি বসবেন। আমি ঠিক সাড়ে সাতটায় আসব। ঘড়িটা মিলিয়ে নিন।"

ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম। তারপর কমরেড লোপোন স্যুটকেস হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার ফস্ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুদিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, "শট্‌গান্ ছুঁড়তে জানেন?" আমি বললাম, "জানি।" কমরেড লোপোন চলে যাওয়ার পর আমার মনে পড়ল নুকু বলেছিল টাইগার হিলের নীচে আমাদের পার্টির 'হ্যাণ্ডহার্স্ট'।

সকালবেলা ঘড়ি মিলিয়ে মেলের রাস্তা ধরলাম। মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেল থেকে আমার নতুন যাত্রার সুরু। কমরেড লোপোনের সংগে জিপ গাড়িতে চেপে আমরা ক্রমশই পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলাম। কয়েক ঘণ্টার পর কমরেড লোপোন গাড়ি থামালেন। এমন জায়গায় থামালেন যেন এক গজ এদিক-ওদিক সরে গেলে আমরা দশ হাজার ফুট নীচে পড়ে যাবো। কমরেড লোপোন বললেন, "আসুন, ভয় পাবেন না। লেনিন-ষ্টালিনবাদের অংক দিয়ে রাস্তা তৈরি, পিছলে পড়বার ভয় নেই।"

গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, "এইটেই কি আমাদের সামরিক ঘাঁটি?"

"কম্যুনিষ্টদের ঘাঁটি সর্বত্র। যে সরাইতে রাত কাটাব সেখানেই আমাদের প্ল্যানিং হবে। সামনেই যে মন্দির দেখছেন ওটা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। আপনি বোধহয় জানেন না যে, আমি এ-অঞ্চলের জমিদার।" এই সময় একজন গোর্খা কমরেড এলো একটা বন্দুক নিয়ে। মৃদুভাবে হেসে তিনি বললেন, "বুর্জোয়াদের মতে অস্ত্র-ব্যবহারের দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম, আত্মরক্ষা; দ্বিতীয়, আক্রমণ।" গোর্খা কমরেডের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললাম, "আমার মতে অস্ত্র-ব্যবহারের উদ্দেশ্য একটা, আক্রমণ।"

পাহাড়ের গা দিয়ে আমরা আরও একটু ওপরে উঠলাম। এখান থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-সীমান্ত খুব বেশি দূর বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল না হিমালয় দুর্ভেদ্য, দুরতিক্রমণীয় কিংবা ভয়সংকুল। ভাবলাম বড়কাকা হয়তো চোখ বুঁজে এরই আশেপাশে কোন গিরিগহ্বরে ধ্যান করছেন। গিলগিট থেকে

নেপাল পর্যন্ত হিমালয়ের বিস্তৃতির মধ্যে বড়কাকা বৃহৎ অকল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,'মহম্মদ ঘোরী কিংবা আহমদ্ শা আবদালির আক্রমণ থানেশ্বর কিংবা পানিপথেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এবারকার আক্রমণের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের ধ্বংসের প্রস্তুতি রয়েছে। লোপোন জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ভাবছেন?"

"ভাবছি থানেশ্বরের যুদ্ধ সত্যিই ছেলেখেলা।"

"কি রকম?" প্রশ্ন করলেন কমরেড লোপোন।

"তিব্বত জয় করতে হবে বলে কমরেড প্লেখানভ তিব্বতীয় ভাষা শিখেছেন প্রায় এক যুগ আগে। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের মধ্যে সেরকম কোন প্ল্যান ছিল না। তিনি তরোয়ালের প্যাচ দিয়ে যে-যুদ্ধ জিতেছিলেন তা আংশিক। আমাদের জয় সমগ্র অর্থাৎ টোটাল। আমাদের সাম্রাজ্যের নাম ভারত সাম্রাজ্য নয়, এমন কি কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যও নয়—সমগ্র সাম্রাজ্য, অর্থাৎ, টোটাল এম্পায়ার!"

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কে-একজন লুকিয়ে কথা শুনছিলেন। আমি অনেক আগেই তা টের পেয়েছিলাম। তিনি এবার আমার সামনে এগিয়ে এলেন, হেসে বললেন, "আপনার বিশ্লেষণের ভঙ্গি ভাল। আপনার বড়কাকার চেয়ে অনেক ভাল।" এই বলে তিনি আমার বন্দুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ঐ গাছটায় দেখুন দুটো পাখী বসে আছে। একটা মা, অপরটা তার বাচ্চা। বাপটা গেছে খাবার সংগ্রহ করতে। সংসার গড়বার সেই আদিম মনোবৃত্তি। আমরা অনেক ভাল খাবার দিয়েছি, ওরা তা গ্রহণ করে না। রাষ্ট্রের নির্দেশ মত মানুষ যদি সংসার গড়তে না চায়, তা হ'লে উপায় কি? তার ব্যবস্থা কি এবং গতি কি?"

বন্দুকের নল্ পাখীর দিকে তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, "এক গুলিতে দুটো ফেলতে পারবেন? সময় এবং খরচ তাতে অনেক বাঁচবে।" সংগে সংগে আমি গুলি ছুঁড়লাম। কমরেড লোপোন ছুটে গিয়ে এক দলা মাংস

কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। হেসে বললেন, "কমরেড চৌধুরীর প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি! দুটোই মরেছে একেবারে জড়াজড়ি করে।"

এবার আমরা পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে লাগলাম। একটু পরেই দেখলাম একটা সুন্দর বাংলো। বাংলোর বড় দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় কমরেড লোপোন বললেন, "পরিচয় করানো হয়নি। কমরেড চৌধুরী, ইনিই আমাদের কমরেড প্লেখানভ।" বন্দুকটা চকিতের মধ্যে বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম কমরেড প্লেখানভের দিকে। আমরা করমর্দন করলাম। কমরেড প্লেখানভ বললেন, "কালই আমি তিব্বতের পথে রওনা হয়ে যাব। কিছু সময় আপনার সংগে কাটানো যাক।"

আমি ভেতরে এসে দেখলাম মস্ত বড় ঘর। বাইরে থেকে মনে হয় বাড়িটা বড় নয়। অন্দরমহল কোন্ দিকে তা ঠাহর করতে পারলাম না। বাড়িতে স্ত্রীলোক আছে কিনা তাও বোঝা সম্ভব নয়। দু'চারজন লোক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা এসে একটা বড় ঘরে বসলাম। লক্ষ্য করলাম ঘরের পেছন দিকে একটা মস্ত বড় কালো পর্দা টাঙানো রয়েছে। পর্দার ওপাশে একটা ঘর আছে বলে মনে হ'ল। এবং সেই ঘর থেকে আমাদের কথাবার্তা কেউ যদি শুনতে চায় তা হ'লে অনায়াসেই সে শুনতে পারবে। ঘরের জানলা নেই বলে ভেতরটায় আলো জ্বালানো থাকে দিবারাত্র।

একটা বড় টেবিল রয়েছে দেখলাম। টেবিলের তিনদিকে দু'খানা করে ছ'খানা চেয়ার সাজানো রয়েছে। কমরেড প্লেখানভ মাঝখানের চেয়ারটায় বসলেন। আমি ঠিক তাঁর পাশের চেয়ার দখল করলাম। তিনি বললেন, "আজকে আমাদের একটা জরুরি মিটিং আছে। আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি এসেছি সেই মিটিংএ যোগদান করতে।" এই সময় আরো দু'জন কমরেড এলেন। কমরেড প্লেখানভ পরিচয় করালেন, "কমরেড যোশেফ রূপবর্ধন।" তারপর হেসে বললেন, "বাপের দেওয়া নাম তাই বাইবেলের সংগে সম্পর্ক রয়েছে। আর ইনি আমাদের কমরেড পল পাটকাই. নাগা

পর্বত-সীমান্তের সজাগ প্রহরী।” ঘরের মধ্যে একটু হাসির হিল্লোল বয়ে গেল।

কমরেড প্লেখানভ এবার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় বললেন, “আমাদের মিটিংএর প্রথম আইটেম, যে-সব উচ্চস্থানীয় কমরেডদের মনে কম্যুনিজ্‌ম সম্বন্ধে সন্দেহ ওঠে তাঁদের কি করে শোধরানো যায়? আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা অহিংসভাবে আইনপরিষদে বসে নেহেরুর সংগে তর্ক করে বিশ্ববিপ্লব আনতে পারব না। পরিষদ একটা ফ্রন্ট, কেবল কংগ্রেসকে বোঝান যে, নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে আমাদের বিশ্বাস আছে। তাই নয় কি পল্?”

কমরেড পল্ বললেন, “যথার্থ। এ সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের সতর্কবাণী আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।”

কমরেড প্লেখানভ আমার দিকে চাইলেন। আমি বললাম, “বিশ্বাসীর মনে যদি কোনদিন অবিশ্বাস জন্মায় তা হ'লে তা শোধন করবার একমাত্র উপায় ফায়ারিং স্কোয়াড্। কমরেড প্লেখানভ, বুর্জোয়াদের ভগবান তাঁর চেলাদের শুনেছি কৃপা করেন। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের মহাপ্রভু কমরেড স্টালিন আমাদের বলেছেন যে, অবিশ্বাসীর বিনাশসাধনই শেষ শোধন।”

কমরেড প্লেখানভ খুব খুশি হয়ে বললেন, “আমি স্বীকার করলাম।” কমরেড যোশেফ যেন একটু উস্‌খুস্ করছেন বলে মনে হ'ল। কমরেড পাটকাই ও কমরেড লোপোন ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। কমরেড প্লেখানভ বললেন, “মিটিংএর দ্বিতীয় আইটেম, সেই অবিশ্বাসীকে খুঁজে বার করা।” তিনি বাঁ-দিকের ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট নোট-বই বার করলেন। সেই নোট-বইটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, “১৪ই ডিসেম্বর রাত দশটার সময় অবিশ্বাসী কমরেড তার স্ত্রীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলছে, মার্কসবাদ ভুয়ো; সে ঠিক করেছে অন্য দলে যোগ দেবে; আগামী নির্বাচনের পর তাকে মন্ত্রী করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওরা।”

কমরেড পাটকাই বেশ উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “লোকটি কে?”

কমরেড প্লেখানভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই সেই বিশ্বাসঘাতক কুত্তা যোশেফ।" আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম কমরেড যোশেফ পকেটে হাত দিয়ে কি যেন নাড়াচাড়া করছিল। কমরেড প্লেখানভ চেঁচিয়ে উঠবার সংগে সংগে যোশেফ চকিতের মধ্যে পিস্তল বার করে প্লেখানভের দিকে তাক্ করল।

আমার বন্দুকে দ্বিতীয় গুলি ছিল। আমার গুলি খেয়ে যোশেফ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কেউ কল্পনা করতে পারেনি যোশেফ এত বড় দুঃসাহসের কাজ করতে পারে। মুহূর্ত কয়েকের জন্য সবাই যেন দম বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। যোশেফের আর্তনাদ পর্যন্ত যেন কারও কানে গিয়ে পৌছল না। সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন বলে কমরেড প্লেখানভ আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, "যোশেফের বউ আমাদের পার্টির মেম্বার। স্বামীর বুকের ওপর সে কান রেখে লুকনো সংবাদ সব সংগ্রহ করেছে।" যোশেফ তখনও আর্তনাদ করছিল। প্লেখানভ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মত বিশ্বাসঘাতক পার্টিতে আর কেউ নেই?" যোশেফ অতিকষ্টে হাতটা কপালের দিকে তুলতে গেল, কিন্তু পারল না। অস্ফুট স্বরে সে বলল, "আছেন। আমার সংগে আরও একজন আছেন।" প্লেখানভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি তার নাম?" মরবার শেষ মুহূর্তে যোশেফ ঘোষণা করে গেল, "ভগবান।"

আসবার সময় কমরেড প্লেখানভ বললেন, "আজকের ঘটনা আমি কমরেড স্ট্যালিনের কানে পৌছে দেব। চৌধুরী, মস্কো যাবে?"

"যাব, যদি পার্টি থেকে আদেশ পাই।"

"পাবে, আদেশ তুমি পাবে।" একটু হেসে তিনি পুনরায় বললেন, "মস্কোতে যদি তোমার সংগে আমার দেখা না-ই হয় তবে দিল্লির দফ্তরে হবে, কি বলো?"

আমি আর কিছু বললাম না। করমর্দন করে কমরেড প্লেখানভের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কমরেড, আজ আমি তোমাদের রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি আজ অনেক দূরে। তোমরা আমাকে শিখিয়েছিলে, প্রয়োজন হ'লে মিথ্যা কথা বলা যায়; শ্রেণী-সংগ্রামের সুবিধার জন্য জুয়াচুরি করায় অধর্ম নেই, হত্যা করায় অপরাধ নেই। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্র গড়বার জন্য আমি নিজে হত্যা করেছি এবং অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করেছি বহু বার।

কিন্তু আজ আমি নির্ভয়ে সত্য কথা বলছি যে, জুয়াচুরি সব সময়েই জুয়াচুরি, মিথ্যা সব সময়ই মিথ্যা। শয়তান কেবল মানুষকে মিথ্যা-জগতের অধীশ্বর করতে পারে, সত্য-জগতের সিংহ-দরজায় তার প্রবেশের অধিকার নেই। আমার বিশ্বাস, কেবল সেই কারণেই তোমাদের শৃঙ্খল থেকে মানব-সমাজ একদিন মুক্তি পাবেই।

আজ, উনিশ-শ' পঁচাত্তর সালেও, আমার মনে হচ্ছে তোমার নিজের মন থেকেও সত্যানুভূতির বীজ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। কম্যুনিষ্ট বন্দীশালায় আমার দুঃখ তোমাকে পীড়া দিয়েছে, মৃত কুকুর পীড়িত আত্মা তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, অনীতার প্রার্থনার প্রলেপ তোমার দগ্ধ জীবনে প্রশান্তি এনেছে। নইলে তোমার নিজের জীবন বিপদসংকুল জেনেও গোপনে আমায় তুমি মুক্তি দিতে পারতে না।

তোমার কাছেই শুনেছিলাম, কমরেড যোশেফের মৃত্যু সেদিন ঘটতই। সে যে সহসা পকেট থেকে পিস্তল বার করে কমরেড প্লেখানভের দিকে তাক্ করতে পারে তা অবশ্য তোমরা কেউ সন্দেহ করোনি। কিন্তু মরণ তার হ'ত এবং তা আমারই সামনে। সমস্ত ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত। আমাকে ভয় দেখানো এবং পরীক্ষা করা দুটো উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের। কমরেড যোশেফের

বিশ্বাসঘাতকার বিবরণ যখন প্রেথানভ পাঠ করছিলেন তখন কালো পর্দা পেছনে পার্টির একজন বড সর্দার পিস্তল হাতে নিয়ে যোশেফের দিকে তাক করে বসেছিলেন। কে সেই বড সদার তার নাম তুমিও আমায় বলনি আমার বিশ্বাস পদার পিছনে তুমি নিজেই ছিলে। এতে আমার কোন সন্দেহই নেই।

তারপর আমি নিজে কতো বার অমনি করে কতো বিভিন্ন দেশ এব প্রদেশের কতো বিভিন্ন ঘরে কালো পদার পেছনে বসে অনেকের অনেক আলাপ আলোচনা শুনেছি। আজ সে সব কথা ভেবে হাসিও পায়, দুঃখও আসে। একটা ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে।

ভারতবর্ষ দখলের দু'একমাস আগে পার্লামেন্টের একজন স্বনামধন্য সদস্যের বাড়িতে বড-মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়। সদস্যটি যদিও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু আসলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলাম আমরা। ঝুকু তাঁর পৃষ্ঠে এমন ভাবে ভর করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সদস্যটি ঝুকুকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। ঝুকু তাঁকে শেষের দিন পর্যন্ত আশা দিয়ে রেখেছিল।

বড-মন্ত্রী এলেন ঘরে। চাএর টেবিলে বসে যখন চা পান সুরু করলেন, তখন সদস্যটি বললেন, "হুজুর, আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?" বড মন্ত্রী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ জগৎশেঠ, স্বাস্থ্য আমার ভালই।" সহসা চাএর পেয়ালাটা নাকের কাছে তুলে নিয়ে বড-মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন বাগানের চা হে জগৎশেঠ? চমৎকার গন্ধ।"

"হুজুর, আপনার সাম্রাজ্যে কোন্ জিনিসটা খারাপ? এই রিফিউজিগুলোই কেবল অবস্থার উন্নতি করতে পারল না।"

"তা তো আমার দোষ নয় শেঠ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্ধেক টাকাই তো ওরা খেয়ে বসল।"

"অর্ধেক নয় হুজুর, অর্ধেকের অর্ধেক।"

"কেন বাকি অর্ধেক কোথায় গেল?"

"খানিকটা ঘুরে ফিরে চলে গেল কর্মচারীদের পকেটে আর বাকিটা গেল যারা রিফিউজি নয় তাদের ব্যাঙ্কে।"

"কই, আমায় তো সে-সব কেউ জানায়নি! আমি তাহ'লে একটা তদন্ত-কমিশন বসাব শেঠ।"

"লাভ কি? তদন্ত-কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বেশি সংখ্যক লোক হবে যারা ঐ অর্থে'ক থেকে ছিটেফোঁটা পেয়েছে।"

"তুমি কি শ্যামাপ্রসাদের গুপ্তচর নাকি হে শেঠ?"

"কি যে বলেন হুজুর! আপনার পার্টির ফাণ্ডে এ-পর্যন্ত তিরিশ লাখ ছাড়লাম। এর পর আর লজ্জা দেবেন না আমায়।"

বড়-মন্ত্রী এবার দ্বিতীয় পেয়ালা হাতে তুলে নিলেন। চায়ে চুমুক না দিয়েই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ বাগানের চা শেঠ?"

"দারজিলিং।"

"দারজিলিং? সেখানের চা-বাগানে তো ধর্মঘট চলেছে।"

"এটা পুরনো স্টক হুজুর।"

"আচ্ছা জগৎশেঠ, তুমি কি শ্যামাপ্রসাদের কথা বিশ্বাস করো?"

"করি যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলেন, করি না যখন কম্যুনিষ্টদের সন্দেহ করেন।"

"আমি কিন্তু কোন কথাই বিশ্বাস করি না।" বড়-মন্ত্রী একটা কুইন-কেকের টুকরো মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললেন, "চমৎকার স্বাদ! কার তৈরি হে?"

"হুজুর, ঐ পুঁজিবাদী রায়বাহাদুর ওব্রাই ব্যাটার! হিন্দুস্থানের সব ক'টি বড় হোটেলের মালিক ও। আপনি তো হুজুর সোস্যালিষ্ট। রায়বাহাদুরের কেক আপনার ভাল লাগল?"

"আমি যে কি আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি না শেঠ। লেখাপড়া শিখলাম হ্যারো আর কেমব্রিজে, রাজনীতি করলাম আগা-খাঁর প্রাসাদে, বিবৃতি দিলাম মাও-সে-তুঙের সপক্ষে, ধর্মপালন করলাম নিরীশ্বরবাদের এরণ্ড-বৃক্ষের তলায়।"

"হুজুর, আপনি যেন খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন ?"

"হাঁ জগৎশেঠ। গান্ধিজি আমায় খুবই বিপদে ফেলে গেছেন। স্বর্গে যদি যাই তবে গড্‌সে-ব্যাটাকে টেনে নিয়ে আসব নরক থেকে। এনে আবার শাস্তি দেব। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ আমায় বিপদে ফেলেছে খুব।"

"কেন, মন্ত্রীত্ব চায় না কি আবার ?"

"না, তা চায় না। শ্যামাপ্রসাদ বলছে, দু'এক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে বিপ্লব সুরু হবে। কম্যুনিষ্টরা আবার হিংসাত্মক কাজ করছে।"

"প্রমাণ দিয়েছে কিছু ?"

"প্রমাণ দিয়েছে, দারজিলিংএ ধর্মঘট; কলকাতার বড় বড় মিল্‌গুলোতে মজুরদের বিক্ষোভ; পেপসুতে কি সব গণ্ডগোল; গাড়োয়াল পাহাড়ে আর সৈন্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে না; নেপাল আর্মির অর্ধেক সৈন্য কম্যুনিষ্ট; সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের সীমান্তে নাকি অনেক বিদেশী লোকের জোর আনাগোনা চলছে। অস্ত্রশস্ত্রও আসছে ঐ রাস্তায়। পশ্চিম-বাংলায় প্রতি ঘরে একজন করে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। আর্মিতেও গণ্ডগোল। দক্ষিণ ভারতের সংগে যোগাযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার খবর রাখো শেঠ ?"

"দক্ষিণ ভারতের সংগে আমার নিজের যোগাযোগ খুব কম হুজুর।"

বড়-মন্ত্রী বললেন, "বেজোয়াদার ও-পাশ থেকে ট্রেনের লাইন তুলে ফেলেছে। সৈন্য যাতায়াত করতে পারছে না। টেলিগ্রাফ অফিসগুলো সব কম্যুনিষ্টরা দখল করে বসে আছে। শ্যামাপ্রসাদের কথা মিথ্যাই বা বলি কি করে ?"

"মিথ্যা কথা হুজুর। বাঙালীরা চিরদিন গণ্ডগোল বাধিয়ে এসেছে।"

"বাঙালীদের সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন।"

বড়-মন্ত্রী এবার চাইলেন কালো পর্দার দিকে। জগৎশেঠ যেন একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলেন, "আপনার গুপ্ত পুলিসরা কোন রিপোর্ট দেয়নি ?"

"দিয়েছে। আর্মির গুপ্ত-পুলিসও দিয়েছে।"

"কি বলে ওরা ?"

"শ্যামাপ্রসাদ যা বলছে তার চাইতে অনেক বেশি।"

"কি রকম ?"

বড়-মন্ত্রী ঘরের এদিক ওদিকে চাইলেন একবার। তারপর একটু ক্লান্ত-ভাবে বললেন, "ওরা বলছে রাষ্ট্র-বিপ্লব সুরু হয়েছে। কংগ্রেসের হাতে আর শাসনভার থাকবে না। মহাদুর্দিন আসছে শেঠ। এখন মনে হচ্ছে চীনাদের হয়ে বিবৃতি দেওয়া উচিত হয়নি। বিজয়লক্ষ্মীও আমায় ভুল বুঝিয়েছে।"

"তা হ'লে পুলিসের রিপোর্ট আপনি বিশ্বাস করছেন হুজুর ?"

"না করে উপায় কি শেঠ ?" বড়-মন্ত্রী হাই তুলতে লাগলেন। তারপর আবার সেই কালো পর্দার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "চমৎকার কোয়ালিটি বলে মনে হচ্ছে, কোথা থেকে কিনলে এই ভেল্‌ভেট ?"

"আমি কিনি নি, উপহার পেয়েছি।"

"উপহার ?" বড়-মন্ত্রী খুবই বিস্মিত হয়েছেন।

"আজ্ঞে হাঁ। ম্যাডাম পণ্ডিত চীনদেশ থেকে নিয়ে এসেছেন।"

বড়-মন্ত্রী এবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘড়িতে সময় দেখলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "চায়ের নেমন্তন্ন করলে কিন্তু উদ্দেশ্য কি তা তো বললে না শেঠ ?"

"আজ্ঞে, কংগ্রেস-ফাণ্ডে আরও কিছু টাকা দেওয়ার দরকার কিনা তাই ভাবছি।"

"ওরা যদি সত্যি সত্যি দেশ দখল করে তা হ'লে তো এসব টাকার কোন মূল্যই থাকবে না।"

"তা হ'লে আমাদের কি উপায় হবে ? আপনিই বা কি করবেন ? চিয়াং-কাইশেকের কথা ভেবে আপনার জন্য আমার রাত্রে ঘুম আসে না হুজুর।"

"ইংরেজরা বলছে, তেমন কোন সম্ভাবনা থাকলে বিলেত চলে যাওয়ার জন্য।"

"তাই ভাল, ধারে কাছে তো কোথাও ফরমোসা নেই। আমি গোয়া কথাও ভেবেছি। সেখানেও আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি তো অসং বিবৃতি দিয়েও জায়গাটাকে দখলে আনতে পারলেন না। ওরা কিন্তু এক থাব দিয়ে নিয়ে নেবে।"

"শেঠ, হাতী গর্তে পড়লে ব্যাঙাচিরাও লাথি মারে দেখছি। তুমিও বি কম্যুনিষ্ট নাকি?"

"কম্যুনিষ্ট? আমি বাক্সপেঁটরা বেঁধে বসে আছি, বম্বারে চেপে আমি আপনার সঙ্গে আকাশে উড়ব।"

"না শেঠ। কাউকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না। শুনতে পাচ্ছি আমার সেক্রেটারিয়েটে বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় অর্ধেক কর্মচারীই কম্যুনি কিংবা ওদের সহযাত্রী। সর্দার পানিকর আর মেনন দু'জনেই আমায় সব ভুল বুঝিয়েছে। চললাম শেঠ। এক বার রাজঘাট হয়ে বাড়ি ফিরব।"

বড়-মন্ত্রী চলে গেলেন।

তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় আমি হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। দূর থেকে কোন জিপ-গাড়ি দেখতে পেলাম না। কমরেড লোপোনে আসবার কথা আছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয় ভেবে আমি রাস্তায় এসে নামলাম। সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই কমরেড লোপোন এলেন, এবার একটা হিলম্যান গাড়ি নিয়ে। তিনি বললেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, একটু দেরী হয়ে গেল। কমরেড বিনয়প্রকাশ একটু অসুস্থ তাই তিনি আসতে পারলেন না।" কথা বলতে বলতে কমরেড লোপোন কার্ট রোড ধরে স্টেশন পর্যন্ত এলেন। আমি বললাম, "চলুন, একবার কারসিয়ং থেকে ঘুরে আসি। সেণ্ট্ হেলেনস্ কনভেণ্টে আমার বোন অনীতা আছে।"

"চলুন।"

গাড়ি এসে কনভেণ্টের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। কমরেড লোপোন বললেন, "আমি আর ভেতরে যাব না। আপনি দেখা করে আস্থন।" এই সময় অনীতা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, তুমি কবে এলে? আমায় চিঠি দাওনি কেন? এসো তোমায় পরিচয় করিয়ে দি' সিস্টারের সংগে।" সিস্টার তখন দুটো দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমার হাত ধরে অনীতা আমায় একটু হেঁচকা টান মারল। আমি এগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। কমরেড লোপোন তখন উল্টোদিকে ঘুরে পাইপ টানছিলেন। ফেলটের টুপিটা তেরছাভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল বলে তাঁর মুখের কোন অংশই ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল না। অনীতা বলল, "সিস্টার আইলিন, আর আমার দাদা দীপক চৌধুরী।"

"কেমন আছ মিঃ চৌধুরী?" তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি বললাম, "ধন্যবাদ, আমি ভাল আছি।"

"কতদিন থাকবে?"

"তা প্রায় একমাস।" অনীতার দিকে চেয়ে বললাম, "ওর তো প্রায় দু'মাস হ'ল।" অনীতা আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, "এখান থেকে আমার যেতেই ইচ্ছে করে না দাদা। একটু আগে সিস্টারকে সেই কথাই বলছিলাম।" স্বীকৃতির ভঙ্গি করে সিস্টার মৃদু হাসলেন। আমি বললাম, "পদার্থ-বিজ্ঞানের তুই ফার্ষ্ট-ক্লাস ফার্ষ্ট, এখানে একটা চাকরি নিয়ে নে না।"

"দাদা, এখানে এলে পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিক বিস্ময় বড্ড ছেলেমানুষি মনে হয়। সিস্টার, আমি কি ভুল বলছি?"

"না অনীতা, ভুল নয়। মিঃ চৌধুরী ভেতরে এসে বসবেন কি?"

আমি বললাম, "অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখুনি আমায় দারজিলিংএ ফিরে যেতে হবে।" অনীতা বলল, "দাদা, আমিও দারজিলিং যাচ্ছিলাম, কাকীমার ওখানে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যাবো বলে কাকীমাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম। দাদা, শ্লাভ রক্তের ওপর বড়কাকার কী ভীষণ ঘেন্না ছিল। কাকীমাকে দেখলে

এবং আলাপ করলে তুমি বুঝবে নর্ডিক রক্তের চেয়ে শ্লাভ রক্ত খারাপ নয় দাদা, কাকীমার সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।"

লক্ষ্য করলাম কমরেড লোপোন যেন মাথার টুপিটা ডানদিক থেকে ব দিকে হেলিয়ে দিলেন। লোপোনের দিকে চেয়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বন্ধু বুঝি? সিস্টারের সংগে পরিচয় করালে না?" কমরেড লোপোন চকিতের মধ্যে গাড়ির এপাশে এসে দাঁড়ালেন, হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে অতি সম্ভ্রমের ভংগিতে। আমি বললাম, "মিঃ ডোরজি লোপোন।"

নামটা শোনবামাত্র সিস্টার বললেন, "মিঃ লোপোনের নাম আমরা জানি।" লোপোন আরও বেশি সম্ভ্রম ও বিনয়ের ভারে মাথাটাকে নত করে বললেন, "আমি একজন নগণ্য জমিদার, তাও সব বাবার কাছ থেকে পাওয়া। একটা ডিগ্রি আছে তাও পেয়েছি অক্সফোর্ড থেকে। জগতের ফুটপাথে শুয়ে আছি খোদাই ষাঁড়ের মত। খোদার নাম জানি অথচ তাঁর মহিমাটুকু নিক্ষিপ্ত কলার খোসার মত মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ফুটপাথে শুয়ে জাবর কাটছি। কিন্তু সিস্টার, আমার মত একটা খোদাই ষাঁড়ের নাম আপনি জানলেন কি করে?" লোপোনের বিনয়বোধ মাটি স্পর্শ করল। সিস্টার বললেন, "শুনেছি আপনার বাড়িতে একটা অতিসুন্দর বৌদ্ধ মন্দির আছে।" লোপোনের কণ্ঠে যেন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামির সুর উঠল। তিনি বললেন, "পূজা হয়, ঘণ্টাও বাজে, কিন্তু তেমন করে কি আমরা ভগবান বুদ্ধকে ডাকতে পারি? যাবেন একদিন মন্দিরটা দেখতে?"

"অনেক ধন্যবাদ।"

"তা হ'লে একটা দিন ঠিক করুন। এই হতভাগ্য আপনাদের এসে নিয়ে যাবে। এতো বড় সম্মান বহনের যোগ্যতা আমার আছে কি সিস্টার?"

"আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। চেষ্টা করলে অযোগ্যতার বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। কি বল অনীতা?" অনীতা সহসা জবাব দিতে পারল না। সে লোপোনের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিল। লোপোনের কথাবার্তা ও বিনয়বোধ

অনীতাকে আকৃষ্ট করেছে। অক্সফোর্ডের ডিগ্রিওয়ালা লোক ফুটপাথে শুয়ে জাবর কাটতে চায় না—কথাটা শুনে অনীতার নিজের বুকে দোলা লাগল। লাগাই স্বাভাবিক। অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, তোমার গাড়িতে কি জায়গা হবে?" লোপোন তাঁর মাথার টুপিটা অনীতার দিকে ভিক্ষাপাত্রের মত চিং করে ধরে বললেন, "অনেক জায়গা। আপনি আসুন। একজন নিষ্কর্মা জমিদারকে একটু কাজ করবার সুযোগ দিন। সত্য বলছি, বাপের সম্পত্তি না পেলে মানুষ হতে পারতাম। বসে খাওয়ার ঝকমারি যে কত তা তো আপনি জানেন না মিস চৌধুরী!" লোপোন গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। আমি আর অনীতা গাড়ির পেছনে বসলাম। কনভেন্টের সামনে দিয়ে হিলম্যান গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

কার্ট রোড দিয়ে একটু এগিয়ে যাওয়ার পর অনীতা বলল, "দাদা, কাকীমা তোমায় দেখতে চেয়েছেন।"

"বেশ তো, এখুনি যাব তোর সংগে।"

"নুকুকে নিয়ে এলে না কেন দাদা?"

"নুকু তো কলকাতায় নেই।"

"নেই? কোথায় গেছে?"

"দিল্লি।"

চুপ করে রইল অনীতা। তারপর বলল, "নুকু এখানে এলে ভাল হ'ত। ওর মনে যে ক্লেদ জমেছে সব সাফ হয়ে যেত।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্লেদ জমেছে তার প্রমাণ কি?"

"দাদা, তোমরা পুরুষমানুষ। মেয়েদের সবটুকু তোমরা দেখতে পাওনা।" জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। কাঁচটা তুলে দিয়ে বললাম, "আমি যতদূর জানি, নুকু একজনকে ভালবাসে তার সমস্ত মন দিয়ে এবং অস্তিত্ব দিয়ে। এর পর আর ক্লেদ রইল কই?"

"তবু রইল যতক্ষণ না বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে।" অনীতার উত্তরের

মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর ভেসে উঠল। কমণ্ডেড লোপোন অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এক গজ রাস্তার এ-দিক সে-দিক হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। তাই তিনি আমাদের আলাপ আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন না। অনীতার শেষের কথাটা শুনে তিনি বললেন, "আমি তো বৌদ্ধ। অতএব আমাদের সবই বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।—আমি শুনেছি, কম্যুনিষ্টরা বলে দেহ মানে কেবলই দেহ, পুরো অস্তিত্বটাই দেহ। অর্থাৎ ক্ষিধে যদি পায়, তা হ'লে, হয় পেটের ক্ষুধা, নয় যৌন ক্ষুধা। আপনার কি একবারও মনে হয় না মিস চৌধুরী যে, কম্যুনিজমকে একবার পরখ করে দেখি ?"

"না, মিঃ লোপোন।"

"আমারও সেই মত। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি রুসিয়া এবং বলকানসের অনেক-গুলো দেশ কম্যুনিজম্ পরখ করে দেখছে এবং তাতে মানুষের অনেক উন্নতি হয়েছে। কথাটা ঠিক কিনা কেবল ভগবান বুদ্ধই বলতে পারেন।"

অনীতা বলল, "ভগবান ও ধর্ম বাদ দিয়ে কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। একটু অপেক্ষা করুন, পরখ যা করবার ইতিহাসই করবে।"

"তা হ'লে কম্যুনিজম পরখ করে দেখবার একটা সুযোগ আমাদের আছে।" লোপোনের একটু উৎসাহ এলো।

অনীতা বলল, "পৃথিবীতে অনেকবার অনেক রকমের আদর্শের ধাক্কা এসেছে এবং চলেও গেছে। ইতিহাস-বিশ্লেষণের মধ্যে একটু নজর দিয়ে দেখবেন যে, এই সব সাময়িক 'চ্যালেঞ্জ' কত সহজে অজানা অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল। কম্যুনিজম্-আদর্শ এবার একটা বড় রকমের আকস্মিক ধাক্কা। সুতরাং ইতিহাস সেই ধাক্কাটা চুষে নিতে একটু বেশি সময় নিচ্ছে। মিঃ লোপোন, ভগবানের অস্তিত্ব ইতিহাসের সারা বুক জুড়ে বিরাজ করছে। মূলত, ইতিহাস বলতে আমরা সেই সদাজাগ্রত বিরাজমান সত্যের ইতিহাসই বুঝি। রাজারাজড়ার যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ভুয়ো আদর্শের লড়াই ইত্যাদি সবই সেই সত্যের আলোক দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। একটু অপেক্ষা করুন মিঃ লোপোন।

কম্যুনিজম-ষাঁড়াকে বেলতলায় গিয়ে দাঁড়াতে দিন, মাথা ফেটে গেলে সরে পড়বে, দ্বিতীয়বার আসবার আর সাহস থাকবে না। আমি অনুরোধ করছি আপনারা ব্যস্ত হবেন না।"

"না, ব্যস্ত আমি হইনি মিস্ চৌধুরী। ইতিহাসের মধ্যেই যখন পরখ এবং পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে তখন অপেক্ষা আমরা করবই।...আমরা মেলের কাছে এসে গেছি। কোন্ রাস্তায় যাবো?"

"ঐ তো রবার্টসন রোড। বাঁ দিকে চলুন।"

গাড়ি আবার চলতে লাগল। একটু পরে অনীতা বলল, "দাদা, এখানে এসে একজন নতুন লোকের সংগে আমার পরিচয় হয়েছে।" আমি অনীতার দিকে চাইলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "পরিচয় মানে কি?" অনীতা একটু ভাবল, তারপর বলতে আরম্ভ করল, "মাসখানেক আগে কারসিয়াংএ একটা বস্তিতে অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। আমি সেখানে যেতাম ওদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য। মড়ক যখন খুবই বাড়তে লাগল তখন কমলবাবু এলেন সেই বস্তিতে। আমি তাঁকে আগে কখনও দেখিনি।"

কমরেড লোপোন বলে বসলেন, "মিঃ চৌধুরী, 'শেষের কবিতা'র কথা মনে পড়ছে না? সেখানে অমিত যেত বন্যমধু সংগ্রহে, এখানে আমাদের বোন যাচ্ছেন বস্তির পংকে কমল তুলতে।" অনীতা লজ্জা পেল। তারপর সে পুনরায় বলতে লাগল, "মানুষ যে এমন করে সেবা করতে পারে সেকথা কমলবাবুকে না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না দাদা। দিবারাত্র খেটে বস্তির নোংরায় তিনি একমাস কাটিয়ে দিলেন। তার উপর নিজের থেকে টাকা খরচ করে তিনি ওষুধপত্র কিনলেন। সেখানেই তাঁর সংগে আমার প্রথম পরিচয়।" অনীতা থামল। কমরেড লোপোন জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?" অনীতা বলল, "সেই বস্তিতেই কমলবাবু নিজে অসুখে পড়লেন। ঘুমোতেন না, ভাল করে খেতেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় জ্বরের উত্তাপ এত বাড়ল যে, তাঁর ডিলিরিয়াম সুরু হ'ল। বড্ড মুস্কিলে পড়লাম। বাড়ি ঘর তাঁর চিনি না। আত্মীয়স্বজন

কেউ এখানে আছেন কি না তাও জানতাম না। সমস্ত রাত আমি পাশে বসে রইলাম। ভোরের দিকে তিনি বললেন, "বাড়ি যাব।"

লোপোন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বাড়ি ?"

"দারজিলিং, বাজারের কাছে।"

আমি লক্ষ্য করছিলাম লোপোন অনেকক্ষণ থেকে রবার্টসন রোডের শেষ-প্রান্তে রাস্তার বাঁ দিকে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ভাবলাম অনীতার গল্প ওঁকে মুগ্ধ করেছে কিংবা মাতিয়েছে। কথা শেষ হওয়ার পর লোপোন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ দিকে যাব ?" অনীতা বাইরের দিকে চেয়ে বলল, "ওমা, এই তো কাকীমার বাড়ি! ধন্যবাদ। আর আপনাকে যেতে হবে না, আমরা পৌঁছে গেছি।"

আমরা দু'জনে নেমে এলাম। লোপোন পাইপ টানতে টানতে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। প্রথম গিয়ারের কর্কশ আওয়াজ হ'ল, গাড়ি উপর দিকে উঠতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় গিয়ার কোথায় গিয়ে যে তিনি পরিবর্তন করলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। হয়তো বা কার্ট রোডের ডান হাতে, বাজারে নামবার রাস্তায়।

বসবার ঘরে কাকীমা ও আর একজন ভদ্রলোক বসে গল্প করছিলেন। আমরা ঢুকতেই কাকীমা আমায় অভিনন্দন জানালেন। কাকীমা বললেন, "এসো, তোমার সংগে ওঁর পরিচয় করিয়ে দি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন মালহোত্রা। আর দীপক, আমার স্বামীর বড়ভাইয়ের ছেলে। কেবল ছেলে বললেই হবে না, চৌধুরী-বংশের একমাত্র ছেলে।" ভারতীয় পদ্ধতিতে আমরা নমস্কার করলাম। সবাই আসন গ্রহণ করবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার বোনরা কোথায় ?" কাকীমা বললেন, "ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি উটিতে। সেখানে কনভেন্টে ওরা ভর্তি হয়েছে। দারজিলিংএর আবহাওয়া ওদের সহ্য হ'ল না।" আমি বললাম, "দাদু আপনাকে ও বোনদের দেখবার

জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন।" কাকীমা যেন একটু লজ্জা পেলেন বলে মনে হ'ল। তিনি বললেন, "সব দোষ তোমার কাকার। তিনি প্রথম থেকেই বলে বসলেন কলকাতার গরম আমরা সইতে পারব না। আমার কিন্তু খুবই ইচ্ছা ছিল সবার সংগে দেখা করে আসি।"

ক্যাপটেন মালহোত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং বললেন, "আজ তাহ'লে আমি উঠি। দীপকবাবু কোথায় উঠেছেন?"

"মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলে।"

"আমিও সেখানেই আছি।" এর পর ক্যাপটেন মালহোত্রা চলে গেলেন। চলে যাওয়ার পর কাকীমা বললেন, "মালহোত্রার সংগে অনীতার বিয়ে হ'লে কেমন হয়?" অনীতা একটু রাগ করেই জবাব দিল, "এ সব কথা বললে আমি আর আসব না কাকীমা!"

"আমি জানি মালহোত্রাকে তোমার পছন্দ নয় কেন।"

আমি ও অনীতা একই সংগে কাকীমার দিকে চাইলাম। একটু হেসে কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কমল প্রপোজ করেছে না কি?" আমি লক্ষ্য করলাম অনীতা মাথা নীচু করে রইল, কিন্তু অস্বীকার কিংবা প্রতিবাদ করল না। আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "লিথুয়েনিয়া কিংবা ল্যাটভিয়া সম্বন্ধে আপনি কোন খবর পান কি?" কাকীমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "খবর তো অনেক পাই। কিন্তু শতকরা একটা খবরও যদি সত্য হয় তাহ'লে—" কথাটা তিনি শেষ করলেন না, চুপ করে রইলেন। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া আমার অভ্যাস নয়। অতএব আমিও চুপ করে চেয়ে রইলাম কাকীমার দিকে। শেষ পর্যন্ত কাকীমা অনীতার দিকে চেয়ে, আমার অস্তিত্ব যেন তিনি ভুলে গেছেন এমনিভাবে, বলতে লাগলেন, "অতো ছোট্ট দেশ, তাই তার ইতিহাসের খবর কেউ রাখে না। লিথুয়েনিয়ার ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে, আমরা কখনও আশা হারাইনি, বাঁচবার আশা আমাদের চিরদিনই প্রবল ছিল। হয়তো ছোট দেশ বলেই আমরা ভয় করেছি বেশি।

কিন্তু এবার আমাদের লিথুয়েনিয়ার কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। সোভিয়েট রাসিয়া তার নতুন সংস্কৃতি দিয়ে দেশের সব কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছে। দীপক, ইন্দোচায়না থেকে ফরাসি গভর্ণমেণ্ট তার সৈন্য সরিয়ে আনে নি বলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কত চিৎকারই না করছ, কিন্তু কই ভারতবর্ষের একটি কণ্ঠও তো চিৎকার করে বলে না রাসিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথা? লিথুয়েনিয়া, ল্যাটভিয়া কিংবা এস্টোনিয়ায় কি হচ্ছে তার খবর তোমরা কতটুকু জানো?"

আমি বললাম, "কাকীমা, আজ আমি উঠছি। তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে তাই আমি খুসি মনেই তোমার কাছে এসেছিলাম। রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান আমার খুবই কম।"

পরদিন বেলা সাড়ে-সাতটায় লোপোনের সংগে তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলাম। আবার সেই ক্রমশ উপর দিকে উঠে যাওয়া পাহাড়ের রাস্তা। শেষের দু'তিন মাইল রাস্তা আর সত্যিকারের রাস্তা নয়, কোন রকমে গন্তব্যস্থলে পৌছবার মত পথ। গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম, চৌধুরী-পরিবারের সব-চেয়ে বিষাক্ত দাঁত এই অনীতা। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিষ ও ছড়াবে যতদিন না দাঁতটি উৎপাটিত হচ্ছে। ঠাকুর চরিত্রের মার্কসিষ্ট বাঁধুনি অনীতার চরিত্রে নেই। তবে এত অহংকার কিসের? প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার এক পুরনো, পচা, পরিত্যক্ত গলগথার ক্রুশ অনীতার চরিত্রকে পূতিগন্ধময় করে তুলেছে। অর্ধেক ইউরোপ আজ এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেয়েছে। বলকানসের প্রতি ঘরে তাই আজ লেনিন-ষ্টালিনবাদের নির্যাস প্রতিটি রুগ্ন মানুষকে নতুন করে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বাস না করো ইতিহাস খুলে দেখো। পোল্যাণ্ডের ওপর যীশুভক্তরা ক'বার ছুরি চালিয়েছে? অষ্ট্রো-হাংগেরিয়ান সাম্রাজ্যের দস্যুগুলো খ্রীষ্টান ছিল না? স্প্যানিস্ ইনকুইজিসনের কথা মনে পড়ে? আরো শুনবে? এসিয়ার উপনিবেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দাও। শোষণের ক্রুশ দিয়ে ইংরেজরা মধ্য-প্রাচ্যের মাটি খুঁড়ে কতো কোটি

গ্যালন তেল বার করেছে প্রভু? ইতিহাসের তৈলাক্ত পৃষ্ঠাগুলোর উপর সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া অধিকার আমরা এবার ভাঙব। অনীতাকে সমূলে উৎপাটিত করা তাই বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো কমলবাবুকে দিয়ে অনীতার সংশোধনও সম্ভব হতে পারে।

গাড়ি এসে থামতেই নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করলাম, কমলবাবু আসলে বিনয়প্রকাশ নয় তো?

পাহাড়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে আজ কুচকাওয়াজ হচ্ছিল। কমরেড লোপোন বললেন, "আসাম, মনিপুর, ও পূর্ব-পাকিস্তানের একদল শিক্ষার্থী আজ শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার আর ক'দিন লাগবে বলে মনে হয় কমরেড?"

"সাত দিন।"

এর পর আমার আরও দশদিন কেটেছে। কিন্তু বিনয়প্রকাশের সংগে আমার আজও দেখা হয়নি। সে প্রতিদিনই খবর পাঠায় যে, কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছে। অবসর পেলেই দেখা করবে।

একদিন কমরেড লোপোনের ওখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সোজা হোটেলে এসে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে বেয়ারা এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। হাতের লেখা দেখে বুঝলাম ঝুকুর চিঠি। খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম। ঝুকু লিখেছে:

'দীপুদা,

'দারজিলিংএ তোমরা কি মজাই না করছ! দিল্লিতে ভীষণ গরম পড়েছে। আমি তাই সন্ধ্যা না হ'লে রাস্তায় পা ফেলি না। জ্যাঠামশাই আমাকে পেয়ে হাত দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছেন। তিনি বলছেন, তাঁর শুষ্ক মন্ত্রীজীবনের

গোবিমরুভূমিতে আমিই একমাত্র মরুদ্যান! দীপুদা, বিশ্বাস না হয় দিল্লিতে এসে আমাদের একটু দেখে যেও। গান্ধিজির যেমন মীরা বেন, বল্লভভাইয়ের মনি বেন, রাজাজির নমোগ্রী, পণ্ডিতজির ইন্দিরা, আমি তেমনি জ্যাঠামশাইয়ের মুকু! বল্লভভাইএর পায়ের ধূলো নিয়েছি। বামুনের মেয়ের হাতে পায়ের ধূলো দিয়ে তিনি খুব খুসি। দিল্লির গদিগুলোতে আজ যাঁরা লম্বাভাবে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছেন তাঁদের পায়ে এখনও অনেক ধূলো। বিদ্রোহী বাঙালী সহজে কারো পায়ের ধূলো নেয় না সন্দেহ করেই সর্দারজি আমার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর সহসা তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, "কেয়া মতলব?" ওমা, বুড়োটা বলে কি গো! ভক্তির মধ্যে আবার মতলব কি? বললাম, মতলব কিছু নেই, সবটুকুই ভক্তি। উত্তর শুনে তিনি আবার চোখ দুটো ছোট করে চিন্তা করতে লাগলেন। বারদৌলি থেকে আরম্ভ করে সুভাষবাবুর পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পুরো ইতিহাসটা একবার ভেবে নিলেন। বাঙালীকে তিনি ভয় করেন। তারপর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাত্তাকা কেয়া হাল্?" বললাম, "হাল্ আর কই সর্দারজি? আমাদের জীবন-তরীর হাল্ ভেঙ্গে গেছে দেশবন্ধুর সময় থেকে?"

"কেয়া?" তিনি যেন আশেপাশে ইতিহাস-লেখক সিতারামিয়াকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে লাগলেন এই জন্য যে, তিনি মিলিয়ে দেখতে চান কংগ্রেসের ইতিহাসের কোথাও দেশবন্ধুর নাম আছে কিনা। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন জলসায় সিতারামিয়া উপস্থিত ছিলেন না। হাতের কাছে ইতিহাস না পেয়ে তিনি যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হাল্ টুট গিয়া তো জীবন-নৌকা কেইসে চলতা হায়?" বললাম, "দু'দিক থেকে কেবল লগি মেরে মেরে চলেছে সর্দারজি। এখন তো নৌকা আর চলছেই না। ট্রেন ভর্তি হয়ে ওদিক থেকে লোক আসছে, কেবল রিফিউজি আর রিফিউজি।"

চোখ দুটো আবার তাঁর ছোট হয়ে এলো। একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "ইধারসে কাহে নেই যাতা? মুসলমানকো হিন্দুস্থানমে কেয়া জরুরত

হায়?" কথাটা বড়-মন্ত্রী শুনলেন। তিনি বললেন, "সর্দারজি, তুমি ভুলে যেও না হিন্দুস্থানে এখনও তিন কোটি ন্যাশনালিষ্ট-মুসলিম আছে।" সর্দারজি বললেন, "কই, আমি তো জানি না! আমি জানি হিন্দুস্থানে কেবল একজনই ন্যাশনালিষ্ট মুসলমান আছেন।" মৌলানা আজাদ গোঁফে একটু তা দিলেন। তারপর পেছন দিক থেকে ছুঁচল দাড়িসমেত মুখটা সর্দারজির কাঁধের ওপর দিয়ে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সেই একমাত্র ভাগ্যবান মুসলমান?" সর্দারজি চোখ দুটো বন্ধ করে বললেন, "হিন্দুস্থানকা প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল।" মৌলানার মুখ থেকে হাসিটুকু উবে গেল। দীপুদা, ব্যাপারটা বুঝলে?

'তারপর রাজাজির পায়ের ধূলো নিতে গিয়েই তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল নমোগ্রী, সে এসে পাশে দাঁড়াল। নমোগ্রী বলল, "—মিনিষ্টারের মেয়ে।"

"কোন্ মিনিষ্টার?"

"নামটা পুরো মনে নেই। মিনিষ্টার চৌধুরী, বাঙালী।" রাজাজি বললেন, "আমার মহাভারত ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে, পড়েছো?" আমি বললাম, "পড়িনি, তবে পড়ব।" তিনি আবার ফিক করে হাসলেন। ধূর্ত শৃগালটি দু'বার করে কেন হাসলেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার হাসির কারণটা ব্যক্ত করুন।" তিনি বললেন, "আমি তোমায় অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি।"

"কেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

"প্রথম, তুমি প্রিটি, দ্বিতীয়, বড়লাট-ভবনে যারা পায়ের ধূলো নেয় তাদের আমি সন্দেহ করি। আর তৃতীয়, যারা আমার মহাভারত পয়সা দিয়ে কেনে না তারা সব কম্যুনিষ্ট।"

'দীপুদা, আগামাথা কিছু বুঝলে? তারপর পণ্ডিতজির কাছে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই তিনি আমায় আলিঙ্গন করলেন। তাঁর হাতের বেটনটা আমার পিঠের দিকে উঁচু হয়ে রইল। পাশ কাটাতে গিয়ে বেটনের খোঁচা

খেলেন শ্যামাপ্রসাদ। বিড়বিড় করে তিনি বাংলায় অনুযোগ করলেন, "ব্যাটা প্রতিভা সহ্য করতে পারে না। আর বাঙালী-প্রতিভা দেখলেই বেটন দিয়ে খোঁচা মারে।" আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দিয়ে পণ্ডিতজি বললেন, "ভারতবর্ষে কাউকে আমি আর মাথা নীচু করতে দেব না, পায়ের ধুলো নেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ।"

ইংরিজিতে বললাম, "বর্ণাশ্রম-ধর্মের পোকা আমরা। পা দেখলেই লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।"

"এতক্ষণ পর একটু ভালু ইংরেজি শুনে কানের আরাম হ'ল। হিন্দুস্থানিতে কথা কওয়া যায় না। কেবল কলরব করতে হয়। 'ভারতবর্ষ আবিষ্কার' আমার ইংরেজিতে লেখা।"

আমি বললাম, "পড়েছি। প্রতিটি অক্ষর পড়েছি।" দীপুদা, বুঝলে গুল্ মারলুম? কেবল আমি একাই গুল্ মারি না। দিল্লির এই অভিজাত জনতার মুখে মুখে প্রতি অক্ষর পড়বার গুল্ প্রচারিত হচ্ছে অহর্নিশ। এই প্রচারের গুঞ্জন নেহেরুর চতুর্দিকে সবচেয়ে বেশি। বেচারী নেহেরু! তাঁর জন্য সত্যিই আমার মায়া হয়। এমন একটা ভালমানুষকে দিয়ে কংগ্রেস কত কাজই না করিয়ে নিতে পারত! কিন্তু তার সম্ভাবনা খুব কম বলে মনে হচ্ছে।

'দীপুদা, কেমন আছ?

'দিদি কোথায়? দু'মাসের ওপর দিদি কারসিয়ংএ আছে। এতদিন তার থাকবার দরকার কি? কলকাতায় জ্যেঠাইমা একা পড়েছেন। দিদিকে তুমি তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠিয়ে দিও। 'আজকে দিদি আমায় সত্যি সত্যি ভাবিয়ে তুলেছে। বুঝলে কিছু দীপুদা? চিঠির উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। কারণ আমি কিছুদিনের জন্য সিমলা যেতে পারি জ্যেঠামশাইয়ের সংগে।

ইতি—

তোমার বোন মুকু।

চিঠিখানা পড়া শেষ করলাম। অনেকটা সময় নিয়েছি চিঠিটা পড়তে। মনে হ'ল চিঠিখানা আরও লম্বা হ'লে আমার ভালই লাগত। অনীতা দিল্লি গিয়ে কারও সংগে মিশতে পারল না, আর নুকুর সংগে মিশবার জন্য সারা দিল্লি পাগল! নুকুর সাহসের বাহাদুরি আছে। তারিফ করতে হয় নুকুর উপস্থিত-বুদ্ধিকে। প্রধান মন্ত্রীকে গুল্ মারবার টেকনিক পর্যন্ত নুকুর রপ্ত হয়ে গেছে। সমস্ত চিঠিটার মধ্যে ওর সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে অনীতার জন্য। কিন্তু আমি জানি এ উদ্বেগ অনীতার জন্য নয়, উদ্বেগ বিনয়-প্রকাশের জন্য। বুর্জোয়াদের মত নুকুও দেখছি বিনয়প্রকাশকে চিরদিনের জন্য ধরে রাখতে চায়। বুর্জোয়াদের প্রচুর অবসর আর অগুন্তি টাকা। তাই তাদের প্রেম কেবল প্রেম হ'লেই চলে না, স্বর্গীয় হওয়া চাই। সর্বহারাদের পকেট কাটা পয়সায় ওরা সিন্ধীর দোকান থেকে 'গজমতি' হার কিনে এনে মেয়েমানুষের গলায় পরিয়ে দেয়। দিয়ে বলে, দিলাম স্বর্গীয় প্রেমের উদ্দেশ্যে। আসলে সব উদ্দেশ্যের মূল মানুষের স্থূল প্রয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার সন্দেহ হ'ল নুকুও বোধ হয় তার নিজের প্রেমকে স্বর্গের দরজায় নিয়ে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করছে। হয়তো বিনয়প্রকাশ সরে গেলে নুকুও একদিন পার্টি থেকে সরে যাবে। ভীষণ রাগ হ'ল আমার। দেশলাই বার করে চিঠিটায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। পুড়তে লাগল নুকুর চিঠি। যখন অর্ধেকটা পুড়েছে তখন ঘরে প্রবেশ করলেন মামা।

"মামা, তুমি ?"

"কলকাতায় যা গরম পড়েছে, পালিয়ে এলাম। এমন মনোযোগ দিয়ে কি পোড়াচ্ছিস ?"

"নুকুর চিঠি।"

"কেন ? রাখবার মত নয় বুঝি ?"

"না মামা। দিল্লিতে গিয়ে কার সংগে প্রেম করেছে সেই সব আজে-বাজে কথা।"

"আজকাল তো শুনতে পাচ্ছি মেয়েরা প্রেম করে না, একেবারে প্রথম থেকেই প্রণয়!"

চিঠির সবটুকু যখন ছাই হয়ে গেল তখন বললাম, "অনাবশ্যক সময় নষ্ট করতে চায় না বোধ হয়।"

"কেন, এই সময় সংক্ষেপের কারণ কি? চারদিকে তো লোকের হাতে কাজ নেই। সময়ের অভাবটা কোথায়? তাছাড়া ঝুকু তো লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছে।"

এই সময় বাইরে থেকে কে একজন বললেন, "আসতে পারি কি? বিশ্বনাথবাবু আছেন?"

মামা বললেন, "আরে রামতনু যে? এসো, এসো।" ঘরে প্রবেশ করলেন রামতনুবাবু। মামা বললেন, "রামতনু ঘোষ। দারজিলিং-এর পুলিসসাহেব। আর দীপক, আমার ভাগ্নে এবং মন্ত্রী গৌরিশংকরের ছেলেও বটে।" আমরা সবাই বসলাম।

মিঃ ঘোষ বললেন, "তোমার চিঠি আমি একটু আগে পেয়েছি।"

মামা বললেন, "গতকাল পাওয়া উচিত ছিল।"

"ভুল করে ওরা সরকারী ফাইলে চিঠিটা ঢুকিয়ে ফেলেছিল বিশু।" রামতনুবাবু সিগারেট ধরালেন।

মামা বললেন, "যত ভুল সব আজকাল ভারতবর্ষের পুলিস বিভাগেই হচ্ছে দেখছি। নইলে গান্ধিজিকে গড্‌সে কি করে মারে?" পুলিসসাহেব একটু হাসলেন। যেন গান্ধিজির মৃত্যুটা একটা হাসির ব্যাপার। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "পাহাড়-পর্বতের দেশ। হিমালয়ের মধ্যে যাওয়া আসার রাস্তাগুলোর ওপর একটু নজর রাখছ তো রামতনু?"

"আমরা তো চাকর। স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড়কর্তা যা আদেশ করেন আমরা তাই পালন করি। কিন্তু বিশু, হঠাৎ তোমার হিমালয়ের মধ্যে নজর পড়ল কেন?"

"আমার কি রকম সন্দেহ হচ্ছে, ওপার থেকে অনেক মালমসলা আসছে ঐ রাস্তায়।" পুলিসসাহেব হেসে উঠলেন হো হো করে। হাসি থামলে পর তিনি বললেন, "নেহেরু আদেশ দিয়েছেন এক এক করে সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আর তুমি বলছ ঠিক উল্টো কথা। কোন দিকে যাই বল তো?" গম্ভীর ভাবে মামা বললেন, "যাবে উত্তর দিকেই। রামতনু, নেহেরু আজ আছে কাল নেই। কাল থাকলেও পরশু নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ তো থাকবে। তোমার সন্তান-সন্ততিরা তো থাকবে?" পুলিসসাহেব বললেন "ভয় করো না। তেমন কোন বড় কম্যুনিষ্ট দারজিলিং জেলায় নেই। চলো 'বারে' গিয়ে বসি, তা হ'লেই তোমার দুর্ভাবনা কাটবে।"

"আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি রামতনু।"

পুলিসসাহেব বললেন, "শ্যালকের উপর রাগ করে কাপড়ের কলটাও বেচে দিলে! শ্যালকটি কি করছে আজকাল?"

"ওদের চাকরি গতকাল যা ছিল আজকালও তাই আছে। তোমাদের মতো গড়ানো পাথর নয়। দেড় হাজার টাকা মাইনে পেলে তুমি এক্ষুনি উত্তর মেরুতে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারো। হরিপ্রসাদ এক কোটি টাকা ছেড়ে দিয়েছে। এক কোটি টাকা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

পুলিসসাহেব উঠলেন। মামা তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য ঘরের বাইরে গেলেন। আমার বুকের মধ্যে সশব্দ তোলপাড় সুরু হ'ল। বিনয়প্রকাশের সংগে দেখা করবার তাগিদ অনুভব করলাম। মামা কি তবে হরিপ্রসাদের অনুসন্ধানে দারজিলিংএ এসেছেন? কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে না তো? কিন্তু আমি ভাবলাম পুলিসের দিক থেকে কোন ভয় নেই। কারণ ওরা নিজেরা গরজ করে আর কোন দিনই আমাদের খুঁজতে বেরোবে না। কংগ্রেস-মন্ত্রীদের নির্দেশ ছাড়া ওরা এক পাও এগোবে না। রাষ্ট্রের সর্বত্র যদি এই দায়িত্বহীন মনোভাবটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে ভারতবর্ষ আমাদের দখলে আসতে ক'বছর সময় নেবে? 'দারজিলিং জেলায় বড় কম্যুনিষ্ট নেই' এইটেই আমার

মারণ-অস্ত্রের অব্যর্থ বুলেট। বিনয়প্রকাশ বলেছিল পার্টির কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি কি ভাবি তার একটা খসড়া লিখতে। ঐ একটি ছত্রের মধ্যে আমার সব কথা বলা হয়ে গেল। ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি শিশুর কানে আমরা যদি অহর্নিশ বলতে পারি। 'খোকা ঘুমল, পাড়া জুড়ল, বর্গি গেল চলে,' তা হ'লে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। মামা ঘরে ঢুকতেই বললাম, "মামা, কাল চলো শিকারে যাই। এখান থেকে খানিকটা দূরে আমার এক বন্ধু বাস করেন। সেখানে ভাল ভাল পাখী আছে।"

"কাল নয় দীপু। অন্য একদিন যাওয়া যাবে। হাঁ রে, কাকীমাকে দেখেছিস, না বোরকা পরে আছেন?"

"দেখেছি মামা।"

"কেমন দেখতে? আমায় একটু দেখা না?"

"তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখব।"

"ভারতীয়দের সংগে না কি মেশেন না খুব? চা-বাগানের সাহেবদের সংগে শুনলাম মদ্যপান আর নাচ চলছে বেদম। ব্যাটারা লিথুয়েনিয়ার মেয়েমানুষের সংগে এতো মজল কি করে?"

"এর জন্য অনেকটা দায়ী বোধ হয় ছোটকাকা। বউকে একলা ফেলে রাখলে তাঁর সময় কাটে কি করে? মামা, কাল চলো শিকারে যাই। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ি।"

"কাল আমার রামতনুর ওখানে নেমন্তন্ন। অন্য একদিন যাব।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতা কোথায়?"

বললাম, "কনভেণ্টে।"

"অমন ভাল মেয়ে কালেভদ্রে দু'একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমি নিজে দেখে শুনে অনীতার বিয়ে ঠিক করব দীপু।"

"সে তো খুব ভাল কথা মামা। কিন্তু অনীতা বোধহয় একজনকে ভালবেসে ফেলেছে।"

"কাকে ভালবাসল ?"

"কমলবাবুকে।"

"কমলবাবুকে ? তিনি কে, আমি তাঁকে দেখতে চাই।" মামা গর্জন করে উঠলেন। আমি বললাম, "অনীতাকে বলব সে-কথা। তবে অনীতার মত সাবধানী মেয়ে চারদিক দেখেশুনেই এগোবে।"

"না দীপু। সরল মানুষরাই হোঁচট খায় বেশি। কুকুর জন্য ভয় নেই। সে একাই ভারতসাম্রাজ্যের খুঁটি নড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু অনীতা ? না দীপু, কালই কারসিয়ং যাব।"

"কিন্তু মামা, অনীতা খুব ভোরেই কারসিয়ং থেকে কাল বেরিয়ে আসবে।"

"তা হ'লে আমি ভোর রাত্রেই রওনা হব।"

দারজিলিংএর শীতে ভোর রাত্রে মামা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরুবেন কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে মনে হাসতে লাগলাম।

"দেখ্ দীপু, হরিপ্রসাদ দারজিলিংএ কেন এসেছে বলতে পারিস ?"

"আমি কি করে বলব ? মামা, হাতে ওটা কি বই ?" আলোচনাটা ঘুরিয়ে দিলাম।

"আর্থার কোয়েস্টলারের লেখা, ডার্কনেস্-এট্-নুন।"

"কি সম্বন্ধে লেখা মামা ?"

মামা এক পা এগিয়ে এসে বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পড়িস।"

"বইটা দেখছি উপন্যাস।"

"হ্যাঁ, উপন্যাস বটে কিন্তু ইতিহাসের সত্য এতে আছে। ডস্টয়েভস্কির বইগুলো কি কেবল উপন্যাস ? মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্য সত্যের আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ?"

"কিন্তু এই বইটার মর্মকথা কি ?"

"নায়ক রুবাশভ একজন প্রাচীন বলশেভিক। তিনি সমগ্র মানবজাতির হয়েই লড়াই করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। কারণ,

কম্যুনিজম্ মানুষের ব্যক্তিত্ব নিংড়ে নিয়ে তাকে একটা নাটবল্টুর আকার দিতে চাইছে।—এমন একটা সর্বনেশে রাজনৈতিক আদর্শবাদ চালু হ'লে আমাদের বাঁচবার দরকার কি দীপক? আর্থার কোয়েস্টলার নিজেই একদিন কম্যুনিস্ট ছিলেন। তাছাড়া কয়েক লক্ষ রাসিয়ান রিফিউজিকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েও দেশে পাঠানো যায় নি। তারা বলছে, ইউরোপে আমরা জুতো পালিস করে জীবিকা নির্বাহ করব তবু 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা স্বদেশে ফিরে যাব না।' কেন যাবে না? কিসের ভয়? শ্রেণী-সংগ্রাম-বিজয়ী স্টালিনের শাসন ব্যবস্থায় শুনেছি মাটিতে ট্রাক্টর দিয়ে ঠেলা মারলেই গম জন্মায়, গাইগুলোর বাঁটে হাত লাগালে চেরা পুঞ্জির বৃষ্টির মত কেবল দুধ পড়তে থাকে। এত গম আর দুধ থাকতে ওরা জুতো পালিস করতে চায় কেন? একজন দু'জন নয় বহু লক্ষ মেয়ে পুরুষ।"

এবার মামা আমার আরও কাছে এলেন। প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "দীপু, আয় আমরা কিছু কাজ করি।"

"কি কাজ মামা?"

"সোবিয়েৎ দেশের স্বরূপ আমরা প্রকাশ করে দেব। দীপক, আজকের দিনে ভারতবর্ষে এইটেই সবচেয়ে বড় কাজ। দিল্লির মসনদ আমরা চাই না। ওখানে তোর বাবার মত লোকরাই বসুক।"

আমি নিজেই গিয়ে মামার গা ঘেঁসে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি প্ল্যানে কাজ করা যায় বলো তো?"

"আমরা একটা খবরের কাগজ বার করব। তার ভেতর দিয়ে আমরা খাঁটি সত্য কথা ছাড়া আর কিছুই বলবো না।"

"দু'একটা সত্য কথার নমুনা দাও।"

"এই ধর্ রুসিয়ার রাজ্য বিস্তারের প্ল্যান।"

"কি রকম?"

"ওরা মুখে বলছে মানুষের জন্য অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছি। আসলে সমগ্র পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করাই হচ্ছে ওদের মুখ্য পরিকল্পনা। একদা

জারদের স্বপ্ন ছিল রুসিয়ার সাম্রাজ্যের সীমা হবে আফগানিস্তান পর্যন্ত; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েৎ দেশের কলোনির আয়তন হয়েছে ৮২ লক্ষ বর্গ মাইল। বিশ্বাস না হয় মানচিত্র খুলে দেখ্। এবার ওরা ভাবছে সমগ্র পৃথিবীর কথা। কবরের নীচে মরা জারদের মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় পড়েছে না? জারদের আমলে ক'লক্ষ লোক সাইবেরিয়ায় মারা গেছে? আর ওদের আমলের হিসেব কি? শ্লেভ-লেবার ক্যাম্পগুলো দেখে আয়, দেখবি কোটির উপরে লোক বরফের মধ্যে তিলে তিলে মারা যাচ্ছে। কলকারখানা তৈরি হচ্ছে বিনে-মাইনের আপ্-খোরাকি মজুরদের শ্রম দিয়ে। দীপক, আয় আমরা এবার সত্য কথা প্রচার করি। অর্গানাইজ!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা?"

মামা ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ছ'খানা ব্যাঙ্কের পাস বই নিয়ে এলেন। আমার সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার সর্বস্ব, প্রায় পঁচাত্তর লাখ টাকা হবে। এক পয়সা নিজের জন্য চাই না। সব তোকে দিলাম। কাজ কর। দীপু, দিল্লির মসনদে বসার লোভ আমার নেই। আমার সন্তান হ'ল না, অতএব ভবিষ্যতে আমার এতে কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব নেই। তোরা বাঁচ, তোদের সন্তানরা বাঁচুক। ভারতবর্ষের শুদ্ধ আত্মাকে মলিন হতে দিস না।"

"মামা, কাল চলো শিকারে যাই। শিকার নাই বা করলে। লোকালয়ের বাইরে বসে আমরা ভাল করে প্ল্যান করতে পারব।"

"কাল নয় দীপু, পরশু চল।"

"তাই ভাল।"

"দীপু, পঁচাত্তর লক্ষ টাকার পাস বই হাতে নিয়ে আজ আমাদের পলিট্-ব্যুরোর সৃষ্টি হ'ল। তুই আর আমি রইলাম যুগ্ম সদস্য। কি বলিস দীপু?" তারপর মামা আমার হাত থেকে সবগুলো পাস বই টেনে নিয়ে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, "দীপু, আমরা এক ঢিলে দিয়ে দুটো পাখী মারব। প্রথম কম্যুনিজম, দ্বিতীয় ক্যাপিটালিজম্।" দরজার

কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মামা, বাবা একদিন বলেছিলেন তোমার কি সব ইনকাম ট্যাক্সের গণ্ডগোল আছে।"

"হাঁ, ওরা জোর করে আমার ওপর বাহাত্তর লক্ষ টাকার ট্যাক্স বসিয়েছে।"

"তা হ'লে কি উপায় হবে? পঁচাত্তর থেকে বাহাত্তর বেরিয়ে গেলে কত আর রইল? মামা, সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সরিয়ে ফেল।"

"না দীপু। আমি সব করতে পারি কিন্তু ভারত সরকারকে ঠকাতে পারব না।"

"আমি ভেবে দেখলাম তুমি ঠিকই বলেছ মামু।"

"দীপু, কাজ তুই আরম্ভ কর। আমার হার্টের অবস্থা ভাল না। কোন্ সময় টেঁসে যাই বলা যায় না। মরবার আগে আমি জেনে যেতে চাই কাজ অন্তত সুরু হয়েছে।"

"হাঁ মামু। শুভস্য শীঘ্রম্।"

"কালকেই তোকে আমি বিশ লাখ দিয়ে দেব। দারজিলিংএর ব্যাঙ্কে যা আছে কুড়িয়ে কাড়িয়ে বিশ লাখ হয়তো হবে।"

"মামু, হঠাৎ তুমি হাই তুললে কেন? হার্টের রোগটা চাড়া দিয়ে উঠল না কি?" তিনি বললেন, "না, তেমন কিছু বুঝতে পারছিনা। তবে এক সংগে বিশ লাখ বেরিয়ে গেলে দু'একটা হাই উঠবেই।" মামা চলে গেলেন। ছ'টা ব্যাঙ্কের নামগুলো লিখে রাখলাম কাগজে। পরে ভুলে গেলে মুস্কিল হতে পারে।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম আসেনি। মনের আকাশে অনেক কল্পনা ভেসে বেড়াতে লাগল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ অনেক সময় নষ্ট করেছে, আর নয়। লোকের চোখ থেকে এবার ঘুম কেড়ে নিতে হবে। কাজের মধ্যে এমন একটা মানসিক তন্ময়তা নিয়ে ডুবে যাওয়া কার পক্ষে সম্ভব? শংকরাচার্যকে গুলে খেয়েও বড়কাকা পারেননি। পারলে ইতিহাসের সর্বগ্রাসী মুখব্যাদানের মধ্যে কম্যুনিজম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। অনীতার ইতিহাস বিশ্লেষণের রীতি আমরা

মানলুম। আমরা টক্কর লড়ব, টক্কর যদি শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ইতিহাসের থাকে আমরা পরাজয় স্বীকার করব। নয়তো ইতিহাসের ঘাড়ে চেপে বসে জগতের বুকে উড়িয়ে দেব লাল পতাকা। ইতিহাসকে এমন করে কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? পারে বোধ হয় একমাত্র কম্যুনিষ্ট 'মিস্টিক'। বিশ্বাস না করো আজকে আমার তন্ময়তার স্বরূপ তোমরা দেখে যাও।

ভোরবেলা ঘরের দরজায় টোকা! আমি ভাবলাম মামাও বোধ হয় বাকি রাতটুকু আমার মত ঘুমোতে পারেননি। হয়তো চেকখানা লিখেই এনেছেন। মৃতপ্রায় মানুষের মুখে যারা এক ফোঁটা ওষুধ দেওয়ার জন্য চার পয়সা খরচ করতে চায় না তারাই আবার বিশ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করে, অনিদ্রা রোগে কষ্ট পায়। ভাবলাম মামাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। টাকাটা আমি নিয়েই নেব।

দরজা খুলে দেখি মামা নয় বিনয়প্রকাশ। বড় সাইজের একটা ফেল্ট হ্যাট পরেছে, দূর থেকে মুখটা খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। দেখা গেলেও ভাল করে চেনা যায় না। দরজাটায় খিল দিলাম। বিনয়প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "বিশুবাবু কোথায়?"

"ঘুমচ্ছেন। শয্যা ত্যাগ করতে আরো অন্তত দু'ঘণ্টা বাকি।"

"বলা যায় না। কোন কারণে আজ হয়তো আগেই শয্যা ত্যাগ করতে পারেন।" বিনয়প্রকাশ খিল্‌টা খুলে দিল। দরজাটা ঠেলা দিয়ে একটু ফাঁকও করে দিল। তারপর বলল, "এখন স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।" আমি বললাম, "তোমাকে অনেক কথা বলতে হবে।" খুব তাড়া না দেখিয়ে সে বলল, "বেলা আটটার সময় লোক আসবে। একটা রিপোর্ট লিখে তাকে দিয়ে দেবে। এখন থেকে আমি মিনিট গুণতে লাগলাম। সময় মত যেন রিপোর্টটা পাই।" আমি বললাম, "রিপোর্ট আমার লেখা শেষ। এই এক মুহূর্ত আগে পর্যন্তও আমি লিখছিলাম। রাত্রে ঘুমোই নি।"

"অনেক ধন্যবাদ কমরেড।" বিনয়প্রকাশ হাত বাড়াল। বিছানার তলা

থেকে ছ'খানা প্যাডের কাগজ গুছিয়ে টেনে বার করতেই জুতোর আওয়াজ করতে করতে মামা এসে হাজির! কাগজগুলো আমার হাতেই ছিল। টেবিলের ওপর খোলা ফাউন্টেন পেনটাও পড়ে ছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবে কাগজগুলো ভাঁজ করে টেবিলের ওপরই রাখলাম। আমি অনুভব করলাম বিনয়প্রকাশ বিচলিত হয়েছে।

আমি বললাম, "মামা, রাত-জেগে সেই ব্যাপারটা সব লিখে ফেলেছি। এইমাত্র কলম ছাড়লাম।" খোলা কলমটার দিকে ইচ্ছে করেই মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করালুম। মামার মনেও ভয় এসেছে আমি তা টের পেলুম। মামা বললেন, "সে সব পারিবারিক ব্যাপার পরে আলোচনা করলেই হবে দীপু। কিন্তু—" মামা টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা লেখাটা আমার কাছেই থাক দীপু। পড়ে দেখব।" তবুও আমি বিচলিত হলাম না। কাগজগুলো খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিলাম মামার ঠিক নাগালের বাইরে। বললাম, "ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই মামা। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার, আরও একটু দেখে শুনে দেব।" বলে সবগুলো কাগজই খুব সহজ ভংগিতে নিজের পকেটে ভরে রাখলাম।

বিনয়প্রকাশ ফেল্ট টুপিটা মাথার ওপর চাপ দিয়ে আরও একটু নীচের দিকে নামিয়ে দিল। মুখের যতটা না দেখা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু বিনয়-প্রকাশ কিংবা মামা তখন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। দু'জনেই ভাবছেন, বিপদ বুঝি তখনও কাটেনি। মামার বিপদ সত্যই কেটেছে। রিপোর্টের শেষের দিকে আমি শেষ সিদ্ধান্ত করে লিখেছি, "পাখী শিকার এখন বন্ধ থাক।" মামা নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধুটির নাম কি?"

ফস করে বলে ফেললাম, "কমলবাবু।"

"হ্যালো, হ্যালো...? কমলবাবু?" মামা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিনয়-প্রকাশের পাশেই বসলেন। বিনয়প্রকাশ মাথা থেকে টুপিটা খুলল না। মাথা নীচু করে হাত থেকে গ্লাভস্ খুলে মামার পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল।

মামার পায়ে ধূলো থাকা সম্ভব নয়। তবুও তিনি খুব খুসি হয়ে পা দুটো এগিয়ে দিলেন। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "পদবী ?" বিনয়প্রকাশ বলল, "চক্রবর্ত্তী।"

"গোত্র ?"

বিনয়প্রকাশ কায়স্থ। বামুনের গোত্রের সংগে গোলমাল হয়ে যেতে পারে ভেবেই আমি বললাম, "মামা, কমলকে বড্ড লজ্জা দিচ্ছ। বিয়ের সময় মানুষ গোত্র জিজ্ঞাসা করে। কমলদের গোত্র শাণ্ডিল্য। তাই না কমল ?"

বিনয়প্রকাশ মাথা নাড়ল। মামা হেসে বললেন, "তোরা তো বাৎসব ?"

"হাঁ মামা। বাৎসব মুনি আর শাণ্ডিল্য মুনির মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করা শুভই হবে।"

মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিচয় ?"

বিনয়প্রকাশ বলল, "লতাপাতা ধরে খুঁজলে ভাওয়ালের রাজ বংশের সংগে একটা সম্পর্ক পাওয়া যায়। এম্. এ. পাশ করেছি।"

"হুঁ। প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম খানদানি গন্ধ বেরচ্ছে। যাক, তাহ'লে আর অনীতার সংগে আজ দেখা করব না। কি বলিস দীপু ?"

"হাঁ, সেই ভাল মামা। এদিকে আবার দশটার সময় ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" মামা আবার ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সে সব কথা পরে হবে। যাই একবার রামতনুর ওখান থেকে ঘুরে আসি। কমলকে চা খাইয়ে দিস।" মামা জুতোর আওয়াজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাগজগুলো সব বিনয়প্রকাশের হাতে দিয়ে দিলাম। সে ছ'খানা কাগজ গুণে গুণে পকেটে রাখল। তারপর বলল, "সাতদিনের বেশি আর দারজিলিংএ থাকবার তোমার দরকার নেই। অর্থাৎ আসছে মঙ্গলবারের মধ্যে বিশুবাবুকে নিয়ে তুমি কলকাতায় পৌছুবে। বুধবার দিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় আউটরাম ঘাটের 'বুফে'তে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। সন্ধ্যে ছ'টা। আমার সংগে তোমার আর দেখা হবে না। কমরেড লোপোন রইলেন, যা করবার তিনিই করবেন।"

দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে বিনয়প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "আমার নাম কমলবাবু তুমি কি করে জানলে এবং কখন জানলে ?"

"এইমাত্র জানলাম, এবং তা তোমার কাছ থেকেই।" একটু হেসে বিনয়প্রকাশ বলল, "অনীতাকে আমাদের পাওয়া চাই।" আমি বললাম, "কার্সিয়ংএর বস্তিতে এবং গির্জের আশেপাশেই ওকে পাবে।"

"আমি ওকে সত্যিই পেতে চাই—নিজের জন্য নয়, পার্টির জন্য।"

টুপিটা একটু টেনে দিয়ে বিনয়প্রকাশ চলে গেল।

সেইদিনই মামা আমার নামে একাউন্ট খুলে ফেললেন। পুরোপুরি বিশ লাখের ব্যবস্থা করে আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চললাম মেলের দিকে। মামা বললেন, "গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। চল্ 'প্লিভাতে' গিয়ে গরম কফি খেয়ে নিই।" ভেতরে গিয়ে মামা কফির অর্ডার দিলেন, তারপর বললেন, "বোঝা অনেক কমলো।"

"হাঁ, অন্তত বিশ লাখের বোঝা। আর যেন কত রইল মামু ?"

"পঞ্চান্ন।"

"ইনকাম ট্যাক্স যদি বাহান্ন দিতে হয়, তা হ'লে তোমার হাতে আর মাত্র তিন থাকে। কেমন ?"

"বলিস কি দীপু ? তিন থাকবে কেন ? এই যে তোর কাছে বিশ লাখ রাখলাম সেটা তো আমার টাকাই !"

"ও হাঁ। বিশ আর তিনে তেইশ। তাতে আমাদের পলিট ব্যুরো ভালই চলবে। তোমায় ক' চামচে চিনি দেব মামু ?"

"ডায়বেটিসে ততো আর জোর নেই আজকাল। দে তিন চামচে।" কফিতে চুমুক দিয়ে মামা বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, গভর্ণমেন্টের লোক আমার ব্যাঙ্কের টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। টের পেলে সবই ধরে নেবে।"

"সব তো ধরতে পারে না। বাহান্ন নিয়ে তিন ছেড়ে দিতেই হবে।"

মামা সহসা আরও এক চামচে চিনি মিশিয়ে ফেললেন। আমি ভয় পেয়ে বললাম, "মামু, তোমার ডায়বেটিস না?"

"ডায়বেটিস্? ডায়বেটিস্ কোথায়? উনি তো তোর কাকীমা।" আমি দেখলাম কাকীমা একজন সাহেবের সংগে বসে চা খাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকীমাকে দেখে তুমি অত চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন?"

"দীপু, এখানে আর নয়। চল ফাঁকায় গিয়ে বসি।"

"তুমি বরং হোটেলে ফিরে যাও। আমি কমলদের ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি।"

"বলিস কি! এখন তো তোকে আমি সব সময় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে থাকব দীপু।"

"টাকা 'তো রাখলে ব্যাঙ্কে। আমাকে ছুঁয়ে থাকলে কি লাভ হবে?" আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।"

প্লিভা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মামা বারবার করে কেবল কাকীমাকে দেখছিলেন। রাস্তায় নেমে বললেন, "দীপু, তোর কাকীমার বাড়ি তো লিথুয়েনিয়া?"

"তোমার মুখেই তো নামটা শুনতে পাই।"

"কেন, তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনিস নি?"

"তিনি বলেন, লিথুয়েনিয়া আর নেই।"

"আমরাও জানি আর নেই। তলিয়ে গেছে।"

এই সময় মামা হঠাৎ পেছনদিকে হন্ হন্ করে ছুটতে লাগলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "মনে হ'ল ঐ চীনে হোটেলে হরিপ্রসাদ ঢুকেছে।"

"তা হ'লে এবার আমি চলি?"

"দীপু, একটা কথা মনে রাখিস। আমি কিন্তু তোর ওপর নির্ভর করলাম। তোকে বিশ্বাস করলাম।"

"বিশ লক্ষ টাকার বিশ্বাস তুমি রাখতে পার মামু।"

"বিশ লক্ষ টাকাই সব নয় দীপু। আমাদের আদর্শটাই বড়।"

"ও, হাঁ। এবার আমি চললাম।"

একটু দূরেই কমরেড লোপোন গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িতে উঠবার পর লোপোন বললেন, "তুমি তো আজ বিশ-লক্ষপতি কমরেড।" অবাক হয়ে চাইলাম লোপোনের দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত তাড়াতাড়ি খবরটা জানলেন কি করে?"

"টেলিফোনে।"

"কি রকম?"

"ব্যাঙ্কে কেবল টাকাই নেই, টাকা নাড়াচাড়া করবার জন্য আমাদের কমরেডরা সেখানে আছেন।"

জিপ গাড়িটা তখন অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। মিনিট দশেক পরে উল্টো দিক থেকে একটা জিপ গাড়ি নীচে নেমে আসছিল। লোপোন বললেন, "মাথার টুপিটা একটু টেনে দিয়ে মুখটা ঢাকুন।" জিপ গাড়িটা পার হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পুলিসসাহেব রামতনু বাবু না?"

"হাঁ। এই ক'দিনের মধ্যেই বিশুবাবু পুলিসসাহেবের কানে অনেক কথা লাগিয়েছেন। অতএব বিশুবাবুকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলুন কলকাতায়।"

"ভয়ের কিছু কারণ ঘটেছে কি?"

"তেমন কিছু নয়। তবে পুলিসসাহেব নিজেই আজ চা-বাগানের দিকটায় সফর করে এলেন। চা-বাগানের কমরেডরা একটু ভয় পাচ্ছেন। রামতনু বাবুকেও এখান থেকে বদলি করা দরকার।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন অস্ত্রের কথা ভেবেছেন কি?"

"আমাদের একটা আলাদা স্কোয়াড আছে। বড় মানুষদের চরিত্র নষ্ট করবার স্কোয়াড। একটা সাপ্তাহিক কাগজ বেরয় দারজিলিং থেকে। পুলিস-সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে একটা ছোট্ট কলংক ছেপে দেওয়া যায় অনায়াসেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "অনায়াসেই ছাপা যাবে কি?" পাইপ থেকে খুঁচিয়ে

খুঁচিয়ে পোড়া তামাক বদলে নিয়ে লোপোন বললেন, "কমরেড লছমিকে আমরা পাঠিয়েছিলাম পুলিসসাহেবের বাড়িতে ঘরদোর সাফ্ করবার কাজ দিয়ে। রামতনুবাবুর স্ত্রী কলকাতায় আছেন বাপের বাড়িতে। অতএব লছমিকে দেখে পুলিসসাহেবের ঘরে ময়লার পরিমাণ সহসা বেড়ে গেল। তিনি লছমিকে কাজ দিলেন। প্রথম দিনই লছমি একটা নতুন সাড়ি পেল।"

বললাম, "তা হ'লে কাগজে এটা ছেপে দিন। দিলে কাজ হবে।"

"স্কোয়াড্ যিনি চালান তিনি বলেছেন দারজিলিংএর ছোট কাগজের খবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিশ্বাস না ও করতে পারেন। সুতরাং এই কাগজের কাটিংটা কলকাতা পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। সেখানকার বড় বড় কাগজে আমাদের বিশ্বস্ত কমরেডরা সব আছেন। ভাল করে ছাপা হতে পারবে। তাতে কাজ হবে নিশ্চয়।" গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে লোপোন বললেন, "ভাঙ্গতে যদি কষ্ট হয় তবে পা দিয়ে পিষে ফেলাই ভাল। ধুলোর সংগে মিশে যাবে। Dust thou art to dust return'st."

গাড়ি থেকে নামবার পর তিনি বললেন, "দারজিলিংএ খুব বেশি দিন হয়তো থাকতে পারবেন না।"

আমি বললাম, "সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

মন্দিরে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হয়েছে। ঘণ্টা বাজার সংগে সংগে পূজারীদের কণ্ঠোত্থিত মন্ত্রের সুর পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। ঢালুর দিকে নামতে নামতে আমি বললাম, "মন্দিরের ভেতরটা কিন্তু আমার দেখা হ'ল না।" লোপোন বললেন, "মন্দিরের ভেতর ভগবান-বুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নেই। মাটির নীচে অবশ্য আমাদের অস্ত্রাগার আছে। ভাল কথা, কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ পরশুদিন আসছেন এখানে। সংগে তাঁর বর্মা দেশের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য শরণার্থীরাও আসবেন।"

ফিরবার পথে আমি বললাম, "মামা হয়তো হোটেলে বসে ছটফট করছেন।"

"ও হাঁ। বিশ লক্ষ টাকা তো সোজা কথা নয়! ভগবান বুদ্ধের সিন্দুক হাতড়ালেও অত টাকা পাওয়া যাবে না। বুদ্ধের সিন্দুক মানে পার্টির সিন্দুক। আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি কমরেড চৌধুরী।" ঢালুর দিকে গাড়ি গড়িয়ে চলল। তিনি বললেন, "কম্যুনিষ্টদের কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। কম্যুনিষ্টরা সব অশরীরী। রক্ত মাংস ও মেদমজ্জার সবটুকুই পার্টির গায়ে। অতএব বিশ লক্ষের বিশ পয়সাও আমাদের নয়। এইটেই আসল কথা।"

কমরেড লোপোন শিস্ দিতে দিতে গাড়ি চালাতে লাগলেন। সুরটা বেশ ভাল লাগছিল। তিনি বললেন, "ইণ্টারন্যাশনাল।"

হোটেলের সামনে এসে কমরেড লোপোন বললেন, "রামতনুবাবুকে শীঘ্রই সরে যেতে হবে। লছমী সংক্রান্ত ব্যাপারটা এখানকার কাগজে আজ বেরিয়েছে। গুড্ নাইট।"

একদিন রাত্রিতে মামা বললেন, "প্লানটার্স ক্লাবে ডিনারে যাচ্ছি।" ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে চা-বাগানের সাহেবদের ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কে কে যাচ্ছেন মামা?"

"রামতনু যাচ্ছে। আজ রামতনুর বিদায় ভোজ।"

"বিদায় ভোজ মানে? তিনি বদলি হয়েছেন নাকি?"

"হাঁ।"

"মামা, তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে পারতে। কিন্তু রামতনুবাবু এত তাড়াতাড়ি চললেন কেন?"

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রামতনুর ওপর ভীষণ চটেছেন। কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে সব খবর বেরিয়েছে। লছমি বলে কে একটা কুলি মেয়ে ওর ঘরদোর সাফ করার কাজ করত। তার সংগে রামতনু…।" বাকিটুকু বাকি রেখে মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝলি?"

"বুঝেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তোমার বন্ধু। তাঁকে তুমি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো তিনি ওঁর বদলির আদেশ বাতিল করে দিতেন।"

ডিনারের পোষাক পরে মামা ঘরের মধ্যে খুব চিন্তান্বিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোর পিসেমশাই প্রমোশন পেয়েছেন।"

"তাই নাকি? কমিশনার হয়েছেন বুঝি?"

"কমিশনার! ননসেন্স! সে তো কমিশার হবে রে দীপু।"

"কি যে সব যা তা বল মামু তার ঠিক নেই। পিসেমশাই কি হয়েছেন তাই এবার বলো।"

"ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস। এর পরে তো পুরো জেনারেল! মানে ইনস্পেক্টর জেনারেল। স্বাধীন ভারতে কেউ কেউ যেন ডবল প্রমোশন পাচ্ছে।"

খুব উৎসাহিত হয়ে বললাম, "মামা, পিসেমশাইকে তাহ'লে কনগ্রেচুলেসানস্ জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম করি?" মামা চিন্তামগ্ন।

"টেলিগ্রাম করতে হবে না। তিনি আজ দারজিলিং এসেছেন। এইসব অঞ্চল এখন তাঁর আওতায় পড়ল। ক্লাবে নিশ্চয়ই আমার সংগে দেখা হবে।"

"তা হ'লে আমার হয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। আচ্ছা মামু, পিসেমশাইকে আমাদের দলে টানলে কেমন হয়?"

"না দীপক। কাউকে ভাল করে না বুঝে আমরা এক পাও ফেলব না। আমাদের পলিট্‌বুরোর কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আমরা রাস্তায় চলতে চলতে মিটিং করব। ভাত খেতে খেতে আমরা প্রস্তাব পাশ করব। আমাদের অস্তিত্ব বাতাসের মত হাল্কা হবে, বুঝলি?"

"বুঝেছি মামু।"

"তা হ'লে এবার আমি চলি। ক্লাব থেকে ফিরতে দেরি হ'লে তুই ঘুমিয়ে পড়িস। কাল সকালে সব রিপোর্ট পাবি।"

মামা খুব চিন্তান্বিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আজ ক'দিন থেকে দারজিলিংএ লোকের ভিড় খুব বেড়েছে। গভর্ণর এসেছেন এখানে। তাঁর পেছনে পেছনে কলকাতার বুর্জোয়ারাও এলেন। হোটেলে অনেক নতুন লোক। পুরনোদের মধ্যে অনেকেই গেছেন চ'লে। ক্যাপটেন মালহোত্রাকে আর দেখতে পাই না। কাকীমার সংগেও আমার আর দেখা হয়নি। অনীতা কি করছে জানি না। হয়তো সে কনভেণ্টে তার প্রার্থনা নিয়ে ব্যস্ত আছে। বিনয়প্রকাশও এখানে নেই। থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হ'ত। দু'দিন থেকে কমরেড লোপোন আসেন না। এদিকে দারজিলিংএ থাকার মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এলো। বুধবার ছ'টার সময় বিনয়প্রকাশ বুফেতে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। মামাকে দারজিলিং থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার একটা প্রধান কাজ। কিন্তু তাঁর যাওয়ার কোন মতলব দেখছি না।

ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাউঞ্জে এলাম। লাউঞ্জে এসে দেখি কমরেড লোপোন একা একা বসে মদ্যপান করছেন। তিনি আমায় ইসারা করতেই তাঁর উল্টো দিকের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, "দারজিলিংএর আবহাওয়া বড্ড গরম হয়ে উঠেছে।" আমি বললাম, "হাঁ। গভর্ণরের দলবল কম নয়।"

"তা হ'লে সোমবার দিন যাচ্ছেন তো?"

আমি বললাম, "যেতেই হবে।"

"তা হ'লে কালকেই টিকিট কাটবার চেষ্টা করবেন। নইলে সোমবার সিট পাবেন না। বড্ড ভিড় হচ্ছে কমরেড চৌধুরী।" তিনি গেলাসে বড় রকমের একটা চুমুক মারলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কিছু বলবেন কি?"

"না। কালকে টিকিট কাটার কথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম।"

"বিশেষ ধন্যবাদ কমরেড।"

বেয়ারাকে টাকা দেওয়ার পর তিনি উঠে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে তিনি বললেন, "যাওয়ার দিন ব্যাঙ্কে একটা চিঠি দিয়ে যাবেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের চিঠি ?"

"টাকাটা আপনার যেন পার্ক ষ্ট্রিটের ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার করে দেয়। অর্থাৎ আপনার একাউন্ট থাকবে পার্ক ষ্ট্রিটের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। সেখানেও আমাদের কমরেডরা আছেন। তাঁরা আপনার টাকাপয়সা সব সময়েই দেখতে পাবেন। চেক কাটবার আপনার দরকার নেই।"

লোপোনের গলার আওয়াজ আজ বড্ড কর্কশ বলে মনে হচ্ছিল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার দেহসংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে গেলেন, "টাকাটা কিন্তু পার্টির। আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

রাত্রিতে ফিরে এসে মামা বললেন, "তোর কাকীমার সংগে আলাপ হ'ল দীপু।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগল কাকীমাকে ?"

টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে তিনি বললেন, "কাকীমার চেয়ে ভাল লাগল তোর পিসেমশাইকে।"

"কেন ?"

"রণদা নাচতে পারে জানতাম না। ওল্‌গা দেবীর কোমর জড়িয়ে রণদার বল্ ডান্স, সে এক দেখবার জিনিস! নৃত্যের তালে তালে দু'জনের মুখ নড়ছিল। তোর ছোটকাকা উপস্থিত থাকলে পুলিসের ডি. আই. জির মাথায় আজ ঢিল ছুঁড়তো। তোর পিসিমাকে গিয়ে খবরটা দিতে হবে। আইন ও শৃঙ্খলার নাম করে এসব কি উচ্ছৃঙ্খলতা ?"

"এ সব কাজ তুমি করতে যেয়ো না মামু।"

"ও, রণদা একটা খবর দিয়েছে আমায়। শোন্...।" বলে তিনি আমার

কানের কাছে তাঁর মুখ নিয়ে এলেন। তারপর বললেন, "ইনকাম ট্যাক্সের লোকরা আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি করা যায় বল্ তো?"

"তোমার ভয় কি? সবই তো আমার নামে রেখেছ।"

"দীপু, যদি টের পায় তা হ'লে ও-টাকা বেনামী ব'লে প্রমাণ করা কঠিন হবে না।"

"বড্ড বিপদে ফেললে মামু।"

"এক কাজ কর। তোর বন্ধু কমলের নামে কিছুদিনের জন্য টাকাটা সরিয়ে রাখ্। কলকাতা গিয়ে সব ঠিক করে নেব। কমল খুব বিশ্বাসী তো?"

গম্ভীর ভাবে বললাম, "একেবারে জিব্রাল্টর।"

"তা হ'লে সমস্যা মিটে গেল।"

আমি বললাম, "মামু, তাহ'লে আমরা কালই চলে যাই?"

"না, আমি তো শনিবারের আগে যেতে পারব না।"

"আমি তা হ'লে কালই চলে যাই মামু। কমল এখানে নেই। কলকাতায় গেছে। ব্যাঙ্কে একটা চিঠি দিয়ে দেব, টাকা সব কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য।"

"কালই যাবি দীপু?"

আমি বললাম, "তোমার জন্যই আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া।"

"বেশ, তা হ'লে তুই চলেই যা দীপক।"

কমরেড, এবার তোমায় আমি কয়েকটা দিন পেছনে নিয়ে যেতে চাই। দারজিলিং থেকে নেমে গেলে কবে আবার ফিরে আসব তার তো ঠিক নেই। অনীতা আর বিনয়প্রকাশের কথাগুলো না জানতে পারলে আমার এই গল্পের মধ্যে অনেকটা ফাঁক থেকে যাবে। অতএব অনীতার ডায়েরি থেকে নীচের অংশটুকু তুলে দিলাম। অনীতার ডায়েরি আমার হাতে এসেছিল বহু বছর পরে।

অনীতার ডায়েরি।

[রবিবার। কমলের সংগে আমার প্রথম পরিচয় কারসিয়ংএর এক বস্তিতে। আমি প্রতিদিনই আসতাম এই বস্তিটায়। কলেরা আর বসন্তে অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। মড়ক যখন খুব বেশি বাড়ল তখন হঠাৎ একদিন কমলবাবু অনেক ওষুধপত্র নিয়ে কোথা থেকে এসে এই বস্তিতে উপস্থিত হলেন। লোকের অভাবে আমি আর সিস্টার প্রত্যেকের সেবা যত্নের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারছিলাম না। কারসিয়ংএ যাঁরা বাইরে থেকে আসেন, তাঁরা সাধারণত হাওয়া পরিবর্তনের জন্য আসেন। তাই কমলবাবুর আবির্ভাবে আমরা যারপরনাই খুসি হলাম। সিস্টার বললেন, "ভগবান-প্রেরিত, নইলে আমরা দু'জন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম।" অনেকেই সেবাযত্নের অভাবে মারা যাচ্ছিল। আমরা দু'জনে মিলে যা পারছিলাম না, কমলবাবু আসবার পর সেটা পূরণ হ'ল। তিনি নিজে হাতে বসন্তের গুটিগুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন। কলেরার নোংরা সাফ করতে লাগলেন। আমাদের অন্তর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতায় নত হ'ল।

আজকে কমলবাবু নিজেই অসুখে পড়লেন। তিনি বস্তি ছেড়ে একদিনও কোথাও যান নি। আমরা তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানতাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি বাড়ি যাবেন ?"

"আজ আর নয়। দু'একদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব।"

"কিন্তু এই বস্তিতে আপনার কষ্ট হবে না ?"

"এদের যখন হয় না, আমারই বা হবে কেন ? তাছাড়া দারজিলিংএ যেখানে আমি থাকি, সেটাও এর চাইতে ভাল জায়গা নয়। আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।"

বিকেলের দিকে কমলবাবুর গায়ে জলবসন্ত উঠল। সিস্টার বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আমায় বললেন, ওঁকে দেখাশুনা করবার জন্য। রাত্রিতে কমলবাবুর জ্বর খুবই বাড়ল। আমি কনভেন্টে আর ফিরে গেলাম না। এইখানেই রয়ে গেলাম। সিস্টার কনভেন্ট থেকে আমায় অনুমতি পাঠিয়ে

দিয়েছেন থাকবার জন্য। সংগে আমার কাঞ্চার মাও রইল। মধ্য রাত্রে জ্বরের উত্তাপে তিনি ভুল বকতে লাগলেন। আমি ভয় পেলাম। অত রাত্রে ডাক্তার কোথায় পাব?

খাটিয়ার পাশে বসে আমি ওঁর মাথায় জলপটি দিতে লাগলাম। আর···
···আর ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। নিরুপায় মানুষের কাছে তিনিই তো সব চেয়ে বড় ডাক্তার!

রাত তিনটের সময় তাঁর ডিলিরিয়াম গুরুতর হ'ল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনাদের ডাক্তারকেই ডাকুন—।"

"ডাকছি।"

"আমি যে পাপী; তিনি তো গরম লোহা ঢেলে দেবেন! উঃ মাগো! না, না, তাঁকে ডাকবার দরকার নেই।"

সমস্ত বস্তিটায় আজ আর কারো জ্বালাযন্ত্রণা ছিল না। কমলবাবুই কেবল মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছেন। ভোরের দিকে তিনি হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার এলেন না কেন? পাপীর প্রতি তাঁর রাগ বুঝি খুব?"

কণ্ঠ যেন তাঁর অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হ'ল। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরের উত্তাপ তখনও খুব বেশি। আমি মনে মনে ভাবলাম, ডাক্তার আমাদের কাছেই রয়েছেন। তিনি রাগ করেন নি। অসুস্থ লোকের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। নিরানব্বই জন ধার্মিক লোককে পেয়ে তাঁর যা আনন্দ তার চেয়ে বেশি আনন্দ একজন অনুতপ্ত অসুস্থ লোককে পেয়ে। হারানো টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য কার না আনন্দ হয়?

এরই মধ্যে কমলবাবু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমি তা টের পাইনি। ঘরের বাইরে এলাম। তেমন খুব বেশি শীত ছিল না। টিপ্‌টিপ্‌ করে হিম পড়ছে গাছের পাতা থেকে। ও-পাশের পাহাড়ের চূড়াটা অন্ধকারের আব্রু ভেদ করে ক্রমে ক্রমে আমারই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। বস্তির সুস্থ লোকদের দু'একজন এরই মধ্যে শয্যা

ত্যাগ করেছে। দিনের রুটি সংগ্রহ করতে কারো কারো ভোর রাত্রেই বেরুতে হয়। শিলিগুড়ি থেকে মাল আনতে যাবে। এরা সব মটর লরির ড্রাইভার। কলেরায় আক্রান্ত স্ত্রীপুত্রকে ফেলেই ওদের যেতে হবে। ভগবানের করুণা না থাকলে এদের কেউ বাঁচাতে পারত না। স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর ক্ষমতা আর কতোটুকুই বা হবে! হঠাৎ কমলবাবুর কথাটা মনে পড়ল, "আপনাদের ডাক্তারকেই ডাকুন।" ডিলিরিয়ামের মধ্যেও সত্যের ঝংকার আমি শুনতে পেয়েছিলাম। তিনি ডাক্তারই বটে!

বুধবার।

কমলবাবু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দারজিলিং থেকে ওল্‌গা কাকীমা আমার সংগে দেখা করতে এসেছিলেন গত সোমবার দিন। কমলবাবুর সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তারপর থেকে তিনি প্রত্যেক দিনই একবার করে আসেন। কমলবাবুকে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। কাকীমা বললেন, "অনীতার সেবাযত্নের পরিপাটি সবাইকে চমৎকৃত করেছে।" আমি জবাব দিলাম, "কাকীমা, একটা সামান্য ব্যাপারকে বাড়িয়ে ব'ল না।"

কমলবাবু কাকীমার দিকে চেয়ে বললেন, "প্রশংসা করবার মত কণ্ঠে আমার সাহস কিংবা শক্তি আসে নি।" যাওয়ার সময় কাকীমা বলে গেলেন, "কমল সুস্থ হ'লে, তোমরা দুটিতে মিলে আমার ওখানে চা খেতে এসো।"

পরের বুধবার।

কমলবাবু এখন পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেছেন। বস্তির লোকরা ওঁকে ছাড়তে চায় না। যাব-যাব করেও তাঁর দারজিলিং যাওয়া হয়ে উঠছে না। এদিকে বস্তির কাজও আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গত চারদিনের মধ্যে কেউ আর নতুন করে আক্রান্ত হয়নি। আজ বিকেলের দিকে আমি বস্তিতে এলাম। সংগে সিস্টারও ছিলেন।

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো ভেজা। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের আলো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ভেঙ্গে

ভেঙ্গে গাছগুলোর ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে।* দেখতে অনেকটা টুকরো টুকরো কাঁচের মত লাগছিল। আমি এসে দাঁড়ালাম কমলবাবুর ঘরের জানলার পাশে। তিনি ঘুমচ্ছিলেন। পড়ন্ত রোদ এদিক ওদিকে ধাক্কা খেয়ে কমলবাবুর মুখের ওপর এসে পড়েছে। বসন্তের দাগগুলো রোদের আলোয় বেশি করে ফুটে বেরচ্ছিল। একেবারে মিলিয়ে যেতে সময় লাগবে। আমি নিজে হাতেই গুটিগুলোতে মলম লাগিয়েছি। পরিষ্কার করেছি আমি। এক মুহূর্তের জন্যও কমলবাবুর মুখের দিকে আমি ভাল করে চেয়ে দেখিনি। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আজ আমার প্রথম মনে হ'ল কমলবাবু কেবল পুরুষ নন, সুপুরুষ। বর্ষা শেষের মেঘের মত বসন্তের কালো দাগগুলো হালকা হয়ে এসেছে। ভাবলাম, আর বোধহয় আমি তেমন নিঃসংকোচে কমলবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। দাড়াবার দরকারই বা কি? দু'এক দিনের মধ্যে তিনি চলে যাবেন দারজিলিং। হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না। না হ'লে ক্ষতি কি? বস্তির কত লোকের গায়েই তো আমি হাত দিয়েছি। কই তাদের সংগে দেখা হবে না বলে তো আমার কোন মনোবেদনা আসে নি? আমি এসেছিলাম সেবার কাজ নিয়ে। কাজ ফুরিয়েছে, আমি আবার কনভেন্টেই ফিরে যাব। কর্তব্যের বিনিময়ে আমি কোন প্রতিদানই চাইতে পারি না। কমলবাবুর কাছে প্রত্যাশার কী-ই বা আছে আমার!

পা বাড়ালাম বাইরের উঠোনের দিকে। সিস্টারের কাজ হয়তো এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। দু'পা এগিয়ে গিয়ে আমায় আবার থামতে হ'ল। কমলবাবুর খোঁজ নিয়ে আসা উচিত ছিল না কি? অন্তত তাঁকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল, কাল থেকে আমি আর আসব না। ওপাশ দিয়ে সিস্টার এলেন। তাঁর হাতে একটা বেতের ঝুড়ি ছিল। তাতে তিনি প্রতিদিনই ফল নিয়ে আসতেন। তিনি বললেন, "চলো, কমলবাবুকে ফল ক'টা দিয়ে আসি।"

কমলবাবুর ঘুম তখন ভেঙ্গে গেছে। তিনি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। সিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কেমন আছেন?"

"খুবই ভাল আছি। আমি কাল সকালেই দারজিলিং যেতে চাই সিস্টার।"

"বেশ তো। কিন্তু আপনার একা একা যাওয়া চলবে না। অনীতা, ওঁর সংগে কে যাবে?"

আমি বললাম, "কাকীমা আসবেন কাল সকাল আটটায়। আমার মনে হয় কাকীমার সংগে গেলে কোন অসুবিধা হবে না।"

সিস্টার বললেন, "তা হ'লে তুমিও সংগে যেতে পার অনীতা। দু'জন থাকলে আর কোন অসুবিধা হবে না। কি বলো?" আমি সহসা কিছু বলতে পারলাম না। কমলবাবু বললেন, "আপনাদের কত কষ্টই না দিলাম!" তখন আমি বললাম, "আচ্ছা, কাকীমার সংগে আমিও যাব।"

বৃহস্পতিবার।

কাকীমা ভোর সাতটার সময়ই কনভেণ্টে এসে উপস্থিত। ক'দিন থেকে কেবল কমলবাবুর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। একটু যেন বাড়াবাড়ি ঠেকছিল। এবার আমার সুখ্যাতির ঝংকারে সিস্টারের কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল। আমার বড্ড লজ্জা করতে লাগল।

আজ সকালে এসেই তিনি সিস্টারকে বললেন, "অনীতা মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করলে কমল কিছুতেই বেঁচে উঠত না।" আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কাকীমা, আমি আর কি করলাম? সবই তো ভগবানের অনুগ্রহ।"

"তা ঠিক। ছুঁয়ে দিলে কুষ্ঠ রোগ সেরে যায় তা কি আর আমি জানি না? কমল বলে, অনীতাকে স্বয়ং ভগবান পাঠিয়েছিলেন। নইলে—" আবার আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ক'টার সময় তোমরা রওনা হবে কাকীমা?"

"রওনা? ও, হাঁ। কমল বসে আছে। তুমি এলেই আমরা যেতে পারি।" সিস্টারের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতাকে আমার কাছে

দু'দিন রাখতে চাই। অনুমতি পাওয়া যাবে কি?" সিস্টার কাকীমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেলেন অনুমতি আনবার জন্য।

শুক্রবার।

কাল সমস্তটা দিন খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কমলবাবুকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। ঘরদোর সব নোংরা হয়েছিল। জিনিসপত্র খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু তাও বড্ড এলোমেলো। কাকীমা কমলবাবুর সংগে বাইরের বারান্দায় বসে কথা বলছিলেন। সেই অবসরে আমি ঘর গুছিয়ে ফেললাম। ঘরের মেজেতে অনেক বই স্তূপীকৃত হয়েছিল। বইগুলো মাটি থেকে তুলে সাজিয়ে রাখলাম দেওয়ালের তাকে। হঠাৎ একখানা বই আমার চোখে পড়ল। বইখানা হাতে নিয়ে দেখি সেণ্ট তেরিজার জীবনী!

বইটা আমার খুব ভাল করে পড়া ছিল। তবুও পৃষ্ঠাগুলো উলটে দু'এক লাইন পড়তে লাগলাম। এমন সময় ওঁরা ঘরে ঢুকলেন। কমলবাবু আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খুবই অবাক হয়েছেন, না?"

"তা একটু অবাক হয়েছি বটে। আজকাল শিক্ষিত মানুষরা আণবিক বোমা তৈরি করছেন। এসব বই পড়বার সময় পান না।"

"মিথ্যা বলেন নি। সমস্যাবহুল জীবনে মানুষ কোনরকমে বেঁচে থাকতে চাইছে।"

"যাঁরা আণবিক বোমা তৈরি করছেন তাঁদের বোধহয় কোনরকমে বেঁচে থাকবার সমস্যা নেই।"

"খুবই সত্যি কথা। তবুও মানুষ প্রতিদিনই বেশি করে জানতে চাইছে। সবকিছু না জানলে সবকিছু আয়ত্তে আসবে কেন?"

"বিজ্ঞানের সাহায্যে সব কিছু আয়ত্তে আসবে কি?"

কমলবাবু একটু থেমে বললেন, "আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হ'লে বলব আসবে না। আসা অসম্ভব। কিন্তু জগতের বেশির ভাগ লোকই আজ আমার সংগে একমত নয়।"

বইখানা তাকের ওপর সাজিয়ে রাখলাম। তারপর বললাম, "জগতের বেশির ভাগ লোকই হয়তো মনে করছেন যে, বিজ্ঞান আর রাজনীতি 'সব-পেয়েছির দেশে' আমাদের পৌছে দেবে। সবটুকু কি পাওয়া যায়? কিংবা পাওয়ার সবটুকুই কি বিজ্ঞান আর রাজনীতি? তুমি কি বলো কাকীমা?" পেছন ফিরে দেখি কাকীমা নেই। কমলবাবু দরজা পর্যন্ত এলেন আমার সংগে। পাহাড়ের গা দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে; একেবারে শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে চাইতেই দেখি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন কমলবাবু।

শনিবার।

দুপুরবেলা কাকীমা কমলবাবুকে গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। ক্যাপ্টেন মালহোত্রা নামে একজন সামরিক কর্মচারীও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কাকীমাদের বন্ধু। বোম্বে থেকে তিনি এসেছেন এক মাসের ছুটিতে। খাওয়ার টেবিলে বসে ওঁরা সব ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথা নিয়ে আলোচনা করলেন। ক্যাপ্টেন মালহোত্রা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে ঘোষণা করলেন। নেহেরুর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। নেহেরুর পরিচালনায় ভারতরাষ্ট্র সব রকম বিপদ যে কাটিয়ে উঠবে সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। বিকেল বেলা পাশের ঘরে একলা পেয়ে কাকীমা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কমলকে তোমার কেমন লাগে অনীতা?" আমি বললাম, "ভালই লাগে। কিন্তু এ-প্রশ্ন কেন করলে কাকীমা?" তিনি জবাব দিলেন না, রহস্যপূর্ণ ভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর তিনিই আবার বললেন, "সব খবর নিয়েছি। এম্. এ. পাশ করেছে। ছোটখাটো ব্যবসা করে। তিন কুলে কেউ নেই। এমন লোক তো শূন্য আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে না অনির্দিষ্ট কালের জন্য। ওর মনের সন্ধান পেয়েছি। বাসা বাঁধতে চায়। তুমি কি বলো অনীতা?"

"আমার বলার উপরে ওর বাসা-বাঁধা নির্ভর করছে না কি?" রহস্য-

মাথা ঠোঁটে তিনি বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুললেন। তবুও একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ আমার করা উচিত ছিল। কাকীমা সুযোগ দিলেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কমলবাবু একা একা বসেছিলেন বসবার ঘরে। ক্যাপ্টেন মালহোত্রা ইতোমধ্যে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আমি তা জানতাম না। ঘরে ঢুকতে আমার একটু দ্বিধা এলো আজ। আমার নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগল। ঐ মানুষটিকেই তো আমি দিবারাত্র নিজের হাতে শুশ্রূষা করেছি! কই, এক মুহূর্তের জন্যও তখন দ্বিধা কিংবা সংশয় আসেনি। কেন এমন হ'ল? আমিও কি তবে বাসা বাঁধতে চাই? কিন্তু আমার আকাশ তো শূন্য নয়! কনভেন্টের পূর্ণতায় আমি আশ্রয় পেয়েছি, সেই তো আমার পরম সৌভাগ্য।

সোমবার।

কারসিয়ংএ আমি কালই ফিরে এসেছি। কাকীমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রবার্টসন রোডের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এখানেই আসছিলাম। মাঝপথে হঠাৎ কি মনে করে কমলবাবুর বাড়ির কাছে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললাম। ভাবলাম, কমলবাবুকে একবার দেখে যাই। এই সময় আমি তাঁকে দেখতে আসব তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। তিনি আশাতীত ভাবে খুসি হয়েছেন বলে আমায় জানালেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতায় কবে ফিরবেন?"

বললাম, "কিছু ঠিক নেই। নাও ফিরতে পারি।"

"চাকরি নিয়েছেন বুঝি?"

"মাঝে মাঝে পড়াই বটে, তবে চাকরি নয়।"

কমলবাবু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার হয়তো শীঘ্রই ফিরতে হবে। আপনাদের গুণমুগ্ধ হয়ে রইলাম চিরদিনের জন্য। বিশেষ করে সিস্টারের কল্যাণহস্ত আমি দূর থেকেও অনুভব করব। এক এক বার মনে হয় আপনাদের ত্যাগ করে আমি সম্ভবত স্বর্গেও যেতে চাইব না। অথচ কলকাতার ক্লেদাক্ত নরকে আমায় পচে মরতে হবে সমস্তটা জীবন। আপনাদের ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ পাওয়ার মত আমি কিছুই করিনি।"

ঘরের সামনে একটা চৌকো মত ছোট্ট উঠোন ছিল। আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল নীচের রাস্তায়। তাই আমি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। ওপর-সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কমলবাবু বললেন, "মানুষ পঞ্চাশ, ষাট, এক-শ' বছরও বাঁচে। হয়তো এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাদের স্মরণ করবার কিছুই থাকে না। সময় কাটাতে হয় বলেই তারা কেবল বেঁচে থাকে। কিন্তু আমার তেমন খেদ রইল না। আপনারা আমার জীবনে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে রইলেন।"

এই বলে তিনি আমার সংগে সংগে একেবারে ট্যাক্সি পর্যন্ত এলেন। বললেন, "সন্ধ্যে হয়ে আসছে, চলুন আপনাকে কারসিয়ংএ পৌছে দিয়ে আসি। এই গাড়িটাতেই আমি আবার ফিরে আসব।" আমি আপত্তি করলাম, তিনি শুনলেন না। পাশাপাশি বসে আমরা পাহাড়ের পথ অতিক্রম করলাম। অসুস্থ কমলবাবু আর সুস্থ পুরুষ এক মানুষ নয়।

আজ সকালেই সিস্টারের কাছে বললাম, "সংসার-আকাশে আমি তো বাসা বাঁধতে চাইনি। আমার কি ভুল হচ্ছে সিস্টার?"

"ভগবান তো সংসারেও নিত্য বিরাজমান। অনীতা, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করব।"

আজও সন্ধ্যার সময় কাকীমা এলেন কনভেণ্টে আমায় দারজিলিং নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো পুরুষ মানুষের এত কাছে আগে কখনও আমি যাই নি, পাপ হ'ল না তো কাকীমা?"

"মনের মানুষ যদি হয় তবে পাপ হবে কেন অনীতা?"

আমার বিশ্বাস, কাকীমা আমায় অত্যন্ত সেকেলে বলে মনে করেন।

তিনি আমায় বললেন, "আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা তো নিজেরাই দেখেশুনে বিয়ে করে। অতএব, এত ভাববার কি আছে?"

"ভাববার আছে বৈকি কাকীমা। আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরাই তো

মানুষটাকে দেখতে গিয়ে বিয়ের আদর্শকে হালকা করে ফেলছে। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে ধর্ম লোপ পেয়েছে বলেই বিচ্ছেদের অনাচার বড় করে বিজ্ঞাপিত হয়। কাকীমা, তোমরা আমাকে ভাববার সময় দাও।"

"বিয়ের সংগে ধর্মের কি সম্বন্ধ অনীতা?"

আমার হাসি পেল। বললাম, "আমি জানি, এর পর তুমি বলবে বিয়ের সংগে কেবল বিজ্ঞানের সম্পর্ক। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে এতটা খেলো হয়ে যাবে তা বোধহয় ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিকরা কল্পনাও করতে পারেন নি। কাকীমা, তুমি এ-যুগের উপযুক্ত প্রশ্নই করেছ।"

কাকীমা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সহসা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার প্রশ্নটা যুগোত্তীর্ণ হ'ল না কেন?" বললাম, "তোমরা সবাই যদি বলো অর্থনীতির সংগে ধর্মের সম্পর্ক নেই, রাজনীতির মধ্যে ধর্ম নেই, সমাজতত্ত্বও ধর্মের বহির্ভূত, ইতিহাস তো কতোগুলো রাজারাজড়ার ব্যাপার, তা হ'লে ধর্ম বেচারীকে তো বনবাদাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়! ধর্মবিচ্যুত সংসারে মানুষের মনে নীতিবোধ আসবে কেন? কাকীমা, ধর্মের সত্য দিয়ে এবার আমরা নতুন বিজ্ঞান কিংবা নতুন রাজনীতি সৃষ্টি করব। নইলে এই শতাব্দীর ভুল কিছুতেই সংশোধন হবে না, কিছুতেই না। ভগবান-কেন্দ্রিক জগতে মানুষ তার হারানো ঐশ্বর্য ফিরে পাবে। আশা করি তুমি আমায় ভুল বুঝবে না কাকীমা।"

বৃহস্পতিবার।

এইমাত্র দারজিলিং থেকে ফিরে এলাম। গত তিন দিনে আমার সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে! কমল জানতে চেয়েছে আমি ওকে বিয়ে করতে সম্মত আছি কি না। কাকীমার সামনে সে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমি চট করে জবাব দিতে পারি নি। সিস্টার আমায় বললেন, "পথের নির্দেশ যদি ঠিক থাকে তবে সংসার-আশ্রমে ভয় কি অনীতা?"

বললাম, "যদি ভুল হয়ে যায়? কমলের কতটুকুই বা আমি জানি?"

কনভেণ্টে আজ সবাই ব্যস্ত। কালকে গুড ফ্রাইডে। অফিস-আদালত সব কাল বন্ধ থাকবে। কাকীমা আমায় দুপুর বেলা তাঁর ওখানে যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছেন। চা-বাগান থেকে দু'চারজন সাহেব-বন্ধুদেরও তিনি ডেকেছেন। কমল তো নিশ্চয়ই আসবে। ওঁরা আমার মতামত কাল জানতে চাইবেন। সেই ভাবনায় সমস্ত রাত আমার ঘুম এলো না।

জানলা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছিল। আমি সেইদিকে চেয়ে চেয়েই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগলাম। কাল আমায় উত্তর একটা দিতেই হবে। আকাশের বুক চিরে উত্তরটা যদি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত? বার বার করে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, যদি ভুল হয়ে যায়? কমল হয়তো আমায় পাহাড়ের চূড়ায় তুলে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী করতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তাতেই বা আমার ভয় কেন? যাতনার প্রতীক তো আমার সামনেই রয়েছে। পথ যদি সত্য হয় তবে যাতনায় তো কোন অগৌরব নেই। কমল-কাঁটা আমি মাথায় রাখব।

সামনের পাইন গাছটার পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। বিদ্যুতের আলোয় সহসা মনে হ'ল বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রক্তের মত লাল! জেগে রইলাম। সমস্ত রাত জেগে রইলাম। আজকের এই বিশেষ রজনীর উপলব্ধির মধ্যে উত্তর আমি পেয়েছি।

শুক্রবার।

কাকীমার বাড়িতে রওনা হওয়ার আগে আমি মনে মনে বললাম, "হে ভগবান, আমি কোনদিনই অসত্যের রাজপুরীর অধিশ্বরী হতে চাই নি। পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার দৃষ্টিতে যেন তোমার ভালবাসার আলোকসম্পাত হয়। আমায় তুমি রক্ষা ক'র প্রভু।'

কমল আমার সম্মতি পেয়েছে।]

কলকাতায় ফিরে এসে খবর পেলাম মামার সবগুলো ব্যাঙ্কের টাকাতেই এটাচমেণ্ট পড়েছে। আজ তারিখে মামার নগদ টাকা রইল মাত্র তিন লাখ; তাও গভর্ণমেণ্টের হাতে রইল। হিসেব মিটে গেলে পরে তিনি ফেরৎ পাবেন; অতএব রোটারি মেসিনের অর্ডার দিতে তাঁর দেরি হবে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ রে, অনীতা কেমন আছে?"

আমি বললাম, "বোধহয় ভালই আছে।"

"বোধহয় কেন? দেখা করিসনি?"

বললাম, "দু'একদিন দেখা হয়েছে। অনীতার পাত্তা পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।" ইচ্ছে করেই কথাটার মধ্যে একটু রহস্যের আভাস দিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতা কি কনভেণ্টে থাকে না?"

"খানিকটা সময় থাকে। আর বাকি সময়টা থাকে কমলবাবুর সংগে।"

মা আমায় যেন তেড়ে এলেন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কমলবাবু কে?"

"কমলবাবু একজন যুবক। অনীতা তাকে ভালবাসে।"

ঠাস্ করে আমার গালে এক চড় মেরে মা বললেন, "মিথ্যুক!" মুহূর্তের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। অত্যন্ত ধীর স্থির সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "হাতে তোমার ব্যথা লাগল না কি?"

"না দীপু। আমার যেন হঠাৎ মনে হ'ল তুই সেই ছোট্ট দশ বছরের ছেলে। তোকে আমি শাসন করলাম। অনীতা দোষ করতে পারে না।"

"তা হ'লে তুমি কাঁদছ কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে অনীতাকে কেউ ঠকাচ্ছে। তুই নিজেও জানিস ঠকাচ্ছে, অথচ তুই বাধা দিচ্ছিস না। কাল জগদ্ধাত্রীর গলা থেকে হীরের মালাটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল! আমি তখনই জানতাম কোথায় যেন একটা কিছু গণ্ডগোল বেধেছে।"

"এতটাই যখন জানতে তখন আমার উপর এমন হিংসাত্মক আক্রমণ না

করলেও চলত। বিশেষ করে তোমার জগদ্ধাত্রী তো মা-কালীর মতো রক্ত-পিপাসু নন।"

"দীপক, চৌধুরী পরিবারের কেউ তো এমনভাবে কথাবার্তা কয় না? তোর মধ্যে আমি মহা অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি।"

"তা হ'লে আমি গোয়াবাগানে চললাম।" আমি পা বাড়াবার আগেই মা দ্রুতপদে তিনতলার ছাদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। অমঙ্গল ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তিনি হয়তো আজ সমস্তটা দিন জগদ্ধাত্রীর সংগে সলাপরামর্শ করবেন।

পরের দিনই মামা দারজিলিং থেকে ফিরে এলেন। দমদম থেকেই টেলিফোন করে জেনে নিয়েছেন যে আমি বাড়িতেই আছি। হঠাৎ তিনি চলে এলেন কেন তাই নিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। হয়তো তিনি টাকার জন্যই ছুটে আসছেন। হয়তো খবর পেয়েছেন যে, ইনকামট্যাক্সের জন্য তাঁর সব টাকাই ধরা পড়েছে। কিংবা তিনি এসে হয়তো বলবেন যে, কমলের নামে টাকা রাখবার দরকার নেই। ঘণ্টাখানেক পর সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে মামা আসছেন বুঝতে পারলাম। প্রতি পদক্ষেপ তাঁর ক্রমশই দ্রুত হচ্ছে। এত উৎকণ্ঠা কেন? আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। ঘরের বাইরে যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। মামা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের লম্বা বারান্দা দিয়ে দৌড়চ্ছেন বুঝতে পারলাম। পা পিছলে পড়ে গেলে কেলেংকারী হবে। হয়তো বা মুহূর্তের জন্য আমি তাঁর মৃত্যু কামনাই করলাম।

মামা এবার আমার ঘরের কাছে এসে পড়েছেন। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কমল, কমল কই?" বিছানায় শুয়েই বললাম, "কমল এখানে থাকবে কেন?"

"তবে কোথায় আছে?"

"হয় ক্লাইভ ষ্ট্রিট, নয় ওয়াল্ ষ্ট্রিট।"

হাঁফাতে হাঁফাতে মামা বললেন, "সর্বনাশ! শেয়ারের বাজার খুব খারাপ!"

আমি নিজে প্রায় লাখ পাঁচেক নষ্ট করেছি সেখানে! দীপু, টাকাটা কমলের নামে ট্রান্সফার করিসনি তো?"

"করেছি।"

"এ্যাঁ! বলিস কি? এসেছিস তো মাত্র কালকে?"

"তুমিই তো বললে তাড়াতাড়ি করবার জন্য। তোমার আদেশ আমি পালন করেছি মামু। কিন্তু তোমার ভয়টা কিসের?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, "পরের হাতে ভাত খাওয়া খুবই বিপজ্জনক।"

"কমলকে দিয়ে তোমার কোন ভয় নেই মামু। মাকে বলে কয়ে অনীতার সংগে কমলের বিয়েটা শেষ করে ফেললেই ল্যাঠা সব চুকে গেল। অনীতার স্বামী তোমার টাকা কিছুতেই মারবে না।"

"অনেক বড় বড় স্বামী দেখেছি দীপু! কিন্তু কাজটা বোধহয় ভাল হ'ল না। অবিশ্যি তোর কোন দোষ নেই। আমি নিজেই তো তোকে বলেছি।" তারপর দু'চারবার পায়চারি করে বললেন, "অনীতার সংগে বিয়েটা হয়ে গেলে কমল চট্ করে ঠিকানা বদলে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। দীপু, আমাদের তবে প্রথম কাজ অনীতার সংগে কমলের বিয়ে দেওয়া। কেমন?" আমি বুঝলাম মামা এখন পর্যন্ত তাঁর নিজের ব্যাঙ্কের খবর পাননি।

এই সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন। কমলের নামটা মামার মুখে শুনলেন তিনি। মামার মুখে শুনলেন বলেই তিনি রাগ করলেন না। মা মামার পায়ের ধূলো নিলেন। মামা হাত দিয়ে মাকে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, থাক। পায়ের ধূলোটুলো পরে হবে বোন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মামা, কমলকে তবে ডেকে নিয়ে আসব?" আলোচনাটা ধরিয়ে দিলাম। মামা বললেন, "না থাক। অতি চমৎকার ছেলে এই কমল। আপত্তি করিস না বোন। বিয়েটা দিয়ে ফেল্ তাড়াতাড়ি করে।"

"কত তাড়াতাড়ি মামু?"

"এই বোশেখে হ'লেই ভাল।"

মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। মনের মধ্যে আমার ভয় এসেছিল। আমি যেন তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই মামার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তাকে দেখেছ দাদা?"

"দেখিনি মানে? স্বচক্ষেই দেখলাম।"

"কি রকম দেখতে? হরিপ্রসাদের মত নয় তো?"

"কি যে সব যা তা বলিস! কোথায় হরিপ্রসাদ আর কোথায় কমল!"

মা বোধহয় এবার টের পেয়েছেন যে, মামা ঠিক মত জবাব দিতে পারছেন না। তাই মা জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা, ছেলেটি ফর্সা না কালো?" মামা করুণভাবে আমার দিকে চাইলেন। তারপর মামা ফস্ করে বলে বসলেন, "উত্তম শ্যামবর্ণ। বর্ণ দিয়ে কি হবে বোন?" আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম, "ভাওয়াল রাজাদের সংগে সম্পর্ক।" মামা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। উৎসাহিত হয়ে বললেন, "পেডিগ্রি খুব ভাল। শিকারি কুকুরের মুখ দেখলেই চেনা যায়। তুই আর অমত করিসনি।" আমি বললাম, "আমাদের অমতে কি যায় আসে?" মামা স্বর চড়িয়ে বললেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। অনীতা নিজে দেখে বাজিয়ে নিয়েছে। নইলে অনীতা নিশ্চয়ই কারসিয়ং থেকে ছুটে আসত না।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "অনীতার সংগে তোমার দেখা হয়েছে বুঝি?"

"তুই চলে আসবার পর সে এসে হাজির। বড্ড ভাল মেয়ে। এমন মেয়ের মা হয়েও সুখ আছে।"

মা এবার মামার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কমল সম্বন্ধে অনীতা কি বলল দাদা?"

অন্যমনস্কভাবে তিনি বললেন, "অনীতা যা বলল তাতে মনে হয় ছেলেটা ভাল। পয়সার লোভে পড়ে মারাত্মক কোন রকমের কাজ সে করবে না।"

আমি বললাম, "পয়সার লোভ যখন নেই তার তবে তুমিই বা এতো ভ
পাচ্ছিলে কেন ?"

"কেন ভয় পাব না বল্ ? অনীতা ফসকালে কমলের ভাবনা কি ? বি
লাখ থাকলে কমল বাংলা দেশের সব ক'টি মেয়েকে কিনে ফেলতে পারে।"

"দাদা, এসব কথা কি বলছ ?"

"বলব না ! বাজারের অবস্থা একবার দেখ না গিয়ে ? সবাই কেবল বেচতে
চায়। অথচ কিনবার লোক নেই।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কমলের হাতে বিশ লাখ এলো কি করে ?" এবার
মামার চৈতন্য ফিরে এলো। মাত্র দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে মামা অনেক রকমের
গোলমাল বাধিয়ে ফেললেন। আমি আগেই বুঝেছিলাম তিনি আজ প্রকৃতিস্থ
নেই। বিশ লাখ হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে তিনি যেন কম্যুনিষ্টদের কথাও
ভুলতে বসেছেন। এর পর বাড়ি গিয়ে যখন খবর পাবেন ব্যাঙ্কেও তার টাকা
নেই তখন তিনি কি করবেন ? জীবন ও জগতের পাপ তাপ থেকে মুক্তি
পাওয়ার তিনি সুযোগ পাবেন। উপস্থিত তিনি যেন মাকে ধমকে উঠলেন,
"বিশ লাখ ? তুই বিশ লাখ দেখলি কোথায় ? যত সব বাজে কথা বলিস !
আমরাই এখন বিশ লাখের সন্ধানে আছি বোন। আচ্ছা আমি এখন
চললাম।"

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিশ লাখের কথা আমি বুঝতে
পারছি না।"

"বিশ লাখ টাকা ফেলে আমি আর দীপু একটা ব্যবসা করব ভাবছি।"

"দীপুর হাতে বিশ লাখ তুমি দেবে দাদা ?"

"কেন মা ? গোয়াবাগানের সম্পত্তির দাম জানো ? বিশ লাখের এক
পয়সাও কম নয়।"

"এর মধ্যেই দালাল লাগিয়ে যাচাই করেছিস না কি ?"

এ-প্রশ্নের জবাব আমি দিলাম না। মামা কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে

হেঁটে বারান্দা দিয়ে চলে গেলেন। পদক্ষেপে কোন ত্বরা ছিল না। এসেছিলেন খুব দ্রুত, ফিরে গেলেন খুব ধীরে।

কুইনস্ পার্কের বাড়ি থেকে এক পাও বাইরে যাই নি। বসে বসে মুহূর্ত গুণছি। কোন্ সময় নেবুবাগান থেকে টেলিফোন আসবে। টেলিফোনের খবরটা আমি মনে মনে একরকম ঠিকই করে রেখেছি। ঘণ্টাখানেক পরে আমার সময় আর কাটিতে চায় না। হার্টফেল করে মামা এখনও মারা যান নি। আমি যেন কোমরে গামছা বেঁধে খালি পায়েই বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিলাম। অত বড় একটা লাস বহন করবার জন্য আমার মত বলিষ্ঠ লোকের দরকার হবে।

টেলিফোন এলো সন্ধ্যের দিকে। মামাই টেলিফোন করলেন। হাঁ, মামার গলাই তো ঠিক। খুবই আশ্চর্য বোধ করতে লাগলাম। গলায় তাঁর উত্তেজনার রেশটুকু পর্যন্ত নেই! মামার তবে কি হ'ল? মামা বললেন: হ্যালো, কে? দীপু?

: হাঁ মামু। তোমার গলায় এতো উত্তেজনা কেন? তোমার হার্ট ভাল আছে তো? হ্যালো...

: আজ আমার একটুও উত্তেজনা নেই। আজ আমি খুব শান্ত দীপু।

: হাঁ, তাই হবে। টেলিফোনে কি রকম একটা শব্দ হচ্ছিল। ভাবলাম তুমি হাঁফাচ্ছ।

: দীপু, আজ রাত্রিতে তোর নেমন্তন্ন। সাতটা নাগাদ আসিস।

: হ্যালো মামা, আবার যেন একটু হাঁফাচ্ছ?

: না, হাঁফাচ্ছি না। কি আর এমন গেছে? পঞ্চাশ কি ষাট? আরও বিশ যদি যায় যাক না। তুই জানিস না আমি এবার কতখানি দেব।

: আচ্ছা মামা, তুমি এত ক্ষেপে উঠেছ কেন?

: আজ রাত্রে তোকে সেই কথাই বলব দীপু। হরিপ্রসাদের মধ্যে আমি যে মানুষ দেখেছি তাতে আমার মজ্জার ভেতরে সুড়সুড়ি দিয়ে উঠেছিল। দুঃখী লোকের দুঃখ ঘুচুক আমরাও চাই। পুঁজিবাদীরা সব ধ্বংস হোক আমিও তা আজকাল কামনা করি। কিন্তু এ হরিপ্রসাদ কে?

: হ্যালো, কে মামু ?

: তোকে আজ বলব সেই কথা।

: আসব, নিশ্চয়ই আসব।

: ছেড়ে দিলাম।

ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় নেমন্তন্ন রাখতে চললাম। মামা তাঁর ঘরেই ছিলেন। মামীমা রান্নাঘরে বনমালীর সংগে কাজ করছিলেন। মামা ঘরে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। মুখে তাঁর কেবল সিগারেট ছিল না, প্রশান্তিও ছিল। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি পড়ছ মামা ?"

"রুসিয়ার রাজ্য বিস্তারের কাহিনী। সাবেক দিনের সিজার কিংবা আলেকজাণ্ডারের কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সব কি করে সম্ভব হচ্ছে মামু ?"

"কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দিয়ে। এ এক অদ্ভুত পার্টি। জগতের বুকে এর প্রথম আবির্ভাব। এরা কেবল পঞ্চমবাহিনী নয়, এরা সব যন্ত্রবাহিনী। মস্কো থেকে কল্ টিপলে ওরা চলে। তুই বিশ্বাস করবি না দীপু, কম্যুনিষ্টরা ঠিক আমাদের মত মানুষ নয়।"

"হরিপ্রসাদকে কি তুমি মানুষ বলো না ?"

"না।"

"তবে সে জানোয়ার ?"

"তাও নয় দীপু। দু'একটা জানোয়ার তো আমি পুষে দেখেছি। তাদের স্বভাব আমার জানা আছে।"

"তবে এরা কি মামা ?" মামা জবাব দিলেন না।

ঘরের এক কোণায় একটা গডরেজ কোম্পানির সিন্দুক ছিল। তিনি সেই সিন্দুক খুলে ছ'টা পাশ বই বার করে বললেন, "সবগুলো ব্যাঙ্কের খবর পেল কি করে তাই ভাবছি।"

আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম। বললাম, "আমিও তাই ভাবছি।" আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "সবগুলো ব্যাঙ্কে একই দিনে ওদের পরোয়ানা গিয়ে হাজির। তুই কিছু বুঝতে পারিস দীপু ?"

"এখন পারছি না, তবে পরে নিশ্চয়ই পারব। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম মামু, সব টাকাটা আমার কাছে থাক। তখন তুমি শুনলে না।"

"শুনিনি তার কারণ, ট্যাক্স আমি শেষ পর্যন্ত সবই দিতাম। কিন্তু আমি ভাবছি একই দিনে সবগুলো ব্যাঙ্কের খবর ওরা পেল কি করে ?"

"আমায় তুমি সন্দেহ করছ নাকি ?"

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তোকে সন্দেহ করলে পায়ের তলায় আর মাটি রইল কই ?"

"মাটি না থাক, অবিশ্বাস তো তবু রইল মামু ?"

"না দীপু, সবগুলো ব্যাঙ্কের নাম জানা তোর পক্ষেও সম্ভব নয়।"

বনমালী এসে খবর দিয়ে গেল খাবার তৈরি হয়েছে। মামীমা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তখন রাত প্রায় ন'টা বাজে। বনমালীকে মামু বললেন, "আমাদের খাবার এখনও দেরি আছে। রাত দশটার আগে তো নয়ই।" তারপর আমাকে বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে দে।"

"কেন মামা ?"

"হরিপ্রসাদ সম্বন্ধে কথা হবে। তোর মামীমা শুনলে হয়তো আঘাত পাবেন।"

"ভাই যদি অসৎ হয় তাতে বোনের তো আঘাত লাগা উচিত নয় ? অপরাধ করলে অপরাধীকে তুমি শাস্তি দেবে না ?"

মামা নিজেই উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। আলমারি থেকে সিগারেটের পুরো টিনটা বার করে রাখলেন টেবিলের ওপরে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সিগারেট ধরেছিস্ ?"

"ধরেছি। তবে খুব বেশি নয়। দু'চার ঘণ্টা না খেয়েও থাকতে পারি। তুমি তোমার কাহিনী আরম্ভ করো মামা।"

মামা বলতে লাগলেন, "কয়েক বছর আগে আমার কারখানায় যখন ধর্মঘট চলছিল তখন আমি খবর পেলাম যে, ধর্মঘটের আসল সর্দার হরিপ্রসাদ। মজুরদের মধ্যে অনেকেই কাজে আসতে চাইছে কিন্তু হরিপ্রসাদ তাদের বাধা দিচ্ছে। একটা কোন বড় রকমের সংঘর্ষ না বাধলে, পাঁচ দশ সের রক্তক্ষয় না হ'লে হরিপ্রসাদের বুকের জ্বালা মিটছে না। সে আমায় এমন করে উত্তেজিত করতে আরম্ভ করলে যে, আমি শেষ পর্যন্ত পুলিস ডাকতে বাধ্য হলাম। গফুর নামে একজন মজুর পুলিসের গুলি খেয়ে মারা গেল। সেই রাত্রেই আমি হরিপ্রসাদকে ডাকিয়ে নিয়ে এলাম। সে এলো প্রায় রাত আটটার সময়। তুই যে-চেয়ারে বসেছিস, হরিপ্রসাদ এসে বসল ঠিক ঐ জায়গায়। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। কোঁচাটার প্রান্তদেশ মাটিতে লুটচ্ছে। পাঞ্জাবির আস্তিনের তলায় ধূলোকালি লেগেছে। পাঞ্জাবির বোতাম একটাও নেই। আর গেঞ্জি ছিল না বলে বুকের অনেকটা জায়গাই দেখা যাচ্ছিল। সমস্ত বুকখানাই লোমে আবৃত। দশটা আঙুলের দিকেই আমার নজর পড়ল। চেয়ারে বসে সে দশ আঙুল দিয়ে লোমাবৃত বুকে আঁচড় কাটতে লাগল। আঙুলের নখগুলো প্রায় চার সুতোর মত লম্বা। এবার আমি ওর মাথার দিকে চাইলাম। চুলগুলো বড় বড়। আগার দিকটা একটু মসৃণ বলে মনে হ'ল। কিন্তু প্রতিটি চুলের গোড়া যেন চিরণীর দাঁতের মত ফাঁক ফাঁক ও শক্ত। কম্যুনিষ্ট হরিপ্রসাদকে আমি সেদিন ভাল করে দেখলাম। দেখার পর আমার মনে হ'ল হরিপ্রসাদ অসাধারণ শক্তি রাখে দেহে। আমি অনুভব করলাম মনের ও দেহের শক্তি ছাড়াও হরিপ্রসাদ একটা তৃতীয় শক্তির অধিকারী। সেই তৃতীয় শক্তিটার ছোঁয়াচ যেন আমাকে স্পর্শ করল। আমি ভয় পেলাম। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঐশ্বরিক শক্তি কি না। ঐশ্বরিক শক্তি যদি হ'ত আমি ভয় পেতাম না। তবে কি ভূতপ্রেতের ধ্যানধারণা করে হরিপ্রসাদ?

"আমার শ্যালক স্বল্পভাষী এ-কথা সবাই জানত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'গফুরকে মারলি কেন?'

'আমি মারিনি, পুলিস মেরেছে।'

'তোরাই তো ইচ্ছে করে এগিয়ে দিলি, ঠেলে দিলি সামনে।'

'আমরা ঠেলিনি। ও নিজেই চলে গেল।'

'কি লাভ হ'ল তাতে?'

'লাভ লোকসান সব পার্টির।'

'হরিপ্রসাদ, আমি তোর ভগ্নিপতি। এ-কথা ঠিক তো?'

'পার্টি থেকে ঠিক করা আছে রাষ্ট্র হাতে এলে এ-রকমের ভগ্নিপতিরা আগে মরবে।'

'আমি মরতে ভয় পাই না। কিন্তু আজ আমি তোর সংগে বোঝাপড়া করতে চাই।'

'এতো তাড়াতাড়ি কেন?'

'তাড়াতাড়ি না করলে তোরা গফুরের বৌকেও মেরে ফেলবি। আজ পাঁচদিন থেকে ওর বৌটা না খেয়ে আছে।'

'ধর্মঘটিদের মাইনে দাও না তাই।'

'কিন্তু গফুর মরবার পর আমার দরোয়ান গফুরের বাড়িতে গিয়েছিল এক বোতল দুধ আর কিছু খাবার নিয়ে। ঠিক কি না?'

'গিয়েছিল।'

'বাচ্ছাকে যখন সেই দুধ খাওয়াতে যাবে তখন তোরা একটা শোভাযাত্রা নিয়ে পার্কে যাচ্ছিলি। ঠিক তো?'

'ভুল নেই।'

'তুই সেই সময় ঘরে ঢুকে লাথি মেরে বোতলটা ফেলে দিয়েছিলি। কেবল তাই নয়। খাবারের ঠোঙাটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলে বৌটাকে বললি, স্বামী মরেছে, সিঙাড়া খাচ্ছিস কেন? প্রতিবাদ করতে যাবি না? পার্কে মিটিং

হবে। যা বেরো। দল ভারী করবার জন্য ওকে তুই উপবাসী রাখলি। বাচ্ছাটা সেই রাত্রেই মারা যায়। ঠিক কিনা?'

'ঠিক নয়। তোমার দরোয়ান খাবার নিয়ে গিয়ে আমার পার্টির কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। পয়সা দিলে যখন তখন দোকানে খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু পার্কে মিটিং করবার জন্য কমরেড গোস্বামীকে যখন তখন পাওয়া যায় না। তাছাড়া মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। দলছাড়া হ'লেই হিড়হিড় করে টেনে দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।'

'কিন্তু বাচ্ছাটা যে মারা গেল?'

'বাচ্ছা দিয়ে আমাদের কি কাজ? কমরেড গোস্বামীর বক্তৃতা সে বুঝত না।'

"আমার স্পষ্ট মনে আছে দীপু, হরিপ্রসাদের গা দিয়ে তখন বোধহয় ভূত-প্রেতের গন্ধ বেরচ্ছিল। সর্বশরীরে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম পিস্তলটা সেখানে আছে কি না। একটু পরে আমার মনে হ'ল পিস্তল দিয়ে তো ভূত প্রেত মারা যায় না। যদি যেতো তা হ'লে সেদিন আমার গুলি খেয়ে হরিপ্রসাদ মরত। একটু ভাবতে সময় নিলাম বলে হরিপ্রসাদ যেন বিরক্ত বোধ করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, 'গফুরের জন্য দুঃখ হচ্ছে, না তার বৌর জন্য?'

'সবার জন্যই। এমন কি তোর জন্যও প্রসাদ।'

ডান দিকের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আঙুল দিয়ে আবার সে আঁচড়াতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ডেকেছিলে কেন? যা বলবে তাড়াতাড়ি বল।' বললাম, 'দু'একটা দিনের মধ্যেই উইল করব ভাবছি। প্রসাদ, আমার প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি। কাকে দিয়ে যাই বল্ তো?'

'আমি নিতে পারি।'

'দেব, যদি তুই পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে পারিস।'

'ঘুষ দিতে চাইছ, না? আমরা ঘুষ খাই না। আর ঘুষ যদি নিতেই হয় তবে কেবল কোটি টাকা নেব কেন?'

'কতো কোটি হ'লে নিবি বল্?'

'বড্ড সময় নষ্ট করছ তুমি।'

'কোটি টাকার উইলে একটু সময় নেবো না?'

'ফুঃ। কোটি টাকা! এমন একটা দিন আসবে যখন গোটা ভারতবর্ষই দিতে চাইবে। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা দান গ্রহণ করে না। আমাকে দিয়ে তো ট্রাই নিলে তুমি।'

'গোটা ভারতবর্ষ পেলেও নিবি না? আরো বেশি আশা করিস না কি?'

'হাঁ, তামাম দুনিয়া। তোমাকে যদি মেরে না ফেলি তা হ'লে তুমি দেখবে, তামাম দুনিয়া। বিশ্ব-বিপ্লবের গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কই, না? গন্ধটা ভূতের গন্ধ কমরেড।'

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'ঠাট্টা? তোর নামে কোটি টাকার উইল করব বলছি। দু'এক লাখে ঠাট্টা থাকতে পারে। কিন্তু কোটি টাকায় ঠাট্টা নেই। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি সবই তোকে দেব। তুই পার্টি থেকে বেরিয়ে আয়। আগাম চাস? দু'এক লাখ সিন্দুকে আছে। এখুনি দিতে পারি।'

'তোমার কুকুরটা কোথায়? ডিউকের শব্দ পাচ্ছি না যে? রাত্রিতে খুলে রাখো বুঝি?'

'ডিউকের কৃতজ্ঞতাবোধ তোর চাইতে অনেক বেশি প্রসাদ।'

'তা হবে। কুকুরগুলো সাধারণত খুব কৃতজ্ঞ হয়। কিন্তু ওরা কোটি টাকার লোভ ছাড়তে পারে না।'

'তা হ'লে তুই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিস?'

'দেওয়ার জন্য তোমার এতো ব্যস্ততা কেন? রাখতে না পারো সিন্দুকে ফেলে রেখো। একদিন রাত্রিতে এসে গোপনে বার করে নিয়ে যাব। অবশ্য

তোমার ডিউক যদি বাধা না দেয়। এখন দাও না দু'লাখ? আমাদের ফাণ্ডে টাকা কম। দেবে দু'লাখ? পরে সাধলেও আমি নেব না। পরে মানে ভারতবর্ষ যেদিন আমরা দখল করে নেব।'

'ততদিন পর্যন্ত আমার হাতে এক পয়সাও থাকবে না প্রসাদ।'

'কেন উড়িয়ে দেবে বুঝি? তবু আমাদের দেবে না?'

'দেওয়ার বোধহয় সময় পাবো না প্রসাদ।'

'আমরা নেওয়ার জন্য বসে থাকব, তোমাকে শুদ্ধ।'

'নিবি জানি। কিন্তু মরা মাথা পাবি। তুই আমার জ্যান্ত মাথা নিতে পারবি না।'

'সে-ব্যবস্থা আমরা করব। উপস্থিত দু'লাখ টাকা সিন্দুক থেকে বার করো। দিয়ে দাও। ইনকামট্যাক্সের পাপ থেকে মুক্তি পাবে। দেবে দু'লাখ?'

'সোজাসুজি দান করার অভ্যেস আমার নেই। আচ্ছা প্রসাদ, তোর কি একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই?'

'কিসের কৃতজ্ঞতা? চাকরি দিয়েছিলে বলে?'

'ধর, তাই যদি হয়?'

'তোমার কারখানায় আমি কাজ করি না। আমার কাজ ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে। তুমি বাধা দিলেও আমি আসতাম। উপস্থিত আমাদের টাকার বড্ড টানাটানি। দেবে দু'লাখ?'

"এই সময় হরিপ্রসাদ বার বার করে আমার সিন্দুকের দিকে চাইতে লাগল। তারপর সিন্দুকের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি এবার চললাম। কিন্তু দু'লাখ নিয়ে যাচ্ছি।'

"বিছানার ও-পাশেই টেলিফোনটা ছিল। হাতটা সেই দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'পুলিসকে এখুনি খবর দেব। সরে আয়।'

'সরে যাচ্ছি। চাবিটা কোথায়?'

'লালবাজারে।'

'তা হ'লে তো ভালই। নিরাপদ জায়গাতেই আছে।'

'কতটা নিরাপদ?'

'লাল বলতে যতটা বোঝায়।'

"আমি এবার বললাম, 'কোটি টাকা যখন ছাড়লি আমিও তবে ব্যবসা ছাড়লাম প্রসাদ। এবার থেকে কেবল তোর সংগে আমার শালা-ভগ্নিপতির সম্পর্ক রইল। শালারব্যাটা বলতে পারলে মনের জ্বালা অনেকটা মিটত।'

'তাও বলতে পারো। আপত্তি করব না। মৃত পিতৃদেবকে শালা বললে আমার গায়ে লাগবে না। দিদি অবিশ্যি আপত্তি করতে পারে। দেবে দু'লাখ? এখুনি?'

"আমি এবার সত্যি সত্যি টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললাম, 'আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে লোক আসতে বেশি সময় নেবে না।'

'আমহার্স্ট স্ট্রিট? ওখানকার অমলেন্দুবাবু আমার বন্ধু। সে আসবেই না তোমার বাড়িতে। চাবিটা দাও। টাকা নেব।'

'হ্যালো...'

'এক্সচেঞ্জের মেয়েগুনোকে আর বিরক্ত করো না। আমি যাচ্ছি।'

'মেয়েগুনোর জন্য তোর অত ভাবনা কেন?'

'ওদের বড্ড খাটুনি। পার্টির কাজ ক'রে তবে তোমাদের ডিউটিতে আসে। তোমরা তো দিনরাত কোটি আর অর্বুদ নিয়ে কথা কও। ঐ দীপক ছোঁড়াটার মাথাও খাচ্ছ। আমরা টেলিফোনের খবরও রাখি, বুঝলে?'

'রাখিস ব'লেই তো এখন মনে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কানে কথাটা তুলে দিতে হবে।'

'আমি সাধারণত হাসি না। তোমার কথা শুনে এবার আমি হাসব।'

'কেন?'

'বুড়ো হ'লেই মানুষ একটু কানে কম শোনে। তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী সত্তর

পেরিয়েছেন। ভারতবর্ষের সব ক'টি মুখ্যের বয়স ষাটের ওপরে। তোমার কথা শুনবে কে? দেবে দু'লাখ?'

'কেন তোদের মস্কো থেকে টাকা আসছে না?'

'এসব তো আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা। আমি বুঝি না। আমি তা হ'লে চললাম।'

'আর কোনদিন না এলেই খুসি হব।' হরিপ্রসাদ বেরিয়ে গেল।

"এমন নির্বিকার ও সহজ ভাবে বেরিয়ে গেল যে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম দরজার দিকে প্রায় মিনিট পাঁচেক। ইচ্ছা করলেই হরিপ্রসাদ আজ আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত। দীপু, এ লোভ থেকে ও মুক্ত হ'ল কি করে? এতগুলো টাকা আমি ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু এতটুকু আগ্রহ কিংবা উত্তেজনা ওর মধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম না। অর্ধশিক্ষিত হরিপ্রসাদ কি করে এটা পারল? তুই কিছু বলতে পারিস দীপু?"

"না, মামু। মাথায় আমার কোন কথাই ঢুকলো না। তুমি বলো আমি শুনি।"

"হরিপ্রসাদের মধ্যে একটা তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।"

"ভূতপ্রেতের শক্তি, না মামু?"

"আমার মনে হয় দীপু, কম্যুনিষ্ট পার্টির শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন একটা নারকীয় বজ্র-আঁটুনি আছে, যাতে মানুষগুলো সব অতি অল্প সময়ের মধ্যে বদলে যায়। ছোটবেলা থেকেই হরিপ্রসাদ আমার শালা। অতএব আমি ওকে খুব ভাল করে চিনব তা তো জানা কথা। কিন্তু এ-হরিপ্রসাদ আমার শালা নয় দীপু।"

"হয়তো শালারব্যাটা হতে পারে মামু।"

"না দীপু। হরিপ্রসাদ যদি কেবল শালারব্যাটা হ'ত তাতেও আমি ব্যবসা ছাড়তাম কিনা সন্দেহ।"

"তবে ছাড়লে কেন মামু?"

"হরিপ্রসাদ আবার সেই রাত্রেই ফিরে এলো। রাত তখন দুটো কি তিনটে।"

"খুব ইনটারেসটিং মনে হচ্ছে মামা!"

"হাঁ। রাত দুটোর সময় হরিপ্রসাদের যে-পরিচয় আমি পেলাম সেইটাই হচ্ছে ওদের আসল পরিচয়। পার্টির জন্য গফুরকে মারবে, ওর বৌকে মারবে, বাচ্ছাকে মারবে। এমনকি হরিপ্রসাদ নিজেকেও মারবে। তবু মানুষ কিছু নয়। ব্যক্তির কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। যা আছে সবই পার্টির এবং পার্টির জন্য। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ্। দেখলেই এদের ভয়াবহতা বুঝতে পারবি।"

"রাত দুটোর সময় হরিপ্রসাদ এলো কেন?"

"হঠাৎ সিন্দুক খোলার শব্দ হতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে?' সেই সহজ ও নির্বিকার ভাবেই জবাব দিল হরিপ্রসাদ, 'আমি'।

'কি করছিস?'

'টাকা নিচ্ছি।'

"বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম চাবির তোড়াটা ও পিস্তলটা নেই। তখন আমি ভয় পেলাম। বিছানায় সুইচ ছিল, বাতি জ্বালাতে সাহস পেলাম না। তারপর অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়ালাম টেলিফোনের দিকে। বুঝলাম তারটা কেটে দিয়েছে। বললাম, 'মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজ তো এটা নয়।' এক-শ' টাকার নোটগুলোতে আওয়াজ হচ্ছিল। হরিপ্রসাদ বলল, 'চেঁচিও না। মাত্র দু'লাখ টাকার জন্য জীবন দেওয়ার মত ভগ্নিপতি তুমি নও।' আমি বললাম, 'আগে আমি কোটিপতি, তারপর বোধহয় ভগ্নিপতি। কিন্তু কোটিপতির টাকাই বা চুরি করছিস কেন?'

'চুরি আমরা করি না।'

'হাঁ। দু'লাখ টাকা যখন, তখন চুরি নয়। ডাকাতি বলা যেতে পারে।'

'ওসব তোমাদের স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীরা করত। আমরা ডাকাতি করতে ঘেন্না করি।'

‘তবে এটা কি করছিস?’

‘টাকা গুণছি। তুমি একটু চুপ করে থাকো, নইলে ভুল হয়ে যাবে। কত আছে যেন বলেছিলে?’

‘এক লক্ষ নব্বই হাজার।’

‘এক লক্ষ আশি হাজার পেয়েছি। আর দশ গেল কোথায়?’

‘দশটা রেখেই যা না হরিপ্রসাদ।’

‘আমরা যখন নি, তখন কিছুই রাখি না।’

‘তা হ’লে পুরোটা নিয়েই সরে পড় দু-পাঁচ-মিনিটের মধ্যে। বাকি রাতটুকু এখন ঘুমুতে পারলে হয়।’

‘তা তুমি ঘুমোও, আমি বাধা দেব না।’

‘ঘুমই কি করে বল্? তোর গা থেকে কিরকম একটা গন্ধ আসছে! দুনিয়ার সব রকম পচা গন্ধ নেবুবাগানের গলিতে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আশেপাশে ফুটপাথে মানুষরা ঘুমতে পারে। কিন্তু তোর গা থেকে যে গন্ধ আসছে তাতে বোধহয় আমি সারা জীবন ঘুমতে পারব না কমরেড।’

‘এই তো পাঁচ পেয়েছি! আরও পাঁচ দরকার। গন্ধটা কোথা থেকে আসছে বললে?’

‘মস্কো থেকে।’

‘তোমায় তা হ’লে মস্কোর লুবিয়াংকা জেলেই আমরা কিছুদিন রেখে দেব। অবিশ্যি তুমি একলা নও। আরও অনেকেই তোমার সংগে থাকবে।’

‘তার মানে? ভারতবর্ষ তোদের হাতে এসে গেছে নাকি? ইচ্ছা করলেই যেন মস্কো পাঠিয়ে দিতে পারিস?’

‘তা পারি।’

‘নেহেরুর অনুমতি লাগবে না?’

‘সব সময় লাগে না।’

‘বাকি পাঁচ পেয়েছিস?’

'পেয়েছি। কিন্তু সব দশটাকার নোট। গুণতে সময় নেবে।'

'কত সময়?'

'আরও কুড়ি মিনিট।'

"আমি লক্ষ্য করলাম টর্চ দিয়ে নিজের ঘড়িটা হরিপ্রসাদ একবার দেখে নিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক'টা বাজে রে?'

'প্রায় ভোর হয়ে এলো।'

'তবে আমাকে দে। তাড়াতাড়ি আমি গুণে দিতে পারব।'

'দরকার হবে না। আমার জিপ আসতে আরও কুড়ি মিনিট বাকি।'

'তোর জিপ আছে না কি?'

'আমরা ফকির। আমাদের কিচ্ছু নেই। সব পার্টির।'

'আচ্ছা হরিপ্রসাদ, ভারতবর্ষের টাঁকশালে প্রবেশ করতে তোদের আর ক'দিন লাগবে রে?'

'টাঁকশালের অর্ধেক লোকই তো আমাদের!'

'তবে দখল করছিস না কেন?'

'ওপর থেকে আদেশ এলেই করব।'

'কবে নাগাদ আদেশ আসবে আমায় একটু বলে যা না।'

'আমার কাজ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে। ওসব খবর আমি জানি না। পুরো এক লাখ নব্বই হাজার পেয়েছি। এবার তুমি বাতিটা জালাও।'

'বললাম, 'এবার তুই সরে পড়। বাতি আমার দরকার নেই।'

'আমার দরকার আছে। এই কাগজটাতে সই করে দাও।' বলে হরিপ্রসাদ নিজেই ঘরের বাতি জ্বালালো। আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম। এমন উদ্বেগহীন মুখ আমি জীবনে দেখিনি। ভক্ত তার সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে যেমন করে দেবতার পূজো করে, হরিপ্রসাদকে দেখে আমার মনে হ'ল সেও ঠিক তেমনি একাগ্র চিত্তে আমার দু'লাখ টাকা চুরি করল। দীপু, হরিপ্রসাদ সত্যিই এক বিস্ময়কর উপসর্গ!"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হরিপ্রসাদের হাতে কিসের কাগজ ছিল মামু?"

"কেবল কাগজই ছিল না, আমার পিস্তলটাও ছিল। আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে সে বলল, 'লিখে দাও, টাকাটা তুমি আমায় স্ব-ইচ্ছায় দিচ্ছ।'

'তোদের কি লাভ হবে?'

'জিপ গাড়িতে বসে অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। পথে যদি তোমাদের কোন পুলিস জিজ্ঞাসা করে, কি বলব? একটা কিছু প্রমাণ চাই। আসলে, তুমি তো স্ব-ইচ্ছায় দিচ্ছ।'

'তাই বলে পিস্তলটা তুই আমার বুকের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবি নাকি? দে লিখে দিচ্ছি।' লিখে দিলাম।

"হরিপ্রসাদ বলল, 'এই ক'টা টাকার জন্য, আশা করি, পরে তুমি কোন রকম গোলমাল করবে না?'

'আমায় কি করতে বলিস?'

'এই ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে যেতে বলি। পুলিস নিয়ে হাঙ্গামা করতে যেয়ো না। গেলে বিপদে পড়বে। অনুরোধ করছি না, সোজাসুজি আদেশ করছি।'

'পুলিসকে তোদের ভয় কেন? সেখানে তোদের লোক নেই?'

'আছে। নাম জানতে চাও না কি?'

'না। নাম জেনে কি করব? মনে রাখতে পারব না।'

'পারবে না। সারা হিন্দুস্থানে পঞ্চাশ লাখের ওপর নাম। অনেক কথা তুমি আজ বুঝতে পারলে বটে কিন্তু প্রমাণ পাবে না। যেমন এই টাকাটা নেওয়ার কোন প্রমাণ পাবে না। আমার সময় হয়ে গেছে। এবার আমি চললাম। তুমি কেবল কোটিপতি নও, আমার ভগ্নিপতিও বটে। পিস্তলের গুলিগুলো খুলে বাইরে ফেলে দিচ্ছি।'

'কেন পিস্তলটাও নিয়ে যা না।'

'দরকার হবে না। অভাব ছিল্ল টাকার। আমি তা পেয়েছি, আর কিছুই নেব না।'

'পায়ের ধুলো নিবি না?'

'উপযুক্ত হ'লে নেব।'

"খালি পিস্তলটা চেয়ারের ওপর ফেলে রেখে দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'কোটিপতি বলেই তোমার গা থেকে এত ঘাম বেরিয়েছে। বিছানা ভিজে গেছে, তুমি লক্ষ্য করোনি। চাদরটা বদলে নাও।'

"হরিপ্রসাদ চলে যাওয়ার পর আমার যেন মনে হ'ল হরিপ্রসাদ ঘরে এসেছিল জল খেতে। এলো, একটানে জলটা খেয়ে ফেলল, খালি গেলাসটা চেয়ারের ওপরে রাখল, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আলগোছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সত্যি সত্যি যেন আমি বিশ্বাস করলাম, হরিপ্রসাদ টাকাটা চুরি করেনি। দীপু, দুনিয়ায় এমন কোন্ আদর্শ আছে যার জন্য চুরি করাটা আইনসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়? যে-লোক কোটি টাকার দান উপেক্ষা করে তার পক্ষে কি দু'লাখ টাকা চুরি করা সম্ভব?"

বললাম, "সম্ভব, ডায়ালেকটিকেলি।"

"বোধহয় সেই জন্যই আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, চুরি সব সময় চুরি নয়। হত্যা সব সময় হত্যা নয়। মিথ্যা কথা সব সময় মিথ্যা কথা নয়। হয়তো সেই কারণেই পিস্তলটার দিকে চেয়ে আমি হেসে উঠেছিলাম। হয়তো অতটা ঘেমে উঠবার কোন কারণই ছিল না। সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে গেল। কিন্তু সেই ভোর রাত্রেই আমি ঠিক করে ফেললাম ব্যবসার মত হাস্যকর ছেলেমানুষি আমি আর করব না। হরিপ্রসাদরা অনেকদিন থেকে হাসছে, আর ওদের আমি হাসতে দেব না। উপেক্ষার বস্তু কুড়োবার জন্য আমার কি দরকার কারখানা চালাবার? দীপু, এখনও যদি আমরা সব ঘুমিয়ে থাকি তা হ'লে ফলাফলটা কি দাঁড়াবে? গোটা ভারতবর্ষটা আমার মত ভোর রাত্রে

ঘামতে থাকবে আর হরিপ্রসাদরা নির্বিকার চিত্তে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। একেবারে অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। তুই কি বলিস দীপু?"

"আমি আর কি বলব। আমি ভাবছি বাড়িতে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তোমার ডিউক কি করছিল? তাকে ডিঙিয়ে হরিপ্রসাদ পালাল কি করে?"

"ডিউক? সে একা কি করবে? শ'দুয়েক মন্ত্রী আর বিরাট পুলিসবাহিনী থাকতে ভারতবর্ষে যখন ওরা একটা গোপন রাষ্ট্র তৈরি করে ফেলতে পারল তখন আমার 'ডিউক' আর কতটুকু বাধা দিতে পারতো? পঞ্চাশ লক্ষ লোক দিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চালানো যায় না?"

বললাম, "হয়তো যায়।"

"তবে আর আমার ডিউকের অপরাধ কি? তবু ডিউক বাধা দিতে ভয় পায় নি। সে তার কর্তব্য করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে।"

"কি রকম?"

"পরের দিন একতলার চান-ঘরে 'ডিউকের' শবদেহ পাওয়া গেল। ডিউকের বুকে পেটে বত্রিশটা ভোজালির আঘাত! হরিপ্রসাদ যে কুকুরটাকে এতো কষ্ট দিয়ে মারবে তা বুঝতে পারিনি দীপু।"

একটু থেমে মামা আবার বললেন, "ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মানুষ কতটা নিষ্ঠুর ও নৃশংস হতে পারে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এদের নিষ্ঠুরতা ব্যক্তিগত নয়। ইমপারসনাল, নিজের জন্য কিছুই করে না। করে পার্টির জন্য। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেই দীপু।"

"মামু, রাত বারটা বেজে গেছে। এবার আমি উঠলাম।"

"খাবি না? তোর মামিমা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

"তাঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই। কারণ, আমি আজ আর খাব না।"

"কেন?"

"খিদে যা ছিল সব মরে গেছে। তুমি কিছু মনে ক'র না। কাল একটু ব্যস্ত থাকব। পরশুদিন দেখা হবে।"

গাড়ি চালিয়ে নেবুবাগানের বাইরে চলে এলাম। দু'লাখ টাকা নেওয়ার জন্য হরিপ্রসাদ ডিউকের বুকে বত্রিশটা আঘাত করেছিল। কুড়ি লাখ নেওয়ার জন্য আমি সারা দুনিয়ার কারো গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটিনি। বিধাতা যদি সত্যিই থেকে থাকেন তাহ'লে সেদিন নিশ্চয়ই তিনি অন্তরালে একটু হেসেছিলেন। নয় কি কমরেড?

পরদিন সকালেই খবর পেলাম মামা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক-শ' তিন ডিগ্রি জর। বাহান্ন লাখের ধাক্কা তিনি হয়তো সামলাতে পারেন নি। তারপর জানা গেল, তাঁর নিমোনিয়া হয়েছে, ডবল নিমোনিয়া। মামার পলিটব্যুরোর কাজ বন্ধ রইল।

গোয়াবাগানে গেলাম ঠাকুরদার সংগে দেখা করতে। দৃষ্টিশক্তি কিছুই আর নেই। তাই চলাফেরা করতে পারেন না। এর মধ্যেই গোয়াবাগানের বাড়িতে পায়রা বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। পুরনো চাকরগুনো কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। হয়তো পুরনো বলেই কাজে আর মন নেই। বড়কাকার ঘরটায় ঢোকা যায় না। বছরখানেক আগে থেকে একটা জানলা খোলা ছিল। বাড়িতে ছ'টা চাকর থাকা সত্ত্বেও সে-জানলা বন্ধ হয় নি। পায়রা আর চড়ুই পাখীর সংখ্যা দেখে মনে হ'ল ঘরখানা ওদের নামে উইল করে দেওয়াই ভাল। শেল্‌ফের বইগুলো সব অক্ষত নেই। ইঁদুর কাটতে আরম্ভ করেছে। হাই-ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবটুকু বিদ্যাই বুঝি ইঁদুরের পেটে গিয়ে আশ্রয় নেবে! তা নিক। দুঃখ করবার কিছুই নেই। যা প্রতিক্রিয়াশীল তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কালের স্রোতে সে-সব ভেসে কোথায় চলে যাবে কেউ তার সন্ধান রাখবে না। বড়কাকা কোথায় ভেসে গেছেন কেউ তা জানে না। গোয়াবাগানের বাড়িটাও ক্রমশ এইভাবে ভেসে চলে যাবে। যাওয়াই ভাল। পুরনো, পচা, পূতিগন্ধময় অতীতের শেষ নির্যাস শূন্য আকাশে মিলিয়ে যাক, আমি আপত্তি করব না।

আমি এলাম ঠাকুরদার ঘরে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ দাদু?"

ঠাকুরদা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "কে? দীপু? দারজিলিং থেকে কবে ফিরলি?"

"পরশু।"

"এক মাস থাকবার কথা ছিল না?"

"ছিল। কিন্তু তোমার শরীর এত ভেঙ্গে পড়ছে! আজ থেকে আমি একেবারে পাকাপাকি ভাবে গোয়াবাগানেই থাকব দাদু।"

"তোর বাড়ি, তুই না থাকলে কে থাকবে বল্? তা ছাড়া আমি তো চললাম। দীপু, বৌমাকে দেখলি? মেয়েরা কি বলে? আর তো আমি ওদের দেখতে পাব না দীপু!"

বললাম, "কাকীমা তোমাকে দেখবার জন্য খুবই ব্যগ্র।"

"তা হ'লে নিয়ে এলি না কেন? বোনদের তো আনতে পারতিস?"

"বোনরা সব উটাকামণ্ডে পড়ছে। দারজিলিংএর আবহাওয়া সহ্য হয়নি ওদের। কাকীমা হয়তো শীতের মুখে আসবেন।"

"আমি ততোদিন হয়তো বাঁচব না।"

"এ-কথা কেন বলছ দাদু? দু'জন ডাক্তার রয়েছেন। তাঁরা তবে কি করছেন?" ঠাকুরদার মুখে বড্ড অসহায় হাসি। তিনি বললেন, "ভেতর থেকে মৃত্যু আসছে। ডাক্তাররা কি করবেন? মৃত্যুরোগের তো কোন ওষুধ নেই দীপু।" একটু থেমে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি আর এম্. এ. পরীক্ষাটা দিবি না?"

"ভাল লাগে না দাদু।"

"তা হ'লে বিলেত চলে যা। হাঁ রে, অনীতাদিদি কেমন আছে? মুকুর কোন খবর জানিস?"

"দিল্লিতে সে ভালই আছে।"

"ভবশংকর যদি মুকুর বিয়েটা দিয়ে যেত আমি নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারতাম।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদু। ঝুকুর বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদু বললেন, "এক মাত্র তোর ওপরই সব নির্ভর করছে। দীপু, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখিস। কোন অমঙ্গল হবে না।"

ঠাকুরদার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম; "দাদু, তুমি চলো কুইনস্ পার্কে। মা তোমায় দেখাশোনা করবেন।"

"না। গোয়াবাগানে না মরলে আমার আত্মার শান্তি হবে না। আমি আমার পিতা-পিতামহের সান্নিধ্য পাচ্ছি, এইটেই তাঁর বড় কৃপা। দীপু, তোদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আমি যেন গোয়াবাগানেই শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি। সব আশা আমার ব্যর্থ হয়েছে। কেবল এই আশাটা যেন আমার সার্থক হয়।"

"হবে দাদু। অন্তত আমার দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"তা হ'লেই যথেষ্ট। আমার ছেলেরা যদি কোনদিন হাসপাতালে আমায় নিয়ে যেতে চায় তুই আমায় যেতে দিস না। এ-বাড়ির মালিক তুই।"

"দাদু, দলিলগুলো সব কোথায়?"

"সবই সিন্দুকে আছে। আর্ট-গ্যালারিতে যে সিন্দুক আছে তাতে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা দিনরাত চেয়ে আছেন ঐ সিন্দুকের দিকে।"

"গোয়াবাগানের বাড়িটা এত বড় যে এর প্রতি ইঞ্চি জমির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আচ্ছা দাদু, ক'বিঘে জমি আছে?"

"আমিও সঠিক করে বলতে পারব না দীপু। কোন পুরুষেই কেউ কোন দিনও মেপে দেখেননি। কারণ মাপবার দরকার হয়নি। আমার মনে হয়, বিঘে কুড়ি হবে। চাবি তো তোর কাছেই আছে। সিন্দুক খুলে একদিন দলিলটা পড়ে দেখিস।"

"কোন পুরুষে কেউ যখন পড়েননি আমিই বা পড়ে কি করব দাদু?"

"সঠিকভাবে আয়তনটা জানা থাকা ভাল।"

"তোমার এখন খাওয়ার সময় হয়েছে। আমিও চান করে নেই।"

"বেলা যায় না কি দীপু?"

"না। মাত্র একটা। বেলা একটা।"

আজ বুধবার। সন্ধ্যা ছ'টার সময় 'বুফে'তে যাওয়ার কথা আছে। বিনয়প্রকাশ সেইখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। বিনয়প্রকাশকে নিয়ে তারপর যাব কমরেড গোস্বামীর সংগে দেখা করতে। কমরেড গোস্বামী সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য। সুতরাং এই বুধবারটা আমার জীবনে স্মরণীয় দিন। সত্যিই স্মরণীয়। কমরেড, তারপর অসংখ্য বুধবার এসেছে, আবার চলেও গেছে। কিন্তু এই বুধবারের অন্ধকারটা ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত জীবনটাকে ঘিরে ফেলল। দিনের আলো থেকে আমি কমরেড গোস্বামীর অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলাম। এই বুধবার থেকেই অন্ধকারের সুরু।

বুফেতে বিনয়প্রকাশ বসে চা খাচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দূর থেকেই আমি ওকে দেখতে পেয়েছিলাম। বিনয়প্রকাশ একটা চাদর গায়ে দিয়ে বুফেতে বসেছিল। চাদর গায়ে না দিলে বাঙালীর আসল চেহারা ধরা পড়ে না। আমি দেশবন্ধুকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর ছবি দেখেছি। চাদর গায়ে দেওয়া ছবি। দেশবন্ধু যদি যৌবন বয়সে চাদর গায়ে দিতেন তাহ'লে দেখতে অনেকটা বিনয়-প্রকাশের মত হ'ত। দূর থেকে আজ তাকে চৈতন্য নিমাই চরিতের অবতার বলে মনে হচ্ছিল। কেবল আমার নয়, সবারই মনে হ'ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিসের বড়কর্তা হীরেনবাবুরও মনে হ'ত। আমি লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিনয়প্রকাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত-ঘড়িতে তখন ঠিক ছ'টা।

বিনয়প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "এক পেয়ালা চা হবে না?"

বললাম, "সময়ের যদি অভাব না হয় তবে আপত্তি নেই।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, "এবার অন্ধকার হয়েছে।"

"হাঁ। চলো। সাড়ে ছ'টা। কমরেড সিং নিশ্চয়ই এসে গেছেন।" বিনয়প্রকাশ পয়সা চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। বিনয়প্রকাশ বলল, "অনীতার চিঠি পেলাম। সে দু'চার দিনের মধ্যেই কলকাতায় আসছে।" আমিও বিনয়প্রকাশকে খবর দিলাম, "নুকু একখানা পোস্টকার্ড লিখেছে আমার কাছে।"

"কি লিখেছে?"

"লিখেছে কলকাতার হাওয়া বাংলা-বিহারের সীমান্তের পর থেকে বিদেশী হাওয়ায় রূপান্তরিত হয়। বাঙালীদের পক্ষে একটানা অনেকদিন বিদেশী হাওয়ায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া খুবই পীড়াদায়ক। তাই দু'চার দিনের জন্য কলকাতায় আসতে চায়।"

"একটা পোস্টকার্ডে জবাব দিয়ে দিও।" বিনয়প্রকাশ থামল।

"কি লিখব তাতে?"

"লিখবে, দ্বিতীয় পোস্টকার্ড না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।"

"কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?"

"যতদিন না দ্বিতীয় পোস্টকার্ড লেখা হয়।'

আমরা রেল লাইন পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ডান দিকে চাইতেই একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আমি লক্ষ্য করলাম মিটার ডাউন করাই ছিল। কমরেড সিং ঘাড় ফিরিয়ে ভেতর থেকে পেছনের দরজাটা খুলে দিলেন। আমরা পেছনে এসে বসলাম। গাড়ি ছুটল খিদিরপুরের দিকে।

আমি ডান দিকেই চেয়েছিলাম। চেয়ে চেয়ে জাহাজ দেখছিলাম। বিদেশী বাণিজ্যের জাহাজ। হঠাৎ যেন কি মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম বিনয়-প্রকাশকে, "জাহাজ-ফ্রণ্টে আমাদের কোন কাজ হচ্ছে না? জাহাজের দু'চারটা কাপ্তেন আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়নি?"

"নাবিক সঙ্ঘ আর ডাংগার মজুরদের খবর আমি বলতে পারি। মার্কসবাদ ওরা বোঝে না। কিন্তু পার্টি বোঝে।"

গাড়ির চালক কমরেড যশোবন্ত সিং নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আলোচনায় যোগ দেননি। পরবর্তী জীবনে আমি অসংখ্য কম্যুনিষ্টের সংস্পর্শে এসেছি। বড় ছোট কত রকমের কম্যুনিষ্ট। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হ্য়ে যেতাম যে, সব কম্যুনিষ্টরাই একরকম। প্রত্যেকটা মানুষ যেন এক ছাঁচে ঢালাই করা। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়। নইলে চুপ করে থাকে। জবাবের মধ্যে একটিও বাড়তি কথা নেই। ওদের প্রত্যেকের মনের দরজায় তালা লাগানো থাকে। তালা খুলবার ক্ষমতা ওদের নেই। কারণ চাবি থাকে পার্টির কাছে। আসল কথা, আমি আজ পর্যন্ত কোন কম্যুনিষ্টকে কথা বলতে শুনি নি। আমি কেন, কেউ শোনে নি। সত্যিই শোনে নি। কম্যুনিষ্টরা কথা কয় না। হয় জবাব দেয়, নয়তো প্রশ্ন করে। এই নিয়ম কেবল ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। দুনিয়ার সর্বত্র।

খিদিরপুরের অনেকটা রাস্তা পার হয়ে গেছি। একটা সরু গলির মোড়ে এসে গাড়ি দাঁড়াল। বিনয়প্রকাশ বলল, "চলো।" গলির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সরু গলি পার হয়ে সরুতর গলিতে গিয়ে ঢুকলাম। সরুতম গলির কল্পনা করতে লাগলাম। কোন কিছু কল্পনা না করলে দু'দিকের দেওয়াল বাঁচিয়ে রাস্তা হাঁটা অসম্ভব হ'ত। শুধু দেওয়াল বাঁচালে কি হবে, গন্ধ থেকে বাঁচব কি করে? যা হোক একটা কিছু কল্পনা করা চাই। বসরার গোলাপ বাগিচার কথা ভাবতে লাগলাম। বসরায় আমি যাইনি বটে, কিন্তু নরেন দেবের ওমরখৈয়ামে দেখেছি, পড়িনি। কবি ওমরখৈয়াম বসরার গোলাপ বাগিচায় মদ্যপান করছেন। পাশে একটি ওরিয়েণ্টাল নারী অস্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন কবির মদ্যপান। সত্যিকারের নারী হ'লে ওমরখৈয়ামকেই দেখতেন। কিন্তু এ কোন্ নারী? সত্যিও নয় মিথ্যেও নয়। শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর নারী।

হঠাৎ পায়ে একটা ঠোক্কর খেলাম। বড় রাস্তা হ'লে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম। একটু যেন রাগ করেই জিজ্ঞাসা করলাম, "সেণ্ট্রাল কমিটির মেম্বার এমন জায়গায় থাকেন কেন ?"

"পুঁজিবাদীদের অত্যাচারে কমরেড।"

"ফাঁকা জায়গায় থাকলে ওরা বাধা দেবে নাকি ? আমার গোয়াবাগান নেই ? আমরা বোধহয় কমরেড গোস্বামীর ওপর অবিচার করছি। আমরা তাঁর জন্য কী না করতে পারি ? কেবল লাটভবনটা দিতে পারব না।"

"যথাসময়ে তিনি লাটভবনে যাবেন। কিন্তু তার আগে আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। এই যে এসে গেছি।"

আমরা দু'জনে এসে একটা দু'তলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। বিনয়প্রকাশ বলল, "এটা কমরেড যশোবন্ত সিংএর বাড়ি। এখানে আজ একটা মিটিং ছিল।" বাড়ির ভেতরে ঢুকে বিনয়প্রকাশ পুনরায় বলল, "কমরেড গোস্বামীর কোন ঠিকানা নেই। তিনি যখন যেখানে থাকেন সেইটাই তাঁর ঠিকানা। দীপক, আজ তোমার মহাপরীক্ষার রাত।" রাতই বটে !

সিঁড়িতে উঠবার ডান দিকে একটু আড়াল মত জায়গা ছিল। অন্ধকার তো ছিলই। বিনয়প্রকাশ আমার হাত ধরে বলল, "তোমার দীক্ষা আমার হাতে। আমার সংগে যদি তোমার আর দেখা না হয় তবুও তোমার পাশে আমি রইলাম।"

"কমরেড, সিঁড়িতে বাতি নেই কেন ?"

"ভয় পাচ্ছ ?"

"না। পায়ের ওপর দিয়ে একটা ইঁদুর চলে গেল। ইঁদুর মানে বাঘের বাচ্চার যদি বাচ্চা হ'ত ঠিক সেই সাইজের। শিখদের আস্তানায় ছোট সাইজের কিছুই পাওয়া যায় না। চলুন।"

বিনয়প্রকাশ বলল, "আমরা পাঁচ মিনিট আগে এসেছি। ওঁদের মিটিং বোধহয় এখনো ভাঙেনি।"

"তা হ'লে সিঁড়ির বাতিটা একটু জ্বালিয়ে দিন না।" আর একটা ইঁদুর যেন আসবে বলে কল্পনা করতে লাগলাম। বিনয়প্রকাশ বলল, "চলো, ওপরে গিয়ে বসি। বসবার একটা জায়গা পাওয়া যাবেই।"

"সেই ভাল। দাঁড়াবার জায়গা হ'লেও চলবে। কিন্তু একটু আলো চাই।"

কমরেড, তুমি তো আজ জানো আমার জীবনে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আমি গোয়াবাগানের মালিক ছিলাম। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে ছিলাম পররাষ্ট্র দফ্‌তরের কমিশার। কিন্তু তবু আমার অভাব ছিল। তোমারও ছিল। এমন কি সারা দুনিয়ার অভাব ছিল। কি সেই অভাব? আলোর অভাব। শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো, ভক্তির আলো। ভগবানের আলোয় আমাদের দীক্ষা হয়নি। সেইটাই ছিল সব চেয়ে বড় অভাব। মানুষ যতদিন বাঁচবে তার সব সমস্যা মিটবে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মেটেনি। রামরাজ্যেও সেটা সম্ভব নয়। একটানা সুখভোগ জীবন ও জগতের প্রকৃতিগত নয়। কেবল গোলা ভর্তি চাল থাকলেই দুঃখের শেষ হবে না। দুনিয়ার সমুদ্রতীরে কোটি কোটি স্বাস্থ্যনিবাস খুলে দাও তবু রোগের মূল তুমি একেবারে উপড়ে ফেলতে পারবে না। রোগ থাকবে, দারিদ্র্য থাকবে, প্লাবন থাকবে, কালবৈশাখী থাকবে। তবে আজকের মত এত বেশি থাকবে না। ভগবৎ-বিশ্বাসের আলো দিয়ে আমরা সমস্যার সংখ্যা কমাব। দুঃখের বোঝা কমাব। কিন্তু পুরোপুরিভাবে দুঃখ কিংবা সমস্যা তুলে দিতে পারব না। যান্ত্রিক সভ্যতার ষ্টিম্ রোলার জীবন-পথে অহর্নিশ গড়িয়ে চলেছে। তবু রাস্তাটা পুরোপুরিভাবে সমতল হ'ল না। উঁচুনীচু একটু থাকবে বন্ধু। সোভিয়েট রাষ্ট্রে আছে, আমেরিকায় আছে, ইউরোপে আছে, জগতের সর্বত্র আছে। দুঃখ বিতাড়নের ষ্টিম্ রোলার ভারতবর্ষেও আমদানি করলে। কিন্তু ফল সেই একই দাঁড়াল। কালবৈশাখী বন্ধ করতে পারো? পারো না। বড় জোর বাড়ি ঘরগুলো শক্ত ও মজবুত করে তৈরি করতে পারো। কালবৈশাখী সেগুলো ফেলে দিতে পারবে না। কিন্তু চিহ্ন রেখে রেখে যাবে।

বিনয়প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি? আমি ভাবছিলাম নাকি? না তো! চলুন পাঁচ মিনিট অতীত হয়েছে। আলো জ্বালবার উপায় নেই। কারণ সিঁড়িতে সম্ভবত আলোর ব্যবস্থা নেই।"

বিনয়প্রকাশ বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

আমরা অন্ধকারে পা ফেলে দু'তলায় উঠলাম। সামনে একটি বারান্দা ছিল। আর ছিল অন্ধকার। পায়ের তলায় মেজে ছিল বটে কিন্তু সিমেণ্ট ছিল না। কমরেড যশোবন্ত সিংএর বাড়িতে কোথাও সিমেণ্ট নেই। অনেকদিন থেকেই নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খানিকটা থাকলেও এই ক'বছরে সবটুকু বোধহয় ইঁদুরের পেটে গেছে। হজম করতে পারেনি জানি, কিন্তু মেজেতে গর্ত করেছে অনেক।

আমার পা একটা গর্তে পড়ল। অনেকগুলো গর্ত পার হয়ে একটা খোলা ছাদে এসে উপস্থিত হ'লাম। মাথার ওপর কালো আকাশ। বিনয়প্রকাশ বলল, "আর একটা বারান্দা, তারপর একটা ঘর। সেটা মিটিংএর দিনের ওয়েটিংরুম্।"

ঘরে প্রবেশ করবার সময় আমার মনে হ'ল যে, আর এক ইঞ্চি বেশি লম্বা হ'লে আমায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকতে হ'ত। ঘরখানা খুবই ছোট। ছ'জন যশোবন্ত সিং পাশাপাশি শুয়ে থাকলে কেউ আর ঘর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। এ-দরজা থেকে লাফিয়ে একেবারে পিছনের দরজায় গিয়ে পৌছতে হবে। উপস্থিত পেছন দিকের দরজা বন্ধ ছিল। আমি চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেয়ার মানে অর্ধেক চেয়ার। চারটে পা-এর মধ্যে পেছনের দুটো আছে, সামনের দুটো নেই। মাথার ওপরে ছাদ ছিল। বর্ষার সময় জল চুঁইয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই পড়ে। নইলে সিলিংএর গায়ে শ্যাওলা জন্মাত না। ছাদের ওপরে হয়তো বটগাছের ঝাড় গজিয়েছে। কলকাতা আজব শহর। আমরা না কি সভ্য! রাস্তায় মড়া পচে, মানুষের মড়া!

শেয়ালদায় অবনী মণ্ডলের বৌ মরে যায় ওষুধের অভাবে, ডাক্তারের অভাবে। সংকার হয় না বার ঘণ্টা। নোংরা মাছির পোয়া বারো! আমরা নাকি সভ্য! মো-হেন-জো-দড়োতে আমাদের সভ্যতার শেকড় পাওয়া গেছে। বয়স পাঁচ হাজার বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে সভ্য মানুষের নিদর্শন আছে অনেক ক'টি। চাকরি বাঁচাতে হয় বলে যাদুঘর বাঁচে এবং সেই সংগে নিদর্শন ক'টিও বাঁচে। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে কোন রকমে টিকে থাকে।

কমরেড যশোবন্ত সিংএর ঘরের চারটে দেওয়ালে শ্যাওলার আভাস আছে। সহসা চোখে পড়ে না। কারণ দেওয়ালগুলোতে অনেকগুলো ছবি টাঙান রয়েছে। প্রথমে গান্ধিজি, দ্বিতীয় পণ্ডিতজি, তৃতীয় রণজিৎ সিং-জি। আরও একটা ছবি ছিল সেখানে। চেহারাটি অনেকটা যশোবন্ত সিংএর মত। বিনয়প্রকাশ বলল, "কমরেড যশোবন্ত সিংএর বড় ভাই। ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার।" বিনয় ছবিটার দিকে চেয়েই ছিল। শেষে বলল, "ব্রিগেডিয়ার পূরণ সিং নবম পাঞ্জাব বাহিনীতে আছেন। বর্তমানে কাশ্মীরে মোতায়েন।"

পেছনের দরজা দিয়ে কমরেড লোপোন বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর একটা ফোলিও ব্যাগ। তিনি বাঁ দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই আমায় দেখতে পেতেন। কিন্তু দৃষ্টি দিলেন না। আদেশ না পেলে কম্যুনিষ্টরা যেদিক সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। সময়ের দাম আছে এবং আমাদের দৃষ্টিরও দাম আছে। দরজাটা খুলে যেতেই টাইপরাইটারের শব্দ পেলাম। ভেতরে কোথায় কেউ টাইপ করছিলেন। আমি আবার নিঃশব্দে দেওয়াল দেখতে লাগলাম। বিনয়প্রকাশ বারবার করে তার হাত-ঘড়িতে সময় দেখতে লাগল।

একটু পরে বিনয়প্রকাশ ভেতরে গেল। দরজার ওপার থেকে কে একজন ইশারা করছেন ওকে। চাদরটা গায়ের ওপর ভাল করে লেপটে নিয়ে বিনয়প্রকাশ ভেতরের দিকে রওনা হয়ে গেল। এদিকে মোমবাতি প্রায়

ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু বিনয়প্রকাশ খুব বেশি দেরি করল না। মিনিট পাচেকের মধ্যেই ফিরে এলো। সে বলল, "কমরেড গোস্বামী একটু ঘুমচ্ছেন। তুমি একটু অপেক্ষা করো।"

"কতক্ষণ ঘুমবেন? সন্ধ্যা সাতটার সময় ঘুম?"

"সকাল সাতটা থেকে মিটিং হচ্ছে একটানা বার ঘণ্টা। বার মিনিটের জন্যও তিনি বিশ্রাম পাননি। এখন ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ঘুমিয়ে নেবেন।"

লজ্জিত হয়ে বললাম, "পাঁচ মিনিটে কি হবে? ষাট মিনিট ঘুমবার জন্য অনুরোধ করুন।"

"তা কি করে হবে কমরেড? রাত দশটা থেকে আবার ক্যামাক ষ্ট্রিটে মিটিং বসবে। চলবে সমস্ত রাত।" একটু পরে ঘড়ির দিকে চেয়ে সে বলল, "পাচ মিনিট হয়ে গেছে।" মোমবাতিটা ঠিক সেই সময় নিভে গেল। ঘরময় অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়ালাম। পেছনের দরজা দিয়ে ছু'নম্বর ঘরে প্রবেশ করলাম। এই ঘরেও কোন আসবাব ছিল না। দু'খানা খাটিয়া পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। জনমানব একটিও নেই। খাটিয়ার এক কোণায় একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতি তার সমস্ত শক্তি দিয়েই জলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অতবড় ঘরখানাকে আলোকিত করবার মত শক্তি তার নেই, চার পয়সার মোমবাতিতে থাকা সম্ভব নয়।

দু'নম্বর ঘর পার হয়ে গিয়ে আবার একটা ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বিনয়প্রকাশ অন্ধকারে আমার হাত চেপে ধরে বলল, "এবার আমি বিদায় নিচ্ছি। তুমি ঐ সামনের ঘরে চলে যাও। কমরেড গোস্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

বিনয়প্রকাশ পেছনের দিকের অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ছিল।

পার্টির গুপ্ত সেক্রেটারিয়েটের প্রবেশ-পথটা ইচ্ছা করেই আজ অন্ধকার কর হয়েছে। প্রকাশ্য সেক্রেটারিয়েটের সবটাই আলোকিত, দিবারাত্র সেখানে আলো-বাতাসের খেলা চলছে। কতবার তো বুর্জোয়া পুলিস সেখান থেকে আমাদের ফালতো কাগজপত্র নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে টেবিল-চেয়ার; এমন কি সেখানে তালা লাগিয়ে গেছে কতবার। কিন্তু আমাদের গোপন সেক্রেটারিয়েটের সন্ধান ওরা জানে না। কেমন করে জানবে? ঠিকানা কি' রাত দশটা পর্যন্ত খিদিরপুরের গলিতে, দশটার পর ক্যামাক স্ট্রিটে। পরের-দিন শ্রীরামপুরে, তার পরের দিন হয়তো চিংড়িপোতায় ঠিকানা বদলে গেছে। বুর্জোয়া পুলিস তাই বার বার করে আমাদের প্রকাশ্য অফিসে হানা দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে যায়। আমাদের অফিসের আবর্জনা তাতে সাফ হয়। আমরা খিদিরপুরের গলিতে বসে হাসি।

ঘরের মধ্যে কেবল কমরেড গোস্বামীই ছিলেন না। অন্য একজন কমরেডও ছিলেন। বাঙালী বলে মনে হ'ল না। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি লক্ষ্য করলাম কমরেড গোস্বামীর চোখে মুখে নিদ্রাহীনতার ছাপ রয়েছে। দাড়ি কামাননি তাই ভাঙ্গা চোয়ালটা আরও বেশি ভাঙ্গা বলে মনে হচ্ছে। কপালটা বেশ চওড়া। সামনের দিকে টাক পড়েছে বলে আরও বেশি চওড়া মনে হয়। কপালেও রেখা পড়েছে, অকালবার্ধক্যের রেখা। কমরেড গোস্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য। আমরা তাঁকে ভিক্টোরিয়া ক্রস দিতে পারিনি। বীরচক্র থেকে আমরা তাঁকে বঞ্চিত করেছি। আমরা দিয়েছি তাঁকে ভগ্নস্বাস্থ্য। কমরেড গোস্বামী তাঁর স্বাস্থ্য পর্যন্ত দান করেছেন। দান করেছেন পার্টিকে। কম্যুনিষ্টরা যত বেশি শ্রান্ত, যত বেশি ভগ্নস্বাস্থ্য তত বেশি তাঁরা জয়ের নেশা অনুভব করেন। চোখের নীচে কালি পড়লে আমরা মহাবীর চক্র পেলাম। চোয়াল ভাঙ্গলে ভিক্টোরিয়া ক্রস। স্বাস্থ্য ভাঙ্গার চিহ্ন আমাদের জয় পতাকা!

আমি ঘরে ঢুকতেই কমরেড গোস্বামী খাটিয়া থেকে মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসলেন। অন্য খাটিয়ায় দ্বিতীয় কমরেড তখন হাই তুলছিলেন। ভারতবর্ষের

ভাবী কর্ণধাররা সব খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমচ্ছেন! দুঃখে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। এঁদের জন্য কী না আমরা করতে পারি! সম্রাট শাহজাহানের পালংকের চাইতে ভাল পালংক আমরা দিতে পারি না?

একটা কাঁঠাল কাঠের তিন টাকা দামের টেবিল ছিল ঘরে। তিনখানা চেয়ার তিন দিকে এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে। টেবিলের ওপরে মস্ত বড় একটা ব্রিফ কেস। কমরেড গোস্বামী এক মুহূর্তও আর দেরি করলেন না। দ্বিতীয় কমরেডও তাই। ওঁরা চেয়ারে এসে বসলেন। আমি তৃতীয় চেয়ার দখল করলাম। কমরেড গোস্বামী বললেন, "উনি দক্ষিণ ভারতের কমরেড রাও। আর কমরেড চৌধুরী।" করমর্দন করলাম আমরা। আমি অনুভব করলাম আমার পাঞ্জায় অনেক বেশি শক্তি। ইচ্ছা করলে ওঁদের দুটো হাতই আমি মটকে দিতে পারতাম। দাল্দা খেলে কব্জিতে আমার এত শক্তি জন্মাত না। গব্যঘৃত খাওয়ার ফল ভালই হয়েছে। করমর্দনের পর কমরেড গোস্বামী সুরু করলেন, "আমরা ইংরেজিতে কথা কইব।" আমি বললাম, "আমার জন্য ভাববেন না। আমি হিন্দুস্থানি, উর্দু, ফরাসি, বাংলা, ইতালিয়ান, সংস্কৃত এবং রাসিয়ান জানি। আপনাদের যাতে সুবিধা হয় সেই ভাষাতেই বলুন যদি উপরোক্ত ভাষাগুলোর বাইরে না হয়।" আমি লক্ষ্য করলাম কমরেড রাও চোখ দুটো সহসা ছোট করে ফেললেন। মাথার টাকে হাত বুলতে লাগলেন। তারপর বললেন, "পররাষ্ট্র দফ্তরের যোগ্য লোক।"

কমরেড গোস্বামী এবার তাঁর ব্রিফ কেস থেকে গুটিকয়েক কাগজ বার করলেন। দেখলাম কাগজগুলো আমারই লেখা। আমি যে-সব রিপোর্ট লিখে বিনয়প্রকাশকে দিয়েছিলাম সেইগুলো। কমরেড গোস্বামী পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। দু'এক জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটা আছে। তিনি বললেন, "আমাদের প্রেরণার উৎস যে রাসিয়া তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?" আমি বললাম, "এ-যাবৎ কাল আমায় কেউ জানায়নি বটে, তবে আমি বুঝতে পেরেছি।"

"আপনার মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনি ?"

"উঠেছিল। কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে জবাব দিয়েছি।"

কমরেড রাও জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'একটা জবাবের নমুনা দিন।"

আমি বললাম, "মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও স্টালিনবাদ রাসিয়ার মাটি আঁকড়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। অতএব রাসিয়া আমাদের পিতৃভূমি। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণেও রাসিয়া আমাদের প্রেরণার উৎস হবে তা তো জানা কথা।"

আমার জবাব শুনে কমরেডরা সন্তুষ্ট হলেন কিনা বুঝতে পারলাম না।

কমরেড গোস্বামী শর্ট হ্যাণ্ডে আমার জবাবটা লিখে নিলেন দেখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা কমরেড চৌধুরী ?"

"আমার ঐ রিপোর্টে আমি আমার ধারণা সব লিখে দিয়েছি। শুনুন, পুনরুল্লেখ করছি। আমরা পার্লামেণ্টে যাব। বর্তমানে ভারতবর্ষের জনমতের একটা বড় অংশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধিতা করছে। করছে এই জন্য যে, আমরা সহিংস। আমরা যদি পার্লামেণ্টে গিয়ে নেহেরু এবং তাঁর অহিংস মন্ত্রীদের সংগে তর্ক বিতর্ক করি তা হ'লে এই বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনমতের একটা অংশ আমরা দলে টানতে পারব। পারবই। পার্লামেণ্টে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ, নেহেরু নিজে মার্কসবাদের দু'চারখানা বই পড়েছেন। অতএব তাঁকে ঘুম পাড়ানো খুব অসুবিধা হবে না। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে অন্যান্য মন্ত্রীরাও ঘুমিয়ে থাকবেন।"

কমরেড গোস্বামী বললেন, "আপনার মতামত আমরা মস্কোতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কমিনফর্মের দফ্‌তরেও এর এক কপি থাকবে।"

কমরেড রাও জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি নিজে পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে চান কি ?"

আমি বললাম, "পার্টি যা আদেশ করবে আমি তাই করব। কিন্তু আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতে চাই না।"

কমরেড রাও বললেন, "খুব সুখের কথা। কিন্তু—" তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তেলেংগানার সংগ্রাম সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

আমি বললাম, "ভুল হচ্ছে। শুনেছি, কমরেড মাও সে তুঙ্ তিব্বত দখল করবেন শীঘ্রই। অতএব তেলেংগানায় যদি সশস্ত্র আন্দোলন হয় তা হ'লে নেহেরু আমাদের খুব বেশি সন্দেহ করবেন। তাছাড়া তিনি হয়তো ভাবতে পারেন মাও সে তুঙ্ সত্যি সত্যি তিব্বত জয় করছেন।"

কমরেড গোস্বামী বললেন, "তিনি তো সত্যি সত্যি তিব্বত জয় করবেনই।"

আমি বললাম, "জয় করা ও দখল করার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জয় করার মধ্যে নেহেরু একটা আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাবেন। কিন্তু দখল করার মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্তের আভাস আছে, যেন তিব্বত চীন দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই মায়ের দুই সন্তান। ছোট সন্তান হঠাৎ যেন ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে নিজের জীবন নষ্ট করছিল। বড় ভাই এবার নিজেই তাকে কান ধরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে, চীন ও তিব্বত এক মায়ের দুই সন্তান এই মনোভাবটা দিল্লির রাজনৈতিক মহলে প্রচার করতে পারলে নেহেরু চুপ করে থাকবেন। কোন শব্দই করবেন না।"

কমরেড রাও আবার তাঁর টাকের ওপর হাত রাখলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কমরেড চৌধুরী, আপনাকে আমরা গুপ্ত সেক্রেটারিয়েটেই রাখব। কমরেড প্লেখানভের মতও তাই।"

কমরেড গোস্বামী যেন সংগে সংগে বলে উঠলেন, "আমার মতও তাই।"

দু'তিন মিনিটের নৈঃশব্দের পর কমরেড গোস্বামী বললেন, "আপনাকে এবার আমরা ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাঠাব। আপনি দেখবেন এবং আপনার মতামত আমরা জানতে চাইব।"

বললাম, "কবে যেতে হবে?"

কমরেড রাও বললেন, "পরের বুধবার। মাদ্রাজ মেইলে চাপবেন. শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টার সময় মাদ্রাজের উডল্যাণ্ডস্ হোটেলের বার নম্বর কামরায় আপনার সংগে আমার দেখা হবে।"

"আমার কোন অসুবিধা হবে না কমরেড।"

কমরেড গোস্বামী বললেন, "এখন থেকে কমরেড রাও আপনার যথাকর্তব্য ঠিক করে দেবেন।"

"তাঁর আদেশ আমি মানব।"

কমরেড রাও এবার তাঁর পাইপে আগুন ধরালেন। পর পর পাঁচটা কাঠি জ্বালালেন। এত বড় পাইপ যে তৈরী হয় আমি জানতাম না। 'পাউচ' থেকে দু'আউন্সের মত তামাক পাইপের মধ্যে ভরে তারপর তিনি ভাল করে জ্বালিয়ে নিলেন। দু'চারবার খুব জোরে টান মারলেন পাইপে। ঘরময় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল। কমরেড রাও চিন্তান্বিত ভাবে ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে লাগলেন। কমরেড গোস্বামী বললেন, "আগামী নির্বাচন-যুদ্ধে যদি আমাদের নামতে হয় তা হ'লে অনেক টাকার প্রয়োজন হবে। কংগ্রেসের অর্থবল প্রচুর।" সহসা কমরেড, রাও দাঁড়িয়ে গেলেন। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হাতে রাখলেন। দেখতে অনেকটা পিস্তলের মত হ'ল। তিনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে। বললেন, "আপনার কুড়ি লাখ আজ পাচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের আরও দরকার।"

কমরেড গোস্বামী বললেন, "একখানা চেক লিখে ফেলুন।" পকেট থেকে চেক বইটা বার করে বললাম, "একখানা লিখলে হবে না।"

"কেন?"

"একখানা চেকে কুড়ি লাখ তুলতে গেলে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। অতএব আমি সব ক'খানা পৃষ্ঠাতে সই করে দিয়েছি। যখন যেমন দরকার টাকা তুলে নেবেন। তবে অল্প অল্প করে তোলাই ভাল।" কমরেড রাও আমার হাত থেকে চেক বইখানা যেন ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। আমি দিতেই

এসেছিলাম, কেড়ে নেওয়ার দরকার ছিল না। পৃষ্ঠাগুলো তিনি প্রত্যেকটা খুলে খুলে ভাল করে পরখ করতে লাগলেন। এক-শ'খানা পৃষ্ঠা তাই গুণতে একটু সময় নিল। আমার হাত-ঘড়িতে তখন প্রায় রাত ন'টা বাজে। মামার বুকের ব্যথাটা ন'টার সময় খুব বেশি হয়। আজও হয়তো তার ব্যতিক্রম হবে না।

প্রকাণ্ড ব্রিফ কেসের মধ্যে চেক বইটা গলিয়ে দিয়ে কমরেড রাও বললেন, "আপনার যথাসাধ্য আপনি করলেন। কিন্তু সব চেয়ে ভালর পরেও আরও ভাল করা যায় যদি আমরা চেষ্টা করি।"

কমরেড গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, "গোয়াবাগানের বাড়িটা বাঁধা দিলে কত টাকা পাওয়া যায় কমরেড চৌধুরী?" আমার গলা কাঁপল না। জবাব দিলাম, "অন্তত পাচ লাখ।" কমরেড রাও প্রশ্ন করলেন, "বেচে ফেললে কেমন হয়?" কমরেড গোস্বামী বললেন, "পার্টির জন্য বাড়িটার প্রয়োজন হবে।" আমার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িটার সংগে আপনাদের একটা পারিবারিক অহংকার জড়িয়ে আছে। কি বলেন?" আমি বললাম, "বংশ-মর্যাদার একটা মিথ্যা ধারাবাহিকতা চলে আসছে বটে, তবে আমি নিজে সে সব বুর্জোয়া মানসিকতা থেকে মুক্ত।"

"আপনার উদারনৈতিক ঠাকুরদাকে আঘাত দেওয়া খুবই কষ্টকর হবে।"

আমি কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। আমি যেন বাড়িটা বাঁধা দিয়ে ফেলেছি এমন ভাব দেখিয়ে কমরেড গোস্বামী বললেন, "এখন সমস্যা হচ্ছে আপনার আত্মীয়-স্বজনরা জিজ্ঞাসা করবেন, এই পাচ লাখ টাকা হঠাৎ আপনার দরকার হ'ল কেন? একটা 'কভার' তো চাই?"

আমি বললাম, "সেটা কোন সমস্যাই নয়। ছোটকাকার পামির কোম্পানির অর্ধেক শেয়ার আমি কিনে নিলাম।"

"ধরুন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাবার কাছে চাইলেন না কেন?"

"বাবার বোধহয় অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।"

"কমরেড চৌধুরী, পার্টির ফাইলে আপনাদের পারিবারিক যে-ইতিহাস

লেখা আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি আপনার বাবা কয়েক বছর আগে আপনার বড়কাকাকে ঠকিয়ে দু'লাখ টাকা হস্তগত করেন।" ঠকিয়ে কথাটা কমরেড গোস্বামী বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। আমি বললাম, "হাঁ, ঠকিয়ে নিয়েছেন বলে শুনেছি। তবে আমাদের পরিবার সম্বন্ধে যতটুকু আমি খবর রাখি তাতে মনে হয় আমাদের রক্তে ঠকাবার প্রবৃত্তি খুবই কম।" কমরেড রাও বললেন, "আমরা আমাদের মুখ্য আলোচনার বাইরে চলে যাচ্ছি। তবে হাঁ...।" কথাটা অসমাপ্ত রেখে তিনি চাইলেন কমরেড গোস্বামীর দিকে এবং বললেন, "আমাদের দেখতে হবে বাড়িটা কত তাড়াতাড়ি বাঁধা দেওয়া যায়।" আমার গলা কাঁপল না, জবাব দিলাম, "কালকেই, যদি টাকা দেওয়ার লোক পাওয়া যায়। আমায় একটু খুঁজতে হবে।" কমরেড রাও বলে উঠলেন, "না, না। লোক খুঁজবার জন্য আপনাকে সময় নষ্ট করতে দেব না। লোক আমাদের কাছেই আছে। আপনি কালকে দলিলগুলো সব পাঠিয়ে দেবেন।" এই বলে তিনি ব্রিফ কেস থেকে একটা বন্ধকি দলিল বার করে আমার সামনে রাখলেন। কমরেড গোস্বামী তাঁর কলমটা এগিয়ে দিলেন। আমি সই করলাম। আমার হাত কাঁপল না। কমরেড রাও বললেন, "সত্যিকারের সর্বহারা না হ'তে পারলে সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় না।"

আমি আমার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ন'টা বাজতে দশ মিনিট। ঠিক এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে আমি পঁচিশ লাখ টাকা দান করে দিয়েছি। কেবল তাই নয়, গোয়াবাগানের বাড়ি আমার কাছে আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। পাঁচ লাখ টাকা আমি কোনদিনও শোধ দিতে পারব না। সত্যিকারের সর্বহারা হ'তে আমার এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি!

আগামী নির্বাচনের জন্যই যে কেবল টাকার দরকার ছিল তা নয়। চৌধুরী পরিবারকে একেবারে দুর্বল করাও পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যতে কোনদিন

যদি চৌধুরী পরিবারের কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় তা হ'লে পারবে না। আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়াই ভাল। এ সব কথা অবিশ্যি আমার সেদিন মনে আসেনি। সব কিছু দেওয়ার পর আমার কেবল মনে হয়েছিল, সমগ্র ভারতবর্ষের বিনিময়ে পঁচিশ লাখ টাকা সত্যিই কিছু নয়। আমি পঁচিশ লাখের অনেক বেশি দিয়েছি। চৌধুরী পরিবারের বাস্তু আমি পার্টির হাতে তুলে দিয়ে এলাম। হয়তো ভালই হ'ল। বুর্জোয়া সংস্কার মার্কসবাদের চিরশত্রু। একান্নবর্তী পরিবারের মিথ্যা অভিমান ভেঙ্গে দেওয়াই ভাল। আমার সন্তানরা ভারতবর্ষের ক্রেমলিনে থাকবে। অতএব শোক করবার কোন কারণই নেই। কিন্তু ঠাকুরদা? তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে একটু যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কমরেড গোস্বামী আমায় রক্ষা করলেন। তিনি বললেন "পার্টি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে কমরেড। ভারতবর্ষের মুক্তির মুহূর্ত সমাগত। আমরা যদি এক মিনিটের জন্য অন্যমনস্ক হই, তবে বিশ্ব-বিপ্লবের গতি এক মিনিট পিছিয়ে পড়বে। আমাদের চারদিকে শত্রুর আনাগোনা। তারা আমাদের ধ্বংস করতে চায়। তারা আমাদের বিশ্ববিপ্লব ব্যর্থ করবার জন্য চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে।" তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "আর দু'মিনিট সময় আছে। আমরা ঠিক ন'টায় উঠব। কাল ভোর ছ'টার সময় কমরেড হরিপ্রসাদ যাবে আপনার কাছে। মূল দলিলটা দিয়ে দেবেন।"

কমরেড রাও বললেন, "আরও দেড় মিনিট সময় আছে। অতএব আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, পামির কোম্পানির শেয়ার কিনবেন বলে প্রথমে আপনার বাবার কাছে টাকা চাইবেন। তারপর অবিশ্যি বুধবার মাদ্রাজে উডল্যাণ্ড হোটেলের বার নম্বর কামরায় সন্ধ্যা ছ'টার সময় দেখা হচ্ছে। আপনার এখন একটু সময় হবে কি?" আমি বললাম, "হবে।"

"তা হ'লে পাশের ঘরে আজ আমাদের পিপলস্ কোর্ট বসবে ঠিক ন'টায়।"

একজন বিশ্বাসঘাতক কমরেডের বিচার হবে। আপনি দর্শক হিসাবে আমাদের বিচারপদ্ধতি দেখুন। অপরাধ খুব গুরুতর।"

পিপলস্ কোর্ট।

বিচার স্বুরু হয়ে গেছে। বিচারক তিনজন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রধান বিচারক রামপুরিয়া কটন মিলে তাঁত চালান কমরেড বাপীদাস। দ্বিতীয় বিচারক কমরেড ভক্তসিং, ট্যাক্সি চালান এবং তৃতীয় বিচারক হালিশহরে লাঙ্গল চালান কমরেড অবনী মণ্ডল। আসামী অমল রায় দশ বৎসর থেকে পার্টিতে কাজ করছিল। ভাল কর্মী, মুর্শিদাবাদ জিলা কমিটির সদস্য। জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড হাশেম পার্টির তরফ থেকে মোকদ্দমা আরম্ভ করলেন। বিবাদী পক্ষে কেউ নেই কেবল আসামী ছাড়া। কোন দেশের পিপলস্ কোর্টে বিবাদীর পক্ষে উকিল দাঁড়ায় না। দাড়াবার ব্যবস্থা নেই। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপদ্ধতি পিপলস্ কোর্টের মত নয়। সেখানে একদিনে বিচার হয় না। কেবল দিন পড়ে।

কমরেড হাশেম স্বুরু করলেন, "আসামী অমল রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ— গুপ্ত ষড়যন্ত্র, দক্ষিণপন্থী মনোভাব, মৃত ট্রট্স্কির প্রতি গোপনে শ্রদ্ধা নিবেদন, কংগ্রেস সভ্যদের সঙ্গে গোপন-যোগাযোগ। এংলো-আমেরিকার দালাল। সব চেয়ে বড় অভিযোগ কমরেড হাশেমকে, অর্থাৎ আমাকে, পুলিসের হাতে সমর্পণ করার চেষ্টা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি আজ পাচ বছর থেকে মাটির নীচে বসবাস করছি। অর্থাৎ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছি। আসামীর উদ্দেশ্য, আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে মুর্শিদাবাদ জিলা কমিটির সম্পাদক সে নিজেই হতে পারবে। উপরোক্ত অভিযোগগুলোর কোন প্রমাণই দরকার নেই। কারণ সবগুলো অভিযোগই প্রমাণিত। কণ্ট্রোল কমিশনের নির্দেশ অনুসারে আমি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা চাইছি। বিচারক-

মণ্ডলী মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিতে বাধ্য, কারণ, কন্ট্রোল কমিশন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পক্ষপাতী।”

আমি লক্ষ্য করলাম আসামী অমল রায়ের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রধান বিচারপতি কমরেড বাপীদাস জিজ্ঞাসা করলেন, “আসামীর কোনো গুণ নেই? পার্টির জন্য কি কি কাজ করেছে?” বিচারপতি অবনী মণ্ডল মাথা চুলকাতে লাগল। মাথায় তার ‘উইগ’ ছিল না। কমরেড হাশেম বললেন, “আসামীর কীর্তি আমরা স্বীকার করছি। মুর্শিদাবাদ-রেশম-শিল্প-মজদুর ইউনিয়ন তারই তৈরি। মুর্শিদাবাদ জিলার কৃষাণ ফ্রণ্টের পোক্ত খুঁটি সে নিজেই। সেখানকার ছাত্র ফেডারেশন তারই হাতে গড়া।” বিচারপতি অবনী মণ্ডল বলল, “তা হ’লে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হোক।” কমরেড হাশেম ধমকে উঠলেন, “আমরা ইউনিয়ন তৈরি করি না। আমরা তৈরি করি পার্টি।”

আসামী অমল রায় অতি নীচু স্বরে বলবার চেষ্টা করল, “আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো প্রমাণ করুন। সাক্ষীসাবুদ দিয়ে প্রমাণ করুন।” কমরেড হাশেম চিৎকার করে হেসে উঠলেন। স্বাভাবিক হাসি নয়। স্বাভাবিক হাসি হ’লে ঘরের সিলিং থেকে চূণবালি খসে পড়ত না। বিচারপতি ভক্তসিংও সংগে সংগে হাসতে লাগলেন। কমরেড বাপীদাস হাসলেন তার পরে। কমরেড অবনী মণ্ডল নিরুপায় ভাবে তিনজনের দিকে চেয়ে রইল এবং অনেক চেষ্টার পর সেও স্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ একটু হেসে উঠল। কমরেড হাশেম বললেন, “ট্রটস্কি কুকুরের বাচ্ছা এই অমল রায়। সে সাক্ষীসাবুদ চাইছে! আমরা এতগুনো লোক সাক্ষী সাবুদ নই? বুর্জোয়া আদালতের ভাড়াটে সাক্ষী না হ’লে এর বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগগুলো প্রমাণিত হবে না? ফুঃ! পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গুপ্তচর যদি মুখ বন্ধ না করে, তবে আমরাই ওর মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করব। প্রমাণ চাই? উনিশ-শ’ পঁয়তাল্লিশ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার সময় বুর্জোয়া পুলিস আমাদ

গ্রেপ্তার করতে আসে। কারণ আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ছিল. কিন্তু বেলা চারটার ট্রেনে আমি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করি এবং আজ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত আটটার সময় কমরেড চারু দত্তের সংগে আসামীর কথাবার্তা হয় রাত দশটা অবধি। সেই সময় আসামী কমরেড চারু দত্তকে বলে যে, সে জিলা কমিটির সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করছে। সত্যি কি না আসামী নিজেই বলুক।"

আসামী : সত্যি।

হাশেম : তা হ'লে পার্টির আদেশ ছাড়া সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করা মানে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। সত্যি?"

আসামী : সত্যি।

হাশেম : কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হওয়ার সময় আসামী কি প্রতিশ্রুতি দেয়নি যে, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পার্টির নির্দেশ ছাড়া সে কোন কাজ করবে না? প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কি দেয়নি?

আসামী : দিয়েছি।

হাশেম : উনিশ-শ' সাতচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে কমরেড স্টালিনের জন্মদিন ছিল। আসামীর মনে আছে?

আসামী : আছে।

হাশেম : ঐ তারিখে সে ভট্টাচার্য-বিপণি থেকে আট টাকা দশ আনার পাউডার, রুমাল, ও অন্যান্য সৌখিন দ্রব্য কিনেছে। সত্যি?

আসামী : সত্যি।

হাশেম : কমরেড স্টালিনের জন্মদিনে জনৈক পুলিস কর্মচারীর কন্যা বেলা মৈত্রের জন্মদিন ছিল কি?

আসামী : ছিল।

হাশেম : সন্ধ্যা ছ'টার সময় পার্টির মিটিং থাকা সত্ত্বেও আসামী ঠিক ছ'টার সময় সেই সব সৌখিন জিনিস নিয়ে বেলা মৈত্রের সংগে দেখা করেছিল কি?

আসামী : করেছিলাম।

হাশেম : পার্টি-মিটিংএ অনুপস্থিত থাকার কি অজুহাত দিয়েছিল আসামী ?

আসামী : মায়ের অসুখ ছিল।

হাশেম : কথাটা কি সত্যি ?

আসামী : না।

হাশেম : এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কোনদিন শুনেছেন যে, কোন কম্যুনিষ্টের মায়ের কখনও অসুখ হয়েছে ?

প্রধান বিচারপতি : মার অসুখ হওয়া অসম্ভব নয়, তবে কমরেড স্টালিনের জন্মদিনে অসুখ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

কমরেড অবনী মণ্ডল হাই তুলতে লাগল।

হাশেম : তা হ'লে আসামী যে পার্টির অনুমতি ছাড়া বুর্জোয়া মেয়েমানুষের সংগে প্রেম করেছে সেটা মারাত্মক অপরাধ নয় কি ?

আসামী : অপরাধ।

হাশেম : আসামী আট টাকা দশ আনা কোথায় পেল ?

আসামী : আমি পার্টি থেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই। সেই থেকে দশ টাকা জমিয়েছিলাম।

কমরেড হাশেম কমরেড ভিসিনিস্কির মত লাফ দিয়ে আসামীর সামনে এলেন।

হাশেম : পুঁজিবাদীর মত তোমার টাকা জমানো অন্যায় কি না বলো ?

আসামী : অন্যায়।

হাশেম : সর্বহারাদের চাঁদার টাকা থেকে তুমি মাইনে পাও। আর সেই টাকায় সৌখিন কিউটিকুরা কিনে তুমি বুর্জোয়া স্ত্রীলোকের গালে পাউডার লাগাও ? পার্টির অনুমতি নিয়েছ কুত্তার বাচ্চা ?

আসামী : না।

হাশেম : তা হ'লে পার্টি-ফাণ্ড তছরুপ করেছ ?

আসামী : করেছি।

হাশেম : উনিশ-শ' আটচল্লিশ সালের ২২শে মার্চ বিকাল চারটার সময় আসামী বেলা মৈত্রের কাছে বলেছিল যে, মুসলমান-হাশেমকে সরিয়ে দিতে পারলে সে নিজে জিলা কমিটির সম্পাদক হবে। সত্যি কি না আসামী নিজেই বলুক ?

আসামী : সত্যি। মুর্শিদাবাদে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছিল।

প্রধান বিচারপতি : বেলা মৈত্রের সংগে যে আসামীর কথা হয়েছিল তা আমরা জানলাম কি করে, কমরেড প্রসিকিউটর ?

হাশেম : বেলা মৈত্র আমাদের পার্টির গুপ্ত মেম্বার।

কমরেড হাশেম এবার মূল অভিযোগ উপস্থিত করলেন।

হাশেম : আসামী গত মাসের পনরো তারিখে সন্ধ্যা সাতটা বার মিনিটের সময় পুনরায় বেলা মৈত্রকে জানায় যে, সে কলকাতা এসে আমার গুপ্ত ঠিকানা বার করবে। সত্যি কিনা আসামী নিজেই বলুক।

আসামী : সত্যি।

হাশেম : আমার গুপ্ত ঠিকানা জানবার প্রয়োজন কি ছিল ? কমরেড বেলা মৈত্রের পিতা পুলিসের কর্মচারী। অতএব তার কাছে ঠিকানা পৌছে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল অমল রায়ের। অস্বীকার করতে পারো বিশ্বাসঘাতক ?

আসামী : না।

প্রসিকিউটার হাশেম একটা নশ্যি-মাখা রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন। এবার প্রধান বিচারপতি কমরেড বাপীদাস বললেন, "অভিযোগ ও অপরাধ গুরুতর।" তিনি চাইলেন কমরেড ভক্তসিং ও কমরেড অবনী মণ্ডলের দিকে। ভক্তসিং মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগলেন। কিন্তু অবনী মণ্ডল উসখুস করতে লাগল। হয়তো চেয়ারে বসা তার অভ্যাস নেই সেইজন্য তার অসুবিধা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কমরেড অবনী মণ্ডল প্রধান বিচারপতিকে বলল, "আসামীকে ফাঁসি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি মানুষ খুন করতে

পারব না।” কমরেড হাশেম এবার কমরেড ভিসিনিস্কির মত ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে গেলেন বিচারপতি অবনী মণ্ডলের দিকে। বললেন, “সর্বনাশ করবেন না। আমাদের পিপলস্ কোর্টে সব বিচারপতিদের একমত না হ’লে আসামীকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বুর্জোয়া আদালতের মত আমাদের আদালত বিচার-পদ্ধতি নিয়ে তামাসা করে না। আপনারা সব একমত দিন।”

অবনী মণ্ডল মাথা নেড়ে বলল, “বড় জোর আমি দু’বছর জেল দিতে পারি। কিন্তু খুন করতে পারব না।”

প্রধান বিচারক: আসামী কি সবগুলো অভিযোগ স্বীকার করেছে?

আসামী: আমার দোষ আমি স্বীকার করেছি। আমায় অনুগ্রহ করে আত্মসমালোচনার একটা সুযোগ দিন।

পিপলস্ কোর্টে সব আসামীকেই দোষ স্বীকার করতে হয়। তাতে সময় বাঁচে, টাকা বাঁচে, আসামী ও বিচারপতিদের হয়রানি হয় খুব কম। দিনের পর দিন একই মোকদ্দমা টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। তা ছাড়া অভিযোগগুলো আগে থেকেই প্রমাণিত হয়ে থাকে। ভাড়াটে সাক্ষীর উপর নির্ভর করার দরকার হয় না। পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে একজন অমত করলে আসামীর প্রতি অবিচার করা হয়। তার নিজের মনে সন্দেহ থাকে হয়তো সে নির্দোষ। পিপলস্ কোর্টে একজনের অমত করার ফাঁক পর্যন্ত বন্ধ আছে। ‘রায়ে’র মধ্যে সর্বসম্মতি থাকা চাই। নইলে বিচারে ফাঁক থাকে।

উপস্থিত কমরেড হাশেম অবনী মণ্ডলকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলেন না। সে কেবল বলতে লাগল, “আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ। আমি শহুরে আইন জানি না।”

কমরেড হাশেম বললেন, “বিচারের মধ্যে ফাঁক রয়ে গেল। অতএব আমরা আগামীকাল ঠিক এই জায়গায় রাত ন’টার সময় সবাই আবার মিলিত হবো। বিচারপতিদের মধ্যে কমরেড অবনী মণ্ডল কাল থাকবেন না। নতুন বিচারপতি আসবেন। আসামী দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় সুযোগ পেল। কিন্তু

আসামীর যেন স্মরণ থাকে, পিপলস্ কোর্টকে অবহেলা করলে মৃত্যু তার অনিবার্য। ভারতবর্ষে এমন কোন গর্ত নেই যেখানে সে লুকিয়ে থাকতে পারবে। কারণ সব গর্তগুলোর খবর আমরা রাখি। আমাদের আদালত এবার ভাঙ্গল। অতএব কেউ আর বিচারপতি নয়। কমরেড ভক্তসিং আসামীকে আপনার ট্যাক্সি করে খিদিরপুরের বাইরে কোথাও পৌছে দিয়ে আসুন।"

আদালত ভাঙ্গবার পর আসামী অমল রায় সবাইকে অনুরোধ করে বলল, "আমি দু'চারটে কথা আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। পাঁচ মিনিটের সময় দেবেন কি?"

কমরেড হাশেম আপত্তি করলেন। কিন্তু কমরেড বাপীদাস বললেন, "বলুন। পাঁচ মিনিটের যেন বেশি না হয়।" তারপর আসামী যা বলল তার সারাংশ হচ্ছে যে, তার দশ বৎসরের পরিশ্রম মাঠে মারা গেল। পার্টিকে সে সবই দিয়েছে। এখন হয়তো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পার্টির কার্ড হয়তো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। পার্টি থেকে চ্যুত হয়ে কোন খাঁটি কম্যুনিষ্টের দিন কাটানো অসম্ভব। যে কম্যুনিষ্ট নয় তাকে এর ভয়াবহ পরিণাম বোঝানো সম্ভব নয়। আশেপাশের কমরেডরা সবাই তাকে সন্দেহ করবে। কেউ তার সংগে কথা কইবে না। পারিয়া কুকুরের মত সে ঘুরে বেড়াবে ডাষ্টবিনের চারদিকে। কোথায় সে যাবে? কেমন করে জীবন কাটাবে? গত দশ বছরে নিজের সবটুকু অস্তিত্ব সে পার্টিকে দিয়েছে। আখের মত নিষ্পেষিত হয়েছে পার্টি-মেসিনে। এখন কেবল রসবিহীন ছিবড়ার মত সে নিক্ষিপ্ত হবে। সবটুকু দেওয়ার বেদনা বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস নয়, সোস্যালিষ্ট দল নয়, হিন্দু মহাসভাও নয়। কংগ্রেস ছেড়ে কাল তুমি সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে পার। ইচ্ছা করলে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক হতে পার। কিন্তু কম্যুনিষ্টের জীবনে সে-রকম দল পরিবর্তনের অবকাশ নেই। অবকাশ থাকলেও মনোভাব থাকে না। ইচ্ছা থাকে না।

অন্তঃসারশূন্য আখের ছিবড়ে যেমন কোন ভাল কাজে লাগে না, কম্যুনিষ্টরাও ঠিক তাই। সুতরাং তারা দোষ স্বীকার করে। তাড়াতাড়ি শাস্তি পেতে চায়। মরে যেতে চায় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ভারতবর্ষেও যা, চেকোশ্লোভাকিয়াতেও তাই, পোল্যাণ্ডে ঠিক একই রকম, রুসিয়াতেও তার একচুল ব্যতিক্রম নেই। বিস্ময়কর মনে হয়। অবিশ্বাস্য বলে ধারণা জন্মে। কিন্তু মেসিনের নিপুণতায় সত্যিই কোন বিস্ময় নেই।

বাধা দিয়ে কমরেড হাশেম চেঁচিয়ে উঠলেন, "শাট্‌আপ্। ট্রটস্কি কুকুরের সন্তান! বক্তৃতা শোনবার সময় আমাদের নেই। কমরেড ভক্তসিং, এই বিশ্বাসঘাতককে গঙ্গার তীর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

কমরেড ভক্তসিং আসামীকে নিয়ে চলে গেলেন। আমি ঘড়িতে দেখলাম রাত ঠিক দশটা। অবনী মণ্ডল ও বাপীদাস তু'জনে একসংগে বেরুল। যাওয়ার সময় আমার কাছে অবনী মণ্ডল এগিয়ে এলো। একটু সরল হাসি এলো তার মুখে। সে বলল, "হুজুর, চিনতে পারেন?" আমি বললাম, "হুজুর নয়, কমরেড।"

"আজ্ঞে হাঁ। কমরেড, চিনতে পারছেন কি?"

"পারছি, কমরেড মণ্ডল।"

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখের ওপরে যেন কি একটা অপরাধের ছায়া নেমে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবে কমরেড মণ্ডল?" অবনী মণ্ডল জবাব দিল, "না, তেমন কিছু নয়। কেবল ভাবছি শহরের নিয়মকানুন সব আলাদা।" মাথা নাড়তে নাড়তে সে বাইরে চলে গেল। একটু পরে কমরেড যশোবন্ত সিং এলেন। আমাকে বললেন, "আসুন।"

সরু গলি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। কমরেড যশোবন্ত সিং নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগলেন। আমি পেছনেই বসলাম। খিদিরপুর ব্রিজ পার হয়ে গঙ্গার দিকে আমরা চললাম। রাত দশটার পর এসব রাস্তায় বড় বেশি লোক চলাচল করে না। এমন কি তু'একটা পুলিস পর্যন্ত নজরে পড়ল না।

খানিকটা দূরে কে একজন ট্যাক্সি থেকে নামল। ট্যাক্সিটা সামনের দিকেই বেরিয়ে চলে গেল। আমরা লোকটার প্রায় কাছাকাছি এসে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম লোকটা ট্যাক্সির ভাড়া দেয় নি। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। মনে হ'ল, রাস্তা ঘাট ঠাহর করতে পারছে না. হয়তো এ-সব রাস্তা সে চেনে না। আরও মনে হ'ল লোকটা ভয় পেয়েছে : রাস্তায় বাতি আছে বটে, কিন্তু চৌরঙ্গির মত প্রখর আলো নয়। আসলে রাস্তার বাতিগুলো আলোর চাইতে অন্ধকার বিকিরণ করে অনেক বেশি। ভাল চোখেও অনেক সময় ধাঁধা লাগে।

আমাদের ট্যাক্সিখানা প্রায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে ছুটছিল। ফাঁকা রাস্তায় পঞ্চাশ মাইল গতি এমন একটা বেশি কিছু মারাত্মক রকমের গতি নয়। মারাত্মক নয় বটে, তবু বোধহয় লোকটা মারাই গেল! একসিডেণ্ট হ'ল : কমরেড যশোবন্ত সিং-এর গাড়ির তলায় চাপা পড়ল লোকটা। একটা চিৎকার শুনলাম। গাড়ির সামনে-পেছুর বাতি আগে থেকেই নেভানো ছিল। ট্যাক্সি ষাট মাইল গতিতে বেরিয়ে গেল। তবুও বোধহয় লোকটা বাঁচতে পারত, যদি উল্টো দিক থেকে আর একখানা পাচ টনের মোটর ট্রাক সেই সময়ে ওখানে না আসত। আমি ট্যাক্সির পেছনের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম ট্রাকখানা লোকটার ঠিক পেটের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় চিৎকার শোনবার সৌভাগ্য আমার হ'ল না। ট্রাকখানা সামনের দিক দিয়ে আসছিল। আমার যেন মনে হ'ল হিন্দুস্থানী ড্রাইভারের পাশে বিনয়প্রকাশ বসে আছে।

কম্যুনিষ্টরা ভুল করে না। ইতিহাস খুলে দেখ। কমরেড স্টালিন এ-কথা কত বার প্রমাণ করেছেন। ভুল করলে কমরেড স্টালিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জিততে পারতেন না। এখানেও বিনয়প্রকাশ ভুল করল না। কমরেড যশোবন্ত সিং যদি কোন রকম ভুল করে ফেলত বিনয়প্রকাশ করত না। সে স্বচক্ষে দেখে গেল লোকটা আর মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে পারবে না। মনে হ'ল লোকটাকে

আমি চিনি। বিচারপতি অবনী মণ্ডল যাকে খুন করতে চায়নি সেই আসামী অমল রায়।

চৌরঙ্গির সামনে এসে বললাম, "কমরেড, গাড়ি থামান। আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি নেমে যাচ্ছি। আপনি খিদিরপুরে ফিরে যান, যত তাড়াতাড়ি হয়।"

"কাহে ?"

"যদি কেউ কোন কিছু দেখে থাকে তবে পরে প্রমাণ করা সুবিধা হবে যে, আপনি সাতদিন থেকে শয্যাগত। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমরা এনে দেব।"

"জি কমরেড।"

শিখ ড্রাইভাররা 'মিটার' ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু বুঝতে পারে বলে আমি জানতাম না। ট্যাক্সির মিটার ওদের জীবনের প্রথম ও শেষ জ্ঞাতব্য বস্তু। কিন্তু আজ সে ট্যাক্সি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় মিটারটা ঠেলা দিয়ে ওপর দিকে তুলে দিল কমরেড যশোবন্ত সিং। পেছন থেকে আমি যেন দেখলাম একটা চাকায় রক্তের দাগ। পিপলস্ কোর্টের রায় মুলতুবি আছে বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের রক্তে চৌরঙ্গির রাস্তায় দাগ পড়ল।

কমরেড, আজ তোমার কাছে স্বীকার করতে ভয় নেই যে, সেই রাত্রে নিজের কৃতকর্মের জন্য আমার অনুশোচনা এসেছিল। আমি নিজেই কেবল নিঃস্ব হয়ে আসিনি। খিদিরপুরের সরু গলিতে ঠাকুরদাকে আমি ভিখিরি করে রেখে এলাম। অর্থের ভিখিরি নয়। তাঁর শেষ নির্ভর দীপক চৌধুরী আজ চৌধুরী বংশের মর্যাদাবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে এসেছে। হাজার বছরের শিক্ষা ও সভ্যতার আলোয় চৌধুরী বংশের মর্যাদাবোধ ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। আমরা কোনদিন চুরি করিনি। কাউকে চুরি করতে সাহায্য করিনি। আমরা যা করেছি ভগবানের কৃপা ব'লেই তা চিরদিন আমরা

বিশ্বাস করেছি। কিন্তু সবকিছু আজ খিদিরপুরের সরু গলিতে রেখে এলাম। রেখে আসতে মাত্র একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট সময় নিয়েছে!

চৌরঙ্গি থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গোয়াবাগানে ফিরে এলাম। রাত তখন এগারটা। পা টিপে টিপে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। বাড়ির বুড়ো দরওয়ান বাচ্চা সিং রাত ন'টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঠাকুরদার মত ওর এত বেশি বয়স নয় বটে তবে প্রায় ষাট বছর হয়েছে। গোয়াবাগানে সে এসেছিল যখন তার বয়স ছিল পনরো। অনেক দিন পাহারা দিয়েছে, অনেক বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনদিনও আমাদের বাড়িতে একটা গাছের ফল পর্যন্ত চুরি হয়নি। বাচ্চা সিং তবু পাহারা দিয়ে চলেছে। গালপাট্টা বেঁধে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে যদি কোন চোরের সন্ধান পাওয়া যায়। বাচ্চা সিং-এর সারা জীবনের কঠিন পাহারা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। সে চোর ধরতে পারল না। সমস্ত গোয়াবাগানটাই আজ চুরি হয়ে গেল।

আমি নিঃশব্দে জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে দিয়ে বাগানের রাস্তা পার হয়ে এলাম। বাচ্চা সিং তো দূরের কথা, জগতের কাউকে আমি ভয় করি না। তবুও কেন যে আমি চোরের মত মন নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম খুবই। যত বার আমি নিজের মনকে বোঝাতে চাইলাম আমি কম্যুনিষ্ট, আমি নির্দোষ, আমি ভগবান মানি না, আমি মানি পার্টি লাইন, ততবারই আমি যেন নিজেকে নিজেই চোর বলে অভিযুক্ত করতে লাগলাম। আমি সাধারণ স্বদেশী চোর নই। আমি অসাধারণ আন্তর্জাতিক চোর। জগতের সব চেয়ে নিকৃষ্ট চোর। আমি কেবল গোয়াবাগানই বাঁধা দেইনি, আমি আজ গোটা ভারতবর্ষটাই বাঁধা দেবার ও বিক্রি করবার ষড়যন্ত্র করছি। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ঘুমন্ত ঠাকুরদার বুক থেকে গোয়াবাগান কেড়ে নিয়ে গেলাম। ঘুমন্ত ভারতবাসীর বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলাম ভগবৎ-বিশ্বাসের শেকড়। হঠাৎ একটা বিড়াল লাফিয়ে পড়ল আমার সামনে। আমি একটু চমকে উঠলাম। একটু বোধহয় ভয় পেয়েছিলাম। তারপর

নিজের মনেই হেসে উঠলাম। বিড়ালের ভাগ্যে হয়তো শেষ পর্যন্ত সিকে ছিঁড়বে না।

ঠাকুরদা ঘুমুচ্ছিলেন। দরজাটা আবজানো রয়েছে। ভেবেছিলাম ঘরটা পাশ কাটিয়ে চলে যাব। কিন্তু ঘরের সামনে আসতেই যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়াবার কোন কারণই ছিল না। তবু আমি মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগলাম। হয়তো মনে মনে আমি তাঁকে আমার শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলাম। ইচ্ছা হ'ল ঘুম থেকে তুলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসি। হয়তো জীবনে আমার এ-সুযোগ আর কোনদিনই আসবে না। সত্যিই আসে নি।

কতক্ষণ যে অভিভূতের মত দাঁড়িয়েছিলাম আজ আর মনে সেই। কেবল মনে আছে যে, সামনের দিকে চাইতেই আমি দ্বিতীয়বার চমকে উঠলাম। বেড়ালটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুটো ওর কেবল জ্বলজ্বল করছিল বলেই প্রথম আমার মনে হ'ল, কিন্তু একটু পরে যেন ভাবলাম বেড়ালটার চোখে আজ আর আলো নেই। সবটুকুই ঘৃণার অন্ধকার।

আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে 'আর্ট গেলারি'তে ঢুকলাম। কাল ভোর ছ'টার সময় কমরেড হরিপ্রসাদ দলিলগুলো নিতে আসবে। ডান দিকের দেওয়ালে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিতেই 'আর্ট গেলারি'র অন্ধকার সব দূর হয়ে গেল। দরজার সোজাসুজি মুখ করে আমার প্রপিতামহের অয়েল পেনটিং-খানা টাঙানো রয়েছে। নীচে লেখা রয়েছে ৺রাখালদাস চৌধুরী। আমি তাঁর প্রপৌত্র। আমার নাম দীপক চৌধুরী। বিশ্ববিপ্লবের একজন নগণ্য সৈনিক। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আমার মনে হ'ল তাঁর চোখ দুটো অবিকল আমারই চোখ। তাঁর কাছ থেকে আমি কেবল চোখ দুটো পাইনি, পেয়েছিলাম শিক্ষা, বংশ-মর্যাদা ও আশ্রয়। কুকুর বেড়ালের মত দু'বেলা পেট ভরে খেয়েই আমরা কেবল বেঁচে থাকিনি। বাঁচবার আভিজাত্য

ছিল চৌধুরী বংশের মস্তবড় সম্পদ। সেই তুলনায় গোয়াবাগানের কুড়ি বিঘা জমি সত্যিই কিছু নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমন্বয় আমার প্রপিতামহের চরিত্রে গভীর রেখাপাত করেছিল। ঠাকুরদা ও বাবার জীবনে যদি এই সমন্বয়ের প্রকাশ থাকত তা হ'লে আমি হয়তো কম্যুনিষ্ট হতে পারতাম না। কিন্তু ঠাকুরদার অর্থহীন উদারনৈতিক শিক্ষার প্রভাব চৌধুরী পরিবারের পক্ষে কল্যাণকর হয় নি। প্রকৃত পক্ষে গত এক-শ' বছরের এই স্যাঁতসেঁতে উদারনীতির পথ ধরে কম্যুনিজম এগিয়ে এলো পৃথিবী গ্রাস করবার জন্য। পুঁজিবাদ সর্বস্ব সমাজজীবনের রুগ্ন পরিণতি এই উদারনীতির বিষময় ফল।

আমি চাবি বার করলাম। সিন্দুক খুলে দলিলগুলোর প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা ভাল করে পড়ে দেখলাম। মূল দলিলের সংগে ঠাকুরদার উইলখানাও ছিল। সবগুলো একটা প্যাকেটে ভর্তি করে নিয়ে সিন্দুকটা বন্ধ করে দিলাম। আমার হাত কাঁপল না। ৺রাখালদাস চৌধুরীকে সম্বোধন করে মনে মনে বললাম, "আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইব ভাবছ? না। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি। ভাবছ, ভুল করছি? না। কারণ, পার্টি কখনও ভুল করে না। ভুল করেছে তোমার সমাজ, তোমার রাষ্ট্র। অপরাধ তোমার নেতৃবৃন্দের। রাজনীতির কালোবাজার আমরা চিনি। সমস্ত দেশটা আজ সেই বাজারে বিকিয়ে যাচ্ছে। কই, তোমরা তো তাদের অপরাধী করলে না? তোমাদের রাষ্ট্র, তোমাদের নির্লজ্জ সামাজিক ব্যবস্থা আমায় আজ কম্যুনিষ্ট হ'তে বাধ্য করেছে। গোয়াবাগানের মিথ্যা অহংকার তাই ভাঙলাম, ভাঙলাম, ভাঙলাম। ভাবছ আমি কাঁদব? কক্ষণও না। লজ্জা কার, আমার না তোমাদের? মন্বন্তরে সেদিন বাঙলা দেশে পঞ্চাশ লক্ষ লোককে খুন করল কারা দাদু? ভুলে গেছ? আমরা ভুলিনি। সেই সব রাক্ষস পুঁজিবাদীগুনো আজও মজা লুটছে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি এই সব রাক্ষসগুনোকে পৃথিবী থেকে বিদায় করব। কম্যুনিজম ছাড়া এদের কেউ আর বিদায় করতে পারবে না।"

হঠাৎ যেন মনে হ'ল আমি কাঁদছি, দলিলগুলো হাতে নিয়েই কাঁদছি।

তোমাদের রাষ্ট্রের জন্য কাঁদিনি, সমাজের দুঃখে কাঁদিনি, গোয়াবাগানের জন্যও কাঁদিনি। মার্কসিষ্টরা ওসব পচা মালের জন্য চোখের জল ফেলে না। মার্কসিষ্ট দীপক চৌধুরী কাঁদছে ব্যক্তিগত কারণে। আমার দুঃখ, তুমি মরে গেছ দাদু। আমার বুকে কান পেতে যদি তুমি শুনতে পারতে তবে বুঝতে আমি আজ তোমায় কি বলতে চেয়েছিলাম। তুমি মরে গেছ তাই শুনতে পেলে না। আমি এবার চললাম। বাতি নিভিয়ে দি, কেমন? প্রাচীন ভারতের অন্ধকারে তোমরা সব নিমজ্জিত, আমি আলোর সন্ধানে চললাম। পা দুটো একটু এগিয়ে দেবে কি? আমি তোমায় প্রণামই করলাম দাদু। তোমার চোখ আমি পেয়েছি, হয়তো একদিন সত্যের আলোয় আমাদের নতুন করে দৃষ্টি বিনিময় হবে। প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকলে আমি গলা এগিয়ে দেব।

বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কেউ টের পেল না আমার চুরির কাহিনী।

•

পরদিন ভোর ছ'টার সময় কমরেড হরিপ্রসাদ এলো। তখনও বাচ্চা সিং-এর ঘুম ভাঙেনি। হরিপ্রসাদ দলিলগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ওর পেছনে পেছনে বারান্দা পর্যন্ত এলাম। ও যতক্ষণ না বাগানের রাস্তা দিয়ে ফটকের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হরিপ্রসাদের দিকেই চেয়েছিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ভাবলাম দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নি। শুতে গিয়ে হঠাৎ মেঝেতে নজর পড়ল। হরিপ্রসাদ আজ তারিখের দৈনিক কাগজখানা ভুল করে ফেলে গেছে। আমাদের পার্টির দৈনিক। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লেখা, "কমরেড অমল রায়ের শোচনীয় মৃত্যু।"

তারপর নিজস্ব সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন—কমরেড অমল রায় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তাঁর পরিশ্রম ও সংগঠন-প্রতিভার জন্য মুর্শিদাবাদ জিলায় কৃষাণ ও শ্রমিকদের মধ্যে নবজাগরণের একটা প্লাবন এসেছিল।

রেশম-শিল্প মজদুর ইউনিয়নের স্রষ্টিকর্তা কমরেড অমল রায়। মুর্শিদাবাদ ছাত্র ইউনিয়নের মূলে প্রেরণা যুগিয়েছেন কমরেড অমল রায়। অতএব পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্র তাঁর চারদিকে গভীর জাল বিস্তার করবে তা তো জানা কথা।

গতকল্য তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা মোটর ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। ইচ্ছাকৃত চাপা। নইলে পেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে ট্রাকের চাকা গেল কি করে? এই ট্রাক কার? এমন একটা প্রশ্ন করা কি অবান্তর হবে? কমরেড অমল রায়ের জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, সোস্যালিষ্ট পার্টি মুর্শিদাবাদ জিলায় কোন কাজই করতে পারছিল না। তবে কি ট্রাকটা সোস্যালিষ্ট পার্টির? আমরা অবিশ্যি নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারব না যতক্ষণ না কংগ্রেসি-পুলিস তদন্তের দ্বারা এর রহস্য উদ্ঘাটন করে। কিন্তু কংগ্রেসি-পুলিসের তদন্ত যে ফলপ্রসূ হবে আমরা তা জোর করে বলতে পারব না। আমাদের এই অবিশ্বাসের কারণ, সোস্যালিষ্ট পার্টির পেছনে বড়বাজারের পুঁজিবাদীরা সব সময়ই সাহায্য করছেন। তা যদি না হবে তবে অতবড় ট্রাক এলো কোত্থেকে? এত মূল্যবান ট্রাক তো সাধারণ লোকের থাকতে পারে না। অতএব কমরেড অমল রায়ের নাম করে আমরা বাংলার কৃষাণ ও মজদুরের কাছে আবেদন করছি, "তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। কম্যুনিষ্ট পার্টির পতাকা তলে এসে দাঁড়াও। পুঁজিবাদীদের চক্রান্ত আমরা ভাঙব। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

সমস্ত কাগজখানাতে আজ আর কোন সংবাদই নেই। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য নেতারা সব আলাদা ভাবে কমরেড অমল রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করেছেন। অনেকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাট পর্যন্ত যাবেন। বিরাট শোভাযাত্রা করে কমরেড অমল রায়ের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলায়। আপনারা সব দলে দলে যোগ দিন। এ-শোক কেবল কম্যুনিষ্ট পার্টির নয়, এ-শোক জনসাধারণের। এত বড় একজন কর্মীর শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে কোন দলাদলি নেই।

কাগজের মাঝখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে—বিরাট জনসভা। ময়দানে চার ঘটিকায় কমরেড অমল রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ। সভায় পৌরোহিত্য করবেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ডক্টর রামদাস পালিত।

কাগজখানা হাতে করেই আমি পূব দিকের বারান্দায় চলে এলাম। চমৎকার সোনালি রোদ পড়েছে চৌধুরীবাড়ির বারান্দায়। আমি বসে বসে অনেক কথা ভাবতে লাগলাম। সহসা পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নুকু। এক মাস আগের নুকু এ নয়।

নুকু জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ কমরেড?"

বললাম, "ভাল নেই। কাল রাতে আধ মিনিটও ঘুমই নি। তুই কেমন আছিস নুকু?"

"খুব ভাল। কাল সন্ধ্যা বেলা জ্যেঠামশাইর সংগে চলে এলাম। ভারত সরকারের প্লেনে চেপে এলাম দীপুদা। বিনয়প্রকাশের সংগে দেখা হয় না?"

বললাম, "হয়।"

নুকু এসে আমার গা ঘেঁষে বসল। দৈনিক কাগজখানার প্রথম ক'টা লাইন পড়ল হয়তো। আমি বুঝলাম কমরেড অমল রায়ের প্রতি ওর কোন আগ্রহ নেই। নুকু বলল, "কাল বিনয়প্রকাশের খোঁজ করেছিলাম একবার। দেখা পাইনি।"

বললাম, "কাল বোধহয় সে বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। অন্তত রাত সাড়ে দশটা অবধি যে ব্যস্ত ছিল তা আমি নিজেই জানি।"

"তোমার খোঁজেও আমি কুইনস্ পার্কে গিয়েছিলাম। দেখলাম দিদি এসেছে। গতকালই এসেছে।"

অনীতা সম্বন্ধে আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই আমি নুকুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দিল্লির বাড়িতে এখন আছে কে?"

"ছোটকাকা। মস্তবড় একটা কনট্রাকট্ পেয়েছেন তিনি। বিলেত থেকে কি সব মেসিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে এনে দেবেন। জ্যেঠামশাই বললেন,

অনেক টাকা লাভ হবে। আচ্ছা দীপুদা, দিদির চোখেমুখে অনেক পরিবর্তন এসেছে দেখলাম। মানে কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "অনেক পরিবর্তন দেখলি না কি?"

"হাঁ।"

"তা হ'লে বোধহয় ধর্মের প্রভাব। যীশুখৃষ্টের শ্রীচরণে নিজেকে পুরোপুরি ভাবে সমর্পণ করবার আগের মুহূর্ত। পর-মুহূর্তও হতে পারে, আমি সম্ভবত জানি না।"

"আমার মনে হচ্ছে দিদিকে দেখবার জন্যই বোধহয় আমি কলকাতা এসেছি দীপুদা। বিনয়প্রকাশকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?"

"মোটামুটি পারি। হয়তো ভুলও হতে পারে।"

"কোথায়?"

"শ্মশানে, কেওড়াতলায়।"

দৈনিকের দুটো লাইন আমি ওর চোখের উপর তুলে ধরলাম।

"দীপুদা, আমায় তোমরা কোন্ শ্মশানে নিয়ে যাবে? 'রাজঘাট' তো আমার বরাতে নেই।"

"এত জলদি শ্মশানের ঠিকানা জানতে চাইছিস কেন মুকু?"

"একটু আগে থেকে প্ল্যান করে রাখা ভাল। তোমার হাড়ের ওপর আমরা 'রাজঘাট' তুলব না, তুলব 'মহারাজঘাট'। তুমি স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহু যুগ পর্যন্ত।"

"কতগুলো যুগ বলে তোর মনে হয় মুকু?"

"অত দূরের হিসাব দিতে পারব না। তুমি নিজেই কেন হিসাব করে বার কর না?"

আমি এবার একটু গম্ভীর ভাবে বললাম, "মুকু, তোর মধ্যে এখনো বুর্জোয়া মনের প্রভাব রয়েছে। বুর্জোয়া রক্তের দোষ তোর এখনও শোধন হয় নি। পার্টি কিন্তু রক্তের মধ্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগায়। বুর্জোয়া পোকাগুলো

খুব বড় বড় দেখায়। মনের নাগাল পাওয়াও কত সোজা তা তো তুই নিজেই জানিস নুকু ?” আমার ইঙ্গিত নুকু বুঝতে পারল।

নুকু জিজ্ঞাসা করল, “দিদি বুঝি দারজিলিংএ কাকীমার বাড়িতেই ছিল ?”

“হাঁ।”

“দিদির পরিবর্তন তা হ'লে বাস্তব, অতএব সত্য। আমি বেশি দিন কলকাতায় থাকতে পারব না। জ্যেঠামশাইর সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্লেনে চেপে শনিবার দিনই আবার দিল্লি ফিরে যাব।”

“কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ?”

“ভালই। এখন তো আমার কেবল রাজনীতির কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারিয়েট আমার লীলাক্ষেত্র। নেহেরুর জন্য আমার মায়া হয় দীপুদা। অমন ছেলেমানুষি সরলতা আমার নিজেরও নেই। আমি বোধহয় তাঁর ক্ষতি কোনদিনই করতে পারব না।”

“বুর্জোয়া মনের বিকৃতি নুকু। মায়া করলে পার্টির শক্তি বাড়বে কেন ?”

“আচ্ছা দীপুদা, তুমি তো সেণ্ট্রাল কমিটিতে যাচ্ছ বলে আমার মনে হচ্ছে। তোমার অধীনে আমায় নিয়ে নাও না ?”

“কেন, বিনয়প্রকাশ কি অপরাধ করল ?”

“ওকে একটু অবসর দিতে চেয়েছিলাম। মেয়েমানুষের সবটুকুই কম্যুনিজম নয় দীপুদা। আমি অসুস্থ।”

“বোধহয় একটু ভুল ডায়গোনিসিস্ হ'ল। সম্ভবত পার্টি অসুস্থ। Sick of you !”

“দীপুদা !!”

নুকু ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। সেই ছেলেবেলাকার মত। নুকু অনুনয়ের স্বরে আবার বলল, “তোমার কাছে আমায় টেনে নাও দীপুদা।”

“বিনয়প্রকাশ ছাড়বে কেন ?”

“তুমি চেষ্টা করলে ছাড়িয়ে আনতে পারবে।”

আমি ভাবলাম, সুকু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে ছেলেবেলায় ফিরে যেতে পারে কিন্তু আমি আর পারি না। বুর্জোয়া অতীত আমার মরে গেছে। এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। সুকু আমার সংগে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"শ্মশানে।"

"কখন ফিরবে ?"

"ঠিক নেই।"

"আমিও তোমার সংগে যাব দীপুদা।"

"তা হ'লে চল্ বাবার সংগে একবার দেখা করে যাই।"

"যাওয়ার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু দিদি আমায় একেবারে সহ্য করতে পারে না দীপুদা।"

"কেন পারে না ভেবে দেখেছিস কোনদিন ?"

"ভেবে দেখেছি, কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাইনি।"

"তা হ'লে কোনদিন যদি তোর সুযোগ আসে তুই প্রতিশোধ নিস। অনীতার সবটুকুই ভগবান-ভালবাসা নয় সুকু।"

"দীপুদা, এ-কথা কেন বললে ?"

"মেয়েমানুষরা কেবল ভগবানকে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই।"

"কিন্তু মেয়েমানুষরা কেবল কম্যুনিজমকেও তো ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকে না দীপুদা ? তবে প্রতিশোধের কথা কেন উঠল ?"

আমি কথাটার জবাব দিলাম না। বাগানের রাস্তায় এসে সুকু বলল, "তোমার সংগে আমার আবার কবে দেখা হয় জানি না। এসো, আজ আমরা দু'জনে একসঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করি।"

"আগে প্রতিজ্ঞাটা বল্ শুনি ?"

"আমরা যতদিন বাঁচব, কেউ কারো নামে রিপোর্ট করব না। রিপোর্ট মানে

বিরুদ্ধ রিপোর্ট। দীপুদা পার্টি আমাদের সব জানে। আমরা কিন্তু পার্টির কিছুই জানি না।"

"হুকু, আমরা উভয়েই বিনয়প্রকাশকে জানি, সেইটাই বড় কথা। বিনয়-প্রকাশের সংগে দেখা করবি না? ওঠ, গাড়িতে উঠে আয়।"

গাড়ি নিয়ে বাইরে চলে এলাম। আমি লক্ষ্য করলাম হুকুর ফরসা রং একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে আমার সংগে কথা কইল না। 'ফারপো'র কাছে এসে বললাম, "নেমে আয়। চা খাব।" ফারপোর উল্টো দিকে গাড়ি রেখে আমরা দু'জনে রাস্তা পার হয়ে ফারপোর বারান্দায় এসে বসলাম। হুকু জিজ্ঞাসা করল, "চা খেতে এখানে এলে কেন?" আমি বললাম, "এখানে বসে শোভাযাত্রা দেখব। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে।"

"আমার কিন্তু মরা মানুষ দেখতে ভাল লাগে না।"

"তোকে আমি জ্যান্ত মানুষ দেখাব।"

এই সময় পুলিসের একটা লরি আস্তে আস্তে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে আসছিল। বুঝলাম শোভাযাত্রা আসছে। শোভাযাত্রা নিশ্চয়ই খুব বড়। সর্বহারাদের উত্তেজনা খুবই আজ বেশি। নইলে পুলিসের বিশেষ ব্যবস্থা থাকত না। ফারপোর সামনের স্ট্যাণ্ডে কমরেড যশোবন্ত সিং তাঁর গাড়ি রাখলেন।

শোভাযাত্রা প্রায় 'ফারপো'র কাছাকাছি এসে গেছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদের ধ্বনি এখান থেকে লালবাজার পর্যন্ত নিশ্চয়ই পৌঁচেছে। কিন্তু আমি জানি ওঁরা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করেন নি। হুকু জিজ্ঞাসা করল, "কমরেড খুব বড় গোছের রুই-কাৎলা না কি দীপুদা?"

"হ্যাঁ, বড় কর্মী। আর এক পেয়ালা চা দেই হুকু?"

"কি রোগে মরল? বুভুক্ষা না কি? কমরেডের মৃত্যুর মধ্যে কোন প্ল্যান নেই তো?"

"বিনয়প্রকাশ আছে। ঐ দেখ, শবদেহ কাঁধে নিয়েছে সে।"

বিরাট জনতা! আমি জানি জনতার মধ্যে সবাই কম্যুনিষ্ট নয়। বহু দলের

লোক আছে এখানে। কিন্তু, সব দলের লোককে শবদেহের শোভাযাত্রায় টেনে আনার ক্ষমতা একমাত্র কম্যুনিষ্টদেরই আছে। আজকে সন্ধ্যা সাড়ে চার ঘটিকায় ময়দানে যে শোকসভা হবে তাতেও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই আসবেন।

শোভাযাত্রার সামনে আমাদের দু'চার জন নেতা দুঃখের বোঝা মাথায় করে মুখ নীচু করে হাঁটছিলেন। তাঁদের পাশে রয়েছেন শহরের দু'জন বড় ব্যারিষ্টার ও একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ। দৈনিকের ষ্টাফ ফটোগ্রাফার তাঁদের ছবি তুলছেন এদিক ওদিক দু'দিক থেকেই। শবদেহের ছবি তাতে উঠল কি না জানি না। তবে আমাদের 'শান্তি কংগ্রেসের' প্রচারপত্রে এর দু'একখানা ছবি নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। এই ছবির প্রচার হবে কলকাতা থেকে পিকিং হয়ে মস্কো পর্যন্ত। সহস্র সহস্র কাগজে ছবি ছাপা হবে শিক্ষাবিদের। তাঁর পাশে থাকবেন আমাদের নেতৃবৃন্দ। প্রচারপত্রের শিরোনামায় লেখা হবে 'প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদের শান্তিকংগ্রেসে যোগদান।' শিক্ষাবিদ অভিভূত হয়ে পড়বেন, অবাক হয়ে যাবেন তাঁর নাম প্রচারের আয়োজন দেখে। কোথায় কলকাতা, কোথায় মস্কো, কোথায় পিকিং, কোথায় নায়াক্রাগুয়া! এই ভারতবর্ষে কেউ তো তাঁকে নিয়ে এমন করে ঢলাঢলি করে নি? কেউ তো তাঁকে এত প্রশংসা দেয় নি? ভারতবর্ষের কোন কংগ্রেসি কাগজে এ যাবৎকাল তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে বলে তিনি খবর রাখেন না। স্বাধীন ভারতের কোন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন শিক্ষা ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চায় নি, পরামর্শও নেয় নি। শিক্ষামন্ত্রী আবুলকালাম আজাদ কিংবা বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর চাইতে তাঁর শিক্ষা কি বেশি ছিল না? পরাধীন ভারতে তাঁর সম্মান হয় নি বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে সম্মান পাওয়া তাঁর উচিত ছিল। তিনি দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন, করবেন বলে আশা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন। সবই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে স্বদেশের শিক্ষাপদ্ধতি, ব্যর্থ হয়েছেন ভারতবর্ষের সমুদয় শিক্ষামন্ত্রীরা। অতএব পিকিং কিংবা মস্কোর খবরের কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হ'লে তাঁর মনে একটু উৎসাহ ফিরে আসবেই। মধ্য-বয়সেও যৌবনের উত্তেজনা

তিনি অনুভব করবেন। করাই স্বাভাবিক। কম্যুনিষ্টরা তাঁর যৌবন ফিরিয়ে এনেছে। তিনি কি কোনদিনও পার্টিতে খোলাখুলিভাবে যোগ দেবেন না? হয়তো দেবেন। আমরা ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। উপস্থিত তাঁর ছবি ছাপা হোক আধখানা পৃথিবীর সবগুলো কাগজে।

বিনয়প্রকাশ কমরেড অমল রায়ের শবদেহ বহন করছে আজ। মৃত কমরেডকে সেও আজ সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি। বিনয়প্রকাশের ঠিক পেছনে মেয়েদের শোভাযাত্রা। তার মধ্যেও সবাই কম্যুনিষ্ট নয়। বেথুন-ব্রাবোর্ণ-ভিক্টোরিয়া থেকে অনেক মেয়েরাই এসেছে। আজ এসেছে কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের সংগে। কাল হয়তো নিজেরাই আসবে।

নুকু জিজ্ঞাসা করল, "এত তন্ময় হয়ে কাকে দেখছ দীপুদা?"

"কাউকে নয়। কিংবা বিনয়প্রকাশকেই হয়তো দেখছিলাম।"

"বিনয়প্রকাশের মধ্যে দেখবার কি আছে?"

"আমাদের কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্য নুকু।"

শোভাযাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এলো। নুকুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই এতক্ষণ কি দেখছিলি?"

"বিনয়প্রকাশকে নয় দীপুদা।"

"চোখের নেশা এত তাড়াতাড়ি কাটল না কি?"

"না, বোধহয় বেড়েছে। কিন্তু নেশা নয়। ত্যাগের স্পৃহা।"

"কার জন্য এই ত্যাগ নুকু?"

"দিদির জন্য।"

ছুটো কথার ধাক্কা আমি সহ্য করতে পারলাম না। মাথাটা যেন সংগে সংগে রাস্তার দিকে ঘুরে গেল। নুকুর দৃষ্টি আমি সইতে পারি নি। প্রায় পাঁচ মিনিট পর নুকু জিজ্ঞাসা করল, "লজ্জা পেলে নাকি দীপুদা?"

"না। ভাবছি তুই বোধহয় সত্যিই অসুস্থ। বিনয়প্রকাশের ওপর শ্রদ্ধা হারানো মানে অসুস্থতা।"

"শ্রদ্ধা আমার বেড়েছে।"

"কেন ?"

"দিদির ঘরে ভোর রাত্রে যে তুমি আলো দেখতে পেতে, বিনয়প্রকাশও সেই আলো দেখবার স্থযোগ পেল দীপুদা।"

"সে-আলো তো ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির আলো রে মুকু ?"

"বোধহয় ভুল দেখেছ। আসলে ওটা স্বর্গের আলো।"

"তোর ভয় করে না, মুকু ?"

"কার জন্যে ?"

"তোর নিজের জন্যে ?"

"না, এতটুকু না। দিদি আমায় হয়তো ঘৃণা করে কিন্তু দিদির জন্য আমার ভালবাসার অন্ত নেই দীপুদা।"

"তা হ'লে বিনয়প্রকাশকে লেলিয়ে দিচ্ছিস কেন ?"

"বিনয়প্রকাশকে নয়, লেলিয়ে দিলাম কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্য।"

"গিলে যদি খেয়ে ফেলে ?"

"সেইটাই একমাত্র ভরসা দীপুদা।"

"কোন্‌টা ?"

"আজ থেকে শতবর্ষ পরেও যদি হয়, দিদির সামনে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বে। দিদি বোধহয় জগতের শেষ ভরসা।"

"পিপলস্ কোর্টে তোর মৃত্যুদণ্ড হবে মুকু।"

"আজকের মত শোভাযাত্রা হবে তো ?"

সহসা মুকুর হাত চেপে ধরলাম। তারপর ওর হাতের কব্জিতে একটু ব্যথা দেবার জন্যই বোধহয় একটা মোচড় দিলাম। মুকু ছলছল চোখে জিজ্ঞাসা করল, "পিপলস্ কোর্ট আমার বিচার করবে ?" আমি বললাম, "দরকার হয় আমরা সেখানেও টেনে নিয়ে যাব তোকে।"

"আমি বোধহয় মরতেই চাইছি দীপুদা।"

"ছিঃ! তোর লজ্জা করে না নুকু? পার্টির চেয়ে বিনয়প্রকাশের প্রেম তোর কাছে বড় হ'ল? নুকু, তোকে আমি দ্বিতীয় সুযোগ দিলাম। আর কিন্তু ভুল করিস না।"

পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। রাস্তা পার হয়ে চলে এলাম গাড়িতে। গাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "অনীতার খবর পেলি কেমন করে?"

"শোভাযাত্রার মধ্যে দিদিও ছিল। দেখনি, একখানা কালো সাড়ি পড়েছে দিদি? আমি জানি দিদির শোকই সব চেয়ে সত্যি। দীপুদা, একটা সিগারেট দাও তো।" নুকু সিগারেট ধরাল।

আমার সংগে নুকুও কুইনস পার্কের বাড়িতে এলো। বাবার অফিস ঘরে অনেক দর্শনপ্রার্থী বসে রয়েছেন দেখলাম। বাইরের বারান্দায় একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। নুকু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম?"

"অবিনাশ দত্ত।"

"আপনিই কি বিজ্ঞান কলেজের ডক্টর দত্ত?"

একটু হেসে তিনি বললেন, "হাঁ। অবিশ্যি ডক্টরেট পেয়েছি মাত্র তিন মাস আগে।—দিল্লির দিকে একটা ভাল চাকরির সন্ধান করছি।"

"কেন, বিজ্ঞান কলেজে অসুবিধা কি? মাইনে কম বুঝি?" প্রশ্ন করল নুকু।

"ডক্টরেট পাওয়ার পর আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে। হয়তো কর্তৃপক্ষ মনে করেন আমার গবেষণার মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।" একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের হাজার রকম পরিকল্পনা চালাবার জন্য হয়তো আমাদের মত লোকের প্রয়োজন হতে পারে। মিঃ চৌধুরী কি আমায় কোন সাহায্য করতে পারেন না?"

"জ্যেঠামশাই এখন পর্যন্ত কোন নতুন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেননি। তাঁর দফ্‌তরে হয়তো পাঁচ ছ'শ টাকার চাকরি যোগাড় হতে পারে। কিন্তু আপনার পক্ষে সে-সব কাজ সুবিধার হবে না ডক্টর দত্ত।"

"মাইনের জন্য হয়তো আমার খুব বেশি অসুবিধা হ'ত না। স্বাধীন ভারতে আমাদের জন্য যদি কোন কাজকর্ম না থাকে তবে পল্লীগ্রামের পোষ্ট মাষ্টার হতেও আপত্তি নেই। কিন্তু……।" বাধা দিয়ে মুকু বলল, "ডক্টর দত্ত, সন্ধ্যার দিকে একবার আসুন না? ধরুন পাঁচটা। এইখানেই? নয়তো চলুন, ফারপোতে চা খাওয়া যাক? আপত্তি আছে না কি?"

"দেখা করতে আপত্তি নেই। তবে পাঁচটায় অসুবিধা হবে।"

"কেন, মিসেস দত্ত বুঝি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন?"

"কোন্ মিসেস দত্ত?

"আপনার স্ত্রী।"

"আমি এখনও অবিবাহিত। চুল পেকেছে একটু অসময়ে।"

মুকু এবার সোজাসুজি ডক্টর দত্তর চোখের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা আপনাকে নিরাশ হতে দেব না।"

বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে একটা লতাগাছ ঢুকে পড়েছে। মুকুর পায়ের কাছে গাছের কচিমাথাটা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে সম্ভবত মুকুর কথা শুনছিল। লতাগাছটার মধ্যে কেবল জীবনীশক্তির প্রাচুর্যই ছিল না, ছিল ফলের প্রতীক্ষা। জীবন্ত লতাগাছটায় ফলের বিপ্লব আসতে আর বেশি দেরি নেই। দু'চারটা ছোট ছোট ফুল মুকুর পদপ্রান্ত স্পর্শ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

নীচু হয়ে একটা ফুল তুলে নিল মুকু। বলল, "ডক্টর দত্ত, আপনার দ্বারা অনেক কাজ হবে। বিজ্ঞানের কাজ, দেশের ও দশের কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বৈজ্ঞানিক ডক্টর বেণীপ্রসাদের মত বড় চাকরি আপনাকে আমরা নিতে দেব না। ফুল ছোট হ'লেও ফুল—আমরা পা দিয়ে মাড়াব না।"

"কেন? আমি কি উপযুক্ত নই মিস্ চৌধুরী?"

"আপনিই তো সত্যিকারের উপযুক্ত লোক। কারণ আপনি কাজ করতে চান। ডক্টর বেণীপ্রসাদ কাজ করেন না। স্তুতি ও স্তোত্র লেখেন।" বিস্মিত ভাবে ডক্টর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে?"

"তিনি প্রধান মন্ত্রীর নামে স্তোত্র লিখেছেন এবং দিল্লির বহু লোক তা পড়েছেন। বিজ্ঞানের বারবেলায় তিনি উপনীত, যাত্রা তাঁর ব্যর্থ হবেই। আমরা স্তোত্র চাই না। আমরা চাই খাঁটি বিজ্ঞান। জীবন ও জগতকে নেড়ে চেড়ে দেখবার বিজ্ঞান। স্তোত্র নয়। বড় চাকরি পাওয়ার জন্য আপনি কি স্তোত্র লিখতে পারেন? পারেন না। আপনার মধ্যে মস্ত বড় সম্ভাবনা রয়েছে, বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। আমরা সন্ধ্যা পাঁচটার সময় আজ তাহ'লে মিলিত হচ্ছি কোথায় ডক্টর দত্ত?"

"এইখানেই মিস চৌধুরী।"

আমি লক্ষ্য করলাম ডক্টর দত্তের চেহারার পরিবর্তন হ'ল। সমস্ত মনের ওপর যেন আশা ও উৎসাহের ঢেউ বইতে লাগল। তিনি হঠাৎ একটা বড় চাকরি বুঝি পেয়েই গেছেন, এমন একটা নিশ্চয়তা নুকু যেন তার বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্ট করে তুলল। শ্রোতা হিসাবে আমারও কম উৎসাহ বাড়ল না। উৎসাহ বাড়ল এই জন্য যে, বিজ্ঞান কলেজে আমাদের দলের একজন সভ্য বাড়ল। কেরানির চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের আমরা বেশি সম্মান দিই। নুকু পুনরায় আরম্ভ করল, "ঐ ঘরে বাংলার দু'জন মন্ত্রী রয়েছেন, চিনতে পারলেন কি?"

ডক্টর দত্ত বিশেষ আশ্চর্য হয়েই বললেন, "না তো! চেহারা দেখে তো মন্ত্রী বলে চিনতে পারলাম না।" নুকু তার কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসের আবেগ তুলে বলল, "কথা শুনেও চিনতে পারবেন না। চেনা অসম্ভব। নাম দুটো যদি ব্যক্ত করি তাতেও চিনতে পারবেন না। আপনার মত শিক্ষিত লোক ক'জন মন্ত্রীর নাম বলতে পারবেন? বড় জোর চারজন। দেখুন ব্যাপার কি গুরুতর! আমাদের মন্ত্রীরা আমাদের জীবনের দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যেও আনাগোনা করেন না। আমাদের কাছে তাঁরা অপরিচিত। কিন্তু লাভ হ'ল কি? কেউ তাঁদের চিনল না, কেউ তাঁদের দেখল না। আপনি দেখে এবং কথা শুনেও বুঝতে পারলেন না তাঁরা বাংলাদেশের মন্ত্রী। অন্যান্য দেশে সম্ভব হ'ত কি?"

আমি এ-পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি। তাই বললাম, "ওঁদের দোষ দিয়ে লাভ কি নুকু? আমরাই তো ওঁদের মন্ত্রী করেছি?" ছেলেমানুষের মত চোখ দুটো নুকু বড় বড় করে বলল, "আম্-রা? ধরে নেওয়া যাক আমরাই। আমরা ভুল করেছি বলে ওঁরা ভুল করবেন কেন? জনসাধারণের মধ্যে শতকরা পনরো জন লিখতে পড়তে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদের দশজনের মধ্যে দশজনই শিক্ষিত। শতকরা কত হ'ল দীপুদা? তাছাড়া তোমাকে কিংবা ডক্টর দত্তকে আমরা একান্ন ভাগ ভোট দিয়ে যদি হঠাৎ ফিল্ড মার্শাল করে দিই তা হ'লে তোমরা কোন্ ফিল্ডে গিয়ে যুদ্ধ করবে? নিজের সৈন্য ও শত্রুসৈন্যরা হাসবে না? আপনি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলেই তো একান্ন ভাগের ভুল আপনি শুধরে নেবেন। কাউকে মজা লুটতে দেবেন না।"

আমি বললাম, "ডক্টর দত্তের বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে নুকু।" ডক্টর দত্ত এতক্ষণ তন্ময় হয়ে নুকুর কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "হাঁ আমি যাচ্ছি। বিকেল পাঁচটায় আসব। খুব ভাল লাগল আপনার আলাপ আলোচনা। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশে যে দশজন মন্ত্রী আছেন তা আমি আজ প্রথম জানলাম। আমার জ্ঞান বাড়ল। বাংলাদেশ যে মন্ত্রীরা শাসন করছেন তা বোধহয় আমি জানতামই না। আসল কথা বিজ্ঞান কলেজের বাইরে আমি বিশেষ কিছু জানি না। এবং বিজ্ঞান কলেজের ভেতরে পদার্থ বিজ্ঞানের বাইরে যেটুকু আমার জানবার ছিল তা আমায় অনীতা জানিয়েছে।"

নুকুর মনে উৎসাহের প্লাবন এলো। জিজ্ঞাসা করল, "কি জানিয়েছে?"

"আমার মতো লোকের কোনদিনই চাকরির উন্নতি হবে না।"

"দিদি তাহ'লে আপনাকে সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু দিদি আপনাকে বলতে যাবে কেন ডক্টর দত্ত?"

"অনীতা আমার ছাত্রী। আমায় আজ মিঃ চৌধুরীর সংগে দেখা করাবার জন্য সে নিজেই সব ব্যবস্থা করেছিল। নইলে তিনি যে একজন মন্ত্রী তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। না জানার সব চেয়ে বড় কারণ আমি

দৈনিক খবরের কাগজ পড়ি না। কিন্তু অনীতা আমায় সময় দিয়েছিল সাড়ে দশটা। এখন বোধহয় সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। অনীতা সম্ভবত অন্য কোন কাজে ব্যস্ত আছে। থাক, তাকে আর এখন খবর দেওয়ার দরকার নেই।"

ঝুকু বলল, "খবর দিলেও দিদিকে পাওয়া যাবে না। কারণ দিদি এখন বাড়ি নেই।"

"ও হাঁ। অনীতা বলেছিল, হয়তো বাড়ি ফিরতে ওর একটু দেরি হবে। কিংবা না-ও ফিরতে পারে।"

"তবে জ্যেঠামশাইয়ের সংগে আপনার দেখা করাবার কি ব্যবস্থা করে গেছে দিদি?"

"মনে পড়েছে। অনীতা বলেছিল, সে সব ব্যবস্থাই পাকা করে গেছে। কেবল আমার নামটা তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলেই হবে।"

"তা হ'লে আমি আপনার নামটা পৌছে দিয়ে আসি ডক্টর দত্ত। সত্যি, আপনাকে ধরে রেখে আমি খুবই অন্যায় করেছি।"

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে ডক্টর দত্ত বললেন, "অন্যায়? আমাকে বেঁধে রাখলেও আমি খুসি হতাম। আপনি যা আমায় জ্ঞান দান করলেন তার প্রতিদান আমি আপনাকে কোনদিনই দিতে পারব না। এখন ভাবছি, পাড়াগাঁয়ের দিকে কবে পর্যন্ত পৌছতে পারব, মানে লুকতে পারব।" ঝুকু জিজ্ঞাসা করল, "পাড়াগাঁয়ে যাবেন কেন?"

"তা ছাড়া মুক্তি কোথায়? মন্ত্রীরা তো পাড়াগাঁয়ে যাবেন না।"

"আপনার ভয় কি?"

"কলকাতায় থাকলে যদি স্তোত্র লিখতে হয়? স্তোত্র লিখতেই হবে কারণ অনীতা আমার জন্য একটা বড় চাকরি ঠিক করে ফেলেছে। মিঃ চৌধুরীর অসীম দয়া। আমায় মাফ করবেন মিস্ চৌধুরী, আমি এবার পালাই।"

ডক্টর দত্ত সত্যি সত্যি পালাবার জন্য পা বাড়ালেন। ঝুকু পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পালাচ্ছেন কেন?"

"আপনার জ্যেঠামশাই দিল্লি থেকে আমার জন্য নিয়োগপত্র সংগে এনেছেন। হাতে-হাতে দেবেন বলে কথা আছে।"

ঝুকু অনুরোধের স্বরে বলল, "তা হ'লে নিয়োগপত্র আপনার নিয়ে যান ডক্টর দত্ত।"

"পথ ছাড়ুন মিস্ চৌধুরী, আমায় আর লজ্জা দেবেন না। ফিল্ড মার্শাল তো দূরের কথা, বন্দুক কখনও ছুঁয়ে দেখিনি। আমি ভোটও চাই না, নিয়োগপত্রও চাই না।"

ঝুকু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এত ঘামছেন কেন? পাখার তলায় বসবেন চলুন।"

"পাখা? আমায় লজ্জা দিয়ে মেরে ফেলবেন নাকি? এখনও উত্তাপ আছে বলে ঘামছি। এর পর উত্তাপ আর একটুও থাকবে না।"

ঝুকু জিজ্ঞাসা করল, "তা হ'লে পাঁচটার সময়..."

কথাটা টেনে নিয়ে তিনি বললেন, "আসব। অতি অবশ্য আসব। কিন্তু এখানে নয়।"

"কেন?"

"অনীতা আমার পকেটে জোর করে নিয়োগপত্র গলিয়ে দেবে। অতএব এখানে নয়। চলুন, পালিয়ে কোথাও আমরা দেখা করি। ধরুন, ইডেন উদ্যানে? আপনার যদি ভয় করে তবে অন্ধকার হওয়ার আগেই পালিয়ে আসব।"

এই সময় অনীতা এলো। শোকের পরিচ্ছদে অনীতাকে চমৎকার মানিয়েছে। কিন্তু ভয়ে ডক্টর দত্তের মুখ শুকিয়ে গেল। নিয়োগপত্রের ভয়! ডক্টর বেণীপ্রসাদের কিংবা অন্য যে-কোন লোকের কাছে যা চরম লাভ ডক্টর দত্তের কাছে তা নিকৃষ্ট লোকসান। অনীতাকে দেখবার সংগে সংগে ডক্টর দত্ত বারান্দার এক কোণায় গিয়ে এমন ভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি অনীতাকে দেখেননি। অনীতা তাঁকে ততটুকু সুযোগও দিল না। একেবারে

তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "স্যার্, আপনি বাবার সংগে দেখা করেন নি?"

ডক্টর দত্তর তোতলামি সুরু হ'ল, "হাঁ, না—না, হাঁ, মানে এখনও যাইনি। আর গিয়ে লাভ নেই অনীতা।"

"কেন স্যার্?"

"আমি পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছি। আমার মূর্খতা কেটেছে। তোমার বোন আমায় সত্যের পথ দেখিয়েছেন। আমি চললাম। তুমি আমার সংগে একবার বিজ্ঞান কলেজে দেখা ক'রো।"

ডক্টর দত্ত দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলেন। তিনি ভুল রাস্তায় হাঁটছিলেন, আমাদের বাড়ির ভেতর দিকে। নুকুও পেছনে পেছনে গেল। বলল, "এ-রাস্তায় না ডক্টর দত্ত। আসুন, আপনাকে আমি পথ দেখাচ্ছি।" ডক্টর দত্তের সংগে সংগে নুকুও অন্তর্হিত হ'ল। আমি ভাবলাম নুকু যদি আর না আসে তা হ'লে ভালই হয়। নুকু আর অনীতাকে দু'দিকে রেখে আমি মাঝখানে থাকতে চাই না। বিশেষ করে আজকে নুকুর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অনীতা আমায় জিজ্ঞাসা করল, "ডক্টর দত্তের সংগে নুকুর পরিচয় ছিল নাকি?"

"ছিল না। আজকেই হ'ল।"

"তুমি জান না দাদা, ডক্টর দত্তের সংসারে কী অভাব অনটন! বুড়ো মা বাবা দেশে থাকেন। এক ভাই বিলেত গেছে। তাঁর সব খরচ তিনি দেন। একটি বোন ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। তারপর বুড়ো বাপ-মাকে টাকা পাঠাতে হয়। ভাই-বোনকে মানুষ করবার জন্য ডক্টর দত্ত ষোল বছর বয়স থেকে উপার্জন করেন।"

"কি রকম? চাকরি করতেন বুঝি?"

"না। ছাত্র পড়াতেন। এখনো পড়ান। একজন নয়, তিনজনকে পড়ান। ভাই-বোনদের জন্য তিনি নিজে বিয়ে করেন নি।"

আমি বললাম, "খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।" একটু ভেবে নিয়ে অনীতা বলল, "এমন লোক এত বড় একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেলেন কি করে তাই ভাবছি। তাঁর জন্য ডক্টর বেণীপ্রসাদকে খানিকটা খোসামোদও করতে হয়েছে বাবার।"

আমি বললাম, "বেণীপ্রসাদ নিশ্চয়ই অবাক হবেন। খুবই অবাক হবেন যে, চিরদরিদ্র বাংলাদেশে এমন লোকও আছেন যাঁর কাছে বড় চাকরিও কেবল চাকরবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"সত্যিই আছেন হয়তো। কিন্তু মুকু ডক্টর দত্তকে কোন অসম্মানজনক কথা বলেনি তো দাদা?"

"মুকু কেবল তাঁকে বলেছে যে, গবেষণার ক্ষেত্র ছেড়ে বৈজ্ঞানিকের বড় চাকরির জন্য দিল্লিতে ছুটে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া মুকুর কথায় যদি সত্য না থাকবে তাহ'লে তিনিই বা নিয়োগপত্র গ্রহণ করতে অতটা লজ্জা পেলেন কেন? অনীতা, তোর কি একবারও মনে হয় না যে, স্বাধীন ভারতে ডক্টর দত্তের জন্য বাবার খোসামোদ করার দরকার ছিল না?"

"দাদা, মানুষ তো ভুল করবেই। কংগ্রেসেরও ভুল হবে। কিন্তু গোটা কংগ্রেসটাই ভুল একথা তুমি তো প্রমাণ করতে পারনি।"

"তুই কি প্রমাণ করতে চাইছিস অনীতা?"

"আমি কেবল বলতে চাইছি যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে কোন গলদ নেই। ভুলত্রুটি সবারই হওয়া সম্ভব। কংগ্রেস নেতাদেরও হয়েছে। আমি জানি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে তোমরা দিনরাত হাসিঠাট্টা করো। কিন্তু একজন লোকের নাম করো না যাঁর হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার তুলে দেওয়া যায়? দাদা, আমরা যদি কেউ সহযোগিতা না করি তা হ'লে তুমি আর মুকুও ভারতবর্ষ শাসন করতে পারবে না।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেতরে খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে অনীতাকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "ধর আমি আর নুকু ভারতবর্ষের শাসনভার পেলাম। কেন শাসন করতে পারব না?"

"কেন পারবে?"

"আমরা তো তোর শ্রীচরণের যুগলদাস। হাত জোড় করে বসে আছি তোর বাণী শুনবার জন্য। তুই বল্ কেন পারব না?"

"পারবে না এই জন্য যে, আমরা কেউ সহযোগিতা করব না। যেমন জগতের সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্কও ফেল পড়বে যদি সবাই তাদের সব টাকাই তুলে নেয়।"

"আমরা যদি সব টাকা তুলতে না দেই?"

"আমার ব্যাঙ্কের টাকা যদি আমার তুলবার অধিকার না থাকে, তা হ'লে সে-টাকা আমার নয়।"

এই সময় নুকু এসে অনীতার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। অনীতাকে জিজ্ঞাসা করল, "দিদির বুঝি অনেক টাকা?"

অনীতা বলল, "ছিল, কিন্তু দাদা কেড়ে নিচ্ছে। নিজের টাকা যখন নিজে তুলতে পারব না তখন বুঝতে হবে ব্যাঙ্কটাও আর ব্যাঙ্ক নয়। মজুত টাকায় কিছুদিন তোমার চলবে, তারপর আর কেউ টাকা দেবে না।"

আমি বললাম, "কারো কাছে উদ্বৃত টাকাও আমরা রাখতে দেব না।"

"হাঁ, জোর করে কয়েকটা দিন কিছু কাজ হয়তো করতে পারবে। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হবে না। তোমাদের রুসিয়াতেও হয় নি। সাইবেরিয়ার দিকে চোখ ঘোরাও; দেখতে পাবে বড় বড় কলকারখানা থেকে দিবারাত্র ধূম নির্গত হচ্ছে। কার ধূম? কোটি দাসের দেহ পুড়ছে। মধ্যযুগের গ্যালিস্লেভরা বিংশ শতাব্দীর কম্যুনিষ্ট। মধ্যযুগের দাসপ্রথা এ-যুগের বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদ। বংশমর্যাদা তোমরা মানো না। কিন্তু জহরলালের বংশমর্যাদা না থাকলে তোমরা সব স্লেভ-লেবার ক্যাম্পেই থাকতে।"

নুকু বলল, "দীপুদা, দিদির দৃষ্টি কেবল বেথেলহেম পর্যন্ত বিস্তৃত নয়,

সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত।” অনীতার দিকে ঘুরে নুকু জিজ্ঞাসা করল. “দিদি, তুমি আজ শোকের পোযাক পরেছ কেন? দাসমজুরদের দুঃখে না কি?”

অনীতা এবার আমার দিকে চাইল। অনীতা মিথ্যা কথা বলবে না জানি। তাই হয়তো জবাবটা সহসা দিতে পারল না। মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। জহরলালকে সমর্থন করার চাইতে নিজেকে সমর্থন করা যেন খুবই কঠিন বলে মনে হতে লাগল অনীতার। একটু পরে অনীতা বলল, “কমলবাবুর একজন বন্ধু কাল মারা গেছেন।”

“কমলবাবু কে দিদি?” নুকু চঞ্চল হয়ে উঠল।

“দাদা, তুমি নুকুকে বুঝিয়ে দিও কমলবাবু কে।”

“হাঁ, তাই ভাল নুকু। পরে আমি তোকে বুঝিয়ে দেব। কিন্তু অনীতা, কমলবাবুর বন্ধুটি কে?”

“ঐ যে কে একজন কমরেড অমল রায়।”

“কমরেড? কম্যুনিষ্ট নাকি?”

“অমল রায় কম্যুনিষ্ট বটে কিন্তু কমলবাবু নন। কেবল বন্ধু বলেই কমল বাবু আজ তাঁর শবদেহ বহন করেছেন।”

নুকুর মুখ পাংশু হয়ে গেল। নুকুর পক্ষে এটা বোঝা অসম্ভব হ’ল না যে, বিনয়প্রকাশ অনীতার কাছে কমলবাবু। সে জিজ্ঞাসা করল, “মৃত কম্যুনিষ্টের শবদেহ-শোভা-যাত্রায় তুমি যোগ দিলে, তাতে পাপ হ’ল না দিদি?”

“না। আমি ওদের দলের লোক নই। কমলবাবুর অনুরোধে আমি কেবল মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়েছি।”

“কেবল মৃতের প্রতি নয়, কমলবাবুর অনুরোধ তুমি উপেক্ষা করতে পারনি দিদি। বোধহয় ভালই হ’ল। মৃত কম্যুনিষ্টের আত্মা সাইবেরিয়ার ফানিল দিয়ে ধূমাকারে বেরবার দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেল। দীপুদা, কম্যুনিষ্টদের কি আত্মা থাকে? দিদি, তুমি কি ঠিক জানো কমলবাবু কম্যুনিষ্ট নন?”

"বিনা কারণে মানুষ কেন মিথ্যা কথা বলবে, তা তো বুঝতে পারি না। কমলকে আমি ভালবাসি নুকু।"

"কবে আমরা সন্দেশ খাব দিদি?" নুকু তার দু'হাত দিয়ে অনীতার গলা জড়িয়ে ধরল, "এখন কি খাব দীপুদা? একটা সিগারেট দেবে?"

আমি টিন্ এগিয়ে দিলাম।

নুকু জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, কমলবাবু যদি কম্যুনিষ্ট হন?"

"বিশ্বাস করতে ভয় হয়। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ ভুল করছে। কমলের ভুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আমি ওর ভুল ভাঙব।"

"খুবই শক্ত কাজ। আচ্ছা দিদি, তোমরা যাকে ভুল বলছ সেটা তোমাদের ভুল, না মার্কসবাদের ভুল?"

"আসলে সেটা লেনিনবাদ ও স্টালিনবাদের ভুল। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সব ভুল। মার্কসবাদের মধ্যে খানিকটা সত্য থাকা সম্ভব। নুকু, ভয়টা তোর কার জন্য? আমার জন্য না কমলের জন্য?"

অন্যমনস্ক ভাবে নুকু বলে ফেলল, "বোধহয় আমার নিজের জন্য দিদি।"

"কেন? কেন রে?"

"বোধহয় সাইবেরিয়াতে গিয়েই আমার মরণ হবে। নিশ্চয়ই হবে, তুমি যদি কোন রকম ভুল করে বসো।"

"এ-কথা কেন বলছিস রে নুকু?"

"বলছি এই জন্য যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঘুণ ধরে গেছে। ভেতর থেকে সব খেয়ে গেছে। একটু জোরে ধাক্কা মারলে সবই পড়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি পড়ো তা হ'লে মানবসমাজের আর থাকবে কি?"

"আমার মনে হয় ঘুণ ধরেছে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে।"

"সেই জন্যই তো বেশি ভয় দিদি। কমল-ঘুণে যদি তোমার সবটাই ঝরঝরে হয়ে যায়, তোমায় তো যীশুখৃষ্টও রক্ষা করতে পারবেন না। যেমন শংকরাচার্য বাবাকে রক্ষা করতে পারেন নি।—আমার একজন বাবা আছেন।

ভাবলে মনে হয় কোন্ এক বিস্মৃতপ্রায় হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফিরে গেলাম! কোথায় হরপ্পার বাবা আর কোথায় তাঁর স্টালিনগ্রাডের নুকু!"

আশ্চর্য হয়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "স্টালিনগ্রাড? স্টালিনগ্রাডে কবে গেলি?"

"যাইনি দিদি। না গিয়েই উত্তেজনার সীমা নেই। অর্থাৎ স্টালিনগ্রাডের রক্ষীদলের মত আমিও যেন অহর্নিশ চারদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছি। যুদ্ধ, ক্রমাগত যুদ্ধ। সমাজের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, মা-বাপের বিরুদ্ধে, এমন কি বোনের বিরুদ্ধেও আমায় যুদ্ধ করতে হচ্ছে। দিদি, তুমি আমায় ছোটবেলা থেকেই ঘেন্না কর, না?"

"না রে বোকা মেয়ে। ঘেন্না আমি কাউকে করি না। তোর ওপরে রাগ হয় খুব।"

"কেন?"

"তুই কেন কম্যুনিষ্ট হতে গেলি?" নুকু চমকে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কি করে বুঝলে?"

"আমি অনেকদিন আগেই জানতাম তুই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিস। তোর মনের মধ্যে কম্যুনিজমের পোকা পড়েছে তা আমি একদিন দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুই ফিরে আয় নুকু। চৌধুরী বংশের শিক্ষার সম্পদ আমরা পেয়েছি। রাজনীতি করবার যদি ইচ্ছা থাকে, আমরা গিয়ে দাঁড়াব নেহেরুর পাশে। তাঁকে আমরা আশা দেব, ভরসা দেব, সাহায্য করব। দু'মুঠো চালের জন্য কম্যুনিজম আমদানি করবার প্রয়োজন নেই। নেহেরুর ব্যক্তিগত সততা সব কিছু সন্দেহের উর্দ্ধে। এমন লোককে যদি আমরা আজও ঠকাই, সহযোগিতা না করি, তা হ'লে ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাদের ক্ষমা করবে কেন?"

নুকু জিজ্ঞাসা করল, "নেহেরুর আশেপাশে অতগুলো মেদমজ্জার স্তূপ রয়েছে। তারা আমাদের জায়গা দেবে কেন দিদি?"

"দেবে। আমরা গেলে ওরা জায়গা ছেড়ে দেবেই। আয় না একবার চেষ্টা করি ?"

"দিদি, কমলবাবুকে সংগে নেবে না ?"

"তুই কথা দে, তা হ'লে তাকেও সংগে নেব।"

"আমি কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ দীপুদা ?"

আমি বললাম, "আমাকে নিয়ে টানাটানি করিস না। রাজনীতির আগুন আমার সহ্য হয় না।"

নুকু জিজ্ঞাসা করল, "কমলবাবুকে আমরা কবে দেখতে পাব দিদি ?" অনীতা খুব গম্ভীর ভাবেই জবাব দিল, "তোকে আমি দেখাব না।"

"কেন ?"

"তুই যদি ওকে কম্যুনিষ্ট করে ফেলিস ?" অনীতা কথাটা বলল হাসতে হাসতে। নুকু কিন্তু হাসল না। আমি বললাম, "অনেক বেলা হয়েছে। চল্ নুকু, আমরা গোয়াবাগানে ফিরে যাই।"

নুকু বলল, "আজ আর আমি গোয়াবাগানে যাব না। আমি জ্যেঠাইমার কাছে থাকব। আমার মা নেই, তোমরা আমায় থাকতে বলো না কেন ?"

অনীতা এবার নুকুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই আমার কাছে থাক নুকু। সমস্ত জীবনভর থাক।"

"দীপুদা, দিদি কি বলে শুনেছ ? তুমি ভা-রি স্বার্থপর তো। নিজে কমলবাবুকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন আর আমি তাই সমস্ত জীবন বসে বসে দেখব ? না দিদি। এই যা, দীপুদা! আমার বোধহয় হার্ট খারাপ হয়েছে। ডান দিকটায় কি রকম মোচড় দিয়ে উঠল।"

অনীতা বলল, "হার্ট তো ডান দিকে থাকে না।"

"তা হ'লে বোধহয় বাঁ দিকেই মোচড় দিয়েছে। চলো দীপুদা, পালাই।"

"না, নুকু। তোকে আজ আমি যেতে দেব না। তুই আমার কাছে থাক।" অনীতা নুকুকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ বেলা সাড়ে বারটা পর্যন্ত আমি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করিনি। ঘুমই নি কিংবা ভাতও খাইনি। তবু আমার শ্রান্তি এলো না কিংবা ক্ষিধে পেল না। এত ঘটনা আর এত কথা এমন ভাবে আমার মনে ভিড় করতে লাগল যে, আমি ভাবলাম, সমস্ত জীবন বোধহয় আমি আর ঘুমতে পারব না। পিপলস্ কোর্ট থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর। কেবল বিস্ময়কর নয়, বিপ্লবের বারুদ দিয়ে ভরপুর।

কমরেড, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রশ্ন করবে যে, সন্দেহ যখন হ'ল তখন কেন আমি পার্টি থেকে বেরিয়ে এলাম না। আমার রাস্তা তো খোলাই ছিল। আমার উত্তর—কম্যুনিষ্টের জীবনে দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

আমি বুঝেছিলাম নুকু প্রতি মুহূর্তে মরছে। তাকে আমি দ্বিতীয় রাস্তার সন্ধান দিতে পারিনি। ছোটবেলা থেকে নুকুর অভিভাবকত্ব আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম; স্বীকৃতির মধ্যে মস্তবড় সম্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম নুকু কোনদিনও ব্যর্থ হবে না। আজ যখন সে অনীতার হাত ধরে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি স্পষ্ট দেখলাম, নুকু পিপলস্ কোর্টের আসামী অমল রায়ের মত পাংশু হয়ে গেছে। মনে মনে যেন আন্দাজ করতে লাগলাম নুকুর বিচারের একটা মোটামুটি তারিখ।

বাবা অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দর্শনপ্রার্থীরা সব বিদায় নিয়েছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "এম্. এ. পরীক্ষাটা দিবি না?"

"না। বিপদে না পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আমি মাড়াব না বাবা।"

"চল্। বাগানে বেঞ্চি পাতা আছে, তোর সংগে একটু ঘরোয়া আলাপ করি। রাজনীতি নয়।"

বেঞ্চিতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজনীতি নয় কেন?"

"ওসব বড্ড ঝকমারী ব্যাপার, তুই বুঝবি না।"

"না বুঝি তোমায় জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু শুনতে আপত্তি কি? দিল্লির রাজ-

নীতি আজকাল সবাই শুনতে চায়।" বাবা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "এম্. এ. যদি না পড়িস তবে কি করবি ? বিলেত যাবি ?"

আমি বললাম, "না।"

"তবে ?"

"ভাবছি ব্যবসা করব।"

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যবসা ?"

"আমদানি ও রপ্তানি। প্রধানত আমদানী। স্বাধীন ভারতবর্ষে বাইরে থেকে কেবল আনতেই হবে। কারণ আমাদের গড়বার দিন আসছে বাবা।"

"হাঁ। মাল আমদানি করবার দিন এসেছে দীপু, বেশি রেটে এবং খারাপ মাল।"

"হাঁ। অনেকটা দিল্লির রাজনীতির মত। যত বেশি পচা তত বেশি চড়া দাম।"

একটু অবাক হয়ে বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "জ্ঞানশংকর তার পামির কোম্পানির অর্ধেক শেয়ার বিক্রি করতে চায়। ইচ্ছা করলে তুই কিনতে পারিস।"

"কাকা নিশ্চয়ই অনেক টাকা দাম চাইবেন।"

"হাঁ, সে পাঁচ লাখ চায়। সেই জন্যই আমি তাকে কিছু বলিনি দীপক। আমার নিজের অত টাকা নেই।"

"আমি ভাবছি গোয়াবাগানের বাড়িটা বাঁধা দিয়ে লাখ পাঁচেক নিয়ে নিই। অবিশ্যি তুমি যদি মত দাও এবং কথাটা গোপন রাখো। তোমার কি মনে হয় না বাবা যে পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ মাসের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে পারব ?"

"জ্ঞানশংকর যে-পরিমাণ কনট্রাক্ট পেয়েছে তাতে মনে হয় নিশ্চয়ই পারবি। কিন্তু তোর ঠাকুরদা...।" এই পর্যন্ত বলে তিনি থেমে গেলেন। আমিও তাঁর সংগে সংগে মাথা নীচু করে যেন কথাটা গভীর ভাবে ভাবতে লাগলাম। বাবা এবার বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লেন। বাগানের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,

"জ্ঞানশংকর প্রধান মন্ত্রীর বন্ধু। বিলেতেই চেনা পরিচয় ছিল। তিনি জ্ঞানশংকরকে মস্কো পাঠাতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত করে। জ্ঞানশংকর রাজি হয়নি।"

"কেন বাবা?"

"পামির কোম্পানির বিরাট মুনাফা ছেড়ে দিয়ে সে বোধহয় রাষ্ট্রদূত হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেনি।"

"ভালই হয়েছে। মস্কো গেলে ছোটকাকা হয়তো কম্যুনিষ্ট হয়ে ফিরে আসতেন।"

"কম্যুনিষ্টদের কোন ভবিষ্যৎ নেই দীপক। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় এসেছে। এখন কম্যুনিজমের শেকড় ভারতবর্ষের মাটিতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

"এটা তোমার নিজের মত নাকি বাবা?"

"না, কেবল নিজের নয়। দিল্লিতে সর্বভারতীয় নেতাদের সবারই মত। শুধু রাজাজি ছাড়া।"

"তিনি কি বলেন?"

"তিনি বলেন হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া সাময়িক। ভারত ও পাকিস্তানের বিবাদ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সব চেয়ে বড় ভয় কম্যুনিজম।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "দক্ষিণ ভারতের হিন্দু এবং খৃষ্টানরা সব চেয়ে গোঁড়া। কম্যুনিজমের শেকড় সেইদিকেই তো সব চেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে বাবা। এই সম্বন্ধে সর্বভারতীয় নেতারা কি বলেন?"

"কিছুই বলেন না। দিল্লিতে আসেন কেবল ঘুমবার জন্য। এমন নিরুদ্বেগে ঘুমনো তাঁদের নিজের প্রদেশে সম্ভব হয় না।"

"কেন?"

"পাওনাদারের অত্যাচারে। মিটিং-এ যোগ দেওয়ার মজুরি এবং আসা যাওয়ার ভাড়ায় ওঁদের পোষায় না দীপক। সবাই অসন্তুষ্ট, সবাই রক্তের চাপ কিংবা বহুমূত্র রোগে ভুগছে।"

"তা হ'লে ত্রিশ কোটি লোকের উপায় হবে কি?"

"উপায় আর কি, দেশশুদ্ধ সবাইকে ভোগাবে। সেইজন্যই তো দল চাই। আমি আলাদা একটা দল গড়ব। সেইজন্যই আমার টাকা চাই। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস আমায় টিকিট দেবে না।" বাবা বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। পা দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে স্থরু করলেন। যেন কুইনস্ পার্কের মাটিতে খোঁচা মারলেই টাকার খনি বেরবে! ঘুরতে ঘুরতে তিনি আবার বেঞ্চির কাছে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, ত্রিশ কোটি লোকের সমস্যা মেটাবার কোন উপায় কি ওঁরা বার করতে পারেননি?"

"দিল্লির রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটা একবার করে দেখ্ না? সবাই কামড়াতে আসবে। তাঁরা চিৎকার করে উচ্চারণ করবেন কেবল একটি অক্ষর—'হিন্দি'। সর্বরোগের মহৌষধ এই হিন্দি! কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি, এ কোন্ রকমের দাওয়াই? বেহালার পাঁচনের মত শতকরা একজনের রোগ সারাতে পারলেও তাকে ওষুধ বলা যেত। কিন্তু এ তাও নয়।"

"তা হ'লে বাড়িটা বাঁধা দিয়ে ফেলব তো বাবা?" আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাবা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। বারান্দায় উঠে তিনি বললেন, "জ্ঞানশংকর কালই কলকাতায় আসছে। যা করবার ভাল করে বুঝেসুঝে করিস। হাঁ রে, বিশুর নাকি ডবল নিমোনিয়া?"

"হাঁ বাবা। কিন্তু মরবার ভয় নেই। পেনিসিলিন চলছে।"

মা একটু আগেই আজ তিনতলা থেকে নামতে চাইলেন। জগদ্ধাত্রীর কাছে নিবেদন করলেন, "আমার স্বামী দিল্লি থেকে এসেছেন। একটু আগেই আজ যাচ্ছি। আমি যাব কি?" মা স্পষ্ট দেখলেন জগদ্ধাত্রীর ঠোঁটে হাসি! তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে না তুলতে পারলে কালিঘাটের কারিগরের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেত। ঠাকুর-ঘরে একটা দেওয়াল-ঘড়ি ছিল। ঘড়িতে

যখন ঠিক দেড়টা বাজল মা ছাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলেন। আর একটু বেশি চমকালে তিনি চিৎকার করে উঠতেন।

নুকু খোলা দরজা দিয়ে মার পূজো দেখছিল। নুকু বলল, "তোমার পূজোর ঘরটা কি সুন্দর জ্যেঠাইমা!" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেবল ঘরটাই সুন্দর?" নুকু বলল, "না, তা কখনও হয়? ঘরটাকে আলো করে রেখেছেন জগদ্ধাত্রী। জ্যেঠাইমা, মূর্তির পেছনের জানলাটা খুলে দাও, আরও বেশি আলো আসবে। অন্ধকারনাশিনী জগদ্ধাত্রীর পেছন দিকটা অন্ধকার রাখলে তিনি রাগ করবেন জ্যেঠাইমা। মানে আমি বলছিলাম কি, প্রতিমাই তো শেষ নয়। তার পরে আরও আছে। ধরো অনাদি, অনন্ত, অসীম। জ্যেঠাইমা, মূর্তির পেছনের জানলাটা খুলে দেব?"

মা তেড়ে এলেন, "না তুই নোংরা, ঘরে ঢুকিসনি। তুই ছাদেই বা এসেছিস কেন নুকু?"

"এসেছিলাম নোংরা থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য। কালিঘাট অনেক দূর। ভাবলাম উপস্থিত জগদ্ধাত্রীর কাছে যাই, হাতের কাছে আছেন তিনি। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে।"

"তোর মনে অনেক নোংরা। দু'একদিনে সাফ্ হবে না।"

"সুরু করতে আপত্তি কি জ্যেঠাইমা? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় দীক্ষা দাও।"

"আমার পায়ে পড়ে কি হবে হতভাগী, ওঁর পায়ে পড়।"

"তুমি ঢুকতে দিলে না যে! জ্যেঠাইমা, আমি ছাদে এসেছিলাম বোধহয় জগদ্ধাত্রীর পায়ে পড়বার জন্যই। তুমি একটু সরে দাঁড়াও।"

"আজ নয় নুকু। ঐ দেখ্ ঘড়িতে দেড়টা বেজেছে। তোর জ্যেঠামশাই অপেক্ষা করছেন।"

"আমার রাস্তা ছাড়ো জ্যেঠাইমা। আমার ভক্তির সংগে ঘড়ির কাঁটার সম্পর্ক নেই। আমি আজ বিক্ষত ও বিধ্বস্ত। যে-কোন দুটো পা হ'লেই

চলবে। পায়ে আমায় পড়তেই হবে। ঘরে ঢুকতে না দাও, তোমার পা দুটো একটু এগিয়ে দেবে কি?" মা এবার হকচকিয়ে গেলেন। তিনতলার ছাদের ভক্তিবাদে নুকু যেন বিক্ষুব্ধ বাতাসের আলোড়ন নিয়ে এলো। ভক্তিবাদের নৈঃশব্দের সংগে মার পরিচয় আছে কিন্তু আলোড়নের সংগে তাঁর পরিচয় নেই। মা নিজেও একটু আলোড়িত হয়ে উঠলেন। তিনি একটু ধমকে উঠলেন, "তোর বিয়ে হওয়া দরকার। খুবই তাড়াতাড়ি। স্বামীর পা-ছাড়া তোর সুবিধা হবে না নুকু।"

"স্বামী?" নুকু যেন অক্ষরটা এই প্রথম শুনল। "কোন্ স্বামী জ্যেঠাইমা? আমি তো কেবল স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানি।"

"তাঁর পায়ে পড়লেও উদ্ধার পাবি।"

"কিন্তু আমি তো উদ্ধার চাইনি, উন্নতি চেয়েছিলাম জ্যেঠাইমা।"

"নুকু, ভক্তিবাদের মধ্যে কোন তর্ক নেই। আর অত চেঁচামেচিও নেই। সর, দরজা বন্ধ করব।" মা ঠাকুর-ঘরের দরজা বন্ধ করে শেকল টেনে দিলেন। মা হয়তো আজ একটু ভুল করলেন। নুকুকে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে শেকল লাগিয়ে দিলে নুকুর হয়তো সত্যিই একটু উন্নতি হ'ত। ঠাকুর-ঘরটা পেছন দিকে রেখে নুকু জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু মেয়েমানুষ। না জ্যেঠাইমা?"

"শুনি তো সবাই বলে। মেয়েমানুষের মন একটু ঈর্ষাকাতর।"

"তা হ'লে ঠিকই শুনেছ। আর আমি তো স্বচক্ষে দেখলাম।"

"আমায় তুই ঈর্ষাকাতর বলছিস?"

"তোমাকে নয়। তোমার মত লাভ্‌লি জ্যেঠাইমা খণ্ডিত বাংলায় ক'জন আছে? আমি বলছিলাম জগদ্ধাত্রীর কথা। মেয়েমানুষ বলেই আমার অন্তর তিনি দেখতে পেলেন না। আমি এবার পুরুষ দেবতার পূজা করব। সব চেয়ে সেরা পুরুষ তো শিব?"

মা বললেন, "নিঃসন্দেহে।"

"তা হ'লে এবার আমার তপস্যার ঠেলা বুঝে নিও।"

"আমার বুঝে কি হবে নুকু, বুঝবেন তো শিব ?"

বাঁ দিকে চেয়ে নুকু জিজ্ঞাসা করল, "একটা নতুন ঘর তুলেছ বুঝি ?"

"তোর ছোটকাকার মালপত্তর থাকে।"

"কি মাল ?"

"রেডিও।"

"ঘরটা খোলা যায় না জ্যেঠাইমা ?"

"চাবি তাঁর কাছেই থাকে।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে নুকু বলল, "আমি তিনতলার ছাদে কেন এসেছিলাম এখন আর ভেবে ঠিক করতে পারছি না।"

মা বললেন, "আমার জগদ্ধাত্রী দেখতে।"

"বোধহয় ছোটকাকার নতুন ঘরটা দেখবার জন্যই এসেছিলাম।"

খাবার-ঘরে সবাই এসে বসলেন। অনীতাকে দেখে বাবা দিল্লির রাজনীতির কথা ভুলে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ডক্টর দত্ত কোথায় ?" বাবা পকেট থেকে একটা বড় খাম বার করে অনীতার দিকে এগিয়ে ধরলেন এবং সংগে সংগে বললেন, "ডক্টর দত্তের নিয়োগপত্র।" অনীতা ধরবার জন্য হাত বাড়াল না, বলল, "ডক্টর দত্ত চাকরি প্রত্যাখ্যান **করেছেন** বাবা।" নুকু যোগ দিল, "ছোট চাকরি তিনি রাখলেন বড় কাজ করবার জন্য। প্রকৃত পক্ষে ডক্টর দত্তের আসল কাজ বিজ্ঞান কলেজে, সেক্রেটারিয়েটে নয়।"

বাবা খামখানা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "মন্ত্রী হিসাবে এইটাই আমার শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল। এমন চাকরির জন্য ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি লোক ষাট কোটি হাত বাড়িয়ে বসে আছে।" নুকু সংশোধন করল, "কেবল দুটো হাত বাদে জ্যেঠামশাই।"

"ঠিক, ঠিক কথা নুকু। ডক্টর দত্তের দুটো হাত বাদ দিতেই হবে।"

সুকু গম্ভীরভাবে বলল, "এবার তা হ'লে পরিসংখ্যানের দিক থেকে একটা প্রফাউণ্ড সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আধুনিক জগতে পরিসংখ্যানের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই গণনা করি না।"

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "পরিসংখ্যানের কোন্ অংশটা প্রফাউণ্ড সুকু?" সুকু জবাব দিল, "পরিসংখ্যানের সবটুকুই সত্য। কোনো 'ডেটাই' অনুমান-সাপেক্ষ নয়। যা সত্য তাই তো প্রফাউণ্ড অথবা তলদর্শী।"

প্রত্যেকের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছে। গরম স্যুপ থেকে ধোঁয়া উঠছিল। কেউ সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। অনীতা বলল, "সবটাই হাইপার-বলিক্যাল, অতিরঞ্জিত।"

"কেন?" সুকুর প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা ছিল।

"তলদর্শী যদি প্রফাউণ্ড কথাটার বাংলা অনুবাদ হয় তবে জিজ্ঞাসা ক'রব তল বলতে কি বোঝায়? তলের শেষ কোথায় এবং কোথা থেকে তলের সুরু? কিংবা তল যেখান থেকে সুরু হ'ল পরিসংখ্যানের তল সেইখানেই শেষ কি না। আমার মনে হয় সুরুতেই শেষ।"

সুকু বলল, "দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাও দিদি।"

"তোর মতে বাবার নিয়োগপত্র গ্রহণ করবার জন্য ভারতবর্ষের উনত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন'শ আটানব্বই হাত এগিয়ে আসত। এই তো?"

"হাঁ। কেবল দুটো হাত বাকি থাকত। কারণ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা আগেই গণনা করে বার করা হয়েছে তিরিশ কোটি।" সুকু বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। অনীতা বসল ঝুঁকে এবং বলল, "প্রথমত, তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে প্রত্যেকেরই দুটো করে হাত নেই। অবশ্য গণনার দ্বারা তাও বার করা যায়। কিন্তু আমি উপস্থিত সে-দিকটা ভাবছি না। আমি কেবল ডক্টর দত্তের দুটো হাতের কথাই বলব। পরি-

সংখ্যানের দ্বারা আমরা প্রমাণ করলাম ভারতবর্ষের মধ্যে দুটো হাত নিয়োগপত্র গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে না আসার মধ্যে কেবল একটা সংখ্যার তল দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুই নয়। সংখ্যার সত্য আছে বটে কিন্তু উপলব্ধির সত্য নেই। গ্রহণ না করার মধ্যে কেবল হাত দুটোই নেই, ডক্টর দত্তের একটা মনের তল পাওয়া যাচ্ছে। উপলব্ধির তল। সেইটা আবার শেষ তল নয়। উপলব্ধিও আবার ক্রমে ক্রমে বহু তলের মধ্য দিয়ে লোকোত্তরিত হচ্ছে।"

ঝুকু বলে উঠল, "তোমার উপলব্ধিকে লোকোত্তরিত করার অর্থ হচ্ছে নেশাগ্রস্ত হওয়া। আফিমখোরের নেশা। বুর্জোয়া ধোঁয়া দিয়ে সত্যের আগুনকে ঢেকে রাখবার প্রাচীন টেকনিক্। ধোঁয়া মানে আগুন নয় দিদি।"

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, "স্যুপ টাণ্ডা হয়ে গেল। একরত্তি ধোঁয়া আর নেই। নিয়োগপত্র আমি আজই ছিঁড়ে ফেলব। এতবড় চাকরি আমি আর জুটিয়ে দিতে পারব না। কারণ আমার মন্ত্রিত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।" এক চামচে স্যুপ মুখ অবধি তুলে মা বললেন, "জগদ্ধাত্রী তা হ'লে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।" অবাক হয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বিরুদ্ধে ঠাকুর দেবতার সংগে ষড়যন্ত্র করবার মানে?"

"তোমায় কলকাতা ফিরিয়ে আনতে চাই তাড়াতাড়ি।"

"কেন?"

"ছেলেমেয়েগুনো সব গোল্লায় গেল।"

সবাই নিঃশব্দে ঠাণ্ডা স্যুপ খেতে লাগলেন।

তিন দিন পরে বাবা ঝুকুকে নিয়ে দিল্লি চলে গেলেন। তিনি জেনে গেলেন যে, ছোটকাকার সংগে আমার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পাঁচ লাখের বদলে আমি পামির এণ্ড কোম্পানির অর্ধেক অংশীদার হয়েছি। তিনি নিজে ছোটকাকাকে আশা দিয়ে গেছেন যে, তাঁর নিজের বিভাগ থেকেও এবার

'একটা মাল আমদানির অর্ডার পামির কেম্পানি পাবে। যাওয়ার দিন আমার সংগে বাবার দেখা হয়নি বলে তিনি একখানা চিঠি রেখে গেছেন মার কাছে। মা আমাকে চিঠি দিলেন। বাবা লিখেছেন— মন দিয়ে ব্যবসা শিখবে। পামির কোম্পানি যেন তোমার চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান হয়। ধ্যান যদি পাকা এবং পোক্ত হয় তা হ'লে ব্যবসায় উন্নতি হবেই। পামির কোম্পানির অফিসে যেন গণেশ বসাতে ভুল না হয়। জ্ঞানশংকর আপত্তি করবে জানি। তবু একটি গণেশ চাই। কালিঘাটে গিয়ে দামাদামি করতে পারলে একটাকা আট আনায় একটা মাঝারি সাইজের গণেশ কিনতে পারবে। ইত্যাদি।

চিঠিখানা যথারীতি পার্টির ফাইলে চলে গেল।

আমার মাদ্রাজ রওনা হওয়ার মাত্র তিনদিন বাকি। আমি আজ পামির কোম্পানির অর্ধেক অংশ দখল নেওয়ার জন্য মিশন রো-তে চললাম গাড়ি হাকিয়ে। লিফ্ট দিয়ে পাঁচতলায় উঠলাম। পাঁচতলার অর্ধেকটাই পামির কোম্পানির। বাকি অর্ধেকটা একটা চীনা কোম্পানির, 'হংকং ট্রেডার্স।'

আমাদের দিকে চারখানা কামরা। সামনে দুটো পেছনে দুটো। সামনের দুটো ঘরে দু'জন লোক বসে কাজ করছিল। অনেক ফাইল, অনেক কাগজপত্র চার দিকে ছড়ানো রয়েছে। দু'চারটে কাঠের বাক্স রয়েছে, তাতে বিলাতি মালের সব নমুনা। ঘরে ঢুকেই তা প্রথমে চোখে পড়ে। অফিসটা সাহেব কোম্পানির মত সাজানো গোছানো নয়। সব যেন এলোমেলো। বোধহয় অল্প স্টাফ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে বলে অফিসের এই রকম চেহারা।

ঘরে ঢুকতেই একজন যুবক উঠে এসে তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন "আমি আয়েংগার। অফিসের ম্যানেজার।" আমার পরিচয় তিনি নিলেন না। মনে হ'ল তিনি আমাকে চেনেন এবং আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ছোটকাকা কোথায় ?"

"তিনি বাইরে গেছেন, আউট অব ক্যালক্যাটা। আপনার কোন অসুবিধা হবে না কমরেড চৌধুরী। আসুন।"

আমার জন্য একটা কামরা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করল. অফিসের সব আসবাবগুলো কেবল পুরনো নয়, অতি শস্তা দামের কাঠ দিয়ে তৈরি। কম্যুনিষ্টদের জীবনে অপব্যয়ের সুযোগ নেই। অপব্যয় করলে পার্টির ক্ষতি। ' কমরেড আয়েংগার বললেন, "এখানে আরও পাঁচজন কর্মচারী আছেন। তার মধ্যে দু'জন বাঙালী, একজন পূব পাঞ্জাব থেকে এসেছেন, একজন অন্ধ্র দেশের, এবং আর একজন—." তিনি পেছন দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললেন, "মিস্ মার্গারেট, ইংরেজ দুহিতা। তিনি সব সময় আসেন না। বড় বড় সাহেব কোম্পানিতে ঘুরতে হয় অর্ডার আনবার জন্য। তাছাড়া শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো তিনিই অর্গানাইজ করেন। অবশ্য তিনি অনেক পেছনে থেকেই করেন, কেউ তাঁর নাম জানে না। পামির কোম্পানির ফাইলে তিনি সেক্রেটারি বলে পরিচিতা। আমরা ছ'জনেই পার্টির সভ্য। মিস মার্গারেট নিজে ছবি আঁকেন, ভাল পিয়ানো বাজান, বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।"

আমি বললাম, "মিস মার্গারেটকে ডাকুন।"

"তিনি তো এখানে নেই। ' তিনি এখন মাদ্রাজে।"

"কেন?"

"আগামী রবিবার মাদ্রাজে ভারতীয় শিল্পীদের একটা শিল্প-প্রদর্শনী আছে। চীন গণতন্ত্রের দু'চারজন শিল্পীর ছবিও তিনি যোগাড করে দিয়েছেন। মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনাদার শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। এই প্রদর্শনী মাদ্রাজ থেকে মালাবার যাবে, মালাবার ঘুরে পুনরায় মহীশূরে আসবে। তারপর কোথায় যাবে আমি জানি না। এই ফাইলটায় পামির কোম্পানির অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। মাদ্রাজ যাবার সময় অনুগ্রহ করে সংগে নিয়ে যাবেন। অফিসে ইমিডিয়েটলি কোন প্রয়োজনীয় কাজ নেই। তবে হাঁ, এই যে কাঠের বাক্সটা রয়েছে দেখছেন তাতে অনেক সাহিত্য এসেছে। ইম্‌পোর্টেড সাহিত্য, মেসিন নয়। মাদ্রাজ যাওয়ার সময় এই বাক্সটা আপনার সংগে যাবে

ইলিয়া এরেনবুর্গের লেটেষ্ট বই এতে আছে। তা ছাড়া ছবি আঁকা সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা সাহিত্য এসেছে। ভারতবর্ষের শিল্পীদের কাছে খুবই উপযোগী হবে। আশা করা যায় মাদ্রাজের শিল্প-প্রদর্শনীর দরজায় এগুলো বিক্রি হয়ে যাবে। কারণ দাম খুব সস্তা।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কমরেড আয়েংগার পানির কোম্পানির এমন একটা ছবি আঁকলেন যে, আমার কাছে কোন কিছু আর অস্পষ্ট রইল না।

কমরেড আয়েংগার কাঠের বাক্স থেকে একখানা উপন্যাস তুলে নিলেন। উপন্যাসের মলাটখানা আমার সামনে তুলে ধরে বললেন, "দেখুন ছবিখানা! একটা ট্রাক্টার আজারবাইজানের মাটিতে চুমু খাচ্ছে। চুম্বনের মধ্যে এমন একটা অনুভব ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী যে, দেখলে মনে হয় চুম্বন নয় চুম্বক। পৃথিবীর সব চেয়ে যোয়ানমর্দ পুরুষের ঠোঁটেও এমন ভঙ্গি আসবে না। অরিজিনাল ছবিখানা তিনি সংগ্রহ করেছেন। মাদ্রাজের শিল্প-প্রদর্শনীর দেওয়ালে রবিবার দিন দেখতে পাবেন। যতদূর জানি ছবিখানা মাদ্রাজ সরকারের কৃষি বিভাগের মন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হবে, সেক্রেটারিয়েটের দেওয়ালে লাগিয়ে রাখবার জন্য। কমরেড চৌধুরী, আপনার কি মনে হয় না কৃষি-বিভাগের কর্মচারীদের এই ছবি দেখে প্রেরণা আসবে?"

আমি বললাম, "ট্রাকটারের মধ্যে দিয়ে রুসিয়ায় শিল্প ও সাহিত্যের যে বিপ্লব এসেছে তা বোধহয় সমগ্র জগতের বুর্জোয়া সাহিত্যকে ধুয়ে মুছে দেবে। আমার ধারণা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সেকস্‌পিয়ার ছাড়া অন্য কোন লেখক বাঁচতে পারবে না। আমরা বাঁচতে দেব না। আজ থেকেই আমাদের প্ল্যান করা দরকার। আমরা কেবল 'মার্ডার ইন দি কেথিড্রাল' চাই না। আমরা এলিয়টকেও মার্ডার করতে চাই। সাত খোপ পায়রা খেয়ে এই বিড়ালতপস্বীগুলো বুড়ো বয়সে এসে যীশুখৃষ্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এই জন্যেই নেহেরু নিজে ভগবান মানেন না। আমরা তাঁকে ব্যাক্ করব। নেহেরুকে আমরা বিড়ালতপস্বী হতে কিছুতেই দেব না।"

আয়েংগার বললেন, "তাই তো আমরা দিল্লিতে একটা হিন্দি সাহিত্যসভার আয়োজন করেছি। রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। বুড়ো ট্যাণ্ডন আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছেন।" জিজ্ঞাসা করলাম, "তারিখ কবে?"

"একমাস পর।"

"হিন্দি সাহিত্যের মহারথীরা সব যোগ দিচ্ছেন তো?"

"নিশ্চয়ই। কেন্দ্রীয় সরকার ও হিন্দি প্রচারণী সভা থেকে অনেক টাকা পাওয়া গেছে। এবং আরও পাওয়া যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হিন্দি সাহিত্যিকদের নাম জানেন?"

"তিনজন তো সাঁই-সাঁই ক'রে বাড়ছে! ওদের ধারণা রবীন্দ্রনাথকে ওরা ছাড়িয়ে গেছে বছর তিনেক আগেই। এখন কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় 'বোনডাষ্ট' দিয়ে গোড়ায় খুরপি চালাতে পারলে তিনজনেই নোবেল পুরস্কার পাবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আসল ব্যাপারটা কি?"

"আসল ব্যাপার গত তিরিশ বছরে কোটি খানেক টাকা খরচ করবার পর হিন্দি প্রচারণী সভা আধ ডজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে। তামিল সাহিত্য যা পঞ্চাশ বছর আগে উদ্গীরণ করেছে ওরা তা আজকাল প্রথম শ্রেণী বলে চালু করছে হিন্দি মার্কেটে।"

আমি বললাম, "আমাদের সে-কথা বলবার দরকার নেই। কম্যুনিষ্টদের প্রাদেশিক মনোভাব থাকা উচিত নয়। আমরা ওদের উৎসাহ দেব। আমরা বলব, চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে যাওয়া যাবে। বলব এই জন্যে যে, হিন্দিভাষীর সংখ্যা অনেক। অতএব আমাদের কম্যুনিষ্ট-সাহিত্য প্রচার করার সুবিধা। রুসিয়ার ট্রাকটারকে হিন্দি ট্রাকটার করতে কতদিন লাগবে কমরেড আয়েংগার?"

ঘড়ির দিকে চেয়ে আয়েংগার বললেন, "এবার আমাদের মিটিং শেষ হওয়া দরকার কমরেড চৌধুরী।"

দুটো ঘরের মাঝখানের দেওয়ালে বেশ খানিকটা ফাঁক রয়েছে। টেলিফোনটা ঐ ফাঁকের মধ্যে থাকে। দু'দিক থেকেই তা ব্যবহার করবার সুবিধা হয়। আরও একটা সুবিধা হয় যে, ও-পাশ থেকে যে-কেউ শর্টহ্যাণ্ডে সব কথাবার্তা টুকে নিতে পারে। আমাদের মিটিং ইংরেজী ভাষায় হচ্ছিল। কম্যুনিষ্টদের মিটিং বুর্জোয়াদের মত তোড়জোড় করে হয় না। আমাদের মিটিংএর কোন বিশেষ সময় নেই। আমরা কথা বললেই সেটা মিটিং। মিটিংএর গুরুত্ব না থাকলে কম্যুনিষ্টরা কথা কয় না। গত তিন বছরে কেবল কংগ্রেস মন্ত্রিরা যা কথা বলেছেন এবং যা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে তার কাটিং আমরা রেখেছি। পামির কোম্পানির গুদামে তা মজুত ছিল। গুদাম মানে, একটা কুড়ি ফুট বাই ষোল ফুটের ঘর। উচ্চতা তিরিশ ফুট। সেই ঘরখানার সিলিং পর্যন্ত কাটিং দিয়ে ঠাসা। দুটো বাচ্চা ইঁদুর হাত পা ছড়িয়ে ভাল করে খেলা করবার জায়াগ পায় না।

আয়েংগারের সংগে সংগে অফিস থেকে বাইরে এলাম। সামনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হংকং ট্রেডার্স কি ব্যবসা করে?"

"আমদানি ও রপ্তানি। তবে আমদানি খুব কম। ভারতবর্ষ থেকে কাঁচা মাল ও কাপড়চোপড় রপ্তানি করে। ভারতবর্ষে বিদেশী টাকা আসে তাতে।"

"কোন্ ভারতবর্ষে?"

"পুঁজিবাদী ভারতবর্ষে।"

"আমাদের তাতে লাভ?"

কমরেড আয়েংগার ইঙ্গিত বুঝলেন। লিফ্‌ট পর্যন্ত হেঁটে এলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। আমি তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি অপেক্ষা করছি দেখে কমরেড আয়েংগার বললেন, "আমাদের লাভ আছে। হংকং ট্রেডার্স যে টাকা অর্জন করে তার খানিকটা অংশ আবার মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেসিয়া প্রভৃতি স্থানে কমরেডদের কাছে পৌছে দিতে হয়।"

লিফ্‌ট উপরে উঠে এলো। বললাম, "কাল সাড়ে দশটায় আসব।" কমরে
আয়েংগার বললেন, "আপনার টিকিট কাটা হয়ে গেছে স্যার্।"

"কাল দেবেন।"

মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। ঠাকুরদার পা ছুঁয়ে এসেছি আগেই। অনীতা বাড়ী ছিল না। আমি রওনা হলাম। মাদ্রাজ যাচ্ছি। কেবল মাদ্রাজ নয়, মা জানেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরব। দেশ দেখব এবং ব্যবসা করব।

মামার সংগে দেখা করিনি। অসুখ তাঁর খুবই বেশি। তবু নাকি তিনি আমাকে দেখবার জন্য আজ দু'দিন থেকে ছটফট করছেন। আরও বিশ লাখ পেনিসিলিন দিলে ছটফটানি কিছুটা হয়তো কমবে। কিন্তু বিশ লাখ টাকার উদ্বেগ তাঁকে বোধহয় সুস্থ হতে দেবে না। যাওয়ার আগে মামাকে একটা চিঠি লিখে গেলাম। হাওড়া যাওয়ার পথে বড় পোষ্টঅফিসে চিঠিখানা ফেলে দিয়েছি। চিঠিতে লিখেছি—

'শ্রীচরণেষু

মামা, তোমার সংগে দেখা করিনি লজ্জায় ও দুঃখে। তুমি আঘাত পাবে বলেই ভাবলাম না যাওয়াই ভাল। মামু, কমলবাবু নেই! কলকাতার কোথাও নেই। আমি কেওড়াতলা ও নিমতলা পর্যন্ত খুঁজে এসেছি। কমলবাবু কোথাও নেই। আমরা ভুল করেছি মামু। বোধহয় ভুল। কাউকে কোন কথা বলতেও পারছি না। পুলিসের কথা ভাবাও বাতুলতা। কেবল বাতুলতা নয়, আমাদের নিজেদেরও ভয় আছে। যে-রকম কাজ নিয়ে আমরা মেতেছিলাম তাতে ষড়যন্ত্রের সত্য রয়েছে। ওরা যদি কোন রকমে টের পায় তা হ'লে আমাদের দু'জনেরই জীবন বিপন্ন হবে। গুপ্ত ঘাতকের আঘাত সারানো পেনিসিলিনের কর্ম নয়। কমলকে আমি সারা ভারতবর্ষে খুঁজে বেড়াব। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে কমলকে খুঁজতে চললাম।

আমার কি দুর্দশা দেখো! তুমি কিছু ভেবো না। আমরা যদি আমাদের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে পারি তা হ'লে বিশ লাখ কিছুই না। বিশ লাখ মানে বিশ লাখ টাকা, বিশ লাখ পেনিসিলিন নয়। যেমন করেই হোক তোমাকে বাঁচতে হবে। নইলে অতবড় বোঝা আমি একা বহন করব কি করে?

'রোটারি মেসিনের অর্ডার এখন দিও না। অপেক্ষা করলে একদিন 'নন্দ-বাজারে'র রোটারি মেসিন আমাদেরই হবে। খুব সস্তায় হবে। কি বিপদ দেখো! বিপদ মানে 'নন্দবাজারে'র বিপদ দেখতে বলছি। ওদের দিক থেকে তো বিপদ নিশ্চয়ই। তোমার ডবলনিমোনিয়া কত তাড়াতাড়ি ভাল হবে মামু? আমার যে আর অপেক্ষা সইছে না! আমার শতকোটি প্রণাম নিও।

ইতি তোমার দীপক।'

হাওড়া ষ্টেশনে খুব বেশি ভিড় নেই। একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমার নাম লেখা রয়েছে। আয়েংগার এলেন। কাঠের বাক্সটা কামরায় আগেই তোলা ছিল। সব দিক ভাল করে একবার দেখে নিলাম। তারপর আয়েংগারের সংগে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ কোণায় গিয়ে থামলাম। আমি আগেই বুঝেছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলতে চান। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "টপ্ সিক্রেট!" নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলাম। আয়েংগার বললেন, "কমরেড মাও-সে-তুঙএর লালফৌজ রওনা হয়েছে।" ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ দিকে কমরেড? মানে আর কত দূর আছে?"

"পরশুদিন তিব্বত দখল করবেন। সুতরাং এখন খুব কাছে। কমরেড রাওকে আমরা এখনও জানাতে পারিনি। কারণ হংকং ট্রেডার্সের কোন শাখা-অফিস মাদ্রাজে নেই। অতএব তিনি আপনার কাছ থেকেই খবর পাবেন প্রথম। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত 'উডল্যাণ্ডসে' আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি স্টেশনের বাইরে আপনার সংগে দেখা করবেন। আমি রিপিট করছি। ভুলবেন না। পরশু তিব্বত দখল করবে লালফৌজ। খবরটা দেবেন কমরেড

রাওকে। তিনি আপনার সংগে স্টেশনের বাইরে দেখা করবেন। ঠিক আছে?"

বললাম "ঠিক আছে।"

"টপ্ সিক্রেট।"

"মনে রাখব।"

আমরা আবার হাঁটতে হাঁটতে কামরার দিকে চললাম। কমরেড আয়েংগার বললেন, "আর একটা কথা।"

"বলুন, আমি শুনছি।"

"আপনার সংগে একই কামরায় মিঃ চাটার্জি যাচ্ছেন বেজোয়াদা পর্যন্ত।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি কে?"

"শিবরাম চাটার্জি। কেন্দ্রীয় সরকারের গুপ্ত পুলিস। কম্যুনিষ্টদের সব চেয়ে বড় শত্রু। আপনার কামরার আগে ছোট্ট একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা জুড়ে দিয়েছে। লক্ষ্য করেছেন?"

বললাম "লক্ষ্য করবার সময় পাইনি।"

"সেই কামরায় দু'জন সশস্ত্র গার্ড যাচ্ছে। মিঃ চাটার্জির দেহরক্ষী। তার মধ্যে একজন বেজোয়াদার লোক। ঐ লোকটার গুলিতে গত সেপটেম্বর মাসে বেজোয়াদা থেকে দশ মাইল দূরে তিনজন কম্যুনিষ্ট-কৃষাণ মারা যায়। খুব ভীষণ প্রকৃতির লোক। বাংলা জানে।"

বললাম, "বুঝেছি।"

কমরেড আয়েংগার জিজ্ঞাসা করলেন, "অনেক দূরের রাস্তা। কি করে সময় কাটাবেন?"

বললাম, "সংগে অনেকগুলো ফিল্মের মাসিক ও সাপ্তাহিক আছে। প্রায় সবগুলোই আমেরিকায় ছাপা। এবং প্রায় সবগুলোতেই দু'চারখানা করে উত্তেজক ছবি আছে।"

কমরেড আয়েংগার বললেন, "বর্ণশংকরদের দেশ, থাকাই স্বাভাবিক।

আমি তা হ'লে চললাম ? আর পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ি ছাড়বে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।" আয়েংগার চ'লে গেলেন।

একটু পরে শিবরাম চাটার্জি এসে কামরায় বসলেন। ছোট একটা সুটকেস কুলির মাথায়। নিজের মাথার সোলার টুপিটা খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেন ব্রাকেটের লোহায়। শিবরাম চাটার্জির মাথায় চুল নেই, সবটাই টাক। হাত বুলতে গেলে হাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তিনি আমার দিকে চাইলেন না। চাইবার আগ্রহ পর্যন্ত দেখালেন না। শিবরামবাবু যত বড় পুলিসই হন না কেন, কম্যুনিষ্ট পুলিসের মত নন। আমরাও চাইতাম না, কিংবা চাইবার আগ্রহ দেখাতাম না অথচ সবকিছুই দেখতাম।

মাদ্রাজ মেল্ ছাড়ল। ধীরে ধীরে গাড়ি প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে গেল। রুমাল উড়িয়ে আমায় কেউ বিদায় সম্ভাষণ জানালো না। প্রাত্যহিক জীবনে কম্যুনিষ্টরা বড্ড একা! সাংসারিক জীবনের মায়ামমতা বঞ্চিত কম্যুনিষ্টকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে জগতের কোন ষ্টেশনে কেউ আসে না।

গাড়ির গতি বাড়ল। লম্বা পাড়ি। খড়গপুরে এসে প্রথম থামবে। আমি সিগারেটটা শেষ করে জানলা দিয়ে শেষ অংশটুকু উড়িয়ে দিলাম। চানঘর থেকে কাপড় বদলে এসে একটা মাসিকপত্র খুলে নিলাম সুটকেস থেকে। মাসিকখানার মলাট জুড়ে কেবল দুটো পা। মেয়েমানুষের পা, আমেরিকার মেয়েমানুষ। পা মানে হাঁটুর অনেক ওপর পর্যন্ত। আবরণ কিছু নেই, থাকলে তিন ডলার দিয়ে কাগজটা কেউ কিনত না। আমেরিকার রাস্তায়-ঘাটে মেয়েরা পা-এর অতটা অবধি বিনা টিকিটে দেখিয়ে বেড়ায় বলে বিশ্বাস হয় না। অন্তত বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। রুজভেল্টের স্ত্রী কিংবা ট্রুম্যানের স্ত্রীকে আমি কতবার দেখেছি, দেখেছি ছবিতে। কিন্তু মলাটের পা-এর সংগে তো মেলে না! তবে এ পা দুটো কার ?

আমরা যেদিন ন্যাংটো হয়ে জন্মেছি শিল্পী আমাদের সেদিন দেখেছেন। ন্যাংটো শিশুর সৌন্দর্য তাঁর তুলির ডগায় মাধুর্য এনেছে, এনেছে জন্ম-রহস্যের

বিমুগ্ধ প্রণতি। ন্যাংটো শিশুর সৌন্দর্য সত্যানুভূতির শিল্পকাহিনী। বয়সের সংগে সংগে কাহিনীর পরিবর্তন হয়। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ বদলায়। এতদিন যা খোলা ছিল, এবার তা ঢাকতে হবে। শিল্পের আবরণ দিয়ে তাকে সাজাতে হবে। যৌবনের প্রারম্ভে শিল্পীর রং বদলালো। নাইটক্লাবের রং নয়, সত্যের রং। কারণ নারীর দেহে সত্য ছাড়া আর কিছু নেই। সৃষ্টির সত্য। মাতৃবক্ষের দুধের বোঁটা সেই সৃষ্টির পরিণত ইঙ্গিত। শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতই শ্রেষ্ঠ শিল্প। জানি, তোমরা বলবে লুকিয়ে লাভ কি, আবরণ দেবার দরকার কি। চাঁদ সুন্দর, তার কলংক নিয়েই সুন্দর। কিন্তু কলংক সুন্দর হয় না তার চাঁদ নিয়ে। চাঁদ সুন্দর তার কলংক সত্বেও, কিন্তু কলংক সুন্দর নয় তার চাঁদ সত্বে। বাচ্চার ঠোঁটে দুধের বোঁটা সুন্দর, কিন্তু নাইটক্লাবে দুধের বোঁটা নয়।

মলাট ছেড়ে পা দুটো যেন আমায় লাথি মারতে লাগল। কাগজখানা ঘুরিয়ে ধরলাম শিবরামবাবুর দিকে। তাঁর টাক পযন্ত ঠেকিয়ে দিতে পারলে তিনি আঘাত পেতেন। এর মধ্যে গাড়ি এসে থামল খড়গপুরে। পা দুটো তখনো শিবরামবাবুর দিকে ঘোরানো।

মাসিকপত্রটা এবার আমায় নামাতেই হ'ল। খড়গপুর স্টেশন দেখব। স্টেশন দেখতে গিয়ে শিবরামবাবুর দিকে চোখ পড়ল। তিনি আমাদের পার্টির দৈনিক কাগজ পড়ছেন। মনে হ'ল তিনিও যেন কাগজটা আমাকে দেখাবার জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে চেষ্টা করছিলেন। আমি যে কাগজখানা দেখলাম তা আবার তাঁকে দেখতে দিলাম না। আমি জানলা দিয়ে মুখ বার করে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে রইলাম। শিবরামবাবু বোধহয় মনে মনে বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। গাড়ি খড়গপুর স্টেশন ছাড়ল। এর পর থামবে এসে বালেশ্বর, উড়িষ্যায়।

শিবরামবাবু জোড় আসন কেটে বসেছেন তাঁর নিজের বিছানায়। সামনে তাঁর চায়ের ট্রে। পেয়ালায় চা ঢালছেন। আমিও এসে আমার বিছানায়

বসলাম। পা দুটো কই? দেখলাম সেটা শিবরামবাবুর বিছানায়। ভুল করে আমিই বোধহয় ঐখানে রেখেছি। কিন্তু ভুল আমি কখন করলাম? তবে কি শিববাবু ভুল করলেন? তিনিই ভুল করেছেন। আমি এদিক ওদিক চাইতেই তিনি বললেন, "আপনার ম্যাগাজিনখানা আমি একটু দেখছি। আপনি আমার দৈনিক কাগজখানা দেখুন।" আমি বললাম, "আমারটা আপনি দেখুন। আপনারটা আমার দেখবার দরকার নেই। ভোর বেলা স্টেটসম্যান পড়ে নিয়েছি।"

"কিন্তু এদের খবর তো স্টেটসম্যানে থাকবে না।" শিবরামবাবু তখনো চায়ের পেয়ালায় মুখ দেননি। আমি বললাম, "ওসব কাগজ পড়লে বাবা রাগ করবেন।"

"মজুরদের দুঃখ কষ্টের কথায় বাবারা তো রাগ করবেনই। কি[illegible] আপনার বাবা রাগ করেন কেন?"

"দিল্লিতে তিনি মস্তবড় কাজ করেন। তাঁর উপরে আর কেউ নেই, কেবল জহরলাল ছাড়া।"

শিবরামবাবু পা নামিয়ে বসলেন। 'আমেরিকার পা দুটো বিছানায় রইল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কি কুইনস্ পার্কের মিঃ চৌধুরী…? আমাদের মন্ত্রী…?"

"আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান। ভারতবর্ষ দেখতে বেরিয়েছি। হিন্দু ভারত। দেবদেবীর ভারত, বেদবেদান্তের ভারত, প্রথমে দক্ষিণ ভারত।"

শিবরামবাবু চায়ের পেয়ালা আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। আমিও যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেয়ালাটা নিলাম। চা-এ চুমুক দিতে বিলম্ব করলাম না। চুমুক দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার চা কোথায়?"

"কেটলিতে। দুধের পটে ঢেলে নিচ্ছি। পথেপ্রবাসে অত নিয়ম-কানুন কে মানে? আপনি দয়া করে খেতে আরম্ভ করুন।"

শিবরামবাবুর সংগে গল্প জমিয়ে বসলাম। অনেক গল্প। বালেশ্বর এসে

গেলাম। ডিনার খাওয়ার সময় তিনি বললেন, "কিছু ভাবতে হবে না। আমার বেয়ারা আছে সংগে। টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি খাবার। হাজার হ'লে আপনি আমার ছেলের মত।" শিবরামবাবুর বড় ছেলে আগামী বছর এম্.এ. পাস করবে এবং আগামী বছর বাবাকে ধরে তার জন্য একটা ভাল চাকরি যোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বালেশ্বর পৌছবার অনেক আগেই তাঁকে দিয়েছিলাম। আগামী বছর যে বাবা নিজের জন্য একটা চাকরি খুঁজতে বেরবেন তা অবশ্য শিবরামবাবুকে বলিনি।

বেজোয়াদার গুণ্ডাটিকে দেখলাম। টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল। দ্বিতীয় দেহরক্ষীটি বাইরে প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে লাগল। কেন্দ্রীয় সরকারের গুপ্ত পুলিস কোন্ কথাটা যে গুপ্ত রাখলেন বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি ছাড়ল। বেজোয়াদার গুণ্ডাটি গাড়ি থেকে নেমে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা মিঃ চাটার্জি, আপনি বুঝি দিল্লিতেই থাকেন?" চমকে উঠে শিবরামবাবু প্রতিবাদ করলেন, "না। থাকি কলকাতায়।"

"কি করেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের কাজ।"

ভোরবেলা শিবরামবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। গাড়ি বহরমপুর এসে থেমেছে। তিনি তাড়াতাড়ি কোমরে ধুতিটা জড়িয়ে কামরা থেকে নেমে পড়লেন। আমি জানলা দিয়ে মুখ বার করলাম। আমি দেখলাম শিবরামবাবু একজন উড়িয়া ভদ্রলোকের সংগে হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। স্টেশনের ডান দিক দিয়ে গোপালপুর-অন্-সিতে যাওয়ার রাস্তা। বড়লোকদের যাওয়ার রাস্তা। এইখান থেকে উড়িষ্যার শেষ, অন্ধ্রের সুরু। চা-ওয়ালার অন্তর্ধান, কফি-ওয়ালার আবির্ভাব। জামা কাপড় বদলে এক গেলাস কফি খেয়ে নিলাম। স্টেশনের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখলাম সবারই চোখেমুখে অল্পবিস্তর গ্রাম্য সরলতা। চেহারা দেখে ভেতরের

সংবাদ খানিকটা জানা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের গুপ্ত পুলিসের মত অনেকটা খোলা।

শিবরামবাবু ফিরে এলেন, তাঁর পেছনে পেছনে দেহরক্ষী দুটিও এলো। আমি সবই দেখলাম। কামরায় এসে তিনি দেখলেন আমি তখনও শয্যা ত্যাগ করিনি। শিবরামবাবু নাকি কম্যুনিষ্ট ধরতে বেরিয়েছেন! কোন্ কম্যুনিষ্ট? আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগুলো তো কম্যুনিষ্ট নয় দাদা! আমরা গেরুয়া পরি না, আমাদের আনন্দমঠে 'বায়োস্কোপে'র মজা নেই। শিবরামবাবু বললেন, "উঠুন। অন্ধ্রের আলো সুরু হয়েছে।" আমি উঠলাম। তিনি বললেন, "শহুরে সভ্যতার ছাপ খুব কম। কলকারখানার সবহারাদের সংখ্যা নগণ্য। তবু অশান্তি আজ এখানে সব চেয়ে বেশি।"

"কেন? আলাদা প্রদেশ চাইছে বলে?"

"অন্ধ্রের জনসাধারণ কিছু চায় বলে আমার মনে হয় না।"

"তবে?"

"কম্যুনিষ্টদের সব সময় কিছু না কিছু চাইতে হয়। ভেতর থেকে গণ্ডগোল পাকাতে পারলে কম্যুনিষ্টদের কাজ এগোয়।".

বললাম, "আলাদা প্রদেশ একটা করে ফেললেই হয়।"

শিবরামবাবু আমাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীর বৎসকে এর চেয়ে বেশি আর দেখার দরকার হ'ল না। তিনি বললেন, "আলাদা প্রদেশ হয়তো হয়ে যাবে। আজ না হোক কাল হবে। কিন্তু অনধ্র প্রদেশ শাসন করবে কম্যুনিষ্টরা।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব খারাপ লোক বুঝি ওরা?"

"দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা তা বুঝতে চাইছেন না। এই অন্ধ্র দেশের মাটি খুঁড়লে কি পাওয়া যাবে জানেন?"

"খনিটনি কিছু হবে।"

"হাঁ, খনি পাওয়া যাবে। তবে গোলাবারুদের খনি। দু'একটা জায়গা

খুঁড়ে দেখিয়েছি। সমগ্র অন্ধ্র খুঁড়ে দেখাতে পারি। কিন্তু দিল্লির মালিকরা দেখবেন না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত।"

"কিন্তু মাটি খুঁড়বার কাজ নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত কেন ? আপনার চাকরি তো প্রচার বিভাগে ?"

"আমি প্রচার নিয়েই ব্যস্ত। মাটি খুঁড়বার লোক অবশ্য আলাদা। আমি তাঁদের পক্ষ নিয়েই কথা বলছিলাম।" শিবরামবাবু বেঞ্চির তলা থেকে একটা ফ্লাস্ক টেনে বার করলেন। জলের ফ্লাস্ক। বাঁ দিকে দেখলাম পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ জায়গা মিঃ চাটার্জি ?"

"ভিজিয়ানাগ্রাম।"

আমি বললাম, "পাহাড়ের গায়ে কত বড় আনারস জন্মেছে ! কি সুন্দর। সূর্যের আলোয় আনারসগুলো ঝিকমিক করছে।"

"এ অঞ্চলের আনারস খুব প্রসিদ্ধ। যেমন মিষ্টি, তেমন মোটা।"

আমি বললাম, "এ অঞ্চলের মহারাজাও খুব মোটা শুনেছি। দু'দশটা আনারসের রস প্রতিদিন খেতে পারলে সবাই মোটা হ'ত। কিন্তু মিঃ চাটার্জি, আনারস যারা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা এত রোগা কেন ? ঐ দেখুন গরুগুলো মাঠে ঘাস খাচ্ছে। এখানে বসে গরুগুলোর হাড় গোণা যায়। এই গরু দিয়ে কি কাজ হয় ? দুধ পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের কাছে পাঠিয়ে দিলে একটা গতি হ'ত। কিন্তু তাতেও মুস্কিল ! সনাতন হিন্দুধর্মের ধূপধুনো দিয়ে গরু পূজো হয়। আশে পাশে মুসলমানরা ঘোরাঘুরি করলে দাঙ্গা বাঁধে। মৃতপ্রায় গরুগুলো খেয়ে মৃতপ্রায় তিন কোটি মুসলমান লোকায়ত রাষ্ট্রে কিছু-দিন বেঁচেবর্তে থাকত। কিন্তু সে-রাস্তাও বন্ধ। আমার বিশ্বাস মহম্মদের তিন কোটি হিন্দুস্থানী ভক্ত একদিন এই কারণেই কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষিধের জ্বালা বড় জ্বালা ! ঠেলায় পড়লে এক হাতে কোরাণ এবং অন্য হাতে কার্লমার্কস নিয়ে ওরাও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। আপনি ঠেকাবেন কি করে ?"

শিবরামবাবু ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে জবাব দিলেন, "আমি আর ঠেকাব কি করে?

ঠেকাবেন তো মন্ত্রীরা। তাঁরাও আবার নিজে ঠেকাবেন না। পাঠিয়ে দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। তাঁরা বুঝবেন।"

"ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও মুসলমান আছে। অতএব কোরাণের সংগে কার্লমার্কস আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।" মুসলমান শব্দটা শুনে শিবরামবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "ঘেন্নায় এক এক বার চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে! মনিব যদি কাজের মর্ম না বোঝেন, তা হ'লে সে-কাজ করে লাভ কি মশাই?"

"কোন লাভ নেই। কংগ্রেসী মনিবের চাইতে কম্যুনিষ্ট মনিব হয়তো খারাপ হবে না। অন্তত একটা পরিবর্তন তো হবে। কথায় বলে নতুন ঝাঁটা কেবল নাড়াচাড়া করতে পারলেও তাতে ঘরের ময়লা বেশি সাফ হয়। আপনি কি বলেন শিবরামবাবু?" ফ্লাস্কটা বেঞ্চির তলায় রেখে দিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের বলা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর জোয়ান ও জেনারেলরা একদিন কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবেন। আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন, ঠেলায় পড়লে কোরাণ আর কার্লমার্কস কোলাকুলি করবে। তারপর অবিশ্যি কমরেডরা ময়লা সাফ করতে গিয়ে প্রথমে কোরাণ সাফ করবেন। নতুন ঝাঁটার ঝকমারি আছে মশাই।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "একটু খুলে বলবেন কি? সবই বুঝি, কিন্তু একটু খুলে না বললে কিছুই যেন বুঝি না। নতুন ঝাঁটায় কি অসুবিধা? আমি তর্কের ছলেই প্রশ্নটা করছি। হাজার হ'লেও আপনার কাছে আমি দুধের শিশু।"

আমি লক্ষ্য করলাম শিবরামবাবু বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চিন্তা তাঁর নতুন ঝাঁটা নিয়ে নয়, চিন্তা তাঁর নিজেকে নিয়ে। তিনি বোধহয় আমার কাছে ধরা দিলেন। পরিস্থিতির ডায়লেকটিকস্ আমি বুঝলাম। শিবরামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন ঝাঁটা মানে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"নতুন ঝাঁটায় বেশি ময়লা ওঠে সত্য, কিন্তু কম্যুনিষ্ট ঝাঁটায় কোন ময়লাই উঠবে না।"

"কেন ?"

তিনি বললেন, "কম্যুনিষ্ট-ঝাঁটা ময়লা সাফ করতে ভারতবর্ষে আসবে না। সব পুড়িয়ে দেবে। রাসিয়া পুড়েছে, বলকানস্ পুড়েছে, চায়নায় পোড়া সুরু হয়েছে। ভারতবর্ষও পুড়বে। দু'এক মাসের মধ্যে তিব্বত ভস্মীভূত হবে। আপনি দেখে নেবেন।" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "তিব্বতে কি হ'ল ?"

"চীনা কম্যুনিষ্টরা নিরুদ্বেগে এগোচ্ছে।"

"কেন, আমাদের ভারত সরকার কিছু করছেন না ?"

"সেই তো দুঃখ ভাই! যার নুন খাব তার সংগে তো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। ও-অঞ্চলের মানচিত্র পর্যন্ত দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। উল্টে ধমকাচ্ছেন, কম্যুনিষ্টদের সব ছেড়ে দাও। তাদের আমরা রাজনীতির আদর্শ দিয়ে পরাজিত করব, ইত্যাদি। পাগল আর কি!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওঁদের কথাবার্তার কোন অংশটা ঠিক পাগলামি ?"

"ঐ যে ওঁরা বলেন চীনারা তিব্বত দখল করতে আসছে না, আসছে তিব্বতকে ধর্মের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে। চীনা কম্যুনিষ্টরা সব মুক্তি ফৌজ! লামার বংশ নির্বংশ করে ছাড়বে এবার। ঘরের ময়লা সাফ করবার নাম করে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। তিব্বত আর কালিম্পংএর রাস্তায় দু'চার জন রুসীয় পশম বিক্রেতার খবরও আমরা রাখি। কিন্তু দিল্লিতে কেউ বিশ্বাস করেন না এ-সব। ওঁরা বলেন, রুসিয়ায় এত পশম থাকতে ওরা কালিম্পংএ কেন আসবে পশমের ব্যবসা করতে। অতএব আমরা এখন বিশ্রাম করছি বন্ধু। এই ওয়ালটেয়ার এসে গেছি।" শিবরামবাবু পুনরায় সামনের দিকে চেয়ে বললেন "ঐ দেখুন, স্টেশন মাস্টারের ঘরের গায়ে একটা তিরিশ বাই বারো ইঞ্চি মাপের পোষ্টার মেরে গেছে। কি লিখেছে ওতে জানেন ?"

"কি করে জানব, ও তো তেলেগু ভাষা।"

"আমি জানি ভাষাটা।' লিখেছে সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংস হোক। কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক। আমরা অনধ্র প্রদেশ চাই। ইতি ছাত্রসংঘ। ব্যাপারটা বুঝলেন? কংগ্রেসী শাসন চলছে অথচ স্টেশনে লিখে রেখেছে কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক! রুসিয়ায় কেউ লিখতে পারত? এখানে পারে। কেবল লিখতে পারে না, রেল স্টেশনের দালানে লাগাতে পারে এবং তা তুলে ফেলবার মত কারো সাহস থাকে না। কে জানে, হয়তো ঐ ব্যাটা স্টেশন মাস্টারটা লুকিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে চাঁদা দেয়।" তিনি গাড়ি থেকে নামলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"যাচ্ছি স্টেশন মাস্টারকে দেখতে। লোকটি কে দেখার দরকার আছে। ছাত্রসংঘের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা ডুবে ডুবে জল খায়। স্টেশন মাস্টারও ডুব দিয়েছে কিনা দেখে আসি।" তিনি চলে গেলেন। আমি একটি পুরো আনারস কেটে খেতে লাগলাম। ওয়ালটেয়ারের আনারস যেমন সুস্বাদু তেমন বড়। বড় মানে মোটা, ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার মত মাংসবহুল। আনারস-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। আনারসের গায়ে মাংস আছে, মহারাজার গায়েও আছে অতিরিক্ত, কিন্তু এ-অঞ্চলের কৃষাণদের গায়ে মাংস নেই। গরুগুলো মুসলমানদের কাছেও বোধহয় অখাদ্য। বিনা পয়সায় দিলেও ওরা সিকি ইঞ্চি জিভ বার করবে না। আমার মনে হয়, যে-কোন দেশের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বোঝা যায় গরুর দিকে দৃষ্টি দিলে। মহারাজারা ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়।

শিবরামবাবু ফিরে এলেন। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে। মুখে হাসি নেই। অসহায় মনের পরাভব চিহ্ন আছে। কমরেড, আমি সেদিন স্পষ্ট দেখেছিলাম শিবরামবাবু আশা হারিয়েছেন। আশা হারাতে বাধ্য। কারণ দিল্লির মসনদের চারদিকে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান নি। কেবল বাস্তু-হারাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। ছাত্রসমাজ জানে না পাস করে কি করবে। কৃষক জানে না প্লাবন বন্ধ হবে কিনা, শ্রমিক জানে না ভবিষ্যতে সে পেট ভরে

খেতে পাবে কি না। মধ্যবিত্তের সংসার একটা মস্তবড় জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের বড় কর্মচারী শিবরামবাবুর মনেও কর্মের প্রেরণা নেই। প্রেরণা না থাকলে কর্তব্যে অবহেলা আসবেই। ব্যর্থতা চতুর্দিকে। নৈরাশ্যের অন্ধকার ভারতবর্ষের আকাশকে কালো করে ফেলল। দুর্ভিক্ষ কি প্লাবনের সমস্যা মেটাবার আগে প্রেরণা আনতে হবে, কর্মের প্রেরণা। ভবিষ্যতের নিদিষ্টতায় মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। সাংবাদিকের বৈঠকে বিবৃতি দিয়ে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যাবে না। কম্যুনিজম তাই তার লটবহর নিয়ে দরজায় সমাগত। বুভুক্ষু মানুষ কম্যুনিজমকে সম্ভাষণ জানাবে, কিন্তু সাদর সম্ভাষণ জানাবে না। ব্যর্থ মানুষ কেবল সাদর সম্ভাষণ নয়, সহস্র মাল্য দিয়ে 'স্বাগত' জানাবে। ব্যর্থ মানুষ চৈত্রের ক্ষ্যাপা কুকুরের চাইতেও বেশি ক্ষ্যাপা।

শিববাবু বেজোয়াদায় নেমে গেলেন। আমি ঘুমচ্ছিলাম। আমাকে ঘুম থেকে তুলে তিনি বেশি কথা কওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেছেন। আজ মনে হচ্ছে ঘুমবার আগেই তাঁকে আমি ক্ষমা করেছিলাম।

পরের দিন সকালে মাদ্রাজে পৌঁছে গেলাম। চারটে আনারসের এক টুকরো পর্যন্ত বাকি রাখিনি। সব খেয়েছি। পথের বোঝা কমিয়ে নিয়েছি পথেই। মাদ্রাজ স্টেশনের চেহারা আমার ভাল লাগল না। আলো বাতাস কম। হাওড়ার তুলনায় অনেক ছোট। কিন্তু হাওড়ার তুলনায় আওয়াজ কম। হিন্দি ভাষার গর্জন নেই।

কমরেড রাও একটা ট্যাক্সির মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ট্যাক্সিতে উঠলাম। দু'জনে কথাবার্তা সুরু করলাম। সাধারণ কথা, আমি কেমন আছি, যাত্রা শুভ হ'ল কিনা ইত্যাদি। ট্যাক্সি সমুদ্রের ধারে এলো একেবারে পোষ্ট অফিসের সামনে। কমরেড রাও বললেন, "আসুন, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসি।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। অনেকগুলো সিঁড়ি। লোকের ভিড় নেই। সুযোগ বুঝে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "টপ্ সিক্রেট ?"

"হাঁ, টপ্ সিক্রেট।"

আমি চট করে বলতে পারলাম না। হঠাৎ যেন বাতাসের বেগ বাড়ল। একটা পাখী আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমি দাঁড়ালাম। পাখীটাকে দেখতে পেলাম না। বাতাসের গতিও যেন অনেকটা কমে গেল। এবার বলা যেতে পারে। তবুও পারলাম না। ট্যাক্সিচালক ভীষণ জোরে একটা হাঁচি দিল। আমি মুহূর্তের জন্য দম নিলাম। চারটা আনারসের শ্রাদ্ধ করে দমের প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলাম। গলা পর্যন্ত রস! কমরেড রাও বললেন, "এগারটায় মিটিং আছে, তাড়াতাড়ি বলো।" আমি বললাম, "তিব্বতে মুক্তি ফৌজ আজ পৌঁছবে।"

কমরেড রাও আমাকে পেছনে ফেলে খুব দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। তিনি চিঠি ফেলতে গেলেন। আমি আবার উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে লাগলাম। মাদ্রাজের দ্রাবিড় কিংবা আর্য-দ্রাবিড় সভ্যতার কোন ভগ্নাবশেষ আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। মুগ্ধ করেছিল মাদ্রাজের সমুদ্র। আর মুগ্ধ করেছিল মাদ্রাজের কৃষাণ। মাদ্রাজের মাটিতে কোদাল চালাতে আমি তাদের দেখেছি। দিল্লি-কলকাতার শিক্ষিত মাদ্রাজী এরা নয়। এরা মাটির মানুষ। মাদ্রাজের সত্য মানুষ মাদ্রাজের কৃষাণ।

কমরেড রাও নেমে এলেন। আমার ঘাড়ে হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। আমি বোধহয় ধ্যান করছিলাম। দক্ষিণাবর্ত ধ্যানের রাজ্য। আমার ধ্যান ভাঙল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলাম ট্যাক্সিওলা সেখানে নেই। আমি বললাম, "ট্যাক্সিতে একটা কাঠের বাক্স ছিল।"

"পেয়েছি। রবিবার দিন প্রদর্শনীর দরজায় বইগুলো বিক্রি হয়ে যাবে।

আসুন এই দিকে। ঐ যে ট্যাক্সি একখানা দাঁড়িয়ে আছে।" ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "এগারটায় মিটিং আছে।"

"এখন কি আমার হোটেলে যাওয়ার সময় হবে?"

"হোটেল? সন্ধ্যার আগে কেমন করে যাবেন? আপনার জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি।" দু'দিন ট্রেনে কাটিয়ে এসেছি। দু'দিন ভাল করে চান করিনি, দু'দিন ভাত খাইনি। কমরেড রাওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কফি পাওয়া যাবে কোথায়?"

"নীলগিরিতে।"

একটা গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকল। আমরা নামলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে পয়সা দিতে হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। নীলগিরি পাহাড় এখান থেকে অনেক দূর। আমি জানি কফি জন্মায় সেই অঞ্চলে। আজকে মাদ্রাজের অফিস-আদালত সব বন্ধ। গলিটা ব্যবসায়-মহল। কিন্তু লোকজন কম। কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম না।

একটা জীবনবীমা কোম্পানির অফিসে এসে ঢুকলাম। কমরেড রাও বললেন, "কমরেড রেড্ডি এসেছেন।"

বসবার পর কমরেড রাও পরিচয় করালেন, "কমরেড দীপক চৌধুরী। আর ইনি কমরেড মেনন, মালাবার থেকে এসেছেন। কমরেড আইয়ার, তামিলনাদ। কমরেড সীতারাম, অন্ধ্র। আর কমরেড রেড্ডি আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি।"

কমরেড রাও বললেন, "তেলেংগানার সংগ্রাম আমরা বন্ধ করব কিনা তাই নিয়ে এখন আলোচনা স্বরু হোক। অবিশ্যি পলিটব্যুরোর মত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।" কমরেড মেনন জিজ্ঞাসা করলেন, "কমিনফর্মের মত কি?" কমরেড রাও স্পষ্টতর গলায় ঘোষণা করলেন, "সহিংস সংগ্রাম বন্ধ করবার আদেশ দিয়েছে।" কমরেড আইয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, "মস্কো কি বলে?" কমরেড রাও স্পষ্টতম ভাষায় বললেন, "মস্কোর আদেশ, ধীরে ধীরে

তেলেংগানাকে শান্ত করে আনা। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারির মারাত্মক ভুল ওঁরা ধরে ফেলেছেন। অতএব মস্কো থেকে দ্বিতীয় আদেশ এসেছে তিনি যেন তাঁর ভুল স্বীকার করেন। ভুল স্বীকার করা মানে নেতৃত্ব ত্যাগ করা। অর্থাৎ নেতৃত্ব ত্যাগ করানো।" কমরেড সীতারাম সংগে সংগে প্রতিটি অক্ষর লিখে যাচ্ছিলেন। কমরেড মেনন জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন নেতৃত্ব কাকে দেওয়া হচ্ছে ?" কমরেড রাও বললেন, "একরকম মোটামুটি ঠিকই আছে। তবুও আপনারা আপনাদের নিজের নিজের মত দিন। পার্টি সবাইকে মত দেবার সুযোগ দিচ্ছে।" কমরেড আইয়ার বললেন, "মস্কোর অভিমত জানতে পারলে আমরা সহজেই মত দিতে পারি।"

কমরেড রাও বললেন, "মস্কোর ইচ্ছা কমরেড গোস্বামী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির পদ লাভ করেন। এবার আপনাদের মতামত দিন। সবারই একমত হওয়া চাই।" কমরেড মেনন বললেন, "কমরেড গোস্বামী যোগ্য নেতা।" কমরেড আইয়ার যোগ দিলেন, "মস্কো ভুল করে না।" কমরেড রেড্ডি সায় দিয়ে বললেন, "আমার মতও তাই।" কমরেড সীতারাম লেখা বন্ধ করে বললেন, "সবার সংগে আমিও একমত।" কমরেড রাও তাঁর মত জুড়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, "আমাদের তা হ'লে একমত। সেণ্ট্রাল কমিটি ও পলিটব্যুরোর মিটিং এ কমরেড গোস্বামীর নাম গৃহীত হয়েছে ন'দিন আগে। তবুও আপনারা যে আপনাদের স্বাধীন মত দিয়েছেন তার জন্য সেণ্ট্রাল কমিটির তরফ থেকে আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

কমরেড রাও এবার কমরেড মেননকে বললেন, "আপনার বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।" কমরেড মেনন সুরু করলেন, "মালাবারের কৃষাণ ও ছাত্রদের মধ্যে দেবদেবীর বড় বেশি প্রভাব। আমরা ঠিক করেছি দেবদেবী ফ্রণ্টে একটা বিরাট বিরুদ্ধ প্রচার সুরু করব।" রাও বললেন, "পলিটব্যুরো থেকে আমরা ঠিক করেছি মালাবার এবং অন্যান্য প্রদেশে ধর্মের

বিরুদ্ধে কোন প্রচার আমরা করব না। উপরন্তু ওদের পূজামণ্ডপে দরকার হ'লে আমরা যোগদান করব।"

"কিন্তু মার্কসবাদে ধর্মকে তো— "

কমরেড রাও ধমকে উঠে বললেন, "আমরা মার্কসবাদ নিয়ে কথা বলছি না। আমরা বলছি মালাবার নিয়ে। অতএব কমরেড মেননের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। কারণ মস্কো থেকে আদেশ এসেছে যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ। মন্দির মসজিদ চালু থাক। রাষ্ট্র হাতে এলে বিরুদ্ধ প্রচারের প্রয়োজন হবে না। এক মাসের মধ্যে মন্দির, মসজিদ আর গীর্জার ইট দিয়ে আমরা রাস্তাঘাট তৈরী করব। গজনির মহম্মদ সোমনাথ ক'বার লুট করেছিলেন? সতরো বার। কিন্তু আমরা কাউকে লুট করতে দেব না, আমরা ইটগুলো একেবারেই খুলে নেব। কম্যুনিষ্টরা অপেক্ষা করতে জানে। ধর্ম মানে আফিম, আমরা সবাই জানি কমরেড মেনন। সুতরাং এখন থেকে আমাদের ধর্মফ্রণ্টের নীতি বদলে গেল। আমরা সবাইকে বলব, কম্যুনিষ্টরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। পণ্ডিত নেহেরুও তাই বলেন।" কমরেড আইয়ার বললেন, "রাষ্ট্র হাতে না এলে আফিমের নেশা দূর করা যাবে না।"

"এখন দূর করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দরকার হ'লে নেশা আমরা বাড়িয়ে দেব।" এই বলে কমরেড রাও ঘড়ির দিকে চাইলেন। সবাইকে সম্বোধন করে তিনি আবার বললেন, "আমাদের বিশ্রামের সময় নেই। বিশ্ববিপ্লব সমাগত। আজ তিব্বতের রাজধানী লাসাতে কমরেড মাও-সে-তুঙএর লালফৌজ এসে পৌঁছবে। টপ্ সিক্রেট।"

কমরেড রেড্ডির মাংসপেশীতে হিল্লোল উঠল। তেলেংগানার কৃষাণদের নিয়ে তিনি দিল্লির লালকেল্লায় লাল-পতাকা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা অপেক্ষা করতে জানে।

কমরেড রাও বললেন, "একটা বেজে পনরো। দেড়টায় আমাদের অন্য জায়গায় মিটিং আছে।" মিটিং ভাঙবার সংগে সংগে দু'জন বেরিয়ে গেলেন।

তারপর গেলেন সীতারাম ও কমরেড রেড্ডি। ওঁরা চলে যাওয়ার পর কমরেড রাও বললেন, "আপনি একটু বসুন। আমি চান-ঘর থেকে আসছি।"

দশ মিনিট পর তিনি বেরলেন। দেখলাম তিনি জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসেছেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন। কমরেড রাও বললেন, "পুরো ডিসেম্বর মাসটা মুখে জল ছোঁয়াতে পারিনি।" আমি দেখলাম তাঁর মুখের চামড়ায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। সজারুর কাঁটার মত শক্ত। একমাস জল লাগেনি বলেই বোধহয় প্রত্যেকটি দাড়ির গোড়ায় নোংরা জমেছে। তোয়ালে দিয়ে ধাক্কা মারতেই ঝুরঝুর করে কয়েকটা বালির দানা মাটিতে পড়ল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে বালিগুলো বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু মুখের অন্যান্য জায়গায় খানিকটা কালির দাগ লাগল। গত ছ'মাস থেকে তোয়ালেখানা কমরেড রাওএর পকেটে পকেটে ঘুরছে। তাই দিয়ে তিনি ট্রামের সিট মুছেছেন, ময়দানে বক্তৃতা দেবার সময় চেয়ার সাফ করেছেন, হয়তো মাদ্রাজ আর কলকাতার অনেক ময়লা সাফ করেছেন এই তোয়ালে দিয়ে। তার ওপর সেণ্ট্রাল কমিটির অন্যান্য সভ্যরাও দেশলাই চাওয়ার মত তাঁর কাছ থেকে এই তোয়ালেখানা চেয়ে নিয়ে কোন কোন সময় নিজেদের ময়লা পরিষ্কার করেছেন।

ঘড়িতে দেড়টা বাজতে এক মিনিট বাকি। জিজ্ঞাসা করলাম, "মিটিংএ যাবেন না কমরেড? মাত্র এক মিনিট বাকি।" তিনি জবাব দিলেন, "এক মিনিট পর ওঁরা আসবেন। মিটিং এখানেই হবে। কণ্ট্রোল কমিশনের মিটিং।" আমি বললাম, "একটু বুঝিয়ে বলুন।" তিনি বললেন, "প্রাদেশিক পার্টির মিটিং একটু আগেই হয়ে গেল। এঁদের কাজকর্ম দেখবার জন্য তিনজন সদস্য নিয়ে একটা কণ্ট্রোল কমিশন আছে। এঁরাই হচ্ছেন আসল লোক। বাইরে থেকে কমরেড আইয়ার কিংবা কমরেড রেড্ডিকে সবাই চেনে, কিন্তু এঁদের কেউ চেনে না।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাদের সেণ্ট্রাল কমিটির পেছনেও কি কোন কণ্ট্রোল কমিশন আছে?"

"নিশ্চয়ই। সেণ্ট্রাল কমিটির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। সেণ্ট্রাল কমিটি চালাবার জন্য আবার একটা আলাদা কণ্ট্রোল কমিশন রয়েছে। কেবল তাই নয়, কণ্ট্রোল কমিশনের মধ্যেও আবার একজন আছেন যিনি ওপরের সংগে যোগাযোগ রাখেন। আমাদের কোথাও ফাঁক নেই কমরেড।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পলিটব্যুরোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ নয়? পলিটব্যুরোর পেছনে নিশ্চয়ই কণ্ট্রোল কমিশন নেই?"

"বোধহয় পলিটব্যুরো স্বাধীন।"

তিনজন কমরেড ঘরে ঢুকলেন। ঘড়িতে ঠিক দেড়টা বাজল। এবার কমরেড রাও আমাকে পরিচয় করালেন না। মিটিং সুরু হ'ল। কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্যরা চুপ করে রইলেন। তাঁরা শ্রোতা, বক্তা কমরেড রাও। ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছিল। সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়ে তিনি আলোচনা করছিলেন। প্রায় দু'ঘণ্টা একটানা বক্তৃতা। সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িগুলোর গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। তিনি পকেট থেকে তোয়ালে বার করে মুখ মুছতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বাধা পড়ল। কন্ট্রোল কমিশনের একজন সদস্য বললেন, "মাদ্রাজ সম্বন্ধে আমরা এখন খুব বেশি চিন্তিত নই কমরেড রাও।"

"তবে?" প্রশ্ন করলেন কমরেড রাও।

"কমরেড রেড্ডিকে বেজোয়াদা যেতে দেবেন না। আশা করি তিনি রওনা হন নি?"

"না।"

"কেন্দ্রীয় পুলিসের শিবরাম চাটার্জি আজকে বেজোয়াদায় কমরেড রেড্ডিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অতএব—।"

দ্বিতীয় সভ্য খুব শান্তভাবে লাইনটা পূরণ করলেন, "অতএব শিবরাম চাটার্জি যেন বেজোয়াদার সীমা অতিক্রম করতে না পারে। কমরেড রাও, আপনি আপনার আদেশ পাঠিয়ে দিন। আদেশের মধ্যে উল্লেখ থাকবে আগামী কল্য

রাত দশটার মধ্যে শিবরাম চাটার্জির দেহ যেন সত্যিই শবদেহ হয়। চারদিন পর কমরেড রেড্ডি তেলেংগানায় যাবেন।" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কমরেড চৌধুরী, আপনি সন্ধ্যা ছ'টার সময় 'মাজ্‌দা'য় আসবেন। মাজ্‌দা মানে মাউন্ট রোডের মাজ্‌দা রেস্তোঁরা।" আমি সম্মতি দেওয়ার আগেই ওঁরা তিনজনে উঠে বেরিয়ে গেলেন। আমি বললাম, "কমরেড রাও, আপনি বড্ড ঘেমে গেছেন। মুখটা মুছে ফেলুন।"

ঘাম মুছবার জন্য তিনি ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না। যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "সর্বনাশ! চারটে বাজে! ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং আছে সাড়ে চারটাতে। যেতে হবে। 'বিনি' মিলে ধর্মঘট চলেছে। মাইনে বাড়াবার দাবি কর্তৃপক্ষ কিছুতেই শুনতে চাইছেন না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

বেরবার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ক্ষিধে লাগে নি?"

"ক্ষিধে লাগবার সময় কই? তা ছাড়া এই তো সবে কাল রাত দশটায় 'মাজ্‌দায়' বসে মাংসের কোপ্তা খেয়েছি তিরিশটা। সংগে দু'মুঠো ভাতও খেয়েছিলাম।" ভেবেছিলাম তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে কিনা। কিন্তু সময় নষ্ট করলেন না। ছুটে চললেন সিঁড়ির দিকে।

আমরা এসে বড় রাস্তায় পড়লাম। তিনি একটা ট্যাক্সি নিতে যাচ্ছিলেন। অনুরোধ করলাম, "একটু সময় দিতে হবে।"

"কেন?"

"সিগারেট নেই। সিগারেট কিনব।" সিগারেট কিনে আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম। খালি পেটে সিগারেট খেতে ভাল লাগছিল না। মায়লাপুরের মুখে এসে তিনি ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। একটু থেমে ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে কমরেড রাও হাঁটতে লাগলেন। বেশ খানিকটা হাঁটলাম। হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠিকানা ভুল হয়েছে বুঝি?"

"না। দু'মিনিট আগে এসেছি।"

আমরা দু'মিনিট সময় বেশি হাঁটলাম। রাস্তার দু'দিকে চেয়ে দেখলাম মায়লাপুর বড়লোকের জায়গা। কলকাতার ক্যামাক ষ্ট্রিট। ট্রেড ইউনিয়নের গুপ্ত মিটিং হবে এই জায়গায়। ফিরতি মুখে দু'মিনিটের মধ্যে কমরেড রাও বললেন, "দুঃখের বিষয়, আপনাকে ট্রেড ইউনিয়নের আসল কর্মীদের দেখাতে পারলাম না।"

"কেন?"

"যিনি ওদের হয়ে আসছেন তিনি ট্রেড ইউনিয়ন পার্টির গুপ্ত উপদেষ্টা। যারা বাইরে প্রকাশ্যভাবে কাজ করে তারা কেউ কমরেড রামস্বামীকে জানে না।"

"তা হ'লে এখন কিসের মিটিং হবে কমরেড রাও?"

"ট্রেড ইউনিয়নের পেছনে আবার কনট্রোল কমিশন আছে। বিশ্ববিপ্লবের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার এই সব শ্রমিকসঙ্ঘ। কিন্তু কমরেড রামস্বামীকে আবার আদেশ নিতে হয় এই কনট্রোল কমিশনের কাছ থেকে। দু'জন মেম্বার। একটু আগে যাঁদের দেখলেন তাঁদের মধ্যে দু'জন। এই যে এসে গেছি।"

আমরা একটা সুদৃশ্য এবং নতুন বাড়ির ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির যিনি মালিক তিনি যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা কামিয়েছেন। ইনি মাদ্রাজ প্রদেশের একজন স্বনামধন্য কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী। কংগ্রেস পার্টির বড় চাঁই। এখন তিনি লোহার বাজারে ঘোরাঘুরি করছেন। সন্ধ্যার সময় যান রাজাজির বাড়িতে চা খেতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজাজি দিল্লি থেকে ফিরে মাদ্রাজেই আছেন বুঝি?"

কমরেড রাও সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "আমরা জানি তিনি মাদ্রাজের রাজনীতিতে আবার হস্তক্ষেপ করবেন। কম্যুনিষ্টদের শক্তি যে দক্ষিণ ভারতে প্রতিদিন বাড়ছে তার সত্যিকারের খবর কেবল তিনিই রাখেন। গান্ধির মৃত্যুর পরে আমাদের পার্টির এত বড় শত্রু আর কেউ

ভারতবর্ষে বেঁচে নেই।" আমি বললাম, "দিল্লিতে তাঁর দুঃখ কেউ বোঝে নি। তিনি কেবল কর্মঠ নন, কর্মী। আমাদের হয়ে তাঁকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না? আমাদের শান্তি-কংগ্রেসের খাতায় কি তিনি সই করেছেন?" কমরেড রাও আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে চেয়ে বললেন, "দক্ষিণ ভারতে সব চেয়ে বড় বাধা নেহেরুর এন্‌টিথিসিস্‌ এই তামিল ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া। মাদ্রাজের রাজনীতিতে তিনি আবার ফিরে আসবেন।"

আমরা একটা কামরায় প্রবেশ করলাম। আধো অন্ধকারের মধ্যে তিনটি প্রাণী চুপ করে বসে আছেন। কেউ কারো সংগে কথা কইছেন না। আমরা ঢুকবার পর দরজা বন্ধ হ'ল। ঘরখানা খাবার ঘর। টেবিল চেয়ার সব ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দামী কাঠের আসবাব। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এখানে বসে অনেক-দিন ডিনার খেয়ে গেছেন। মাদ্রাজের মন্ত্রী সংখ্যা হয়তো কোনদিন তিরিশ-চল্লিশ হতে পারে কল্পনা করেই এই টেবিলখানা তৈরি করানো হয়েছে। কংগ্রেস পার্টির দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা যেদিন দেশ ও দশের মাথায় অসহনীয় হয়ে উঠবে, সেদিন সব প্রদেশেই চল্লিশজন করে মন্ত্রী থাকবে। ফরাসি বিপ্লবের দিনে বাস্তিল দুর্গে প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল না? তবু দুর্গের দরজা খুলে দিতে হ'ল।

মিটিং আরম্ভ হ'ল। কমরেড রামস্বামী বললেন, "বিনি মিলে ধর্মঘট সুরু হয়েছে তিরিশ দিন হ'ল।" তিনি পয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিলেন ধর্মঘটের ইতিহাস বর্ণনা করতে। কর্তৃপক্ষের সংগে ক'বার আলাপ আলোচনা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিতে আরও কুড়ি মিনিট সময় লাগল। কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্য দু'জন অত্যন্ত ধৈয ও শ্রদ্ধাসহকারে কমরেড রামস্বামীর বক্তৃতা শুনলেন। আমিও শুনলাম। শেষ পর্যন্ত কমরেড রামস্বামী বললেন, "কর্তৃ-পক্ষের মেরুদণ্ড নরম হয়ে এসেছে। আমাদের সংগ্রাম করবার শক্তি এই থেকে অনুমান করে নিতে হবে।" কমরেড রাও জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুমান কেন?"

"সংগ্রাম শেষ হ'লে তবে শক্তির একটা প্রামাণিক গড় আমরা বার করতে পারব। অতএব এখনও ওদের শক্তি অনুমানের পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।" কমরেড রামস্বামী নস্যি নিলেন। নেওয়ার পর তিনি বললেন, "সংগ্রাম চলুক।" প্রথম সদস্য এবার কথা বললেন, "সংগ্রাম বন্ধ করুন কমরেড।" রামস্বামী নস্যির কৌটো নিজের পকেটেই আবার তাড়াতাড়ি করে খুঁজতে গিয়ে আমার বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। আমি একটু সরে বসতেই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কেবল ভুল পকেটে হাত ঢোকাবার ভুল নয়। ধর্মঘট চালাবার ভুল। হয়তো শেষ পযন্ত প্রমাণিত হবে ধর্মঘট সুরু করাই ভুল হয়েছিল।

দ্বিতীয় বার নস্যি নেওয়ার পর, কমরেড রামস্বামী বললেন, "আর পনরো দিন ধর্মঘট চালাতে পারলে শ্রমিকদের সব দাবি ওঁরা মেনে নেবেন।" দ্বিতীয় সদস্য বললেন, "আমরা এখন দাবি সম্বন্ধে আলোচনা করছি না কমরেড।"

"ধর্মঘট নিয়ে করছি তো?"

"আপনি জেগে আছেন, না ঘুমোচ্ছেন?"

এবার প্রথম সদস্য টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, "ধর্মঘট এবং শ্রমিকদের দাবি সম্বন্ধে আপনি পঁচাত্তর মিনিট বক্তৃতা করলেন। এবার আমরা পাঁচ মিনিট কথা কইব। কথা কইব ধর্মঘট কিংবা দাবি নিয়ে নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ধর্মঘট বন্ধ করা।" দ্বিতীয় সদস্য বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধর্মঘট বন্ধ করুন। ধর্মঘট সুরু করার কৃতিত্ব যেমন আপনার, বন্ধ করার গৌরবও আপনার।" কমরেড রামস্বামী বললেন, "শ্রমিকদের বহু লোকসান হ'ল।"

"দু'পাঁচ হাজার শ্রমিক মরে গেলেও পার্টির লোকসান হবে না। কারণ শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়বেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের চীনা মুক্তি-ফৌজ তিব্বত দখল করছেন। অতএব ভারতবর্ষের কোথাও কোন গণ্ডগোল থাকা উচিত নয়। কংগ্রেস নেতাদের শুচিবাই আছে। ওঁরা হয়তো মনে করতে পারেন যে, শ্রমিকসংঘের ধর্মঘট তিব্বত দখল পরিকল্পনার একটি

অপরিহার্য অংশ। তা ছাড়া মস্কো থেকে আদেশ এসেছে ; অতএব বন্ধ করতেই হবে।" প্রথম সদস্য হেসে বললেন, "নেহেরুর ধারণা তিনি একটু জোরে ফুঁ দিলেই কম্যুনিষ্টরা ঠাণ্ডা হয়।" দ্বিতীয় সদস্য যোগ দিলেন, "বিনি মিলের শ্রমিকদের লোকসানের চেয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের লোকসান বেশি বলে মনে হয় না কমরেড ?"

কমরেড রামস্বামী উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, "আলবৎ। এবার আমি সব বুঝেছি। ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমি কমরেড মাও-সে-তুঙকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ওঁরা উঠলেন। সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কমরেড রাও বললেন, "ছ'টার সময় আপনাকে 'মাজদা'য় যেতে হবে কমরেড চৌধুরী।"

আমি বললাম, "স্মরণ আছে।"

"আপনি যাচ্ছেন মিঃ কৃষ্ণানের স'গে দেখা করতে।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার কেন ?"

"তিনি আমাদের পার্টির মেম্বার নন। এ-সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব না কমরেড চৌধুরী।" আমি বললাম, "মাজদায় খাবারদাবার কিছু পাওয়া যায় তো ?"

"অনেক। মুসলমানের দোকান, মাছ মাংস পাবেন। বাঙালীর পক্ষে খুবই সুবিধা।" আমরা নিঃশব্দে বাকি পথটুকু হেঁটে এলাম। মায়লাপুরের মুখে এসে তিনি বললেন, "ট্যাক্সি নেওয়ার দরকার নেই। এখনো পঁচিশ মিনিট বাকি। অন্ধকার হয়ে এসেছে। হেঁটে যাই চলুন।" আমি বললাম, "হাঁ, তাই ভাল। কিন্তু একটু আগে গেলে কিছু খেয়ে নিতে পারতাম।"

"আপনার বুঝি সন্ধ্যার সময় খাওয়ার অভ্যাস ?"

"না। ঠিক তা নয়। এখন থেকে যাট ঘণ্টা আগে আমি ভাত খেয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম।"

"একেবারে হোটেলে গিয়েই খাবেন। বার নম্বর কামরা। সব রেডি পাবেন।"

'মাজদা'য় মিঃ কৃষ্ণান কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, "চলুন।" আমি বসবার সুযোগ পেলাম না। কমরেড রাও আর ভেতরে ঢোকেন নি। আমরা দু'জন বাইরে বেরিয়ে এসে মাউণ্ট রোড ধরে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা দূরে এগিয়ে আসার পর তিনি পেছন দিকে ফিরে চাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশুবাবু কি মারা গেছেন?"

আমি বললাম, "না। গত দু'দিনের খবর আমি জানি না।" আবার পাঁচ মিনিট পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। তেষ্টায় ও ক্ষিধের জালায় আমার পা কাঁপছিল। কৃষ্ণান বললেন, "চলুন, একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।" হাতে আমার স্বর্গ ঠেকল। ডান হাতের সবগুলো আঙুল ইতোমধ্যে সিগারেটের বিষে হলদে হয়ে উঠেছিল। তিনি চারদিকে চাইতে চাইতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেই পৌছে গেলেন। 'স্টেশনের সামনে একটা পরিচিত ট্যাক্সি ছিল। ট্যাক্সিতে চেপে তিনি আমার হাতে একটা চাবি দিয়ে বললেন, "বার নম্বর কামরার চাবি। হোটেলের খাতায় কি নাম লিখবেন?"

"দীপক চৌধুরী লেখাই উচিত হবে।"

"বেশ তাই হোক। হোটেলে আমরা জানিয়ে দিয়েছি আপনার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী।" ট্যাক্সিচালককে বললেন, "উডল্যাণ্ডস্।" শব্দটার উচ্চারণে গলায় আমার কফির স্বাদ এলো। গলাটা যেন একটু ভিজে উঠেছে। উডল্যাণ্ডসের সামনে নেমে ট্যাক্সিকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করলেন। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "আপনি একটু বিশ্রাম করুন। চান করে নিন। রাত আটটার সময় আপনি ঘরের চাবিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। জামা কাপড় বদলে নেবেন। ঠিক আটটায় আমি এই রাস্তা

দিয়ে হাঁটব। ম্যানেজারকে বলে আসবেন আজ রাত্রিতে ফিরবেন না। কারণ আপনার নেমন্তন্ন আছে।"

"গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

বারো নম্বর কামরায় ঢুকতেই হোটেলের সবাই খবর পেয়ে গেল। ম্যানেজার ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে এক্ষুনি কফি পাঠিয়ে দি?"

"কফির সংগে দু'টুকরো রুটি আর চারটে ডিমের ওমলেটও দেবেন।"

"রাত্তিরে কোন বিশেষ ডিস্ খাবেন কি?"

"রাত্তিরে আমি খাব না। নেমন্তন্ন আছে।"

"তা হ'লে বিশেষ 'ডিস্‌টা' আমার নষ্ট হ'ল। মুরগির মাংস দিয়ে বিরিয়ানি করিয়েছিলাম। বাঙালী ব্রাহ্মণরা মুরগি খান আমি জানি।"

"তা হ'লে ডিমরুটির দরকার নেই। বিরিয়ানিটা পাঠিয়ে দিন। এখানেই পাঠিয়ে দিন। আমি বড্ড পরিশ্রান্ত।"

"না না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। কোন অসুবিধা হ'লে আমাকে দয়া করে তক্ষুনি জানাবেন। দুটো লোক দিলাম, আপনার সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য।"

"একটা লোক হ'লেই আমার চলবে। আমি কিন্তু মন্ত্রী নই। মন্ত্রী আমার বাবা, বুঝলেন?"

"আমি জানি মিঃ চৌধুরী। আমার ছেলে এবার বি. এ. পাশ করবে। ভাল ছেলে। ভাবছি তাকে আমি দিল্লি পাঠাব।"

"কিন্তু আমি এখন কাপড় ছাড়ব, ঘরটা একটু ফাঁকা হ'লে সুবিধা হয়।"

"ও, হাঁ, হাঁ—।"

ঘাড় নাড়তে নাড়তে তিনি বিদায় নিলেন। চাকর দুটো দ্রাবিড় জল্লাদের মত দুটো তোয়ালে কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটাকে বললাম, "জুতোর

ফিতেটা খুলে দাও।" দুটোই এক সংগে চারটে হাত দিয়ে জুতোর ফি... খুলতে এলো। দুটো পা ছড়িয়ে দিলাম দু'জনের দিকে। জুতো খোলার সংগে সংগে আমি এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। দুটো জল্লাদ আমার কোট নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। ওরা যখন গা থেকে জামাটা খোলার চেষ্টা করছিল, সেই সময় হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। আধঘণ্টা পর আমার কফি আর বিরিয়ানি এসে উপস্থিত। দুটো থেকেই ধোঁয়া উঠছে। আধঘণ্টা ঘুমের পর আমার শরীরে অসীম শক্তি ফিরে এলো। আমি সজীব হয়ে উঠলাম। হঠাৎ মনে পড়ল আজ আমার জন্মদিন।

কৃষ্ণান উত্তর দিকে হাঁটছিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এ... পোষাক আর এমন চেহারা নিয়ে রাস্তায় হাঁটলে ভিড় জমে যাবে।"

"বলেন কি, দেহের সৌন্দর্যের জন্য দক্ষিণ-ভারত প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ! যত সব নাচিয়েরা তো এ দিক থেকেই যায়।"

"দু'একজন মাঝে মাঝে এদিকেও আসে। এই যে এসে গেছি।" আমি দেখলাম আমরা ঘুরে ফিরে সেই মায়লাপুরেই আছি। এবং আছি সেই বড়-লোক লোহা বিক্রেতার বাড়িতে। জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব বড় পার্টি বুঝি?"

"না, খুব বড় নয়। মিঃ চেট্টিয়ার, মানে বাড়ির মালিক একটা শিল্প-প্রদর্শনী অর্গানাইজ করেছেন। সেই সম্পর্কে মিঃ চেট্টিয়ার শহরের দু'চারজন গণ্যমান্য শিল্পরসিককে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন। বড় রসিক মাদ্রাজের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনাদার। তিনিই পরশুদিন প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করবেন। তাছাড়া দিল্লি থেকে মিঃ সিমেনস এসেছেন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে। তাঁকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই 'ভয়েড এণ্ড ভয়েড' কোম্পানির নাম শুনেছেন? বিলাতী কোম্পানি। সর্বভারতে বহু শাখা অফিস। মিঃ সিমেনস সেই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। চেট্টিয়ার ধূর্ত লোক। মোটা একটা চাঁদার অঙ্ক আদায় করে নেবেন। আরো একজন আসবে। হয়তো এসেই গেছে।

তাঁর নাম মিস্ মার্গারেট। সুন্দরী এবং ছবি আঁকেন ভাল। শিল্প-প্রদর্শনীর পর মাদ্রাজে একটা সাহিত্যসভার অধিবেশন হবে। চেট্টিয়ার ঘোষণা করেছেন, সব চেয়ে ভাল সাহিত্যিককে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অত টাকা ঘোষণা করতে গভর্ণমেণ্টও ভয় পায়। অন্তত আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্যিক গভর্ণমেণ্টের কাছে অত টাকা পায় নি। গত দশ বছরের মধ্যে অভাবের তাড়নায় কম পক্ষে দশটি সাহিত্যিক নষ্ট হয়ে গেছে। যক্ষায় মরেছে তিন জন। একজনকে আমি চিনতাম। বেঁচে থাকলে তামিল ভাষায় ট্রাক্টর-সাহিত্য জন্ম নিত খুব তাড়াতাড়ি। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে ফেলবার জন্য গজনী থেকে লোক ডাকতে হ'ত না। সে একাই পারত।"

কৃষ্ণান পকেট থেকে পাইপ বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। আগে থেকেই পাইপে তামাক ভর্তি করা ছিল। ফটকের বাইরে দেখলাম পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কড়া পাহারা! কৃষ্ণান হেসে বললেন, "রেড্ডির রাত্রিতে খুব ভাল ঘুম হবে। বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে দোষ দেওয়া যায় না, বড্ড ছেলেমানুষ। ফটকে পুলিশ পাহারা থাকলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা হ'লেও পড়তাম। এদিকে, শিবরাম চাটার্জি ঠাণ্ডার মধ্যে বেজোয়াদা স্টেশনে রেড্ডিকে খুঁজছে!"

আমি বললাম, "শিববাবুকে বেশিক্ষণ ঠাণ্ডায় কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না।"

"তা যা বলেছেন। রাও এতক্ষণে বন্দোবস্ত সব পাকা করে ফেলেছে।"

নৈশভোজ আরম্ভ হয়েছে। সেই বড় টেবিলটার চারদিকে প্রায় কুড়িজন লোক বসেছেন। কুড়িজনের মধ্যে দশজনই স্ত্রীলোক। আমি দেখলাম দু'চার-জন মেয়ে সত্যই সুন্দরী। অজন্তার ছাঁচে ঢালাই করা দেহসৌষ্ঠব। বেশভূষা, কথাবার্তা এবং ভংগিতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কলকাতার কোন ক্লাবে এ-সৌষ্ঠব দেখা যেত না। বাবার সংগে আমি বড় বড় পার্টিতে গেছি। কিন্তু সব সময় আমার মনে হ'ত মহিলা এবং মহোদয়গণের নামগুলোই কেবল ভারতীয়। আর সবই ইংরেজি ভাবাপন্ন। ভাষা এবং ভংগির সবটুকুই

ইংরেজি। সেই তুলনায় মাদ্রাজ অনেকটা গ্রাম্য। লিপ-স্টিকের বাহুল্য কোথাও নেই। এবং কারো কারো ঠোঁটে স্পর্শ পর্যন্ত নেই।

সবার সংগে পরিচয় হ'ল। কৃষ্ণান দেখলাম বাবার নামটাই খুব বেশি করে প্রচার করছেন। সবার শেষে পরিচয় হ'ল লক্ষ্মীর সংগে। আমার পাশেই বসেছে। কৃষ্ণানের আপন বোন। মনে হ'ল অজন্তার দেওয়াল থেকে তুলে এনে চেট্টির বাড়ির চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। চেট্টিয়ার থেকে সুরু করে সবাই সুযোগ সুবিধা মত অজন্তার সৌন্দর্য দেখছিলেন। কিন্তু মেয়েরা তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমার ডান পাশে কৃষ্ণান বসেছেন। কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "সংযুক্তাকে খুঁজে পেলে?" আমি বললাম, "পেয়েছি। জয়চাঁদের আপত্তি না থাকলে নামটা উচ্চারণ করতে পারি।"

সূপ খাওয়া শেষ হয়েছে। চেট্টিয়ার শেষ করেছেন অনেক আগে। চেট্টিয়ার নিজেও সুপুরুষ। মোষের দুধের মত সাদা ধবধবে খদ্দরের কাপড় পরেছেন। মাথায় গান্ধি টুপি। এবার চাইলাম আমি মাদ্রাজের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনাদারের দিকে। তাঁকে আজকের এই সমাগত সৌন্দর্যের মধ্যে ডেকে আনা উচিত হয় নি। আমার মনে হ'ল উপহাস করবার জন্যই তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে।

মিঃ সিমেনস মাদ্রাজ কৃষি-বিভাগের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মুখ্য মন্ত্রী বললেন, "তোমরা যদি বিলেত থেকে ট্রাকটার আর ফারটিলাইজার তাড়াতাড়ি এনে ফেলতে না পার তা হ'লে কৃষিসমস্যা কিছুতেই মিটবে না।" মিঃ সিমেনস বললেন, "ভয়েড এণ্ড ভয়েড কোম্পানির প্রতিনিধিরা ইতালি থেকে বিলেত পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছে মাল যোগাড় করবার জন্য। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না। আবার জাহাজ পাওয়া গেলেও মাল পাওয়া যাচ্ছে না। বিলেতের রপ্তানি ব্যবসা কত বেড়েছে দেখেছ? তবুও ভারতবর্ষের অভাব মেটাতে পারছে না। আমরা অবিশ্যি যথাসাধ্য করছি।" মুখ্য মন্ত্রী পুডিং খাচ্ছিলেন মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ তিনি দেখলেন তাঁর দিকে সবাই

চেয়ে আছেন, কেবল মেয়েরা ছাড়া। শ্রীনাদার বললেন, "যথাসাধ্য করছি বলেই তো থেমে গেলে চলবে না, মিঃ সিমেনস। কৃষাণদের কাছে তাড়াতাড়ি জিনিস পৌছুতে হবে। নইলে কম্যুনিষ্টরা সব গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যদি একবার চেপে বসে যায় তা হ'লে মার্কসবাদের জিভ দিয়ে চেটে চেটে মাটির সার পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। ইংল্যাণ্ডের তাতে কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখো মিঃ সিমেনস।"

চেট্টিয়ার বললেন, "মাদ্রাজ প্রদেশ মন্দির, গির্জা, আর মাটির দেশ। এখানে কম্যুনিজম প্রবেশ করলে সর্বনাশ হবে। তবে মাদ্রাজ সম্বন্ধে শ্রীনাদার যতটা ওয়াকিবহাল, তাতে মনে হয়, সবাই যদি আমরা ততটা ওয়াকিবহাল হই তবে কম্যুনিজমকে আমরা মোটেই ভয় করব না।" শ্রীনাদার খুসি হলেন।

নৈশ ভোজ শেষ হ'ল। সবাই ভারতীয় পদ্ধতিতে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম কৃষ্ণান সিমেনস সাহেবের সংগে সংগে গেলেন। লক্ষ্মীর সংগে এখনও আমার নমস্কার বিনিময় হয়নি। সে উঠল সবার শেষে। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দনের জন্য। কেন যেন মনে হ'ল, আজ বোধহয় ইংরেজি কায়দায় করমর্দন করাই উচিত হবে।

লক্ষ্মী ইতস্তত করছিল। কলকাতার কোন ক্লাবে কোন ভারতীয় মহিলা মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করত না। আমি হাত উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। লক্ষ্মী তার হাত বাড়িয়ে দিল। আমি করমর্দন করলাম। আমার হাতের উত্তাপ সে অনুভব করল। সে জিজ্ঞাসা করল, "মাদ্রাজে ক'দিন আছেন?" বললাম, "অন্তত পনরো দিন।"

"কাল তাহ'লে আমাদের বাড়িতে একবার আসুন না? মা খুব খুসি হবেন।"

"ক'টার সময় যাব?"

"সন্ধ্যা ছ'টা। অসুবিধা হবে?"

"বোধহয় হবে না।"

আমরা দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লম্বা ঘরটা অতিক্রম করতে লাগলাম। লক্ষ্মী বলল, "চেট্টিয়াররা সবাই কোটিপতি।"

বললাম, "শুনেছি, যুদ্ধের পূবে বর্মা থেকে সুরু করে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া চেট্টিয়াররা প্রায় কিনে নিয়েছিল।"

"আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমাদের এই চেট্টিয়ারও ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার বড় ব্যবসায়ী। হেড অফিস ছিল সিংগাপুরে। কিন্তু যুদ্ধের পর ওঁর বর্মাতেই কেবল পঞ্চাশ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। ইংরেজরা ওঁর সংগে অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সিংগাপুরের চীনা কোটিপতিরা ওঁকে পছন্দ করত না। যুদ্ধের পরে যখন তিনি সেখানে ফিরে গেলেন তখন চীনা কোটি-পতিরা ইংরেজের সাহায্য নিয়ে চেট্টিয়ারকে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার ব্যবসায়-রাজ্য থেকে উৎখাত করে। সেখানেও তাঁর কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। তিনি পুনরায় ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ছাড়া তাঁর ক্ষতি পূরণের আর কোন পথ রইল না। তিনি যদি আবার কোনদিন সত্যিই বড় লোক হতে পারেন তা হ'লে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তিনি চীনা কোটিপতি ও ইংরেজদের সংগে খুব বড় রকমের টক্কর লড়বেন।" লক্ষ্মীর কণ্ঠে চেট্টিয়ারের জীবনবৃত্তান্ত অতি সুন্দর শোনাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ সিমেনসকে তবে ঘটা করে খানা খাওয়াচ্ছেন কেন?"

"আমার মনে হয় প্রথম কারণ, ব্যবসায় সুবিধা। দ্বিতীয়, সিমেনস পুরো-পুরি ইংরেজ নয়। বিয়েসাদি করেননি। করবার বোধহয় আর বয়সও নেই। দাদা কিন্তু সিমেনসকে দেখতে পারেন না।"

"কেন?"

"ভীষণ মাতাল।"

আমরা এবার বাইরে এসে পড়েছি। সামনে বাগান দেখা যাচ্ছে। অনেক ফুল ফুটে রয়েছে তাতে। বাগানের মধ্যে নেমে এলাম। ফটকের বাইরে

থেকে কৃষ্ণান আর চেট্টিয়ার আসছিলেন। লক্ষ্মী বলল, "বাংলার মত মাদ্রাজে মাড়োয়ারি সমস্যা নেই। এখানকার চেট্টিয়ার সমস্যা প্রবল না হ'লেও প্রখর।" দেওয়াল-ঘড়িতে কোথায় যেন দশটা বাজার শব্দ হ'ল। চেট্টিয়ার মাথা নীচু করে আমায় নমস্কার করলেন। আমিও তাই করলাম। তিনি বললেন, "আমার গাড়িটা বাইরেই আছে। আপনাদের পৌছে দেবে।" আমরা তাঁর গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমি আর লক্ষ্মী বসলাম পেছনে। কৃষ্ণান বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সব ব্যবস্থাই আমার মনঃপূত হ'ল।

আমরা পাশাপাশি বসে মাদ্রাজের রাস্তা দিয়ে ছুটে চললাম। ভাবলাম, আমার জীবনের রাস্তা মাদ্রাজের রাস্তার মত নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বিঘ্ন ও বিপদসংকুল রাস্তায় আমার চলা ফেরা। এমন রাস্তায় অজন্তার সৌন্দর্য কেবল ভাঙতেই থাকবে। রক্ষা করা যাবে না। কি দরকার পথের বিড়ম্বনা বাড়ানো? কোটের বুকে আমি কোনদিন ফুল লাগাই না। ভয়ে মরি, পাপড়িগুলোতে যদি আঘাত লাগে! লক্ষ্মী কেবল আঘাতই পাবে না, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করলাম আগামীকাল অজুহাত দেব। নেমন্তন্ন রক্ষা আমি করব না। এই ভেবে গাড়ির কোণায় সরে বসলাম।

কৃষ্ণানদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নামবার আগে লক্ষ্মী আমার হাত ভিক্ষা করল করমর্দনের জন্য। আমি ভারতীয় কায়দায় নমস্কার করলাম। লক্ষ্মী নেমে গেল। গাড়িতে বসে কৃষ্ণান ড্রাইভারকে বললেন, "রায়পেতা, ভয়েড্ এণ্ড ভয়েড্ কোম্পানির অফিস।"

অফিসের ওপরেই তিনঘরের একটা ফ্ল্যাট। কোম্পানির বড় সাহেবরা দিল্লি-কলকাতা থেকে যখন মাদ্রাজে আসেন তখন এখানেই থাকেন। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণান অফিস-বাড়ির সংলগ্ন একটা রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি অন্য একটা রাস্তা দিয়ে আমায় সেই অফিসবাড়ির মধ্যেই নিয়ে এলেন। দরজার দারোয়ান আমাদের সেলাম জানাল।

আশপাশের বাড়িগুলোতে আলো দেখতে পেলাম না। ভয়েড্ এণ্ড ভয়েড্ কোম্পানির অফিসও নিস্তব্ধ। আমরা অন্ধকার রায়পেতায় প্রবেশ করলাম। আমার জীবনের অন্ধকার এই রায়পেতার রাস্তায় গভীরতর হ'ল।

ঘরে ঢুকতেই সিমেনস হেসে আমায় রাসিয়ান্ ভাষায় অভিবাদন করলেন, "টোভারিস—।" আমিও রাসিয়ান ভাষায় জবাব দিলাম। কৃষ্ণানকে তিনি বললেন, "কাল সাড়ে দশটার সময় আমার সংগে অফিসে দেখা ক'র।" সম্মতি জানিয়ে কৃষ্ণান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি বললেন, "চলো, শোবার ঘরে গিয়ে বসি।"

শোবার ঘরটা অত্যন্ত ছোট। একটা খাট পাতা রয়েছে। খাটের সামনে একটা ছোট্ট টেবিল। দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা হুইস্কির পুরো বোতল। পাশে দুটো গেলাস রয়েছে।

"আমার বয়স কত বলে তোমার মনে হয় চৌধুরী?" সিমেনস আমায় প্রশ্ন করলেন।

"পয়তাল্লিশ।"

"ঠিক বলেছ।" সিমেনস বাঁ দিকের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজের বাক্স বার করে দুটো টেবলেট খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "গ্যাসট্রিক আলসার। অনেক দিনের ব্যাধি।" সোডার সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে দুটো গেলাস ভর্তি করে চেয়ারে বসলেন ঠিক আমার উল্টো দিকে। আমাদের দু'জনের মুখের দূরত্ব হ'ল দু'ফুট। গেলাস থেকে প্রায় অর্ধেকটা একটানে খেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার ফরাসি ভাষায়, "তুমি খাচ্ছ না যে?"

"খুব বেশি অভ্যাস নেই, তাই একটু সময় নিচ্ছি।" আমার ফরাসি উচ্চারণ শুনে তিনি যেন একটু খুসি হলেন বলে মনে হ'ল। আমি বুঝলাম, আমার মদ খাওয়া সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহশীল ছিলেন না। তিনি আমার

ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সিমেনস ইতালীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশু রায় এখনো মারা যান নি?" আমি জবাব দিলাম, "না তো!"

"তা হ'লে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন কাল, হার্টফেল করে?"

"তাই নাকি? কিন্তু তাঁর তো কোন অসুখ ছিল না।"

"শক পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। এখন বিশু রায়ও ধীরে ধীরে মারা যাবেন বলে আশা করা যায়। কি বল?"

"আমার বিশ্বাস তাই। কিন্তু মিঃ সিমেনস, একটা প্রশ্ন করব?"

"নির্ভয়ে।"

"আমি এখন কার সংগে কথা কইছি?"

"কমরেড সেলেনকভের প্রতিনিধি। তোমাদের পার্টি যার কাছ থেকে আদেশ নেয়।"

গেলাসে আমি প্রথম চুমুক দিলাম। বড্ড তেতো লাগল। তিনি ডান দিকের ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করলেন। মস্তবড় মোটা ফাইল। দীপক চৌধুরীর জীবন বৃত্তান্ত। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ফাইলের এক জায়গায় দেখলাম রাসিয়ান ভাষায় কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে। সিমেনস পাতা ওল্টাতে লাগলেন। মনে হ'ল তিনি ফাইলের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন। প্রায় মিনিট দশেক পর্যন্ত ডুবে রইলেন। তারপর বললেন, "ভারতবর্ষে আমাকে কেউ চেনে না, একমাত্র কৃষ্ণান ছাড়া। আর তুমি হচ্ছ দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ান যার কাছে আমি আজ নিজের পরিচয় দিচ্ছি। অতএব তোমার স্থান পার্টির অনেক ঊর্ধ্বে। কোন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেউ এমন সম্মান পায়নি।" আমি নির্ভয়ে প্রশ্ন করলাম, "আমাকে এই বিশেষ অনুগ্রহ কেন?"

"কমরেড সেলেনকভ তোমার ফাইল দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। শীঘ্রই তোমার ডাক আসবে মস্কো থেকে। কমরেড প্লেখানভ তোমার পেছনে রয়েছেন।" এক মুহূর্তের মধ্যে আমার সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। আমি ভারতবর্ষের

সীমা অতিক্রম করে গেলাম। আমি আন্তর্জাতিক দীপক চৌধুরী। সিমেনস বললেন, "এখন সময় নষ্ট না করে আসল আলোচনায় নেমে পড়া যাক। প্রথমত তুমি তোমার কাজের জন্য কেবল আমার কাছে দায়ী থাকবে। পার্টি তোমার আদেশ মানবে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের যতগুলো কণ্ট্রোল কমিশন আছে তার সম্বন্ধে গুপ্ত রিপোর্ট তুমি কেবল আমাকে দেবে। তৃতীয়, তোমার সেক্রেটারিয়েট থাকবে তোমার মনে। দ্বিতীয় কোন সাহায্যকারী থাকবে না। চতুর্থ, কৃষ্ণানের ওপর দৃষ্টি রাখবে তুমি। পঞ্চম, পলিটব্যুরোকে আদেশ দেবে তুমি। কৃষ্ণান পৌছে দেবে। পার্টির লোক কেবল জানুক তুমি একজন সাধারণ কম্যুনিষ্ট। ষষ্ঠ, পার্টির কোন কাগজপত্রে তোমার নাম থাকবে না। অতএব আজ থেকে তুমি আর পার্টির মেম্বার নও। তুমি সব কণ্ট্রোল কমিশনের মিটিংএ উপস্থিত থাকবে দর্শক হিসাবে। সপ্তম, তোমার সব চেয়ে বড় কাজ রাজনৈতিক। মনে করো, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ। ঐ দূরের সীমাহীন দিগন্তের নীচে আমি আর তুমি। তীর থেকে আমাদের কেউ দেখতে পায় না। কৃষ্ণান-সূর্য দিগন্ত থেকে উপরে উঠল আমাদের আদেশ নিয়ে। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট রাজ্যের সংগে কৃষ্ণানের যোগাযোগ হ'ল। রাজ্য আলোকিত হ'ল। আমরা আদেশ দিয়েছি, অতএব দায়িত্ব সব আমাদের। কমরেড চৌধুরী, আমরা শক্তি চাই। পাওয়ার। আমাদের চারটে হাতের বজ্রশাসনে ভারতবর্ষকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আমাদের পার্টিকে তাই এক-প্রস্তর-স্তম্ভ করতে হয়েছে, মনোলিথিক। মার্কসবাদ নিয়ে সময় নষ্ট করবার সময় আমাদের হাতে নেই। এংলো-আমেরিকার লৌহবেষ্টনী প্রতিদিন ভারতবর্ষকে ঘিরে ফেলছে। কৃষক মরুক, মধ্যবিত্ত মরুক, শ্রমিক মরুক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে পারব না। আমরা ভাবব ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিদিন প্রতি মিনিটে কি করে ঘুণ লাগানো যায়। কেবল দেহের প্রতি রোমকূপে পোকা ধরিয়ে দিলে চলবে না, ভেতর থেকে খাইয়ে দিতে হবে। মানুষ সহজে বিদ্রোহ করে না। এ-যুগের 'ইনসারেকসন্' ফরাসি বিপ্লবের

মত ছেলেখেলা নয়। ভারতবর্ষের মাটিতে চিমটি কাটলে যেদিন পাঁচজন করে কম্যুনিষ্ট বেরবে, সেদিন বুঝবে, নেহেরুর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিদ্রোহ অনিবার্য। এই তো রাজনীতি।"

সিমেনস বাকি গেলাসটা শেষ করে বোতল থেকে আবার খানিকটা ঢেলে নিলেন। আমি জিভের ডগা দিয়ে একটু একটু করে চাটছিলাম। সিমেনস পাইপ ধরিয়ে বললেন, "তা হ'লে রাজনীতির শেষ শব্দটা আমরা জানি। কিন্তু তার আগে আরো কতকগুলো শব্দ আছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটু দাঁড়াও, দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিই।" তিনি দুটো ট্যাবলেট খেয়ে পুনরায় আরম্ভ করলেন, "আমাদের রাজনীতি বুর্জোয়াদের মত মাঠে বক্তৃতা দেওয়া নয়। আমাদের রাজনীতির একটা প্রধান কাজ সংবাদ সংগ্রহ করা। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই। কেবল নেহেরু-বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মত কয়েকটি লোকের খবর জানলে হবে না। প্রত্যেকটি লোক সম্বন্ধে আমরা জানব। অত লোকের খবর জানতে হ'লে দরকার গুপ্ত কর্মীসংঘের। রাসিয়ায় যেমন 'ওগ্‌পু'। এংলো-আমেরিকানরা গুপ্ত পুলিস বলে গাল দেয় বটে কিন্তু আসলে ওগ্‌পু হচ্ছে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি গোপন দৃষ্টি রাখবার সজাগ প্রহরী। চব্বিশ ঘণ্টার প্রহরী! উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত। কমরেড, ভারতবর্ষেও আমরা 'ওগ্‌পু'র মত গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব। আমরা কাজ আরম্ভ করেছি।"

সিমেনস হঠাৎ উঠে পড়লেন। দ্রুতপদে বসবার ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরের দরজা খুলে বারান্দার দু'দিকটা ভাল করে দেখে এলেন। এসে ফাইল থেকে একটা টাইপ করা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, "যে সব কাজ তোমায় করতে হবে বলে বললাম তা সব এই কাগজে লেখা আছে। সবটা মুখস্থ করতে হবে। কোন নোট রাখলে চলবে না। কতক্ষণ লাগবে?" বললাম, "এক ঘণ্টা।"

"ভেরি গুড।"

হঠাৎ তিনি টেবিলের ওপর এমন ভাবে ঝুঁকে বসলেন যে, সিমেনসের ঠোঁটের সংগে আমার ঠোঁটের দূরত্ব রইল মাত্র চার ইঞ্চি।

নেহেরু-রাজ্যের রাজধানী থেকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের রাজধানীর দূরত্ব চার ইঞ্চির বেশি নয়।

আমি দীপক চৌধুরী, এই চার ইঞ্চির দূরত্ব ঘুচিয়ে দেব বলে তৈরি হচ্ছি। খণ্ডিত বাংলার তাজা ক্ষতের মধ্যে যারা আজ ক'বছর থেকে নুনের ছিটে দিচ্ছে তাদের প্রত্যেকটা নাম আমার মনে আছে। কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব কত দূর? তোমরা ভাব অনেক দূর। আমি মনে মনে হাসি।

সিমেনস চার ইঞ্চি দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ওল্‌গা কাকীমা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

"ধারণা আমার খুব ভাল নয়।"

"কেন? কেন?" আগ্রহের আতিশয্যে সিমেনস এক ইঞ্চি দূরত্ব আরও কমিয়ে নিয়ে এলেন।

বললাম, "চরিত্র ভাল নয়।"

"প্রমাণ?"

"আমি তাঁকে কেবল একদিনই দেখেছি মিঃ সিমেনস। মাত্র এক ঘণ্টা। কিন্তু আমার ধারণা তিনি উপস্থিত ছোটকাকাকে ঠকাচ্ছেন।"

"আ! কি করে বুঝলে ছোটকাকা ঠকছেন?"

"পিসেমশাই রনদা ব্যানার্জিকে দেখে।"

"আ!! ওয়াণ্ডারফুল!!!" সিমেনস বাঘের মত লাফিয়ে উঠে ড্রয়ারটা টেনে বার করলেন। তাতে একটা পিস্তল ছিল। আমি ভয় পেলাম। তারপর হঠাৎ তিনি ড্রয়ারটা আবার ধীরে ধীরে বন্ধ করে রাখলেন। বললেন, "এখনও সময় হয়নি। আগে আন্দ্রিয়েভকে সরাতে হবে। লুবিয়াংকার অন্ধকার কতটা ভয়ংকর ওরা কেউ তা জানে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। মনে হ'ল সিমেনসের কথায় অসংলগ্নতা রয়েছে।

তিনি দ্বিতীয় বোতল বার করে নিয়ে এলেন। গল্‌গল্‌ করে কাঁচা হুইস্কি ঢেলে নিলেন গেলাসে। যতটা ঢাললেন তার অর্ধেকটা খেয়ে ফেললেন চুমুক দিয়ে। মাদ্রাজে বে-আইনী মদের অভাব নেই বুঝলাম। আরও বুঝলাম মাদ্রাজের মুখ্য মন্ত্রীর মূর্খতা। তিনি কম্যুনিষ্টদের উচ্ছেদ করতে চাইছেন, অথচ বে-আইনী মদের বোতল খুঁজে বার করবার মত ক্ষমতা নেই তাঁর।

খাওয়ার মদ বোতলে থাকে, চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, নাকে গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কম্যুনিজমের মদ বাতাসে ওড়ে, চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিলেও গন্ধ পাওয়া যায় না। চেট্টিয়ারের বাড়িতে নৈশ ভোজে শ্রীনাদার গলা পর্যন্ত কম্যুনিজমের মদ পান করে গেলেন। কিন্তু গন্ধ পাননি।

চার ইঞ্চির দূরত্ব আবার মেপে নিয়ে সিমেনস ঝুঁকে বসলেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন, "ওল্‌গা পার্টিতে আছে তের বছর। উনিশ-শ' আটত্রিশে মস্কো-পার্জে ওর বাবা-মা দু'জনেই মরে। ওল্‌গা তখন খারখোভ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পড়ত। আমি পড়াতাম। পার্টি ওকে হাইডেলবার্গে পাঠায় দর্শন পড়বার জন্য। ওল্‌গা তার আগেই আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে। নিবেদন আমি গ্রহণও করি। হঠাৎ একদিন সে চলে এলো। আমিও এলাম হাইডেলবার্গে। পড়াতে নয়, পড়তে। হিটলার যখন কম্যুনিষ্টদের সন্ধান করতে লাগল, আমরা ইংলণ্ডে চলে আসি। ওল্‌গা ডক্টরেট পেল। কিন্তু থিসিসটা সে আমার ড্রয়ার থেকে চুরি করে নেয়। এমন নিখুঁত ভাবে চুরি করে যে, পশ্চিম ইউরোপের সামরিক গুপ্ত পুলিসের কর্মকর্তা ক্রিভিটস্কির চোখ পড়ে ওল্‌গার ওপর। ওল্‌গা আমাদের গুপ্ত কর্মীসংঘের তালিকাভুক্ত হয়। ক্রিভিটস্কি একদিন তার বৌ আর ছেলে নিয়ে পালিয়ে যায় আমেরিকায়। ওল্‌গা প্যারিস থেকে ইংলণ্ডে চলে আসে। চলে আসে পার্টির আদেশ পেয়ে। ক্রিভিটস্কি আমেরিকায় পালাল বটে কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে নি। সে একটা বই লিখে আমাদের অনেক ক্ষতি করে। ওল্‌গা

ইংলণ্ডে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। সাতদিন পর সে জ্ঞানশংকরকে বিয়ে করে ফেলে। প্যারিসে থাকবার সময় ওল্‌গা শুনেছি কমরেড থোরের সংগে ঢলাঢলি করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার চেষ্টা। হয়তো ক্রিভিটস্কির আদেশে সে থোরের উপর চোখ রাখছিল। যাই হোক, ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া আমার কাছে খারাপ লাগল না। চেম্বারলেন গভর্ণমেণ্টের একজন বড় রাজকর্মচারী আমাদের পার্টির মেম্বার ছিলেন। তিনি আমায় পরিচয় করিয়ে দেন লর্ড বীভারব্রুকের সংগে। তিনি ভয়েড্‌ এণ্ড ভয়েড্‌ কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার। আমি ভারতবর্ষে আসি পাঁচ বছর আগে। কমরেড চৌধুরী, এ-সব কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছ?"

আমি বললাম, "পারছি মিঃ সিমেনস।" তিনি আর এক চুমুক কাঁচা মদ খেয়ে বললেন, "ওল্‌গা জ্ঞানশংকরকে পার্টিতে আনে। পরিচয় করিয়ে দেয় আন্দ্রিয়েভের সংগে। আন্দ্রিয়েভও এণ্ডারসন নাম নিয়ে বিলেতেই ছিল। সে বড় ইঞ্জিনিয়ার। ওল্‌গা বিয়ের পর, আন্দ্রিয়েভের সংগে প্রেম করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলণ্ডে আসবার আগেই আন্দ্রিয়েভ বলকানে তার পুরুষত্বের সবটুকুই ফেলে আসে। আন্দ্রিয়েভ ইমপোটেণ্ট। আন্দ্রিয়েভ ওকে বাহুতে টানল না বটে, কিন্তু গুপ্ত কর্মীসংঘে সে ওল্‌গাকে টেনে নিল। ওগপুর প্রধান কর্মকর্তা লরেন্টি বেরিয়া ওকে ভারতবর্ষে পাঠায়। আন্দ্রিয়েভ এখন বেংগালোরে ইঞ্জিনিয়ার, এণ্ডারসন নামে পরিচিত। সে সমগ্র ভারতবর্ষের গুপ্ত কর্মীসংঘের প্রধান কর্মকর্তা। ওল্‌গা তার দক্ষিণ বাহু। কিন্তু জ্ঞানশংকর তা জানে না।"

"কেন?"

"জ্ঞানশংকরের বুকের খবর রাখতে হয় ওল্‌গার। জ্ঞানশংকরের ধারণা সে ওগপুর হয়ে একাই কাজ করছে ভারতবর্ষে। বেরিয়া ঘাস খায় না কমরেড চৌধুরী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কমরেড সেলেনকভ আর কমরেড বেরিয়ার মধ্যে কি রেষারেষি আছে মিঃ সিমেনস?"

"একেবারেই না। পার্টি মনোলিথিক। এক-প্রস্তর-স্তম্ভ। এগুলো হচ্ছে ফাঁক বন্ধ করবার মশলা। নীচের থেকে গড়ে নিয়ে স্তম্ভ এসে মিশে যাচ্ছে ওপর দিকে, স্তম্ভের পিন্‌পয়েণ্টে। ভারতবর্ষের পার্টি ছোটখাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কারণ পার্টি লাইন আগে থেকেই ঠিক করা আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওরা আদেশ নেবে আমাদের কাছে। ভারতবর্ষকে যদি একটা বৃত্ত বলে কল্পনা করা যায়, তাহ'লে ওরা সব বৃত্তের ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে ছোটাছুটি করছে। বৃত্তের মধ্যস্থলে আমরা। বৃত্তের বাহু কৃষ্ণান। আমরা আদেশ পাঠাব কৃষ্ণান-বাহু দিয়ে। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সাহিত্যসভা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই আমাদের রাজনীতির অস্ত্র। আমরা দু'জনাই কেবল রাজনীতি করব। আমাদের ওপর ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। আমাদের ওপর নির্ভর করেই পুরো বৃত্তটা ঘুরবে।"

সিমেনস রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর বললেন, "আন্দ্রিয়েভও আমাদের আদেশ পালন করতে বাধ্য, যেমন আমরাও তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে ওল্‌গাকে মস্কো পাঠানো যায় এবং মস্কোর ওপরই লুবিয়াংকার ঠিকানা। আন্দ্রিয়েভ ওকে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওল্‌গা তার দেহটাকে কেন্দ্র করে একটা দুর্নীতির বৃত্ত সৃষ্টি করেছে। এটা আমাদের ভাঙতে হবে। তুমি সাহায্য না করলে ভাঙা অসম্ভব হবে। যেমন করে ধীরে ধীরে প্রতি মুহূর্তে বিশু রায়কে তুমি ভেঙে এনেছ, তেমন করে ভেঙে দিতে হবে।"

তিনি আমার সংগে করমর্দন করলেন। বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আমি সমস্তটা বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখে আর কিছুই অস্পষ্ট রইল না। আমি আমার শক্তির চাপ অনুভব করলাম। খারখোভ টেক্‌নিক্যাল ইনস্টি-টিউটের অধ্যাপক সিমেনস এ নয়। ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার সুদৃঢ়

স্তম্ভ এই সিমেনস। এক প্রস্তরের মধ্যে আমিও বিলীন হয়ে গেলাম। সিমেনস আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, "ওল্‌গা গতকাল 'উটি'তে গিয়ে পৌচেছে। মেয়েদের দেখতে গেছে। সাতদিন পর সে বেংগালোরে যাবে। আমি চাই সেই সময় তুমি সেখানেই থাকো।" আমি বললাম, "থাকব।"

"চৌধুরী, আমাদের মধ্যে যেন কোনদিন কোন অবিশ্বাসের কারণ না ঘটে। একটা সাম্রাজ্যের কর্ণধার তুমি আর আমি। ইমপোর্টেণ্ট আন্দ্রিয়েভকে সরিয়ে দিতে বেশি দিন লাগবে না। তোমার ওপর কোন বাধা নিষেধ রইল না। এখন কেবল তোমার তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে।

"প্রথম—পলিটব্যুরো কিংবা সেণ্ট্রাল কমিটিকে কোন আদেশ দেওয়ার সময় আমার সংগে পরামর্শ করে নিতে হবে আদেশগুলো যদি পার্টি লাইনের বাইরে হয়। সমস্ত রিপোর্ট তুমি পেশ করবে কেবল আমার কাছে।

"দ্বিতীয়—নির্বাচন-পর্ব শেষ হওয়ার পর আসছে বছর ২৬শে জানুয়ারি তোমায় ইংলণ্ডে গিয়ে পৌছতে হবে। ৩১শে জানুয়ারি তুমি মস্কোর ক্রেমলিনে কমরেড সেলেনকভের অতিথি।

"তৃতীয়—তোমার রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। রাজনীতির উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভেতরে ঘুণ ধরিয়ে দেওয়া, যেন খামচি দিয়ে মাটি তুলতে গেলেই পাঁচজন করে কম্যুনিষ্টের মুখ দেখা যায়।

"উপসংহার—তোমার পায়ের কাছে আধখানা পৃথিবী পড়ে রইল। ক্রেমলিন থেকে কলকাতা পর্যন্ত তোমার গতিবিধির প্রত্যেক ইঞ্চি রাস্তা আমরা পাহারা দেব। নেহেরুর সাধ্য নেই তোমাকে স্পর্শ করে। বিলেত পৌছবার সংগে সংগে তুমি জাল পাসপোর্ট পাবে। তাই নিয়ে ফিনল্যাণ্ড। ফিনল্যাণ্ড থেকে পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না।"

সিমেনস একটু চুপ করে রইলেন, তারপর আবার বললেন, "আমরা তা হ'লে অফিসিয়াল কাজ শেষ করে ফেললাম। দিল্লিতে কবে আসছ? ধরো,

আজ থেকে দু'মাস পরে। ৭ই মার্চ? বেলা তিনটার সময় আমার অফিসে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এই দু'মাস তুমি সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশ দেখে নাও। ফিরবার মুখে বোম্বে, পেপসু প্রভৃতি যে-সব জায়গায় যাওয়া দরকার মনে কর যাবে। কৃষ্ণান সব ব্যবস্থা করে দেবে। আচ্ছা, লছমী তোমায় কি বলল?"

"কৃষ্ণান তোমায় খুব অপছন্দ করে।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সিমেনস। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'টা বাজল চৌধুরী?"

"চারটে।"

"তা হ'লে তুমি বসে বসে কাগজখানা মুখস্থ কর। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি জাগিয়ে দিয়ো। পরীক্ষা দিয়ে তারপর তোমার ছুটি।" টেবিলের ওপর মাথাটা দু'হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন। ভয়েড এণ্ড ভয়েড্ কোম্পানির বড়সাহেব হয়তো ঘুমতে লাগলেন। হয়তো বা এক ঘণ্টার জন্য তিনি স্বপ্ন দেখতে চান। সেই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তিনি খারখোভে ফিরে যাবেন। কিন্তু ফিরে গিয়ে লাভ হবে কি বন্ধু? ওল্গা পালিয়েছে।

মুখস্থ করতে আমার এক ঘণ্টাও লাগল না। কিন্তু সিমেনসকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলতে বড্ড মায়া লাগল। বেচারি ঘুমচ্ছে। কোথায় খারখোভ, আর কোথায় মাদ্রাজের রায়পেত্তা! বাপ, মা, ভাই বন্ধু কেউ নেই। আমার চাইতেও সে শতগুণে বেশি একাকী। ঠিক যখন পাঁচটা বাজল, সিমেনস নিজেই উঠে বসলেন। ঘুমের মধ্যেও সংযমের কঠিন ব্যবস্থা! তিনি আমার পরীক্ষা নিলেন। প্রতিটি অক্ষর তিনি কাগজের সংগে মিলিয়ে দেখলেন।

"তুমি চা খেয়ে যাও চৌধুরী। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে চা এসে যাবে। সকাল আটটায় যাচ্ছি রাজাজির বাড়িতে।" এই বলে তিনি একটু হাসলেন।

চা নিয়ে এলো বেয়ারা। আমরা চা খেলাম। সিমেনস চান-ঘর থেকে

হাত মুখ ধুয়ে পোষাক পরলেন। রাত্রের সিমেনস দিনের বেলায় বদলে গেল। মনে হ'ল দিনের বেলায় সিমেনস ছোটকাকার চেয়ে হাজার গুণে বেশি সুন্দর। আমাকে বললেন, "একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে চলে যাও। আমি কাল সকালে প্লেনে চাপব। কলকাতা হয়ে দিল্লি ফিরে যাব।" আমরা করমর্দন করলুম। দরজায় পা দিতেই তিনি বললেন, "এক মিনিট দাঁড়াও চৌধুরী।" আমি ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। হাঁটতে হাঁটতে আবার শোবার ঘরেই এলাম। শোবার ঘরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার জীবন আর তোমার নয়। পার্টির। প্রকৃত পক্ষে পার্টির বৃত্তটি তোমার ওপর নির্ভর করে ঘুরবে। তোমার স্বাস্থ্যের উপর বৃত্তের স্বাস্থ্য নিভর করবে।" একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন "দরকার হ'লে লছমী তোমার সংগে বেংগালোরে গিয়ে দেখা করবে, হাইগ্রাউণ্ড হোটেলে। অল্ রাইট্?"

"অল্ রাইট্ সিমেনস।"

"চিয়ার ইউ, চৌধুরী।"

"চিয়ার ইউ, সিমেনস।"

ট্যাক্সিতে উঠবার সময় মনে হ'ল বৃত্তাকার অন্ধকারে এবার আমি একা।

ক্ষমতার গর্ব নিয়ে ঘুমতে দু'মিনিট'ও লাগল না। হোটেলের এই বারো নম্বর ঘরটা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ঘুম থেকে উঠলাম বেলা তিনটার সময়। ম্যানেজার বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। গতকাল একবারও খাইনি, আজও দুপুরে খেলাম না। অতএব তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমি বললাম, "চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার কোন ত্রুটি হয় নি। ত্রুটি মাদ্রাজের বড়লোকদের। তাঁরা আমাকে নেমন্তন্ন করছেন কেন? যাই হোক, তিনটে বাজলেও আমি এক্ষুনি খাব।"

"সব গরম রেখেছি। পাইপিং হট। পাঠিয়ে দিচ্ছি।" ম্যানেজার ছুটলেন।

চান শেষ করলাম, খাওয়া শেষ করলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজের স্তূপ থেকে মাদ্রাজের 'হিন্দু' দৈনিকখানা তুলে নিলাম পড়বার জন্য। স্নায়ুর উত্তেজনা অনেক কমে এসেছে। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে ভেবেছিলাম আমি আর বাঁচব না। ডেক-চেয়ারে শুয়ে মনে হ'ল আমি নতুন মানুষ।

খবরের কাগজে পড়বার বিশেষ কিছু ছিল না। পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ ক্যলমের নিম্নতম স্থানে তিন লাইনের একটা ছোট্ট খবর আমার চোখে পড়ল। খবরটা শিবরামবাবুর সম্বন্ধে। ইঞ্জিনের তলায় পড়ে শিবরামবাবু (একজন পুলিসের কর্মচারী) রাত দশটার সময় মারা গেছেন। নেহেরু ফুঁ দিলেই নাকি কম্যুনিষ্টরা সব গর্তে গিয়ে লুকোয়! কোন গর্তে প্রভু? দিল্লির সেক্রেটারিয়েটে নয় তো?

আবার ঘুম আসছিল। ঘুমবার আগে হঠাৎ লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ল। ছ'টায় আমার ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে। কাপড় জামা পরে আমি বাইরে এলাম। রাস্তায় কৃষ্ণান আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গতরাত্রের কৃষ্ণান আজকে বদলে গেছেন। মাথাটা নীচু করেই আছেন। যেন প্রতি মুহূর্তে আদেশ নেওয়ার জন্য সজাগ ও সতর্ক হয়ে রয়েছেন। আদেশ না পেলে মাথা তুলবেন না বুঝলাম।

ট্যাক্সিতে উঠবার পরও তিনি তাঁর দুটো কান শুদ্ধ মাথাটা আমার মুখের দিকে সারস পাখীর ঠোঁটের মত একটু এগিয়ে রাখলেন। শুনতে যদি কোন অক্ষর ভুল হয়ে যায় তা হ'লে পার্টির ভুল শোধরাতে তিন মাস লাগবে। সমগ্র ভারতবর্ষের পার্টি-মেসিন বন্ধ করতে করতেও তিন টন্ কাগজ খরচ হয়ে যাবে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক থেকে আরম্ভ ক'রে হ্যাণ্ডবিল পর্যন্ত সব কিছুতেই সেই ভুল থেকে যাবে। এমন কি দু'দশখানা নাটক নভেলও সেই

ভুলের স্বাক্ষর নিয়ে বাজারে বিক্রি হতে থাকবে। অতএব কৃষ্ণান চিরদিন মাইক্রোফোনের মত তাঁর কান দুটো আমার মুখের সামনে ধরে রাখবেন।

কৃষ্ণানদের বাড়িটা আমাদের বালিগঞ্জের মধ্যবিত্তের বাড়ির মত মনে হ'ল : সাধারণ ভাবে সাজানো গোছানো। মোটামুটি পরিষ্কার। বসবার জন্য একখানা ঘর ড্রয়িংরুম করা হয়েছে। রাত্রিতে কার্পেটটা উল্টে রেখে চাকর-বাকররা মেঝেতে শোয়। চাকরদের জন্য আলাদা ঘর নেই।

জানলা দরজায় পর্দা লাগানো আছে। একদিকের দরজার পর্দায় নোংরা লেগে রয়েছে। চাকরগুনো লুকিয়ে অনেক সময় পর্দায় হাত মোছে। বাড়িটা একতলা। কৃষ্ণানের মা বাড়ি নেই। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। লক্ষ্মী কাল রাত্রিতে আমায় বলেছিল আমাকে দেখলে মা খুসি হবেন। বসবার ঘরের দু'দিকে দু'খানা ঘর। পর্দা টাঙানো রয়েছে। বেশ মোটা কাপড়ের পর্দা। পর্দার পেছনে সিমেনস বসে বসে হয়তো আমাদের কথা শুনছেন।

কৃষ্ণান বললেন, "তুমি বসো।· লক্ষ্মী এখুনি আসবে। মা বাড়ি নেই। আমি যাচ্ছি সিমেনসের সংগে দেখা করতে।" জুতোর শব্দ করতে করতে কৃষ্ণান বেরিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মী এলো। এলো মানে দুনিয়ার সব সৌন্দয উজাড় করে নিয়ে এলো। অবনী ঠাকুর মরে গেছেন। তিনি নব অজন্তার মাদ্রাজী লক্ষ্মীকে দেখে যেতে পারলেন না! মনে হ'ল ভারতবর্ষ লক্ষ্মীর—আমার নয়, সিমেনসের তো নয়ই। লক্ষ্মী এসে শোফার উপর বসল, পা তুলে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে ডেকে এনে দেখাতাম। আমি জানি লক্ষ্মীর উপর তিনি কবিতা লিখতেন। কবিতার নাম দিতেন 'ভারতলক্ষ্মী'।

লক্ষ্মী বলল, "মা একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছেন·।"

আমি বললাম, "আমার তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি মার সংগে দেখা করতে আসিনি, এসেছি তোমার কাছে।" চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে

এলো। লক্ষ্মী নিজে হাতে সব সাজিয়ে দিল সেণ্টার-টেবিলের উপর। আমি সব কিছু খেয়ে ফেললাম। লক্ষ্মী খুসি হ'ল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কৃষ্ণান তাঁর মাকে নিয়ে ফিরে এলেন। আমরা তখন সামনের ছোট্ট বাগানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল একটা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে ওর খোঁপায় পরিয়ে দিই। কিন্তু কৃষ্ণান তখন সামনের ফটকের কাছে এসে পড়েছেন। মায়ের সংগে পরিচয় হ'ল। স্বামী তাঁর মাদ্রাজের মস্ত বড় উকিল ছিলেন। দুটি ভাইবোনকে তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় লক্ষ্মীকে ছ'মাস পরেই ফিরে আসতে হয়। দু'জনের খরচ চালানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কৃষ্ণান পাস করল বটে, কিন্তু বড় চাকরি পেল না। কোন্ এক বিলেতি কোম্পানির মেসিন বেচে। মাসিক মাইনে মাত্র পাঁচ-শ' টাকা। তার ওপর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়। বাছার বড় কষ্ট! এবার শুনছি জহর মাদ্রাজে আসবে। জহর মানে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী। স্বামীর সংগে খুব ভাব ছিল তার। কতবার নিজে হাতে রান্না করে খাইয়েছি। আমায় ডাকত 'আন্নি'। এবার এলে তাকে বলব কৃষ্ণানকে একটা ভাল চাকরি দিতে। মাইনে পাঁচ-শ' না হোক, বুড়ো কালে পেনসন পেলেই চলবে। ছোটাছুটির কাজ আমি ওকে নিতে দেব না।

"তুমি কি করো বাছা?"

কৃষ্ণানই জবাব দিলেন, "মস্ত বড় ধনী লোক। বিরাট ব্যবসা। বাবা একজন জহরলালের মত মন্ত্রী। একমাত্র ছেলে।"

"কি জাত?"

"ব্রাহ্মণ।"

কৃষ্ণানের মা সব খবর শুনে খুসি হলেন। ব্রাহ্মণ শব্দটায় বৃদ্ধার চোখে মুখে রং ফিরে এলো। তিনি জানালেন, "সমস্ত মাদ্রাজে অ-ব্রাহ্মণদের রাজত্ব চলেছে। তাতে ফল ভাল হবে না। মাদ্রাজে এত দুর্ভিক্ষ কেন? এই সব অনাচারের জন্য। তার উপর বামুনদের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন আইন। চাকরি

দেবে মাথা গুণে। লেখাপড়ায় পারে না আমাদের ছেলেদের সংগে। তাই আইন করে ওদের ছেলেদের পাস করাচ্ছে। চাকরির যোগ্যতা না থাকলেও ওরাই চাকরি পাচ্ছে। জহর দিল্লিতে বসে কি করছে? এবার এলে আমি ওকে সব কথা বলব। নিজে তো কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ; আমাদের দিকে না চাইলে এ-দেশের শিক্ষা সভ্যতা রক্ষা করবে কে? তোমাদের বাংলা দেশেও কি ব্রাহ্মণদের ওপর এমন অত্যাচার চলছে?"

কৃষ্ণান বললেন, "বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণে ঝগড়া নেই। মিলে মিশে ওরা ভালই আছে। মুসলমানদের সংগে ঝগড়া ছিল, তাও এখন মিটে গেছে আম্মা।"

"কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা না কি মাছ মাংস খায়? আমি বিশ্বাস করি না। এ-সব কথা শুনলেও পাপ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে কতদিন কাটিয়ে গেছেন। কই, কেউ তো তাঁকে কোনদিন মাংস খেতে দেখেনি? বিবেকানন্দ বাঙালী ছিলেন না?"

"বাঙালী ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না।"

"আলবৎ ছিলেন, পরমহংসদেব তাঁকে ব্রাহ্মণ করে সৃষ্টি করেছিলেন। এই তো মঠ থেকে আসছি। আমার কাছে গুল্ মারিস না। আমাদের গত তিন পুরুষ থেকে প্রায় সবাই তো বিলেত গেছে লেখাপড়া শিখতে। কিন্তু তোদের মত কেউ অধার্মিক ছিলেন না। ছি ছি—মহাত্মাজির রামরাজ্যের এই নমুনা?"

"আম্মা, তোমার পূজার সময় হয়েছে।" লক্ষ্মী তার মাকে স্মরণ করিয়ে দিল। আমি সবাইকে নমস্কার করে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম। পেছন দিকে আর চাইলাম না। আমি অনুভব করলাম, লক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে আছে।

পরের দিন শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন হ'ল। আমিও সেই সময় উপস্থিত

ছিলাম। সিমেনসকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়ার পর কৃষ্ণান আমার সংগেই লেগে রয়েছেন। আমি জানি কৃষ্ণান আমার ওপর চোখ রাখছেন।

চেট্টিয়ার খুব ব্যস্ত। শিল্প নিয়ে নয়, শ্রীনাদারকে নিয়ে। সন্ধ্যার আগেই শ্রীনাদারকে এখান থেকে বার করে দিয়ে তিনি আবার ছুটবেন রাজাজির বাড়িতে। যোগাযোগ বাঁচিয়ে রাখবার পদ্ধতি তিনি জানেন। শ্রীনাদার আজ আছে কাল নেই। কিন্তু তাঁকে থাকতে হবে। ব্যবসায় করতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। অতএব তিনি ব্যস্ত। টাকা চাই, আসছে নির্বাচনে কেবল পঁচিশ লাখ হ'লেই চলবে না। আরও অনেক চাই। শ্রীনাদার থেকে আরম্ভ করে দিল্লির নেহেরু পর্যন্ত তাঁকে আসছে নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চেট্টিয়ার প্রতিবারই মাথা নত করে তাঁদের জানিয়েছেন, "আমি কংগ্রেসের একজন চার আনার সেবক। সেবা করেই আমি খুসি। মন্ত্রী হতে চাই না।"

ওঁরা সব অবাক হয়ে যেতেন চেট্টিয়ারের মাথা নত করার ভংগি দেখে। তিনি মন্ত্রিও হ'তে চান না। তিনি কেবল মাল সাপ্লাই দিয়েই খালাস। এই তো গেল-বছর ছ'হাজার টিউবওয়েল কৃষিবিভাগের মন্ত্রীকে তিনি যোগাড় করে দিয়েছেন। এমন সময় দিলেন যাতে সালেম জিলার কৃষকরা টিউবওয়েলের জল পেল না। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল হ'ল না। এবারও খুব মুস্কিল হবে। সামনে নির্বাচন আসছে। মাঠে গিয়ে টিউবওয়েল পৌঁচেছে কিন্তু খনন করবে কে? মজুরগুনো কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু আজ একমাস থেকে ওরা সব ধর্মঘট করেছে। ধর্মঘটের কারণ অবিশ্যি খুবই সামান্য। সামান্য হ'লেও সেটা কারণ তো বটে। মুখ্য মন্ত্রী শিল্প-প্রদর্শনী নিয়ে খুবই ব্যস্ত। সালেম ও ভেলোরের টিউবওয়েল সম্বন্ধে এখনো মনোযোগ দিতে পারেন নি। আর একমাস এমনি করে মনোযোগ না দিতে পারলে এবারও কৃষকরা জল পাবে না। ফসল নষ্ট হবে। ততোদিনে ভোটযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। কম্যুনিষ্টরা তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবে ভোটপ্রার্থী হয়ে। কৃষকরা তাদের ভোট দেবে। শ্রীনাদার

টিউবওয়েলের রহস্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু রাজাজি তাঁর বাড়িতে ব… বুঝতে পেরেছেন। অতএব চেট্টিয়ার তাঁর সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা করে আসেন।

প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করা হ'ল। বহু সম্মানিত ও ধনী লোকরা এসেছেন। কিন্তু মিস মার্গারেট নেই। চেনাশুনা কম্যুনিষ্টরা কেউ নেই। অথচ দরজায় বই বিক্রি হচ্ছে। সবই রাসিয়ায় ছাপা। খুব সুন্দর ছাপা, কিন্তু খুব সস্তা। আমি দেখলাম বইগুলো সবই বিক্রি হয়ে গেল। আরো থাকলে আরো হ'ত।

চারটে বড় বড় ঘর। সবগুলো ঘরের দেওয়ালেই ভারতীয় শিল্পীদের দু'একখানা করে ছবি রয়েছে। অত্যন্ত বাজে শ্রেণীর ছবি। তিন নম্বর ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই মুখ্য মন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী সামনের দিকে চেয়ে মিনিট তিনেক হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সিলিং-এর কাছ থেকে প্রায় মেজে পর্যন্ত একটা বিরাট ট্রাক্টরের ছবি! সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মাটিতে ঢেউ উঠেছে। ট্রাক্টরের তলার দিকটাকে সূচলো ঢেউয়ের ঠিক চূড়ার ওপর সুন্দর ভাবে বসিয়ে দিয়েছে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে মনের মধ্যে দোলা লাগে! শ্রীনাদারের নিশ্চয়ই লেগেছিল। তাঁকে যত বেশি দোলা দিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। টিউবওয়েল মাঠে পড়ে থাকবে, মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাবে। চেট্টিয়ারের কাছে আবার অর্ডার আসবে।

ছবিখানা প্রদর্শনী-কমিটির তরফ থেকে কৃষিমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হ'ল। চারদিকে হাততালি। কমিটির তরফ থেকে উপহার কে দিলেন? মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় অধ্যাপক। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ, মরে গেলেও কম্যুনিজমের আদর্শে বিশ্বাস করবেন না। মনে হ'ল, তাঁকে দিবানিদ্রা থেকে কেউ তুলে নিয়ে এসেছে। তিনি কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু উপহারটি দিয়ে গেলেন কমিটির তরফ থেকে। তিনি কৃতার্থ বোধ করলেন। এতগুনো বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সামনে আসবার তাঁর এই প্রথম সুযোগ এসেছে জীবনে। তিনি নবীন জীবন লাভ করলেন। কি হ'ল, কে তাঁকে নিয়ে এলো, কেমন করে তিনি এলেন, কিছুই তাঁর মনে নেই। তিনি এলেন এইটাই সত্যি। তিনি কেবল

উপহার দিলেন না, ছোট্ট একটা কাগজ থেকে দু'লাইন বক্তৃতাও দিলেন। কে তাঁকে কাগজখানা দিয়েছে তিনি তা জানলেন না। তিনি তবু পড়লেন, বক্তৃতা দিলেন। বললেন, "রুসিয়া ও চীনদেশের শিল্পীদের দেওয়া উপহার আমরা গ্রহণ করেছি। মাদ্রাজ কৃষির দেশ, এখানে আমরা ট্রাক্টরই চাইব। নন্দলাল বসুর উর্বশী চাইব না। প্রথমে আমরা বাঁচব, তারপর করব সৌখিনতা।"

অধ্যাপক কম্যুনিষ্ট নন, গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ। মদ মাংস খান না। তবু তিনি নন্দলাল বসুকে নীচু করে গেলেন! বিনাপয়সায় কৃষিমন্ত্রীকে ছবিখানা দিয়ে গেলেন। পরের দিন খবরের কাগজে সব খবর বেরল। অধ্যাপকের পুরো বক্তৃতাটাই কাগজে ছাপা হ'ল। কম্যুনিষ্টদের কাগজে নয়, ক্যাপিটালিষ্টদের কাগজে। নেহেরু আইন করে নাকি কম্যুনিষ্টদের কাগজ সব বন্ধ করে দেবেন!

•

সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাদ্রাজের বাইরে বাইরে কাটল। অনেকগুলো গ্রাম দেখে এলাম। কৃষাণদের মধ্যে বাস করেছি, রাত কাটিয়েছি, 'রসম' খেয়েছি ঠিক ওদেরই মত। মার্কসবাদ কোথাও নেই। কম্যুনিজমের 'ক' পর্যন্ত কারো মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করা হয়নি। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার কৃষাণ আমাদের পার্টির সভ্য। তারা কমরেড স্টালিনের নাম জানে। অন্যান্য দেবদেবীর সংগে তাঁকেও পূজো করে। হিন্দু মন্দিরে স্টালিন-দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক গ্রামে। কেন হয়েছে প্রশ্ন করলে ওরা কেবল একটা জবাবই দিতে পারে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কৃষাণরা জমির মালিক হবে। পেট ভরে খেতে পাবে। দুটি কথা। কংগ্রেসও বলতে পারে, বলে অনেক জায়গায়, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসের রাস্তা কংগ্রেসই খানিকটা বন্ধ করেছে, বাকিটা কংগ্রেসের হয়ে কম্যুনিষ্টরা বন্ধ করছে। কম্যুনিষ্টরা বাইরে থেকে গিয়ে মাথায় গান্ধি টুপি পরে কৃষাণদের কাছে পূজো চায় না। কম্যুনিষ্টরা ওদের

মধ্যে বসবাস করে। করতেই হয়। করবার আদেশ আমিই দিয়েছি। হাজার হাজার গ্রামে আমার আদেশের আগুন কৃষাণদের মনে আগুন জালিয়েছে; ভেতর থেকে পোড়াবার টেকনিক্ কেবল আমরাই জানি। রাষ্ট্র হাতে এলে এই পোড়া কৃষাণদের আমরা লোষ্ট্রবৎ বর্জন করব। 'কুলাক' বলে অপরাধী করব। পিপলস্ কোর্টে এদের দিয়েই এদের বিচার করাব। মিনিটে এক-শ' করে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারলে ভারতবর্ষের পোড়া মানুষগুলোকে সরিয়ে ফেলতে ক'দিন লাগবে? আমরা তাও হিসেব করে রেখেছি। তারপর নতুন মানুষ নিয়ে নয়া রাষ্ট্রের কাজ সুরু করতে আমাদের ঠিক বারো ঘণ্টা সময় লাগবে, কংগ্রেস যা সাড়ে তিন বছরে পারেনি। আমরা বারো ঘণ্টার মধ্যেই সুরু করতে পারব। বুড়ো অধ্যাপককে বিছানা থেকে তুলে এনে নতুন মানুষ করতে আমাদের পাঁচ মিনিটও লাগেনি। আমরা দৃষ্টান্ত ছাড়া ফাঁকা কথা বলি না: আমাদের ট্রাক্টর রিয়েল, তোমাদের ট্রাক্টর পরিকল্পনা। এর বিরুদ্ধে জবাব দিতে পারো? পারো না। আমিও পারিনি। পারিনি বলেই তো একদিন সরল বিশ্বাস নিয়ে মার্কসবাদ পড়েছিলাম। টানা দুটি বছর আমি মার্কসবাদ ছাড়া আর কিছুই পড়িনি। মার্কসবাদের মধ্যে আমি জীবনকে নতুনভাবে দর্শন করেছিলাম। রাষ্ট্রের নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে মার্কসবাদ আমায় বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছিল।

কমরেড, মাদ্রাজের কৃষাণরা মার্কসকে চেনে না, চেনে স্টালিনকে। ভারত-বর্ষের মাটিতে চিমটি কাটলে কেবল পাঁচজন করে কম্যুনিষ্ট উঁকি মারলে হবে না, পাঁচজনের সংগে স্টালিনকেও উঁকি মারতে হবে। স্টালিন সর্বত্র। কোটি কোটি ঘুণের পেছনে স্টালিন। এ কোটিরূপ নয়, বিশ্বরূপ, কেবল বিশ্বরূপও নয়, সমগ্র রূপ। স্টালিনবাদ। কি করে হ'ল? কেমন করে হ'ল? প্রেরণার মূল কোথায়? খুঁজতে যাও, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। মার্কস্ মৃত। লেনিনও উবে গেছেন অনেকদিন আগে। হেগেল তো শুঁটকি মাছ। গন্ধের ভয়ে ক্রেমলিনের তিনতলার জানলা দরজা বন্ধ! তবে মূল খুঁজব কোথায়? ক্যাণ্ট?

দ্যা কাঁরতে ? মিথ্যা সময় নষ্ট হবে। স্টালিনবাদের প্রেরণার মূল স্টালিন নিজেই। গোটা স্টালিন। নবম আশ্চর্য নয়, আশ্চর্যতম নবম। এই আশ্চর্যতম নবমটি কি ? নতুন ফেনোমেনন, স্টালিন-মিস্তিক। স্টালিনের মধ্যেই স্থরু এবং স্টালিনের মধ্যেই শেষ। হাঁ, শেষ।

বাংগালোরে এসেছি। আছি 'হাইগ্রাউণ্ড' হোটেলে। কাকীমা এসেছেন, আন্দ্রিয়েভের কোন্ এক ভারতীয় বন্ধুর বাড়িতে তিনি উঠেছেন। কাকীমা পরিচয় করিয়েছেন আন্দ্রিয়েভের সংগে সাউথ্ প্যারেডের রাস্তায়। সাউথ প্যারেড কলকাতার চৌরঙ্গি। চৌরঙ্গির চাইতেও সুন্দর। আন্দ্রিয়েভ এই সাউথ প্যারেডে থাকে।

রাত্রিতে এলাম তার বাড়িতে। ওল্গা কাকীমা সেখানেই ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আন্দ্রিয়েভ সামরিক কায়দায় আমায় স্যালুট করল। আমরা বসলাম গিয়ে শোবার ঘরে। সব দিকের জানলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কোন ছিদ্র রইল না কোনদিকে। আন্দ্রিয়েভ বলল, "কমরেড, আমি ভারতবর্ষের গুপ্ত কর্মীসংঘের উচ্চতম কর্মচারী। রুমানিয়ায় কমরেড আনা-প'কারের আমি দেহরক্ষী ছিলাম।" আন্দ্রিয়েভই একটু পরে আমাকে বলল, "কমরেড সেলেনকভ্ আপনাকে মস্কোতে নেমন্তন্ন করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?"

"জানি।"

"তাঁর আদেশ, কমরেড সিমেনস সম্বন্ধে একটা গুপ্ত রিপোর্ট কমরেড সেলেনকভের কাছে আপনাকে পাঠাতে হবে।"

"তাঁর আদেশ আমি দেখতে চাই।"

একটা ফোলিও ব্যাগ থেকে ফস্ করে একটা কাগজ বার করে আন্দ্রিয়েভ আমার চোখের সামনে ধরল। রাসিয়ান ভাষায় লেখা। আমি পড়লাম। আন্দ্রিয়েভ পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাগজখানাকে পুড়িয়ে ফেলল। ছাইগুলো ছাইদানির জলের সংগে মিশিয়ে দিয়ে সে বলল, "সাতদিন আগে

রায়পেতায় কমরেড সিমেনসের সংগে যে আপনার আলাপ হয়েছে তার পুরো রিপোর্ট আপনি কাল চারটের মধ্যে লিখে রাখবেন। কমরেড ওল্‌গা গিয়ে নিয়ে আসবেন। সরকারী লোক বাংগালোরে অপেক্ষা করছেন। কাল রাত্রের ট্রেনে তিনি চলে যাবেন। কমরেড চৌধুরী, আপনাকে স্মরণ করান নিষ্প্রয়োজন যে, আমার সংগে যে আলাপ আলোচনা হ'ল তার প্রতিটি অক্ষর টপ্‌ সিক্রেট।" আমি বললাম, "স্মরণ থাকবে।"

"আমার সংগে আপনার দেখা সব সময় হওয়া সম্ভব নয়। আপনার যা কিছু আদেশ দেওয়ার থাকে সব কমরেড ওল্‌গার কাছে দেবেন। তিনি আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। কাল চারটের সময় কমরেড ওল্‌গা আপনার হোটেলে যাবেন।" আমি বললাম, "যাওয়ার দরকার হবে না।"

"কেন?"

"রিপোর্ট আমি সংগে এনেছি।" পকেট থেকে ভাঁজকরা চারখানা কাগজ আন্দ্রিয়েভের হাতে দিলাম। আনা প'কারের দেহরক্ষীর চোখে ধাঁধা লাগল। কাগজগুলো নিয়ে সে আমায় আবার সামরিক কায়দায় স্যালুট করল। কাজ শেষ হ'তে এক ঘণ্টাও সময় লাগল'না।

হোটেলে ফিরে এলাম। কোন ঘরেই আর বাতি জ্বলছে না। আমি চাবি দিয়ে নিজের ঘর খুলবার আগে চারদিক ভাল করে দেখে নিলাম। কেউ কোথাও নেই। আমার ঘরটা ছিল বড় বাড়িটা থেকে বিচ্ছিন্ন। কটেজ। এপাশে ওপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর আবার আর একটা কটেজ। একটা পাজামা পরে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বসলাম। পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে আমার মাংসপেশীর দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হ'ল। অর্ধেক পৃথিবীর শক্তি দিয়ে আমার যৌবন দৃঢ়তর হয়েছে বটে কিন্তু মনের ময়দান ফাঁকা। একটা সিগারেট ধরিয়ে গত ক'দিনের সব ব্যাপারগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। সহসা মনে হ'ল আমি যেন ক্রমশই পাতালের অন্ধকারে নিমজ্জিত

হয়ে পড়ছি। বৃত্তাকার অন্ধকারটা প্রতিদিনই বুঝি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসছে।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলাম। লক্ষ্মী এসেছে আমার সংগে দেখা করতে! ভেতরে এসে খুবই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম, "তুমি? এতো রাত্রে? কৃষ্ণান কোথায়?"

"ঘুমচ্ছে।"

"তুমি ঘুমোওনি কেন?"

"ঘুম আসছিল না।"

"কেন আসছিল না?"

"তোমার কথা ভাবছিলাম।"

"ভালবাসার কথা বুঝি?"

লক্ষ্মী কোন জবাব দিল না। আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। লক্ষ্মী মেঝের কার্পেটের ওপর একটু এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের ভারতলক্ষ্মী ধূল্যবলুন্ঠিতা! মুহূর্তের মধ্যেই আমার বাঙালী কৃষ্টির সহজিয়া স্নায়ুতে ভক্তিমার্গের খোল্‌করতাল বেজে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন সময় কেন এলে?" লক্ষ্মী সোজা-সুজি জবাব দিল, "উদ্ধার পাওয়ার জন্য।"

"উদ্ধার?"

"হাঁ। আমি পাতালে প্রবেশ করেছি। ইচ্ছা করলে আমায় তুমি উদ্ধার করতে পার। শুনবে আমার কথা?"

"শুনতে পারি, কিন্তু উদ্ধার করতে পারব না।" লক্ষ্মী এবার মেঝে থেকে উঠে এসে আমার বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর বলল, "আমি বিলেতে মাত্র ছ'মাস ছিলাম তা তুমি মার কাছেই শুনেছ। সেইখানে মিস মার্গারেটের সংগে আমার চেনা হয়।"

"সেইখানে মানে?"

"বিলেতের এক রেস্তোঁরায়।"

"আর কে কে ছিল সেখানে?"

"আমার দাদা আর আন্দ্রিয়েভ। ওদের সবাইকে আমি চিনি। ওদের খানিকটা খবরও আমি রাখি। ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওদের দলে আমি যোগ দেইনি।"

"এ-সব খবর শোনাবার প্রয়োজন কি?"

"আমার মনে হয় তুমি পার্টিতে নতুন ঢুকেছ। তাই প্রয়োজন আছে। আমার নিজের ভয়ও বড় কম নয়। আমায় ওরা সরিয়ে ফেলতে চায়। দাদা ভীষণ প্রকৃতির লোক। পুরো দলটাই ভারতবর্ষে ফিরে এসেছে। আমার দিবারাত্র চোখে ঘুম নেই। দাদা খুনী। আমি স্বচক্ষে খুন করতে দেখেছি। সে ইচ্ছা করে আমাকে দেখিয়েছে। না দেখালেও আমি বুঝেছিলাম সে ভীষণ লোক। সে অনেক জায়গায় গেছে। মস্কো, প্রাহা, সোফিয়া, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট। সেখানেও সে গুপ্ত-ঘাতকের কাজ করেছে। দাদা হাসে না, এমন কি কাঁদেও না। ইন্দো-চায়নার হো-চিন-মি তার সব চেয়ে বড় বন্ধু। প্যারিতে ওদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয় প্লেখানভের মধ্যস্থতায়। ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বিরাট ষড়যন্ত্র! ওরা যা করছে তা মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদ আমি পড়েছি।"

আমি বললাম, "কৃষ্ণান হয়তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তোমার এবার যাওয়া উচিত লক্ষ্মী।"

"দীপক, আমি জানি সিমেনসও আন্দ্রিয়েভের মত রুসিয়ার গুপ্তচর। আমাকে মারবার জন্য মাস্টার প্ল্যান করছে। তুমি কি আমায় কোন সাহায্যই করতে পার না?"

"পার্টির নিরাপত্তার জন্য তোমার নিজেরই মরে যাওয়া উচিত।"

ফস করে লক্ষ্মী খাট থেকে উঠে পড়ল। অজন্তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য উবে যেতে এক মুহূর্তও লাগল না। পাতালের অন্ধকার নেমে এলো লক্ষ্মীর চোখের

সামনে।' ঋজু দেহটাকে দড়ির মত পাকিয়ে যেন শক্ত করে ফেলল নিমেষের মধ্যে। আমার মুখের সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে বলল, "আমায় একটা সন্তান উপহার দিতে পারো?"

"কি করবে সন্তান দিয়ে?"

"জঙ্গলে পালিয়ে যাব। গিরিগহ্বরে ফলমূল খাইয়ে তাকে মানুষ করব। তারপর তোমাদের রাষ্ট্র যখন খাড়া হবে তারই গোড়ায় কুড়ুল মারবে আমারই সন্তান। ভগবানের নিজের দেওয়া প্রেম ও ভালবাসার কুড়ুল। ভারতবর্ষের নব-শংকরাচার্য যেন জারজ না হয়, সেই জন্যই এসেছিলাম তোমার কাছে। তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে!"

"ভোর হ'তে আর দেরি নেই। এবার তুমি যাও।" দরজা খুলে দিলাম। লক্ষ্মী চলে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, কৃষ্ণান জানলার ও-পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমি কোচিনের পথে। কোচিন-এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীতে আমি, আর কৃষ্ণান তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সন্ধ্যা অতিক্রম করে গেছি। রাত হয়ে এলো। রাত গভীর হ'ল। আমার চোখে ঘুম নেই। গাড়ি পালঘাটের বুক চিরে চলেছে। জ্যোৎস্না রাতে দু'দিকে হাজার হাজার মাইল মাঠ দেখা যায়। কোচিন-এক্সপ্রেসের সংগে পাল্লা দিয়ে মাঠ চলেছে—সীমাহীন। মাদ্রাজের খাদ্যে তবু ঘাটতি পড়ে। এ-ঘাটতি সত্যিকারের ঘাটতি নয়। মানুষের নিজের সৃষ্ট ঘাটতি। শ্রীনাদার থেকে আরম্ভ করে সবাই এই চক্রান্তের মধ্যে অংশ নিয়েছে। এখন যত তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে রাষ্ট্র আসে ততই মঙ্গল। জনসাধারণের মঙ্গল। বুর্জোয়ারা বলে, স্টালিন-দণ্ড দিয়ে ভগবান নাকি জগতের দুষ্ট ক্যাপিটালিষ্টদের শাসন করছেন। সাবধান করছেন, এখনো সময় আছে, গরীব লোকদের দিকে ফিরে তাকাও। নইলে

মরবে। স্টালিনদণ্ডের মার খেয়ে মরবে। অতএব আমেরিকার পুঁজিবাদীরা আর ভারতবর্ষের সাদাটুপিরা সব ভাল ছেলে হবে। ভগবান বলেছেন, ওরা ভাল হ'লে স্টালিনদণ্ডকে তিনি ইউরাল পর্বতের নীচে পুঁতে ফেলবেন, কিংবা ভল্‌গার জলেও ভাসিয়ে দিতে পারেন।

আমার নিজের তেমন বিশ্বাস নেই। থাকলে আমি নিশ্চয়ই এখন কোচিন রাজ্যে আসতাম না। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুমের মধ্যে ভগবান আর স্টালিন দু'জনের কথাই ভুলে গেলাম। স্বপ্ন দেখলাম কেবল লক্ষ্মীকে নিয়ে। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে।

দু'দিকে চেয়ে দেখলাম, একেবারে বাংলা দেশ। গাছগাছড়ার ঘন বন। মাঠভরা ঘাস। ছোট ছোট খাল দেখা যাচ্ছে এদিক-সেদিকে। মাঝখানের স্টেশন থেকে ছেলেরা সব গাড়িতে উঠতে লাগল। কোচিনের রাজধানী এর্নাকুলামে চলেছে। সেখানে যাচ্ছে কলেজে পড়তে। ডেলি পাসেঞ্জার। ছাত্র বলেই ওরা অনেকে টিকিট কাটেনি। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট যাদের সংগে আছে তারা সব দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। ইংরেজ আমলে চেকার ছিল। ধরতে পারলে জরিমানা দিতে হ'ত। কংগ্রেসী আমলেও চেকার আছে। কিন্তু তারা তৃতীয় শ্রেণীতে বসে বসে ঘুমোয়। টিকিট পরীক্ষা করতে সাহস পায় না। রেল কোম্পানি কার? তোমাদের নয়, কংগ্রেসের। অতএব পয়সা দিও না। তোমাদের শিক্ষামন্ত্রীর নাম জানো? পণ্ডিত আবুল কালাম আজাদ। কোথায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে না? অল্ হাজার না কি? সেখানে আরবি পড়ানো হয়। তিনি সেখানকার পণ্ডিত। ট্রেনে চাপলে ভাড়া দিতে হয়, এ-শিক্ষা তোমাদের দেবে কে?

এর্নাকুলাম এসে গেলাম বেলা প্রায় দশটায়। কৃষ্ণান কোথায় একটা সাধারণ হোটেলে গিয়ে উঠলেন। আমার জন্য জায়গা আছে ট্রাভলার্স বাংলোয়, বাংলাদেশে যাকে ডাক-বাংলো বলা হয়। চমৎকার জায়গা। বাংলোর সামনে সমুদ্র। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উইলিংডন পোর্ট দেখা যায়।

দুপুর বেলা কৃষ্ণান এলেন। সংগে কমরেড ভর্মা এসেছেন। ভর্মা শুনলাম মহারাজার উনবিংশ সন্তানের চতুর্থ কন্যার সপ্তম পুত্র। মাসহারা পান বাইশ টাকা চার আনা। আগামী পুরুষের সন্তানের ভাগ্যে হয়তো চার আনা গিয়ে ঠেকবে। তিনি তাই আগে থেকেই সাবধান হয়েছেন। তিনি পার্টির মেম্বার।

কৃষ্ণানকে বলা ছিল আমি গ্রাম দেখব। সমুদ্রের কূল ধরে যাব, সেখান থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি কোন গ্রাম আমি দেখতে চাই। কমরেড ভর্মা মালাবারের কৃষাণদের মধ্যে খুব নাম করেছেন। তিনি রাস্তাঘাট চেনেন। কমরেড ভর্মা ও কৃষ্ণান হাঁফিয়ে পড়লেন। কিন্তু হাঁটার তবু বিরাম নেই আমার। কৃষাণদের বাড়িতে রাত্রিযাপন করেছি। তাদের দেখেছি। সুখদুঃখের কত আলাপ! পারিবারিক দ্বন্দ্ব মিটিয়েছি, কলহ মিটিয়েছি। সাতদিন পর এলেপ্পির কাছে এসে থামলাম একদিন।

পূবদিকে সমুদ্র। দেখলাম চেয়ে ভারতের উপকূলে পাহারা নেই। ফিরবার মুখে কৃষ্ণান গোপনে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলেন?" আমি বললাম, "উপকূল। অস্ত্র আমদানির রাস্তা। সিন্ধিয়ার ক'খানা ভুনের জাহাজ ক'মাইল সমুদ্রই বা পাহারা দিতে পারবে! আর ভারত সরকারের নৌবাহিনী সিন্ধিয়ার চাইতে একটু বড়। কৃষ্ণান, ধরো দু'খানা ডুবো-জাহাজ যদি একটু দূরে থাকে, তা থেকে অস্ত্রগুলো নামিয়ে নিতে পারবে না?"

কৃষ্ণান জিভ বার করে তাঁর শুকনো ঠোঁটের ওপর থুতু লাগাতে আরম্ভ করলেন। মানুষের লোভের কোন সীমা নেই। কৃষ্ণান বললেন, "খুব সোজা। এর চাইতে অনেক কঠিন কাজের চাপ বলকানসের রাস্তায় রেখে এসেছি। বুডাপেস্টে আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল।" কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌদি নেই?"

"না। মরে গেছে।"

"গল্পটা বলুন।"

"আমি বলকানসে রিসার্চ করতে গিয়েছিলাম। হাংগেরিয়ার গ্রাম্য সংগীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ছিল অনেকদিন থেকে। ডেনিয়ুবের জলে নৌকো ভাসিয়ে গ্রাম্যসংগীত শোনা সে এক অপূর্ব ব্যাপার। 'টিটো' তখন বেশির ভাগ সময় আমার নৌকোয় বসে গান শুনত। যুগোশ্লাভিয়ায় তখনও সে প্রবেশ করতে পারে না। মস্কো থেকে আসতো আমার বাড়িতে। এইখান থেকে সে তার পার্টির লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত। তখন যদি জানতাম 'টিটো' বাঘের ওপর তাগ্ করে পাল্টা মারবে!" কৃষ্ণান হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

"এনা বলে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। বিয়েও করেছিলাম। ভেবেছিলাম যতদিন ও-অঞ্চলে থাকব ততদিন ভালই চলে যাবে। টিটো ব্যাটার জন্য কি আমার কম দুর্ভোগ হয়েছে। এনাকে দেখলে কাজকর্ম বন্ধ করে ঘরে বসে থাকত। এদিকে আন্দ্রিয়েভ এসে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলল।"

"আন্দ্রিয়েভ ওখানে কি করছিল?"

"টিটোর গতিবিধির ওপর চোখ রাখত। তাছাড়া টিটোর যাওয়া আসার নিরাপত্তা ছিল আন্দ্রিয়েভের বিশেষ দায়িত্ব। হঠাৎ একদিন নিজের চোখে দেখলাম, টিটো নয়, আন্দ্রিয়েভ এনাকে নিয়ে ডানিয়ুবের জলে নৌকো ভাসিয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। তারপর একদিন এনা মরে গেল নৌকাডুবি হয়ে।"

ট্রেন থেকে নামলাম আমরা। ট্রাভানকোর হয়ে মাদ্রাজ ফিরে আসতে আরও পনরো দিন কাটল।

রাত্রির গাড়িতেই আবার সেকেন্দ্রাবাদ রওনা হলাম। বেজোয়াদায় ট্রেন পরিবর্তন করতে হ'ল। ট্রেন পরিবর্তন করতে কোন ভয় নেই। শিবরাম চাটার্জি মারা গেছেন অনেকদিন হ'ল। ছেলেরা বোধহয় এতদিনে জীবনবীমার টাকাও পেয়ে গেছে।

হায়দ্রাবাদে পনর দিন ছিলাম। একই প্যাটার্ণ। পার্টির একই ছাঁচ। মাদ্রাজের মত কম্যুনিজমের শেকড় মাটির তলায় গিয়ে পৌচেছে। নাইজাম বড়লোক। খোদার ফজলে তিনি ভালই আছেন। মণিমুক্তা পাহারা দিচ্ছেন দিনরাত। পাঁচবার নামাজ পড়েন। প্রতিবারই আল্লাহতালার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, "পাকিস্তানের সংগে মিলে মিশে যেতে আর কতদিন লাগবে খোদা?" এর জবাব খোদার কাছে নেই, আছে আমাদের কাছে। নামাজ পড়বার দরকার নেই। খোদার সংগে পরামর্শ না করেই আমরা মিলিয়ে দিতে পারব। ধর্মপ্রাণ নাইজাম, আপনি আমাদের পার্টিতে যোগ দিন।

তেলেংগানার সংগ্রাম বন্ধ করবার হুকুম চলে গেছে। বন্ধ করবার চেষ্টা চলেছে। বড় আগুন নিভতে সময় নিচ্ছে, কিন্তু পুলিসের অত্যাচার এখনো কমেনি। নালগোন্দার চতুর্দিকে বিদ্রোহ দমনের পুলিসী চেষ্টার চিহ্ন দেখলে পাথরের গা বেয়ে জল পড়তো। তেলেংগানার ভুল কার? আমি কৃষ্ণানকে বললাম, "আদেশ নাও।" কৃষ্ণান তাঁর কানটি এগিয়ে দিলেন। বললাম, "পুলিস মনে করছে তেলেংগানায় বিদ্রোহ দমন ওরাই করেছে। তা করুক। বিদ্রোহ বন্ধ করবার জন্য কড়া হুকুম পাঠিয়ে দাও। আর—কতগুলো অস্ত্র আগে থেকে ঠিক করে রাখতে বল। সমগ্র ভারতবর্ষে ভাল করে পাবলিসিটি দেওয়ার পর সেগুলো পুলিসের হাতে যথারীতি সমর্পণ করা হবে। নেহেরু যেন মনে করেন তাঁর অনুরোধে আমরা অস্ত্রশস্ত্র সব দিয়ে দিলাম। হাঁ, আর একটা কথা। অস্ত্রগুলো দেওয়ার আগে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিতে ব'ল।" "কি দেখবে মিঃ চৌধুরী?", প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণান।

"দেখবে যে অস্ত্রগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই অকেজো। হুকুম আজকেই পাঠিয়ে দাও কমরেডদের কাছে। পরে পলিটব্যুরোকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিও।"

কৃষ্ণান বললেন, "পুণা একটা মস্ত বড় সামরিক ঘাঁটি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কে আছেন সেখানে?"

"অনেকেই আছেন। তার মধ্যে ক্যাপ্টেন মজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

"তাঁর ইতিহাস কি?"

"চতুর্দশ পাঞ্জাব বাহিনীতে ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। বার্লিন দখলের পর তিনি পূর্ব-জার্মানিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাস্তাঘাট ঠিক করে দেয় আন্দ্রিয়েভ।"

"তারপর?"

"মস্কো পর্যন্ত গমন করেন। মার্শাল বুরোশিলভের সংগে মোলাকাত হয়। মোলাকাতের সময় আন্দ্রিয়েভ উপস্থিত ছিল। তারপর কমরেড প্লেখানভ তাঁকে দীক্ষা দেন।"

"ক্যাপটেন মজিদের চাকরিতে উন্নতি হয়নি কেন?"

"যত ওপরে উঠবেন কাজের তত অসুবিধা। ক্ষেত্র ছোট হয়ে আসে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল আকবর খাঁর দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের সাবধান থাকা দরকার। একটু বেশি নড়াচড়া করতে গিয়ে সর্বনাশ করে ফেললেন। পাঞ্জাবী রক্ত গরম বেশি। দক্ষিণ ভারতের ধর্মপ্রাণ নিরামিষাশী হিন্দুদের মত শান্ত নয়।"

আমরা পুণা হয়ে বোম্বে এলাম। দু'চারটা ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং দেখলাম। কমরেড রাও এই সময় বোম্বেতেই ছিলেন। কৃষ্ণান আমার তেলেংগানা সম্পর্কীয় আদেশ কমরেড রাওকে দিয়ে দিয়েছেন। সেনট্রাল কমিটি আর পলিটব্যুরোর মধ্যে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন। কিন্তু কৃষ্ণানের সংগে তাঁর গুপ্ত যোগাযোগের খবর অন্য কেউ জানেন না। কৃষ্ণান দিনের বেলা ভয়েভ এণ্ড ভয়েড কোম্পানির মেসিন বেচবার জন্য চারদিকে ছোটাছুটি করেন। সন্ধ্যার পর আসেন আমার কাছে। রাত্রে ঘুমোবার বদ অভ্যাস আর নেই। আজকে তিনি এলেন আমার হোটেলে। তাঁকে বলেছিলাম বোম্বে থেকে যে-সব কাগজ পার্টির পয়সায় প্রকাশিত হয় তার নমুনা আনতে। বোম্বেতে চটকল নেই, কিন্তু চট পাওয়া যায়। চট দিয়ে বেঁধে একটা বিরাট বোঝা

কুলির মাথায় করে তিনি নিয়ে এলেন। ভয়েড এণ্ড ভয়েড কোম্পানির একটা মেসিনও হতে পারত।

ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি পা দিয়ে লাথি মারতে মারতে বোঝাটাকে আমার খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, "অবসর সময়ে দেখবেন। ইংরাজি, গুজরাটি, হিন্দি, মারাঠি ভাষায় অনেক কাগজ আছে। কেবল দৈনিক নয়, সব রকমের সাময়িক। তা ছাড়া আমাদের হয়ে অনেক কথা ওদের কাগজেও বহু লেখা হয়। কমরেডরা সে-সব কাগজেও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের রাষ্ট্র আপাতত লুকনো থাকলেও রাষ্ট্র।"

তিব্বত দখলের সময় সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট বড় মিয়ে পঞ্চাশটা ধর্মঘট চলছিল। উপস্থিত সব বন্ধ আছে। বোম্বে-আহমদাবাদের শ্রমিকরাও সবাই গিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের একজন উপনেতা একটা মিটিংএ ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল কৃষ্ণানের কাছে শুনলাম। সে কিছুতেই ধর্মঘট বন্ধ করতে চায়নি। সে মিটিংএ বলেছিল, "আর সাতদিন রুখে থাকতে পারলে মিল কর্তৃপক্ষ আমাদের সব দাবি মেনে নেবে। সাতদিন কমরেড, মাত্র সাতদিন।"

কমরেড রাও মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন। উপনেতার আবেগ যখন যথেষ্ট পরিমাণে কমে এলো কমরেড রাও ঘোষণা করলেন, "মিটিং আজ স্থগিত রইল। কাল সন্ধ্যে সাতটায় হবে।" বাইরে নিরিবিলিতে উপনেতাকে কমরেড রাও ডেকে নিয়ে এসে বললেন, "দাবি মিটলেই কি দাবির শেষ হয়? দাবির কখনও শেষ নেই।" উত্তেজিত হয়ে উপনেতা বলতে যাচ্ছিল, "কিন্তু কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে লেখা…।"

"থামুন, কমরেড থামুন। মেনিফেষ্টো আমরাও পড়েছি। আমরা কথা বলছি ধর্মঘট বন্ধ করা সম্বন্ধে। অর্থাৎ দাবি আমাদের চিরদিনই থাকবে, যতদিন না কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র হচ্ছে। বুঝেছেন?" ধমক খেয়ে উপনেতা বলল, "বুঝেছি।"

"তা হ'লে বুঝবার রাস্তাটা আরও একটু এগিয়ে দিচ্ছি। দাবিগুলো হচ্ছে আমাদের রাজনীতির অস্ত্র। দরকার বুঝে ব্যবহার করব। শ্রমিকরা দু'টাকা মাইনে বেশি পেলে আমরা খুসি হব কিন্তু না পেলে দুঃখ করবার কি আছে? অস্ত্র সব সময় ব্যবহার করলে ভোঁতা হয়ে যায়। তাছাড়া রুসিয়াতে ধর্মঘট হয় না। ধর্মঘট করার অধিকার তাদের নেই। আমাদের আছে। বুঝেছেন?"

"বুঝেছি।"

"তা হ'লে কাল থেকেই যেন শ্রমিকরা সব কাজে যোগ দেয়।"

"দেবে। কিন্তু কেউ কেউ খুবই আপত্তি করবে।"

"তার জন্য আপনি রয়েছেন। আপনি ট্রেড ইউনিয়নের বেতনভোগী কর্মচারী। যদি না পারেন, বলুন?"

"পারব, নিশ্চয়ই পারব। এতো সোজা কাজ, পারব না?"

মানুষ কেবল আদর্শ নিয়েই বাঁচে না, তাকে বেতন নিয়েও বাঁচতে হয়।

বোম্বেতে পনরো দিন কাটিয়ে রাজপুতানায় এলাম। সেখান থেকে পেপসু। তারপর পূর্ব-পাঞ্জাব। ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে দু'ঘণ্টা ছিলাম। সীমান্তের পাহারা দেখে হাসি পেল। ইঙ্গ-মার্কিনের ষড়যন্ত্রের ছাপ সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি জমিতে। যত ভাগ করতে পারবে তত সুবিধা। কিন্তু ভাগ করবার টেকনিক্ আমাদের চাইতে ভাল কেউ জানে না। ওরা ভাগ করে ওপরে—আমরা ভেতর থেকে ভাগ করতে করতে আসি। ওদের অস্ত্র দিয়ে আমরা একদিন ওদেরই পাল্টা মারব।

দিল্লি এলাম ৭ই মার্চ। ভারতবর্ষের রাজধানী। দিল্লির সৌন্দর্য কিংবা ইতিহাস নিয়ে লিখবার কিছুই নেই। আমি ট্যুরিষ্ট নই, আমি কম্যুনিষ্ট। আমাদের গর্তগুলো দেখবার পর বাইরে বেরবার সময় থাকে না।

বাবার বাংলোয় এসে উঠলাম। হোটেলের পয়সা বাঁচবে। বাড়ির বাইরে পুলিস পাহারা আছে। মাইনে করা পুলিস সব সময় সজাগ নয়, মাঝে

মাঝে ঘুমোয়। বাবা শুনলাম এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব মাথার ওপরে। বেলা দশটা পর্যন্ত তাই ঘুমতে হয়। স্বকুর ঘরে এলাম। স্বকু নেই। সাইকেল চড়ে সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছে। স্লিমিং-এর পক্ষে সাইকেল চড়া ভাল ব্যায়াম। ওর ঘরে টেবিলের ওপরে একখানা বই পড়ে রয়েছে দেখলাম। বাংলা নভেল। লিখেছে রমেন বটব্যাল। কৌতূহল হ'ল, পাতা ওল্টাতে লাগলাম। অনেকদিন ওর সংগে দেখা হয় না। পার্টিতে ঢুকেছে। কতটা উন্নতি হয়েছে ওর বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। পড়তে ভাল লাগছিল। মরা মানুষের উপকথা এ নয়। এমন কি কলেজ ষ্ট্রিট আর বালিগঞ্জের স্বাস্থ্যহীন হলুদ বর্ণের মেয়েগুলোকেও দেখতে পেলাম না। রমেনের মধ্যে সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে। বইটা শেষ করে ফেললাম। বুকের তলায় বালিস দিয়ে উপুড় হয়ে রমেন এ-বই লিখতে পারেনি। মেরুদণ্ড সোজা করে সে নিজের অস্তিত্ব ঢেলে দিয়েছিল, কম্যুনিজমের লাভায়। তাই তো এতে এত বেশি উত্তাপ রয়েছে, গতি রয়েছে, সুপ্ত মাটিকে গিলে ফেলবার মুখব্যাদান রয়েছে। রমেন আমাদের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গোর্কি।

রমেনের বইটা হাতে নিয়ে আজ অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। বুর্জোয়া সাহিত্যের পচা শামুকে পা কাটতে যাচ্ছিল। আমিই ওকে পার্টিতে নিয়ে আসি।

একদিন কলেজ ষ্ট্রিটে ইউ. এন. ধরের দোকানের সো-কেসে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়তেই দেখি যে একখানা নতুন বাংলা উপন্যাস রয়েছে ওখানে। বইখানার নীচের দিকে লেখা রয়েছে রমেন বটব্যাল। খুবই অবাক হয়ে গেলাম। রমেন এমন সুন্দর বাঁধাই বই লিখেছে আমি তা জানতাম না। অনেক দিন ওর সংগে দেখা হয়নি। বইখানার ওপরে বুর্জোয়া রং ও ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন। সাচ্চা জিনিসের জন্য কে কবে এমন করে বিজ্ঞাপন দেয়? এমন সস্তা দামের রং মেখে রাস্তায় বসে থাকে কারা? বইখানা কিনে ফেললাম। রং-চং মাখা বই।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ছাত্রছাত্রীরা সব ঐ রাস্তায়ই আসছিল। রমেন বটব্যালের মডেল সব! ছেলেদের মধ্যে অনেকরই দেহগুলো যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। মুখগুলো মলিন। চোখের দৃষ্টি কুয়াসাচ্ছন্ন। উচিত-ওজনের মাংস কারো শরীরে কেউ বহন করে না। বড্ড রোগা। 'বসন্ত কেবিনে'র সরু রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করতে তাই কারো কষ্টই হয় না। এম. এ. পাস করবার আগেই নিকোটিনের আধিক্যে আঙুলগুলো হলদে হয়েছে। বুকের ভেতরটা কতখানি হলদে হয়েছে তা বোধহয় রমেন জানে না। জানলে উপন্যাসের মলাটে সে হলদে রং লাগাত না। আমরা রং বলতে লাল রং বুঝি। টুকটুকে লাল কিংবা টকটকে লাল। লাল স্বাস্থ্য, লাল জীবন এবং লাল মৃত্যু। কোথায় সেই লালের খেলা? ছাত্রীদের শাড়িগুলোও তো লাল নয়। সবুজ আছে, নীল আছে, মাটি রং আছে, ছাই রং আছে, হলদে আছে, এক রংএর সংগে অন্য রংএর মিশ্রণ আছে; কিন্তু লাল কই? বিয়ের রাত্রের সেই লাল বেনারসির রং কই? রমেন তার উত্তর দিতে পারবে না। পারবে না এই জন্যে যে বিয়ের রাত্রে বেনারসি সাড়ি কিনবার পয়সা ওদের নেই। কেবল বিয়ে করবার পয়সাই বা ক'জনের আছে? ক'টা মেয়ের জীবনে ঘর বাঁধবার সুযোগ আসবে রমেন তা নিজেই জানে না। কিন্তু আমরা জানি। কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রে বিয়ের আয়োজন বিরাট ভাবে থাকবে। বারো মাসের প্রতিমুহূর্তেই বিয়ের লগ্ন। পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হবে না। কেবল একটা কাগজ সই করলেই চলবে। কোনদিন যদি অসুবিধা হয় তা হ'লে স্বামীস্ত্রীর যে কেউ একজন দু'পয়সার একখানা পোষ্টকার্ডে বিবাহ বিচ্ছেদের সংবাদটা লিখে জানালেই হ'ল। পোষ্টকার্ড রেজেষ্ট্রি অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেলেই বিয়ে ভেঙ্গে গেল। আদালত নেই, ক্ষতিপূরণের কথা নেই, এমন কি বিবাদী পর্যন্ত নেই। শুধু জানিয়ে দিও বোন, তা হ'লেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। সন্তান প্রতিপালন করতে হবে না। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নেবে। বাড়ি ফিরে প্রথমে রমেনের উপন্যাস পড়তে বসলাম। উপন্যাসের

প্রথম লাইন—আমি এম্. এ. পাস করেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কলকাতার বাঙালী হিরো আর কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. পাস করবে ভাই? ভবানীপুরে তো দ্বিতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। প্রথম লাইনেই কি দরকার ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন দেবার? ছেলে ধরার জন্য? ছেলের তো অভাব নেই। অনেক ছেলে স্ব-ইচ্ছায় আসে এইখানে। অনেকে ভুল করে ঢুকে পড়ে। ভিড় তো লেগেই রয়েছে। তবে আবার বিজ্ঞাপন কেন?

প্রথম পৃষ্ঠায় ঐ একটা খবর ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার খবর—আমি প্রাচীন ভারতের অলংকার নিয়ে গবেষণা করছি।

তৃতীয় পৃষ্ঠার বড় খবর—রেণু গেল-বছর থেকেই গবেষণা করছিল, 'প্রাচীন ভারতে শিল্প সৌন্দর্য।' রেণু আমার আগে এম্. এ. পাস করেছে কিন্তু জন্মেছে আমার পরে। কত পরে জানি না, হয়তো দু'ঘণ্টা পাচ মিনিট পরে।

রমেন বাহাদুর বটে! প্রথম থেকেই জন্মের সময় নিয়ে আলোচনা, প্রথম থেকেই কুষ্ঠি বিচার!

চতুর্থ পৃষ্ঠায় রমেন লিখেছে—সাত দিন গবেষণার পরেই আমার ফাউণ্টেন পেন বিক্রি করলাম জলের দামে। মাত্র কুড়ি টাকায়! মাত্র কুড়ি টাকা পেলাম সাট টাকার পার্কার বেচে। তাই দিয়ে কড়ে-আঙুলের মাপে একটা আংটি কিনলাম। অন্য আঙুলের জন্য কিনলে দাম বেশি পড়ে।

পঞ্চম পৃষ্ঠায়—রেণু বলল, কড়ে আঙুল কি আঙুল নয়? আসল কথা আংটিতে সৌন্দর্য আছে কি না। হিরো বলল, "সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সোনা খুব কম। সিকি ভরিও নেই। সোনার বাজার গরম।"

আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। ছুটলাম রমেনের বাড়ির দিকে। নিজেকে ও নষ্ট করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর রাগ করে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওকে রক্ষা করা দরকার।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর থেকে সব মিছে কথা লিখেছে রমেন। রেণুকে ও পায় নি।

কিন্তু রমেন লিখবার স্টাইল পেয়েছে। মার্কসবাদের দাওয়াই খাওয়াতে পারলে রমেন সত্যিকারের উপন্যাস লিখতে পারবে।

আমি ছুটলাম কবীর রোডের দিকে। প্যাকার্ডের স্পিড তুললাম ষাট মাইল। রমেন লিখতে পারে সেইটাই বড় কথা। তার উপর স্টাইল আছে। মার্কসবাদের মধ্যে দিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতিভা মানে তাই। ভগবানপ্রদত্ত্ প্রতিভার উপর আমরা বিশ্বাস করি না।

এই তো কবীর রোড। হাঁ, ঠিকই এসেছি। এই তো রমেনদের বাড়ি। হাঁ, ঠিকই পেয়েছি। দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। ডান দিকেই তো রমেনের ঘর। ঘরের দরজা খোলা। রমেন আছে। বিছানার উপর বুকের তলায় বালিস দিয়ে কি যেন লিখছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "দুনিয়ার কোন্ প্রতিভা বালিস বুকে দিয়ে কোন্ উপন্যাস লিখেছেন বন্ধু?"

"উপন্যাস নয়, কর্পোরেসনের বড় কর্তার কাছে একটা চিঠি লিখছি। বাড়ির সামনে আজ দু'দিন থেকে একটা মরা-কুকুর প'ড়ে আছে। গন্ধ পেলি না দীপক?"

"গন্ধ আসছে তোর উপন্যাস থেকে হতভাগা।"

"সেই জন্যই তোকে এক কপিও উপহার দেইনি।"

এই উপন্যাস কেন লিখলি রমেন?"

"কেন লিখব না বল্? এম্. এ. পাস করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যেতে হয় না। হাতে কাজ নেই। একটা কিছু করতে হবে তো। তাই উপন্যাস লিখলাম।"

"কিন্তু এতে সত্যিকারের জীবন নেই। রেণুকে তুই দেখেছিস?"

"তুই নেশা করেছিস না কি দীপক? রেণুকে দেখতে গেলে পার্কার কলম বেচতে হ'ত। দ্বিতীয় উপন্যাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা আগাম পেয়েছি।"

"তোকে আমি পাঁচ-শ' টাকা দেব। আমায় একখানা বই লিখে দে।

সত্যিকারের মানুষ থাকবে তাতে। বাংলার মধ্যবিত্ত, বাংলার শ্রমিক, বাংলার কৃষক।"

"বাংলার মাড়োয়ারী, বাংলার পাঞ্জাবী, বাংলার মাদ্রাজী নয় কেন?"

"নয় এই জন্য যে, প্রাদেশিকতা মানুষকে কোনদিনই বড় করতে পারবে না। সমস্যা মেটাতে পারবে না।"

"তা হ'লে তুই গীতাকে বল্ সে হয়তো বাঁ হাত দিয়েই তোকে একখানা উপন্যাস লিখে দিতে পারবে।"

"না রমেন। তোর ডান হাতের লেখা উপন্যাস চাই। উপন্যাস লিখে মাড়োয়ারীর উপর প্রতিশোধ নিতে পারবি না। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি? আয়, আমরা শক্ত হই। শক্তি সংগ্রহ করি, সংঘবদ্ধ হই। এমন দিন আসবে যেদিন হয় ওরা আমাদের সংগে যোগ দেবে, নয় পালিয়ে যাবে। কিন্তু তোকে আমি কথা দিচ্ছি, এক ভরি সোনা নিয়ে পালিয়ে যেতে দেব না। ক্যাস-সার্টিফিকেট আর কারেন্সির মূল্য এক কাণা কড়িও পাবে না আমাদের কাছে। কাজ করবার এই তো সুযোগ রমেন। আমরা পতিত, আমরা প্রতিমুহূর্তে লাথি খাচ্ছি। আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, এখনও যদি আমরা রাস্তা ভুল করি। কিন্তু রাস্তা আমাদের আছে। ভগবানের ঠিকাদারের তৈরি রাস্তা নয়। বিশ্ববিপ্লবের রাস্তা। রমেন, আমি তোকে মসলা দিচ্ছি, তাই দিয়ে তুই উপন্যাসের বুলেট তৈরি কর্।"

"মসলার নমুনা দে।" রমেন উঠে বসল।

আমি বললাম, "ভারতের বুভুক্ষু মধ্যবিত্ত, বুভুক্ষু শ্রমিক, বুভুক্ষু কৃষাণরাই তোর মসলা। তুই লেখ্। তোকে আমরা ভারতের গোর্কি বলে সম্মান দেব। তুই লিখবি না রমেন?"

"কিন্তু মসলাগুলোকে তো দেখা চাই দীপক।" রমেন বিছানা থেকে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

ওর হাত দুটো আমার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, "দেখাব নিশ্চয়ই, দেখাব।"

রমেন এবার বিছানার তলা থেকে এক দিস্তা কাগজ টেনে বার করল। আমায় বলল, "দ্বিতীয় উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিলাম।" এই বলে সে কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "প্রথম কি দেখাবি ? শ্রমিক-মসলা ?"

"না। মধ্যবিত্ত-মসলা। এবার তুই ল-ক্লাসে ভর্তি হয়ে যা।"

"আবার আমায় ল পাস করাবি না কি দীপক ?"

"পাস করবার দরকার নেই, কেবল পড়ে গেলেই হবে। ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সবাই তো মধ্যবিত্ত।"

"আমি ছাত্রদের মধ্যে কি করব ?"

"প্রশ্ন করিস না। যখন দেখাব বলছি তখন একটু ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। ছাত্র ফেডারেসনের কাউকে চিনিস ?"

"না। আমার নায়ক সমরবাবু কেবল এম্. এ. পাস ছিলেন।"

"তাকেও আমরা দলে টেনে নেব। যোগ্য লোকের সম্মান আমরা দিতে জানি রমেন। আজকে আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হ'ল। তোর হাতে আমি আজ এই উপহারটা তুলে দিলাম। মনে রাখিস।" পকেট থেকে সোনার পার্কার কলম বার করে রমেনের পকেটে ঝুলিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে রমেন অভিভূত হয়ে পড়ল। সে আম্‌তা-আম্‌তা করে বলল, "এত দামী কলম দিয়ে লিখতে পারব কি দীপক ?"

"ভারতবর্ষের গোর্কির হাতে কলম তুলে দিয়েছি নিজেকে কেবল গৌরবান্বিত করবার জন্য। তোর মাথায় কত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম সে-কথা ভবিষ্যতের ইতিহাসই কেবল বলতে পারবে ভাই। জানিস রমেন, আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, আগামী দিনের নতুন ইতিহাস আমরাই রচনা করব। অতীত ভারতের মাটি থেকে আমাদের জীবনের শেকড় আল্‌গা হয়ে গেছে। আমরা

নতুন মাটির সন্ধান পেয়েছি। তোর দ্বিতীয় উপন্যাস সৃষ্টি হবে সেই নতুন মাটি থেকে। আমরা কেবল গোর্কি চাইব না। আমরা চাইব পুরনো গোর্কির চাইতেও বড় গোর্কি। অনেক বড় না হোক অন্তত সামান্য বড়। আমরা সব তলায় আছি বলেই আমাদের সম্ভাবনা বেশি। আমরা সবাই এবার রমেন বটব্যালের দ্বিতীয় উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। আশা দিচ্ছিস তো?"

"আমি কাউকে ভগ্নাংশ দিতে পারি না। আমার দেওয়া মানে পুরোপুরি দেওয়া। কেবল অঙ্গীকারই দিলাম না, নিজেকেও দিলাম।"

রমেন যেন মুহূর্তের মধ্যে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বালিস বুকে দিয়ে বাংলা উপন্যাস লেখক রমেন বটব্যাল এ নয়। আমি জানি, আজ যা সম্মান আমি ওকে দিলাম তার শতাংশের এক অংশ সম্মানও কেউ ওকে দেয়নি। রমেনের পুনর্জন্ম হ'ল।

বইখানা স্থকুর টেবিলে রেখে দিয়ে বাবার ঘরে এলাম। আমাকে দেখে তিনি মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠলেন। না দেখলে একটার একটু আগে লাঞ্চে যাওয়ার সময় হয়তো উঠতেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "চাকরি করতে যাওনি বাবা?"

"সেক্রেটারি গেছে। বেলাবেলি এক সময় গিয়ে সই করে দিয়ে আসব। তাছাড়া গুরুতর কিছু কাজ থাকলে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হয়। আমি আর কষ্ট করে মাথা ঘামাই না।"

"তোমার মাথা তবে এখন ফাঁকা বাবা?"

"সেই জন্যই তো জন মাথাই চাকরি ছেড়ে দিলেন। টাটা কোম্পানির কাজ ভারত সরকারের কাজের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। কেবল সই করবার জন্য তিনি সময় নষ্ট করতে চাইলেন না।"

"কিন্তু রাষ্ট্রের কাজের চেয়ে টাটা কোম্পানির কাজ কঠিন কেন?"

"টাটা কোম্পানীকে ব্যবসা করে লাভ অর্জন করতে হয়। ভারত সরকার,

অর্জন করে কেবল লোকসান। দীপু, লোকসান রোজকার করা লাভ অর্জনের চেয়ে সোজা নয় ?"

আমি স্বীকার করলাম, "সোজা। তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। কাশ্মীর রক্ষার জন্য বছরে কেবল দেড়-শ' কোটি টাকা লোকসান। অথচ মাদ্রাজের রায়লাসিমাতে দেড় ইঞ্চি টিউবওয়েল খুঁড়তে তিন-শ' পঁয়ষট্টি দিন লাগে।"

তড়াক করে বাবা বিছানা থেকে নেমে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "খবরটা সত্যি না কি রে ?"

"কোন্ খবরটা ?"

"কাশ্মীর এবং টিউবওয়েল ?"

"খুব সত্যি। দেড় ইঞ্চিটা একটু বাড়িয়ে বলেছি। মাপলে হয়তো সিকি ইঞ্চি কম হবে। কাশ্মীরে দেড়-শ' কোটি টাকা কেবল সৈন্য রাখবার খরচ। তার উপরে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য আবদুল্লা আমাদের কাছ থেকে আরও অনেক টাকা ধার নিচ্ছেন।"

"বলিস কি দীপু ? ধার ? আমেরিকার কাছে আমরাই তো ধারে তল হয়ে আছি ! আমরা আবার ধার দেব কি করে ?"

"ক্যাপিটালিষ্ট অর্থনীতির এই তো রহস্য বাবা। নেহেরু কেবল একদিকের লোকসানে সন্তুষ্ট নন। দু'দিকে লোকসান না হ'লে ইংগমার্কিন খবরের কাগজগুলো তাঁকে আন্তর্জাতিক পুরুষ বলে পাবলিসিটি দেয় না।"

"তা হ'লে আমি শ্যামাপ্রসাদের সংগে একবার দেখা করি। কালিবাড়িতে গিয়ে দেখা করলে কোন কথা উঠবে না।"

"কেন ?"

"কাশ্মীর আর টিউবওয়েল নিয়ে একটা ভাল বক্তৃতা দিয়ে দিতে পারবেন।"

"শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা দিলে তোমার রাজনীতি হ'ল কই ?"

"তুই কি করতে বলিস ?"

"চাকরিতে ইস্তফা দাও। দিয়ে কলকাতায় চলে এসো। দল গড়তে হবে। নির্বাচন আসতে আর ক'দিনই বা বাকি বলো?"

"তুই ঠিকই বলেছিস দীপু। দিল্লিতে বসে একবারে নিষ্কর্মা হয়ে গেলাম। তার ওপর স্বকু প্রায় প্রতিদিনই দিল্লির সবাইকে ডেকে 'ডিনার' খাওয়াচ্ছে। মাইনে থেকে আমার এক পয়সাও জমে না। কেবল সই করবার জন্য দিল্লিতে বসে লাভ কি?"

"কিছু লাভ নেই বাবা।"

"ঠিক, ঠিক কথা। লাভ যা হচ্ছে সব স্বকুর। দিল্লির সেক্রেটারিয়েট থেকে সুরু করে জেনারেল কারিয়াপ্পার সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত বড় বড় লোকদের সংগে এমন খাতির বাগিয়ে বসেছে যে, স্বকু চলে গেলে দিল্লির শাসনব্যবস্থা সব অচল হয়ে পড়তে পারে। তার উপরে নেহেরু বলতে স্বকু তো অজ্ঞান! কাগজে ছবি দেখিস না যেখানে নেহেরু সেখানে স্বকু? কারিয়াপ্পাকে শুনলাম একখানা বাংলা গীতাঞ্জলি দিয়ে এসেছে। স্বকু ওঁকে বাংলা শেখাবে।"

"এ-সব সর্বনেশে কথার প্রচার ক'রো না বাবা।"

"কেন রে?"

"কাশ্মীরে দেড়-শ' কোটি টাকা খরচ হচ্ছে আর সেই সময় কারিয়াপ্পা গীতাঞ্জলি পড়ছেন? নেহেরু শুনলে রাগ করবেন। স্বকু দেখছি ভারতরাষ্ট্র দুর্বল করে ফেলবে?"

"তুই ঠিক বলেছিস দীপু। স্বকুর বিয়ের ব্যবস্থা করি। কিন্তু করি কার সংগে বল্ তো? দিল্লিতে ওর যা চাহিদা তাতে কেবল রুই হ'লে চলবে না। রুই মাছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুই হওয়া চাই। কিন্তু ভারতবর্ষের সবগুলো রুই মাছই তো বুড়ো। দীপু, সমস্যা আমার অনেক। কংগ্রেস আমায় টিকিট দেবে না। দল গড়তে হবে। তার উপর আবার স্বকুর বিয়ে! সর্, এবার চান করতে যাই। আজ রাত্রিতেও আবার পার্টি আছে। দেরি করলে স্বকু আমায় তেড়ে আসবে। হাঁ রে দীপু, পামির কোম্পানিকে তো মুনাফার হাওয়া

দিয়ে জ্ঞানশংকর বেলুনের মত ফাঁপিয়ে তুলেছে! তোর অংশ সব ঠিকমত বুঝে নিয়ে আমার কাছে রেখে দিস। বুঝলি? বেলা হয়েছে। চান করতে যাই। চল।" আমি সরে আসতেই বাবা গিয়ে চান-ঘরে ঢুকলেন।

কিছুক্ষণ পরে নুকু হু'জন সাইকেল-ওয়ালীকে নিয়ে মন্ত্রী গৌরীশংকর চৌধুরীর বাড়িতে প্রবেশ করল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি দূর থেকেই ওদের দেখতে পেয়েছিলাম। এরকম দৃশ্য হিন্দি বায়স্কোপে শুনেছি অনেক দেখা যায়। আমি নিজেও কোথায় যেন দেখেছি বলে স্মরণ হ'ল। বাগানের মধ্যে ঢুকে সাইকেল-ওয়ালীরা সব শরবৎ খেলো। হাসিঠাট্টার হুল্লোড়! নুকুর হুল্লোড় সব চেয়ে বেশি। মনে হ'ল মেয়েগুনো সব লাহোরের পুরনো উচ্ছিষ্ট। প্রাক্-আজাদি লাহোরের রামধনুকের রঙ এদের একটুও ম্লান হয়নি। পুনর্বাসন বিভাগ থেকে এরা নিয়মিত মাসহারা পায়। যাদের মুখে রঙ নেই সে-সব রিফিউজিরা কাতারে কাতারে মরছে! নুকুর কার্যক্ষেত্র কেবল এক সেক্রেটারিয়েট থেকে অন্য সেক্রেটারিয়েট নয়: নুকু লাহোরের উচ্ছিষ্ট নিয়েও নাড়াচাড়া করছে। শরবৎ খেয়ে ওরা সব চলে গেল। ভেতরে এসে আমাকে দেখে নুকু খুবই আশ্চর্য হয়েছে।

নুকু আমায় টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে এলো। আমার মনে হয় আমি ছাড়া এ-ঘরে আর কেউ ঢোকে নি। ঢুকলে অবাক হ'ত। মন্ত্রীর বাড়ি। অতএব প্রত্যেক ইঞ্চি ঘর, বারান্দা ও উঠোন পর্যন্ত অতি যত্নসহকারে তৈরি। কোথাও খুঁৎ নেই। তার উপর চৌধুরী পরিবারের স্পর্শ লেগে এর আভিজাত্য অনেক বেড়েছে। প্রত্যেকটি ঘর ঝক্ঝক্ করছে। আসবাবগুলোতে সুরুচির পরিচয় রয়েছে। ঘরবাড়ি সাজিয়ে গেছে অনীতা। কিন্তু নুকুর ঘরের পরিবর্তন সে নিজেই করেছে। ঘরে একটা সাধারণ লেখবার টেবিল, পাশে চেয়ার। হু'জনের বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের খাটিয়ার মত চারপেয়ে একটা তক্তাপোষ। নুকু তাতে শোয়। শোয় এবং ঘুমোয়। কম্যুনি-

কর্মীর পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। কৃচ্ছ্রসাধন তাদের জীবনের পরম ব্রত। কিন্তু নুকুর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে এযাবৎকাল। আজ ওর ঘরের দীনতায় আমার সন্দেহ হ'ল, নুকু হয়তো বিনয়প্রকাশকে ভুলবার চেষ্টা করছে।' ভুলে গেলেই ভাল।

নুকু বলল, "দীপুদা, রাত্রে তোমার নেমন্তন্ন। দু'চারজনকে বলেছি।"

"কথা দিতে পারছি না রে। লাভ আছে কিছু?"

"তোমার লাভলোকসানের কথা কে ভাবে? পার্টির লাভ হবে। একজন আবার হেগেলের দর্শন নিয়ে বক্‌বক্‌ সুরু করেছে। রেল বিভাগের খুব বড় কাংলা। দীপুদা, রেল চলাচলের মধ্যে কোন ডায়লেকটিক্‌স্‌ আছে না কি? রেলগাড়িতে চেপে সৈন্যরা সব যাওয়া আসা করে, না? অতএব রেল বিভাগেও দু'চারজন কমরেড থাকা ভাল, না দীপুদা? আমার ছেলেমানুষি শুনে হাসছ? তা হ'লে থাক। আর কিছু বলব না। দিদি কেমন আছে?"

"আমি তো কলকাতার বাইরে দু'মাসের ওপর। কোন খবরই পাইনি। তুই পাস নি?"

নুকু বলল, "পেয়েছি।" বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি বার করে নুকু আমায় বলল, "পড়ো।"

'নুকু,

তুই চলে যাওয়ার পর মার কাছে শুনলাম আমাদের বাড়ির তিনতলার ছাদে গিয়েছিলি জগদ্ধাত্রীকে দেখতে। কেন রে? তোর জীবনের যা আদর্শ তাতে তো জগদ্ধাত্রী নেই। জগদ্ধাত্রী বলতে এখানে আমি ভগবানের কথাই ভাবছি। তুই ভগবানের কথা ভাবলি কেন? ব্যথা পেয়েছিস নাকি? আজকালকার মানুষের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। ব্যথা না পেলে কেউ তাঁর কথা ভাবে না। তবে হাঁ, মানুষের সুখ যেমন সত্যি, দুঃখও তেমনি সত্যি। দুঃখের মধ্যে দিয়ে না গেলে তাঁকে বোধহয় ভাল করে বোঝা যায় না।

'আমি তোকে কোনভাবে আঘাত দিয়েছি রে? তুই আমাকে বলবি না

মুকু? দিদির কাছে গোপন করিস না। দুঃখ সইবার ক্ষমতা আমার কত ত তুই জানিস না।

'মুকু, তুই কি কমলকে চিনিস? কমলের হাতে একটা বই ছিল। বুফেতে আমরা একদিন চা খেতে গিয়েছিলাম। বইটা কমল আমাকে পড়তে দেয়। সোভিয়েট রাসিয়ায় নাকি জীববিদ্যায় যুগান্তর এসেছে! গম গাছের মূল থেকে সুরু করে মানুষের জন্মমূল পর্যন্ত সব কিছু বিজ্ঞানের আলোয় দেখা যাচ্ছে। বইটা ছিল সেই সম্বন্ধে লেখা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সামান্য একটু লেখাপড়া করেছি বলে তুই বোধহয় জানিস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি বলে আমি বড়াই করছি না। বিজ্ঞান আমার ভাল লাগে। কিন্তু এই বইটার বাহাদুরি আদ্যোপান্ত অবৈজ্ঞানিক। ভগবানকে উড়িয়ে দেবার জন্যই সৃষ্টিরহস্যকে একটা ফরমুলা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যাক। বইটা পড়তে পড়তে এক জায়গায়, এক-শ' সতরো পৃষ্ঠায়, কালি দিয়ে লেখা দুটো অক্ষর দেখলাম। আমার মনে হ'ল অক্ষর দুটো তোর হাতের লেখা। দুটো কথার মর্মার্থ যদিও ভুল কিন্তু তাই নিয়ে আমার ভাবনা হয়নি। কারণ চার-শ' পৃষ্ঠার মধ্যে যদি অতগুলো ভুল থাকতে পারে তা হ'লে দুটো কথার জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই। মুকু, তুই কি কমলকে চিনিস? কমল বলে, বইটা প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন্ এক অধ্যাপকের কাছ থেকে নেওয়া। হয়তো তুইও তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলি। কমল আমায় মিথ্যা বলবে না। তুই জবাব দিস। নইলে শান্তি পাব না। তোরও অশান্তি হবে। লুকোচুরিতে কেবল দুঃখই বাড়বে। আমার ভালবাসা জানিস।

ইতি

দিদি।'

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মুকুর দিকে চাইলাম। টেবিলের ওপরে মাথা নীচু করে ও দাঁড়িয়েছিল। আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেললাম।

তিনটার সময় সিমেনসের সংগে দেখা করলাম। হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় লুফে নিলেন। পকেট থেকে এক গোছা কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, "রিপোর্ট।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বাস্থ্য কেমন আছে?"

"খুব ভাল।"

তাঁর বাড়িতে এলাম। বসবার ঘর। চারদিকে কেবল গান্ধি আর নেহেরুর ছবি। মাঝখানে চার্চিলের একটা বড় ছবি। যুদ্ধের সময়কার দু' আঙুলের 'ভি' মার্কা ছবি। 'ভি' মানে ভিক্টরি, জয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তিনি জিতেছেন।

সিমেনস তৃতীয় যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। মহাযুদ্ধ নয়। শেষ যুদ্ধ। চারদিকের জানলা দরজা বন্ধ করলেন। আমরা ট্যুরিষ্ট নই, কম্যুনিষ্ট। জানলা দরজা বন্ধ করলে রায়পেতার সংগে দিল্লির কোন প্রভেদ থাকে না। সেকেন্দ্রাবাদের গর্ত আর দিল্লির গর্ত একরকম হয়ে যায়। আমরা প্রাচীন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ স্থান দেখি না। কারণ আমরা নতুন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ স্থান তৈরি করছি। সিমেনস জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলে? দক্ষিণ ভারতে আমাদের রাষ্ট্রের সীমানা কত দূর বলে তোমার মনে হয় চৌধুরী?"

"কুমারিকা অন্তরীপ থেকে হায়দরাবাদের উত্তর সীমা। আরংগাবাদের শির থেকে গোদাবরী নদীর সংগে নীচের দিকে নেমে আসা যায়। উত্তর সীমার এই তো মোটামুটি ধারণা আমার। তেলেগু অংশের জোর সব চেয়ে বেশি।"

"দক্ষিণ ভারতের ধার্মিক লোকদের সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?"

"ওরা গোঁড়া বলেই আমাদের আদর্শ প্রচারের খুব সুবিধা। দু'শ্রেণীর লোক। শিক্ষিত ধার্মিক আর অশিক্ষিত ধার্মিক। শিক্ষিত ধার্মিকরা মার্কসবাদ পড়ে। মার্কসবাদের মধ্যে ওরা চাকরির গন্ধ পায়। মার্কসবাদ দক্ষিণ ভারতে এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো। বেকার সমস্যা না থাকলে মার্কসবাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। অশিক্ষিত ধার্মিক হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের কৃষাণ। আকাশ

থেকে যদি দরকারের সময় বৃষ্টি না পড়ে, কিংবা বেশি বৃষ্টি পড়ে তা হ'লে আমাদের সভ্য সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকবে। কংগ্রেস টিউবওয়েল বসাতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

সিমেনস খুসি হয়েছেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে সুরু করলেন। আমি বললাম, "ভারতের উপকূল ফাঁকা। ক'খানা নুনের জাহাজ আর ইংরেজদের দেওয়া গোটাকয়েক ভাঙ্গা রণতরী ভারতের উপকূল পাহারা দিতে পারবে না। তোমরা দু'একখানা ডুবো-জাহাজ যদি পাঠাও দক্ষিণ ভারতে তাহ'লে অস্ত্র আমদানির সমস্যা খানিকটা মিটতে পারে। হিমালয় থেকে ওদিকে অস্ত্র পাঠানো বিপজ্জনক। রাজাকার আর মাড়ওয়ারীদের কাছ থেকে যে-সব অস্ত্র ওরা কিনেছিল তার মধ্যে বেশির ভাগ অস্ত্রই অকেজো হয়ে পড়েছে। আমি সেগুলো নেহেরুর অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য ব্যবহার করব মানে অকেজো অস্ত্রগুলো।"

"কি রকম?"

"তিনি আমাদের অহিংস হ'তে বলেছেন। আমাদের অহিংস মনোভাব প্রমাণ করবার সব চেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে এই সব ভাঙ্গা অস্ত্র। দু'চারটা চালু বন্দুকও ওর মধ্যে মিশিয়ে দিতে বলেছি।"

"খুব ভাল, খুব ভাল।" বলতে বলতে সিমেনস মদের বোতল বার করলেন। পর পর দু'পেগ গলায় ঢেলে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আন্দ্রিয়েভ কি বলে? ওল্গাকে দেখলে?" তিনি পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করে গিলে ফেললেন। মাথা নীচু করে সোফায় বসে রইলেন। পেটের ব্যথার সংগে অন্তরের ব্যথা কোন্ এক মুহূর্তে যেন মিশে গিয়ে তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলল। বেচারা সিমেনস! ওল্গা কাকীমার বরাতে যে কি আছে কে জানে।

মিনিট দশেক পর তিনি মাথা তুললেন। মুখ দেখে মনে হ'ল জগতের সব কিছুর ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে, একমাত্র রাজনীতি ছাড়া।

ভারতবর্ষে আছেন তিনি রাজনীতি করতে। কম্যুনিজম্ তাঁর হাতের অস্ত্র। সিমেনস বললেন, "তু'তিন মাসের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা সব কংগ্রেসের জেল থেকে বেরবে। মস্কো যাওয়ার আগে তোমার তুটি কাজ আছে। প্রথম ইনফিল-ট্রেশনের গতি বাড়ানো। ভারতবর্ষের পেটে আল্সার তৈরি করো। অবিশ্যি আল্সার স্থরু করেছে কংগ্রেস, আমরা কেবল কম্যুনিজমের দাওয়াই দিয়ে ওটাকে বাড়িয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয়, স্বাধীন ভারতের প্রথম ইলেকসন্। আমাদের এবার খুব স্থবিধা হবে না জানি। কিন্তু পার্লামেণ্ট ফাঁকা থাকলে তো চলবে না চৌধুরী ?"

"ফাঁকা ? আমি তো ভাবছি ঐখানেই আমরা বড় ট্রেঞ্চ খুঁড়ব।"

"চৌধুরী, গুটিকয়েক বাক্যবীব ওখানে পাঠাও। বক্তৃতায়ও যেন কংগ্রেস আমাদের সংগে না পারে। এমন লোক নির্বাচনের জন্য দাঁড় করাবে যাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে পার্টি আর কিছু পাবে না কেবল বক্তৃতা ছাড়া। যারা সবটুকু দিয়ে ফতুর হয়ে গেছে তাদের বোঝা পার্টি কখনও বহন করতে পারে না। ঠিক কিনা, চৌধুরী ?"

"ঠিক সিমেনস।"

এবার তিনি নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "দিল্লিতে ক'দিন থাকবে বলে ভাবছ ?"

"সাত দিনের বেশি নয়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং নেপাল আমার দেখা দরকার। সে-সব জায়গায় তু'মাস লাগবে।"

"ভেরি গুড্। ভেরি গুড্। চৌধুরী, তুকুর খবর বোধহয় তুমি সব রাখো না ?"

"সব রাখি না।"

"সে আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টির রত্ন। জেম্।"

"সত্যি ?"

"কোন সংশয় নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকেও মস্কো পাঠাই। শিখিয়ে

নিয়ে আসি। তারপর তোমরা দুটিতে মিলে রাজনীতি করো। আমি সরে দাঁড়াই। কিন্তু কোনদিনও সরে দাঁড়াতে পারব না। কারণ, সুকু মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ বলেই ওর ওপরে চব্বিশ ঘণ্টা চোখ রাখতে হচ্ছে।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তিনি। করমর্দনের পর সিমেনস বললেন, "চৌধুরী, আমি বাংলা শিখছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হঠাৎ বাংলা শিখবার ইচ্ছা হ'ল কেন ?"

"রবীন্দ্রনাথ পড়ব।"

"সুকু তাহ'লে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে ?"

"হাঁ। আমাকেও সে পার্টিতে ভর্তি করতে চায়। এখন কেবল আমার মনের অলিতে গলিতে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাকে বোঝাবার জন্য।"

"কত দূর সে ছুটবে সিমেনস ?"

"খারখভ পর্যন্ত নিশ্চয়ই নয়।"

একটু হেসে সিমেনস দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে কৃষ্ণান ওপরে উঠছিলেন। হাতে তাঁর ভয়েড এণ্ড ভয়েড কোম্পানির নাম লেখা মস্ত বড় ফোলিও ব্যাগ। রাজনীতির ব্যাগ।

সাত দিন পর আমি দিল্লি ছাড়লাম। এই সাত দিনে সুকু আমায় সাত রকমের পার্টিতে নিয়ে গেছে। সুকুর কম্যুনিজম সত্যিই সর্বগ্রাসী। জগৎশেঠের মত অত বড় ধনী লোকও পার্টির কাগজে নাম সই করেছেন। রাজকর্মচারী আর ধনী লোকদের নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলছে। সুকু বোধহয় কোনদিন ফুরবে না, ফতুর হবে না।

চলে এলাম যুক্তপ্রদেশে। সেখান থেকে বিহার। তারপর নেপাল। আড়াই মাস কাটল আমার এই অঞ্চলে। যুক্তপ্রদেশ আর বিহারের মাঠে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন ভেবেছি, আমি প্রতিশোধ নেব। ভীষণ প্রতিশোধ! ঐ যে কাতারে কাতারে নগ্ন ফকিরের নগ্নতম শিষ্যগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ-

বল্লভ পন্থের মুখের দিকে চেয়ে আছে, ওরা কারা? যুক্তপ্রদেশের কৃষাণ গো কৃষাণ। গোবিন্দবল্লভ জমিদারি তুলে দেবেন। তুলে দেবেন নিশ্চয়ই। কৃষাণরা জমির মালিক হবে। কেমন করে হবে? গোবিন্দবল্লভ বলেছেন, "দশ বছরের খাজনা এক সংগে করে নিয়ে এসো। জমা দিয়ে যেয়ো গভর্ণমেন্টের কাছে। ফিরে যাওয়ার সময় জমিটুকু তোমাদের দিয়ে দেব।" তারপর? তারপর জমি পেলে। তারপর আমার কথাটি ফুরল নটে গাছটি মুড়ল। নটে গাছটি কে? কৃষাণ গো কৃষাণ, দশ বছরের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যারা। লোহার সিন্দুকে জমিয়ে রেখেছিল টাকাগুলো! আমার কথা বিশ্বাস করবার দরকার নেই। আমি কম্যুনিষ্ট। কিন্তু আপনারা তো 'ভদ্দরনোক'। এসে একবার বাছাদের দেখে যান। দেখে যান পেটের জ্বালা কেমন করে ওদের প্রতি মুহূর্তে দগ্ধে দগ্ধে মারছে। গোবিন্দবল্লভের জমিদারি উচ্ছেদের কি বিরাট আয়োজন! হিন্দি সাহিত্যের 'প্রেমাশ্রমে' প্রেমচাঁদের জমিদার-হিরো, ভূদান যজ্ঞ সমাপ্ত করে কৃষাণদের গলা জড়িয়ে কাঁদছে! স্বর্গের শয্যায় শুয়ে হিন্দুস্থানী-গোর্কী তার গোঁফ ভিজিয়ে ফেললেন!

নেপাল থেকে ফিরবার পথে রক্সৌলে এসে খবরের কাগজে দেখলাম বাবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। ভাল লোকরা এমনি করে দিল্লি থেকে ক্রমে ক্রমে ফিরে এলে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।

হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা গোয়াবাগানে গিয়ে উঠলাম। ঠাকুরদা আর শয্যা ত্যাগ করতে পারেন না। পায়ে কোন রকমে একটু হাত ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ দাদু?"

ঠাকুরদা বললেন, "এই বয়সে ভাল থাকবার কথা নয়। তুই কেমন আছিস?"

"ভালই আছি।"

"ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলো দেখে এসেছিস তো?"

"সে আর বলতে! মুসলমান আর ইংরেজ আমলে হিন্দুরা বড্ড দমে

গিয়েছিল, এবার আবার শাঁখ আর কাঁসার বাজার গরম! সোমনাথ আবার খাড়া হয়েছে দাদু। দু'এক কোটি টাকা নস্যির মত উবে গেল!"

"অত টাকা খরচ করা বোধহয় উচিত হয়নি দীপু।"

"কেন?"

"সতরো বার লুঠ করেছে বলে সর্দারজি গজনির মাহ্মুদের ওপর এক হাত নিয়ে গেলেন বটে। কিন্তু অষ্টাদশ আক্রমণ ঠেকাবে কে? এবার তো মুসলমানরা সোমনাথের ধারে কাছেও যাবে না।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দাদু। সোমনাথ কি আবার লুঠ হবে?"

"হবে বলেই তো আমার বিশ্বাস দীপু। এবার কেবল লুঠ হবে না, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সোমনাথকে মুছে দেবার ব্যবস্থা হবে।"

"এমন দুঃসাহিক কারা দাদু?"

ঠাকুরদা চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "এতে লুকোবার কিছুই নেই। সবই বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারছি। সর্দারজি গড়লেন বটে। কিন্তু তোরাই তো আবার ভাঙ্গবি।"

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা? কি বলছ দাদু? আমি তো তীর্থ করে এলাম।"

"তোকেও একদিন ওদের সংগে হাত মেলাতে হবে। আজ আমি বুঝতে পারছি, ভবশংকর কেন এমন করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।"

ঠাকুরদা চোখ বন্ধ করে ভাবলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন, "দেখ্ দীপু, আমার খুবই অবাক লাগছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস যেন হিন্দি ফিল্মের মত বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। কেবল বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। অথচ অবিশ্বাস করলে আমাকেই মিথ্যুক হতে হয়।"

অভয় দিয়ে বললাম, "আমি তোমাকে মিথ্যুক ভাবব না। তুমি বলো।"

"তোর বাবা কোনদিন রাজনীতি করবে এ আমি তার বাপ হয়েও কল্পনা করতে পারিনি। ভেবেছিলাম ভবশংকরই রাজনীতির যোগ্য ব্যক্তি। তারপর

জ্ঞানশংকর বিলেতে বারো বছর কাটিয়ে এসে হঠাৎ ব্যবসা খুলে বসল। একটা সামান্য কেরানিগিরিও কিছুদিন শিখতে হয়। অথচ জ্ঞানশংকর একটা সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করেছে! এই যে সামাজিক জীবনের ওলট-পালট, এই থেকে আমরা একটা সহজ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি দীপু।"

"কি সিদ্ধান্ত দাদু?"

"ভেতরে মারাত্মক ঘণ ধরেছে। অতীত ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ফিরে না গেলে আমাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

আমি উঠে পড়লাম। দরজার কাছে যেতেই দাদু আমায় ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্বনাথ দর্শন করিসনি?"

"করেছি।"

"তা হ'লে আমার জন্য একটু প্রসাদ নিয়ে আয় তো।"

মনে হ'ল ঠাকুরদা যেন প্রসাদের জন্য হাত বাড়ালেন। আমি বললাম, "কুইনস পার্কে ঠোঙ্গাটা রেখে এসেছি। সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসব।"

"আমি কিন্তু হাত বাড়িয়ে রইলাম দীপু।"

আমি দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার আবার কাজ বাড়ল। সন্ধ্যার আগে কিছু সন্দেশ কিনে তাতে দু'চারটে ফুল বেলপাতা দিতে হবে। নইলে ঠাকুরদা হয়তো সমস্ত রাত হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকবেন।

গোয়াবাগান থেকে গেলাম মার কাছে। আমি জানতাম মাকে হয়তো পাওয়া যাবে না। বেলা মাত্র দশটা। তিনি নিশ্চয়ই তিনতলার ছাদে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। তা সত্ত্বেও আমি কুইনস পার্কেই এসে পড়লাম।

গোরাচাঁদ নীচেই ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "মা কই রে?"

"পূজোর ঘরে।" এই বলে সে ঝাড়ন দিয়ে আসবাবের ময়লা সাফ করতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম।

ঠাকুরঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা আমার সাড়া পেলেন না।

দেখলাম জগদ্ধাত্রীর সামনে ভীমনাগের সন্দেশ নেই। চারখানা বাতাসা রয়েছে। তিনি তাঁর হাত দু'খানা প্রার্থনার ভংগিতে তুলে ধরেছেন জগদ্ধাত্রীর সামনে। মায়ের হাত থেকে মন্ত্র লেখা কাগজখানা উধাও হয়েছে। নুকু একদিন বলেছিল, "জ্যেঠাইমা, ঘরের সব জানলাই খোলা আছে কিন্তু জগদ্ধাত্রীর পেছনের জানলাটা বন্ধ। ওটা খুলে দাও। আলো আসুক।" সেই থেকে জানলাটা সম্ভবত মা খুলেই রেখেছেন। আমার বিশ্বাস, পেছন দিকের জানলা খোলার ব্যাপারটা মা বুঝতে পারেন নি। হয়তো ভক্তিবাদের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা নেই; সবটাই চোখ বুজে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু নুকুই বা পেছনের জানলাটা খুলতে বলল কেন? সে কি মনে করেছিল যে, মার পুজো কেবল জগদ্ধাত্রী-পুতুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

একটু বাদে মা পেছন ফিরে চাইলেন। কোন রকম চিত্ত-চাঞ্চল্য নেই। উল্লেখযোগ্য আগ্রহ নেই আমার কুশল সংবাদ জানবার। আমিই প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, তোমার মন্ত্র লেখা কাগজখানা কোথায়?"

"কাগজ? আমার কাছে কাগজ কোথায়?"

"যে-কাগজে কালিঘাটের পণ্ডিত ব্যাকরণ ও বানান ভুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন?"

আসন ছেড়ে মা এবার উঠলেন। ঘরের দরজাটা মনে হ'ল ইচ্ছা করেই তিনি আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "মন্ত্র আমার মুখস্থ। মনের ভুল না থাকলেই হ'ল দীপু। ব্যাকরণ আর বানান ভুলের জন্য জগদ্ধাত্রী আমাদের ক্ষমা করবেন।" আগেকার দিনের মত তিনি রেগে উঠলেন না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মা বললেন, "দু'চার দিনের মধ্যেই তোর বাবা কলকাতায় ফিরে আসবেন। হয়তো আবার হাইকোর্টে গিয়ে তাঁকে বসতে হবে।"

"কেন? রাজনীতি ছাড়বেন কেন?"

"আমি তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দিতেই বলব। কিন্তু ভয় হচ্ছে, রাজনীতি তোর বাবাকে ছাড়বে না। এ বড় সর্বনেশে কাজ দীপু।"

"রাজনীতি ছাড়া আজকের দিনের সভ্য মানুষেরা বাঁচতেই পারে না।"

"রাজনীতি সত্ত্বেও তোদের সভ্য মানুষরা বাঁচবে না দীপু।"

"বুঝতে পারলাম না মা। যদি সময় থাকে তবে বুঝিয়ে দাও।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা দু'তলার বারান্দায় এলাম। রেলিংএর উপর ভর দিয়ে মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম আমি। মার হাতে একটা রেকাবী। তাতে চারখানা বাতাসা আর দুটো জবা ফুল রয়েছে। মা বললেন, "রাজনীতির মধ্যে দু'চারটা ফুল বেলপাতা থাকলে সভ্য মানুষরা হয়তো বা বেঁচে উঠতে পারত। অনীতা বলে, রাজনীতির মধ্যে যদি রাজ এবং নীতি দুটো শব্দই থাকত তা হ'লে পৃথিবীর বুকে এত অশান্তির ঝড় বইত না।"

"অনীতার বিয়ে দিচ্ছ কবে?"

"ভগবান যেদিন বিয়ে দেবেন সেইদিন।"

"বাবার হাতে পয়সাকড়ি থাকতেই ওকে বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে—।" বাধা দিয়ে মা বললেন, "নইলে তোর কাছে কোনদিন হাত পাতব না জেনে রাখিস।"

"ভাগ্য নিয়ে বড়াই করতে যেয়ো না।" এই পর্যন্ত বলেই গলার সুর বদলে দিলাম। ফস করে রেকাবির ওপর থেকে জবা ফুল দুটো তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে দিলাম। মা আমায় আশীর্বাদ করলেন। তারপর ফুল দুটো পকেটে রেখে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

কুইনস্ পার্ক থেকে সোজা এলাম মামার নেবুবাগানের বাড়িতে। ঢুকতে গিয়েই প্রথমে বাধা পেলাম। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চাই? একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ছেন যে?"

"বলেন কি মশাই? একমাত্র ভাগ্নে আমি। মামা মরে গেলে বিষয়-সম্পত্তি সবই আমার হবে।"

"দেখুন, আপনি ঐ পাশের দরজা দিয়ে যান। নতুন একটা দরজা তৈরি করেছেন বিশুবাবু। আমরা এই অর্ধেকটা ভাড়া নিয়েছি।"

আমি গলির সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। এ-পাশটায় সত্যিই একটা নতুন দরজা হয়েছে। মামার বাড়ির এখন দুটো ফটক। বুঝলাম টাকার অভাব হয়েছে। অভাব বাড়লে হয়তো তিনটে ফটক হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের বেরবার জন্য আলাদা রাস্তা থাকলে হয়। উনি নাকি আমাদের মাথামুণ্ডন করবার জন্য নেবুবাগানে বসে খুরে শান্ দিচ্ছেন!

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। বিশুমামা তাঁর নিজের ঘরে আছেন দেখলাম। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে কি যেন লিখছেন। ঘরে ঢুকেই তাঁর পায়ের পাতায় হাত ঠেকিয়ে ধুলো নিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে তিনি হা-হুতাশ করে উঠবেন। প্রথম হুতাশ বিশ লক্ষ টাকার জন্য। দ্বিতীয় হুতাশ মামীমার জন্য। কিন্তু উপস্থিত তিনি মাথা তুললেন না। বললেন, "বস্ দীপু। লাইনটা শেষ করে নি।"

"তুমি উপুড় হয়েছ কেন মামু? বুকে তোমার নিমোনিয়া হয়েছিল না?"

"হয়েছিল, এখন নেই।"

"বুকের তলায় বালিস দিয়ে লিখছ কি?"

"কপি রেডি করছি। কাগজে এ-সব ছাপা হবে।"

"কোন্ কাগজে?"

"সাপ্তাহিক আস্তাবল।"

"বলো কি? রোটারি কই?"

"লাগবে না। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে কমলকে পাওয়া যায়নি আমি তা জানি। আমি তাই আলামোহন দাসের কারখানা থেকে একটা ট্রিড্‌ল মেসিন কিনব ঠিক করেছি। পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে চালাব। তবুও প্রতিমাসে শ'খানেক করে চার পৃষ্ঠার একটা কাগজ আমি বার করতে পারবই। দীপু, তুই কি এখনো আমার সংগে আছিস?"

"তোমার সংগে আমি সব সময়ই আছি। কিন্তু কমল যে পালিয়ে গেল।"

"যাক, টাকা তো হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই। কিন্তু আদর্শ ধরে রাখতে হবেই।"

"আদর্শও যদি কোন দিন পালিয়ে যায় মামু?" প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে মামা বললেন, "দীপু, তোর মামীমা হঠাৎ মরে গেলেন!"

"তোমার খুবই আঘাত লেগেছে জানি। শুনলাম, মরবার আগে তোমায় মামীমা কিছুই বলে যেতে পারেন নি।"

"সমস্ত জীবন ভরে কিছুই বল্লেন না, মরবার আগে হঠাৎ তার কথা বলবার ইচ্ছা হবে কেন? দুঃখ আমার সেই জন্য নয়।"

"তবে?"

"মরবার সময় তিনি কথা বলে গেছেন।"

"কি কথা মামা? আপত্তি না থাকলে বলবে কি?"

"তোর কাছে আমি তো কোন কথাই গোপন করতে পারি না।"

"তবে বল।"

মামা কোঁচার আগা দিয়ে ঘাড়ের চারপাশের ঘাম মুছলেন। তারপর বললেন, "তোর মামীমা সংজ্ঞা হারিয়ে আবার এক মিনিটের জন্য সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। কথা ক'টা বলবার জন্যই যে তিনি এক মিনিটের জন্য সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলেন, এ-সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নেই।"

"সন্দেহ তোমার গেল কি করে?"

"তাঁর কথা শুনে। তিনি চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'নেবু-বাগানের বাড়িটা যেন হরিপ্রসাদ পায়।' ভগবানের কি অসীম করুণা! আমি নিশ্চিন্ত হলাম দীপু।"

"হরিপ্রসাদকে বাড়িটা দিয়ে দিলে বুঝি?"

"না।"

"তবে নিশ্চিন্ত হ'লে কেন?"

"তিনি চোখ বুজলেন।"

"মামু, তুমি বড্ড হৃদয়বিদারক কথাবার্তা বল।"

"কেন?"

"মামীমার মৃত্যুতে ভগবানের করুণা কোথায় পেলে?"

"ভগবানের করুণা, আমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হয় নি। মৃত্যুশয্যায় তাকে প্রতিশ্রুতি দিলে বাড়িটা হরিপ্রসাদকে দিয়ে দিতেই হ'ত। অতএব বাড়ি' নামটাও বদলে দিয়েছি।"

চোখ বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মামীমার নামে বাড়িটার নাম ছিল 'মনোরমা সদন'। এখন কি রাখলে?"

"ডিউক কোর্ট।"

আমি খুব অবাক হয়েই মামাকে দেখছিলাম। দু'দশ হাজার টাকা লোকসান হ'লে মানুষের সাত রাত্রি ঘুম হয় না। আর বিশুমামা কোটি টাকা হারিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কপি লিখছেন!

মামা বললেন, "দীপু, গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার যে উদ্বৃত্ত তিন লাখ টাকা ছিল তাও আমি পাব না।"

আমি যেন হাহাকার করে উঠলাম, "কেন? কেন?"

"ওরা আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল দেখা করবার জন্য। সাপ্লাই বিভাগের কোন্ এক পুরনো ফাইল থেকে ওরা খবর পেয়েছে যুদ্ধের সময় আমি এক লক্ষ টাকার মশারি সাপ্লাই করেছিলাম। বর্মার জংগলে আমাদের সৈন্যরা মশারি টাঙিয়ে ঘুমত। আমি দেখা করতে যাইনি।"

"কেন মামা? এক লক্ষ টাকায় আর কত টাকাই বা ইনকাম্-ট্যাক্স দিতে হ'ত!"

"বিশেষ কিছুই না। তবু আমি লিখে পাঠালাম, স্ব-ইচ্ছায় বাকি তিন লক্ষ টাকাই আমি ট্যাক্স দিলাম। এক পয়সা ফিরে চাই না। দেখা করবার সময় নেই। হাতে আমার অনেক কাজ। কি কাজ বুঝলি দীপু?"

"এ-রকম পাগলামি না করলেও পারতে।"

"করতাম না, কমল যদি পালিয়ে না যেত। বিশ লাখ যাওয়ার পর আমি বুঝলাম ভারত সরকারের টাকা সব মেকি।"

"আজ তা হ'লে আসি মামু।"

দরজার সামনে পর্যন্ত এগিয়ে এলেন মামা। বললেন, "আমি আজ রিয়েল সর্বহারা। আমার এই 'ডিউক কোর্ট' থেকে যে-কাগজ বেরবে তার টাইপ কম্পোজ করব আমি নিজে হাতে। আলামোহন দাসের স্বদেশী মেসিন যদি কোন রকমে খানিকটা ঘুরপাক খায় তা হ'লেই আমার কাগজ বেরবে জেনে রাখিস।"

"মামা, তুমি আমায় ধমকালে?"

"না। ক্ষমা করলাম।"

"আমার অপরাধ?"

"মেকি টাকা নিয়ে তুই তোর ছোটকাকার সংগে ব্যবসা করছিস।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলাম। এক রকম ছিটকে পড়লাম রাস্তায়। কোটিপতি মামার সংগে কথা কইতে কোনদিনও ভয় পাইনি। কিন্তু সর্বহারা মামার দীর্ঘ নিশ্বাসে গায়ে যেন আমার ফোস্কা পড়ল। পালিয়ে এলাম।

রাস্তা থেকে কিছু সন্দেশ কিনে নিলাম। বাড়ি গিয়ে জবা ফুল দুটো শালপাতার ঠোঙার মধ্যে ভরে রাখলেই সন্দেশটা বিশ্বনাথের প্রসাদ হ'তে এক মুহূর্তও লাগবে না। বাবা-বিশ্বনাথ যখন ঠাকুরদার বহুমূত্র রোগ ভাল করতে পারলেন না তখন এক চিমটি সন্দেশ তুলে ঠাকুরদার জিভের আগায় স্পর্শ করালেই চলবে। অতটুকু স্বাদ থেকে বৌবাজারের মেকি প্রসাদ তিনি নিশ্চয়ই ধরতে পারবেন না।

গোয়াবাগানে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে জবা ফুল দুটো বার করলাম। বাঁ হাতে আমার সন্দেশের ঠোঙা। ঠিক সেই

মুহূর্তে কৃষ্ণান এলেন। আমি ফুল দুটো খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাকের কাছে তুলে ধরলাম। কৃষ্ণান জানেন না যে, জবা ফুলের গন্ধ নেই। আমি বললাম, "চল, আমার ঘরে বসবে। আমি চট্ করে দাদুর জলখাবারটা দিয়ে আসি।"

ঠাকুরদা চোখে দেখতে পান না ভাল করে। তাই ঠোঙাটায় ইচ্ছা করেই মচ্‌মচ্ শব্দ করতে লাগলাম। ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপু, এসেছিস?"

"হাঁ, দাদু।"

"বাবা-বিশ্বনাথের প্রসাদ কই?"

"এই যে—।" ঠোঙাটা শব্দ করে খুলতে লাগলাম যেন বাবা-বিশ্বনাথ নিজেই আজ সশব্দে বৌবাজারের ঠোঙা থেকে আবির্ভূত হবেন! ঠাকুরদা বললেন, "ওখানে পরিষ্কার জল আছে। জলটা নিয়ে আয়, হাত ধোব।"

"না, না। হাত ধোয়ার কোন দরকার নেই দাদু। তুমি এবার হাঁ করো, তোমার জিভের ওপর ফেলে দিই। প্রসাদ কণিকা মাত্র।" ঠাকুরদা লম্বা করে জিভটা বার করে দিলেন। হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল খাওয়ার অভ্যাস আছে ঠাকুরদার।

আমি সত্য সত্যই সন্দেশের কণিকামাত্র জিভে ফেললাম। বেশি দিলে বাবা-বিশ্বনাথের আসল পরিচয় ধরা পড়ত। তা ছাড়া তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছেন। মিষ্টি জিনিস তাঁর খাওয়া নিষেধ। কিন্তু কণিকা থেকেও ঠাকুরদার সন্দেহ হ'ল। অত বড় ব্যবহারজীবীর কাছে কণিকার ফাঁকিও মস্ত ফাঁকি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপু, কাঁচা ছানার গন্ধ কেন রে?"

আমি বললাম, "তুমি তো বহু দিন হ'ল কাশীতে যাও না। সেখানেও সব নতুন বিধি-ব্যবস্থা হয়েছে।"

"কি রকম?"

"ছানা সব টাটকা না হ'লে গভর্ণমেণ্ট থেকে সন্দেশ তৈরি করতে দেয় না। বিশ্বনাথের সন্দেশের উপর কড়া নজর! বহু লোকে খায় বলে রোগের বিস্তার

খুব স্বাভাবিক। তার উপর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর নিজেও রোগে ভুগছেন বার মাস।"

ঠাকুরদা যখন কপালে হাত ঠেকিয়ে অনুপস্থিত বিশ্বনাথকে প্রণাম করছিলেন সেই সময় আমি ঘর থেকে পালিয়ে এলাম।

কৃষ্ণান অপেক্ষা করছিলেন। আমি বললাম, "সুরু করুন।"

কৃষ্ণান ফোলিও ব্যাগ থেকে কাগজ বার করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নির্বাচন সম্বন্ধে আপনার আদেশ কি? কালকে সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং আছে।" আমি বললাম, "এমন লোকদের নির্বাচনে দাঁড় করাতে হবে যে, তাদের কাছ থেকে পার্টি ভবিষ্যতে কোন কিছু আর পাবে না। সংগঠন শক্তি যাদের নিঃশেষ হয়েছে তেমন লোকই কেবল পার্লামেণ্টে কিংবা প্রাদেশিক শাসন পরিষদে যাবেন। সেণ্ট্রাল কমিটি কি কোন লিষ্ট তৈরি করেছে?"

কৃষ্ণান আমার হাতে একটা লিষ্ট দিলেন। আমি বললাম, "এটা আমার কাছে থাক। রাত্তিরে আমার মতামত দেব।" আমি আরামকেদারায় শুয়ে পড়লাম। কৃষ্ণান জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'চারজন সত্যিকারের কর্মীকে শাসন পরিষদে পাঠালে ভাল হ'ত না?"

"লাভ? শাসন পরিষদে তাঁরা কি কাজ করবেন? তা ছাড়া পার্ল্যামেণ্টে আমরা সংখ্যালঘু দল হব। কাজ করা সম্ভব হবে না। বিপ্লব আসবে মাঠে আর কারখানায়, পার্লামেণ্টে নয়।" মাদ্রাজী কায়দায় তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি তাঁকে আবার বললাম, "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য দল সৃষ্টি করুন। নির্বাচনের সময় এইটাই হবে আমাদের পার্টি লাইন।"

কৃষ্ণান তাঁর কাগজপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরলেন। কাগজের দু'এক টুকরো যদি পড়ে গিয়ে থাকে সেই ভয়ে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চৌকির নীচ পর্যন্ত খুঁজে দেখে এলেন। চৌকিটাতে মাঝে মাঝে চাকরবাকররা ঘুময়। সেইজন্য চৌকির উচ্চতা খুব কম। সস্তায় কেনা। কৃষ্ণান হামাগুড়ি দেওয়া

সত্ত্বেও একেবারে তলায় যেতে পারছিলেন না। আমি দেখলাম তিনি লম্ব ভাবে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। তারপর দেহটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে একদম পুরোটাই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি শব্দ পেলাম, উপুড় হয়ে তিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন। চৌকির তলায় একটু অন্ধকার থাকা সম্ভব। তারপর তিনি পেছন দিকে দেহটাকে আবার ঠেলতে ঠেলতে বা করে নিয়ে এলেন। মাদ্রাজ থেকে তাঁর কোটপ্যাণ্ট বদলায়নি। এমন শক্ত কাপড় ভূভারতের কোথায় যে পাওয়া যায় আমি জানি না। প্রতিদিন একই কোট প্যাণ্ট পরছেন বলে ধোয়ার সুযোগ হয়নি। সর্বভারতীয় ধূলোতে তাঁর জামা কাপড় মলিন। চৌকির তলা থেকে যে ধূলো তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন সেটাও উপস্থিত তিনি ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন না। তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হ'ল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কাগজপত্র কিছু পড়ে রইল না তো?"

"না। সব জায়গাই তো দেখলাম, কেবল সিমেণ্ট খোঁড়া বাকি রইল।"

"থাক। দরকার হ'লে আমিই খুঁড়ে দেখব।"

কৃষ্ণান ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, "পাঁচটায় সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং। এখন সাড়ে চারটা। আমি যাই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাত খেয়েছেন?"

"ভাত? সে তো সাতদিন আগে খেয়েছি!"

"আমার এখানে খেয়ে যান মিঃ কৃষ্ণান।"

"সময় কই? আমার পকেটে চকলেট আছে।" এই বলে কৃষ্ণান পকেট থেকে সত্যি সত্যিই চকলেট বার করলেন। তারপর চকলেট চাটতে চাটতে গোয়াবাগান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমারও ক্ষিধে যেন মরে গেছে বলে অনুভব করলাম। সাড়ে চারটার সময় ভাত খাওয়ার ইচ্ছা আর রইল না। আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগলাম। গত ছ'মাসের মধ্যে দু'মিনিট সত্যিকারের বিশ্রাম

পাইনি। যখনই ভেবেছি একটু বিশ্রাম করব তখনই কৃষ্ণান এসে উপস্থিত হয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হ'ত কৃষ্ণান আমাকে বিশ্রাম দেবেন না বলেই আসতেন।

সন্ধ্যার একটু পর আমার ঘুম ভাঙল। চেয়ে দেখি একটা টি টেবিল রয়েছে আমার সামনে। অনীতা তাতে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। অনীতা বলল, "দাদা, এ-রকম অনিয়ম করলে তো স্বাস্থ্য টিকবে না। মুখ ধুয়ে এস। খাবে।"

ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে বলে মনে হ'ল। হয়তো অনীতাকে দেখেই আমার ক্ষিধের জ্বালা বেশি বলে বোধ হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার ক্ষিধে লেগেছে তোকে কে বলল ?"

"কেউ বলে নি।"

"তবে খাবার নিয়ে এলি কেন ?"

"তোমার মুখ দেখে বুঝলাম তোমার ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি রাগ করছ কেন দাদা ?"

"রাগ করছি না। কিন্তু আমি এখন খাবও না।"

"একটু কিছু মুখে না দিলে তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।"

"কই নুকুর জন্য তো তোর এত ভাবনা নেই ? হাজার দিন তো নুকু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুই তো কখনও ওকে ঘুম থেকে তুলে খেতে ডাকিসনি অনীতা ?"

"আমি জানতাম না দাদা। জানলে নুকুকে আমি নিশ্চয়ই ডাকতাম।"

"কেন, তোদের ভগবান উপবাসী নুকুর কথা বুঝি তোকে আগে থেকে জানান না ? অনেকে তো শুনেছি, চোখ বুজলেই, দু-শ' বছর পরে কি হবে তাও বলতে পারেন।"

খাবারের ডিসটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে অনীতা বলল, "মা বলেন, বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহু দূর। আর কিছুক্ষণ তর্ক করলে লুচি ক'খানা

ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মুকু হ'লে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বার দশেক চুমু খেত আর লুচি ক'খানাও খেত।"

দু'দিন পরে বাবা ফিরে এলেন কলকাতায়। মুকু এলো না, পরে আসবে হাওড়া স্টেশনে পৌছেই তিনি সেখান থেকে আমায় টেলিফোন করলেন। বললেন, "দীপু, এক্ষুনি একবার কুইনস পার্কে আয়।"

"কেন বাবা?"

"পরামর্শ আছে। সমস্ত রাত আমার ঘুম আসেনি। নতুন দলের কি যে নাম দেব ভেবে পাচ্ছি না।"

"নাম ঠিক করতে যদি দু'দিন লাগে তবে রাজনীতি করবে কখন বাবা?"

"নামটা একবার ঠিক হয়ে গেলে, তারপর তুই দেখে নিস।"

"আমাকে দেখিয়ে কি হবে? সারা দেশকে দেখিয়ে দাও। আমার একটা ভোট তুমি পাবেই।"

তক্ষুনি অবিশ্যি আমি কুইনস পার্কে যাইনি; সকাল বেলায়ই কৃষ্ণান এলেন তিনি বললেন, "আগামী নির্বাচনের জন্য যে-সব লোকের নাম আপনি দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই জেলে।"

"তারা সব বেরিয়ে আসবে।"

"কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর ইচ্ছা নয় যে তারা বেরিয়ে আসে।"

"আমরা ভারত সরকারের মন ঠিক করে জেনেছি। অতএব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর মতামতের আর কোন মূল্য নেই। আপনি ওদের বলে দেবেন যে পার্টি মেসিন যেন চলতে সুরু করে কুমারিকা থেকে কালিম্পং পর্যন্ত। সব জায়গায় আমরা নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করাতে পারব না এবার।—সময় অত্যন্ত অল্প। যে-সব জায়গায় পারব না সেখানে অন্য কোন দলকে আমরা সাপোর্ট করব।" কৃষ্ণান চলে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "লক্ষ্মী কেমন আছে?"

"লক্ষ্মী ভালই আছে। আর আছে তো কলকাতায়।"

"কলকাতায়?"

"হাঁ। আজ দু'দিন হ'ল এসেছে। আপনার দরকার?"

"না, না। তেমন কিছু দরকার নেই। তবে দেখা হ'লে ভালই হ'ত।"

"তা হ'লে রাত্রিতে পাঠিয়ে দেব কি? এখানে দেখা হ'লেই ভাল হবে। আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী। আমি কাল সকালে দিল্লি যাচ্ছি। পরশু দিনই ফিরব।"

বেলা দশটার সময় আমি কুইনস পার্কে এলাম। বাবার অফিস ঘরে অনেক লোক এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। মনে হ'ল তিনি হাওড়া স্টেশনে নেমেই কলকাতার চারদিকে অনেকের কাছেই টেলিফোন করেছেন। বাবার কলকাতা আসবার খবর এবার কোন কাগজেই ছাপা হয় নি। দরজায় একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম কাজাপতি, মিঃ চৌধুরীর সেক্রেটারি। আমি মহারাষ্ট্র থেকে এসেছি। আপনি?"

"আমি দীপক চৌধুরী, এসেছি গোয়াবাগান থেকে। মিঃ চৌধুরী আমার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর।" অফিসের ভেতরে গিয়ে বাবাকে বললাম, "বাবা তোমার দল তো সর্বভারতীয় বলে মনে হচ্ছে।"

"কি করে বুঝলি?"

"তোমার সেক্রেটারিকে দেখে। কিন্তু একজন সেক্রেটারিতে তো হবে না। আরও অন্তত দু'জন চাই। একজন বাঙালী ও একজন মাদ্রাজী।"

টেবিলের চারপাশে আটজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। এঁরা সব আগামী নির্বাচনে বাবার দল থেকে ভোটপ্রার্থী হবেন। চেহারা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে, দু'দশটার বেশি ভোট এঁরা পাবেন না। এমন লোক ভারতবর্ষে বহু আছেন যে যাঁরা চোখ বুজে ভোটের বাক্সে কাগজখানা ফেলে আসবেন। যে-বাক্সটা প্রথমে হাতে ঠেকবে সেই বাক্সটাই ভোট পাবে। মানুষ দেখে ভোট দিতে এলে এঁরা আত্মহত্যা করতেন লজ্জায় ও ঘৃণায়।

আরো দু'জন সেক্রেটারি নিয়োগের কথা শুনে আট ব্যক্তি এক সঙ্গে বলে উঠলেন, "খুব ভাল প্রস্তাব।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "নাম ঠিক হ'ল ?"

বাবা বললেন, "কৃষাণ-শ্রমিক-হরিজন সংঘ। নামটা বড় বটে, কিন্তু এদের হাতেই ভোট সংখ্যা বেশি।"

আমি বললাম, "বেশি তা ঠিক। কিন্তু তোমার অফিস-ঘরে কোন কৃষাণ শ্রমিক কিংবা হরিজন নেই। সবাই বামুন বলে মনে হচ্ছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম দিয়ে পার্টি তো চলবে না বাবা।"

বাবা বললেন, "এঁরা সব কৃষাণ, শ্রমিক আর হরিজনদের কাছে যাবেন।"

একজন ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। তিনি বললেন, "আমায় শহরের মধ্যেই রাখবেন।"

"কেন ?"

"কৃষাণদের আমি এই বয়স পর্যন্ত দেখিনি। ওরা কি রকম দেখতে তাও জানি না। আচ্ছা, আমি এখন চলি গৌরিবাবু। সন্ধ্যার দিকে আসব। আপনার গাড়িটা তো দেখলাম বাইরে পড়ে আছে। ড্রাইভার ব্যাটার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘাড়ে-গর্দানে চবি জমেছে। শেয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছে দিলে কোলেদের বাজার থেকে কিছু মাছ নিয়ে যেতাম। দশটার পর মাছের দর একটু সস্তা হয়।"

বাবা বললেন, "বেশ তো। গাড়ি নিয়ে আপনি যান।"

তিনি চলে যাওয়ার পর বাবাকে বললাম, "কেবল প্রস্তাব পাস করলেই চলবে না। টাকার বন্দোবস্ত আগে করতে হবে।"

বাকি সাতজন দম-দেওয়া স্প্রিং-এর মত এক সংগে লাফিয়ে উঠলেন। বাবা বললেন, "বসুন, বসুন আপনারা। টাকা আমিই দেব। টাকা আসবে ভগবানের কাছ থেকে। কারণ আমরা কেবল কংগ্রেসের সংগেই লড়ব না; কম্যুনিষ্টদের দাঁতের গোড়াও আলগা করে দেব।"

কিন্তু ওঁরা যখন একবার উঠেই পড়লেন তখন আর তাঁদের বসানো গেল না। বাবা সবাইকে সন্ধ্যার সময় আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। বাবাকে আমি বললাম, "আমি তোমায় একজন ভাল বিশ্বাসী ক্যাসিয়ার দিচ্ছি। ধরো, প্রথমে দু'লাখ টাকা দিয়ে একটা আলাদা একাউন্ট খুললে। নিজের হাতে কিছুই রাখবে না। সব সময়ই এমন ভাব দেখাবে যে, তোমার টাকার বড্ড টানাটানি। নইলে ভোটের দিন আসবার আগেই টাকার চোট সামলাতে পারবে না। সবাই লুটেপুটে খাবে।"

"প্ল্যানটা মন্দ নয় দীপু।"

"এবার যা বলব সেটা আরও ভাল বাবা।"

বাবা আমার দিকে চোখ তুললেন। আমি বললাম, "ক্যাসিয়ারের নামটা কখনও কাউকে বলবে না। বললেও সত্যি নাম বলবে না। যখনই দেখবে টাকার চাহিদা বাড়ছে অমনি বলবে ক্যাসিয়ার তো নেই এখন। পরে দেব। ভোটের দিন যখন এগিয়ে আসবে তখন হঠাৎ বলে বসবে, ক্যাসিয়ারের ডবল নিমোনিয়া হয়েছে। চেক সই করতে পারছে না।"

"তবে কাজ চলবে কি করে?"

"চলবে। দু-শ' টাকা চাইলে কুড়ি টাকা বার করবে। কুড়ি টাকা হাতে দিয়ে বলবে চালিয়ে নিন মশাই, চালিয়ে নিন। ডবল নিমোনিয়া ভাল হয়ে গেলে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত বুঝিয়ে দেব। ভোটের দিনটা পার হয়ে গেলে বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু দীপু, প্রতিশ্রুতি দিলে তো তা রাখতে হবে?"

"রাখবে যদি তোমার টাকা থাকে। না থাকলে তুমি আর কি করবে? তাছাড়া নির্বাচনের সময় কেউ তো কথা কয় না, কেবল প্রতিশ্রুতি দেয়। কংগ্রেসও তাই দেবে। এবং পরে তারা যদি একটা প্রতিশ্রুতিও রাখে তবে আমার কান ম'লে দিও বাবা।"

বাবা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "আমাদের বংশে কেউ রাজনীতি করেনি। অথচ তুই আর মুকু কি করে 'রাজনীতির আখ চিবিয়ে খাচ্ছিস রে? ঐ মারাঠা সেক্রেটারিকে মুকুই আমায় দিয়েছে।"

"আমিও তোমার জন্য ক্যাসিয়ার ঠিক করে ফেলেছি। কোটি টাকার বস্তা সামনে ফেলে রাখো, হাত দিয়ে ছোঁবে না। বসে বসে কেবল বস্তা পাহারা দেবে। এক্ষুনি এসে পড়বে সে।" বলতে বলতে সেক্রেটারি এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "মাধববাবু এসেছেন।" উৎসাহের আতিশয্য দেখিয়ে বললাম, "ডেকে নিয়ে আসুন। বাবা, সে এসে গেছে।" সেক্রেটারিকে আর ডাকতে হ'ল না। মাধববাবু তাঁর পেছনে পেছনে এসে বাবার অফিস ঘরে ঢুকল।

বাবা মাধববাবুকে ভাল করে দেখলেন। বেশিক্ষণ দেখবার সুযোগ দিলাম না আমরা। বাবাকে বললাম, "তুমি এবার উঠে পড়ো। কোন্ ব্যাঙ্কে রাখবে? চেক বইটা কোথায়?" জবাব দেওয়ারও সময় দিলাম না। বাবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, "এই তো চেক বই! মাধবকে নিয়ে চলো এক্ষুনি। কংগ্রেস এরই মধ্যে প্রচার কায সুরু করেছে। কোন্ ব্যাঙ্কে রাখবে বাবা?"

বাবা বললেন, "ইম্পিরিয়াল ছাড়া আমি অন্য কোন ব্যাঙ্কে রাখব না।"

আমি বললাম, "খুব ভাল। চলো। হেড অফিসে যাই। স্ট্রাণ্ড রোড তো? কুইনস পার্ক থেকে স্ট্রাণ্ড রোড অনেকটা দূর। তা হোক। দু'দশ হাজার টাকা সব সময়ই ট্যাঁকে রাখতে হবে। দেরি করছ কেন বাবা?"

"তোর মার সংগে একটু দেখা করে যাই।"

"সর্বনাশ! তাঁর পূজোর ঘরে গেলে এখন মহাপ্রলয় হয়ে যাবে! তাছাড়া এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয়। কংগ্রেস অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চলো।" বাবার হাতে মৃদু একটু টান দিলাম। বাবা উঠে পড়লেন। তারপর

বাকিটুকু অত্যন্ত সোজা হয়ে গেল। গাড়ি চালিয়ে আমরা স্ট্রাণ্ড রোডে এসে গেলাম। তু'লক্ষ টাকা মাধববাবুর নামে রাখা হ'ল। চেক বইটা আপাতত বাবার পকেটেই আমি রেখে দিলাম। বললাম, "তোমার কাছেই থাক। পরে সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে টাকা খরচ সুরু হবে। তখন চেক বইটা মাধবকে দিয়ে দিলেই হবে।" বাবার ভয় অনেকটা কাটল। বেশ সাবধান ভাবে চেক বইটা তিনি কোটের ভিতর-পকেটে রেখে দিলেন। কেন রাখলেন একমাত্র তিনিই জানেন। পরের বোঝা বয়ে বেড়ানোতে বড্ড বেশি ঝকমারি। তু'লক্ষ টাকার বোঝা থেকে বড়কাকা একদিন মুক্তি পেয়েছিলেন। সে-টাকা হাতে আনতে বাবার প্রায় একদিন সময় লেগেছিল। আমার ফিরিয়ে আনতে তিন ঘণ্টাও লাগল না। মাধব এসপ্ল্যানেডের মোড়ে নেমে গেল। বাবা বললেন, "কাল সন্ধ্যার সময় আমার সংগে একবার দেখা ক'রো।"

গাড়ির মধ্যে উবু হয়েই মাধব বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "যখন আদেশ করবেন তখনই আসব। রাত দুটো কিংবা বেলা দুটোর মধ্যে কোন তফাং রাখবেন না। আমি আপনার সন্তানের মত।" মাধবের প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে বুর্জোয়া ভালমানুষির ঝংকার উঠল। ফলভারানত বৃক্ষশাখার মত প্রত্যেকটা অক্ষর বাবার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কত রইল বাবা?"

"প্রায় সাড়ে তিন লাখ।"

"এত অল্প টাকায় সর্বভারতীয় দল কি করে হবে বাবা?"

"আরও পাওয়া যাবে। পূর্ব-পাঞ্জাবের এক মস্ত ধনী লোক আমাকে দশ লাখের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

"তাঁর স্বার্থ কি?"

"কংগ্রেস তাঁকে টিকিট দেবে না। তিনি মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন।"

"কেন?"

"তাঁর সারা জীবনের সখ। তাঁর বাড়ির দরজায় চব্বিশঘণ্টা যদি একটা সেপাই বসে থাকত তা হ'লেই তিনি চরম আনন্দ লাভ করতেন।"

"এমন একটা চবিওয়ালা লোককে কংগ্রেস ছাড়ল কেন বাবা?"

"শুনেছি ওর চেহারা দেখে নেহেরু বাথরুমে গিয়ে বমি করে ফেললেন। নেহেরুর কাছে তাঁর নাম উল্লেখ করবার সাহস আর কারো নেই। তাই তিনি কংগ্রেসকে ঘায়েল করবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন।"

"এমন লোক তো কোনদিন কম্যুনিষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"অসম্ভব কিছু না। সেই জন্যেই ওঁকে সংগে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছি।"

"কি নাম?"

"কুন্দনলাল বাজাজ।"

"তবে তোমার উচিত ছিল প্রথমে দশ লাখ টাকা নিয়ে নেওয়া।"

"তিনি সংগে করে ড্রাফট নিয়ে এসেছেন। নিজেই নিয়ে আসবেন। তাঁর পেছনে ঘুরলে লোকে আমায় ঠাট্টা করবে দীপু। হ্যারে, নুকুর ব্যাপারটা কি বলতে পারিস?"

"কি ব্যাপার বাবা?"

"নুকু নাকি কম্যুনিষ্ট?"

"কি যে সব বলো! কোথায় শুনলে?"

"দিল্লিতে। সেণ্ট্রাল্ ইন্‌টেলিজেন্‌সের একজন অফিসার নুকুকে সন্দেহ করেন।"

"ওঃ, কেবল সন্দেহ! মিছে কথা। ইংরেজ যাওয়ার পর ওদের হাতে কোন কাজ নেই কি না।"

"আমারও তাই মনে হয় দীপু।"

পার্কসার্কাসের মোড়ে এসে বললাম, "এইখানে আমি নামব।"

"বাড়ি যাবি না?"

"গোয়াবাগানে যাব। তারপর সন্ধ্যার সময় তোমার সংগে দেখা করব।"

গোয়াবাগানে ফিরে আসতেই দেখি বিনয়প্রকাশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছেন মাধববাবু?"

কয়েকমাস পরে মাধববাবু কেমন আছেন সে-প্রশ্নটা আর কেউ করল না। গৌরীশংকরবাবু কেমন আছেন সেইটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। সর্বভারতীয় দল গড়তে গিয়ে বাবার চার লাখ টাকা শেষ হয়েছে, কুন্দনলাল বাজাজের ন'লাখ গেছে। নির্বাচনের কাগজ ভোটের বাক্সে ফেলতে এখনও মাসখানেক বাকি। পার্টির তহবিলে লাখ দুয়েক মাত্র আছে। এত ক'টা টাকায় শেষদিন পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হ'ল। কুন্দনলাল বাজাজ বললেন, "আমি হিসাব দেখতে চাই।"

ক্যাশিয়ার মাধববাবু দু'বস্তা রসিদ এনে হাজির করলেন। প্রত্যেকটা রসিদ জাল না জেনুইন্ তা খুঁজে বার করতে গেলে কুন্দনলালবাবুর আয়ু থেকে আরও দুটি বছর খসে পড়ত। অতএব তিনি বললেন, "রসিদ সব ঠিক হ্যায়। বস্তামে রাখ দো।"

একদিন শোনা গেল মাধববাবুর ডবল নিমোনিয়া। চেক সই করতে পারছেন না।

ইলেকশন শেষ হ'তে আরও দশদিন বাকি। বাবা একদিন ছুটে এলেন আমার কাছে গোয়াবাগানে। বললেন, "দীপু, বোধহয় শেষরক্ষা আর হ'ল না।"

"কেন বাবা?"

"আমার তো সব গেছে। কুন্দনলাল দশের উপরে এগার লাখ ফেলেছে। মাধব একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে যে, পার্টির ফাণ্ডে আর টাকা নেই। আমার মনে হয় মাধব ছোকরাটি দু'এক লাখ টাকা সরিয়েছে।"

"আমায় কি করতে বলো বাবা?"

"লাখ খানেক টাকা তুই আমায় ধার দে।"

"আমার কাছে লাখ পয়সা নেই। সব ছোটকাকার কাছে। ছোটকাকার কাছেও বেশি নেই বলে জানি। তার ওপর ছোটকাকা নিজে এখন কলকাতায় নেই। তা ছাড়া আমিও বিলেত যাচ্ছি তেইশে জানুয়ারি। পামির কোম্পানির তরফ থেকেই যাচ্ছি। বাবা, মাধবকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর একাউন্টে আর একটি পয়সাও দিও না।"

"পয়সা?" প্রশ্নবোধক শব্দ করে বাবা দু'মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "পয়সা আমার আর নেই। ইলেকশন শেষ হওয়ার আগেই আমায় হাইকোর্টে গিয়ে বসতে হবে। মনে হচ্ছে আর দিন সাতেক পর আমার বাজার খরচাও থাকবে না।"

"বলো কি বাবা? তা হ'লে মাকে নিয়ে তুমি গোয়াবাগানে চলে এসো। ঠাকুরদা মরবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের রান্নাবাড়া সব ঠিক মত চলবে। বাজার খরচের কোন অভাবই হবে না। তুমি এক কাজ কর বাবা। কুইনস্ পার্কের বাড়িটা বাঁধা দিয়ে লাখ খানেক টাকা নিয়ে এসো।"

"দীপু, বাজারে আমার দু'লাখ টাকার ওপর দেনা। কেবল মুখের কথায় যারা আমায় টাকা ধার দিয়েছে তাদের দেনা শোধ দিতে গেলেও বাড়ি আমায় বাঁধা দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি প্রতিশ্রুতি আমায় রাখতেই হবে।"

"সে তো ঠিক কথা। কিন্তু মা বোধহয় তোমার আর্থিক দুরবস্থার কথা জানেন না। জানলে তিনতলার ছাদের ওপর থেকে তিনি বোধহয় জগদ্ধাত্রীকে রাস্তায় ফেলে দেবেন। তোমরা গোয়াবাগানে এসে থাকো। অনেক ঘর পড়ে রয়েছে। বাগানটাও বড়। কিছু কিছু সব্জি লাগিয়ে দাও। বাজার থেকে কেবল মাছটুকু কিনলেই চলবে। বাবা, মাধবকে আর খোঁজ করে লাভ নেই। যে-ঠিকানায় সে থাকত সেখান থেকে সে উঠে গেছে। শুনলাম তুমি ক'বারই লোক পাঠিয়েছিলে। এর চাইতে ডবল নিমোনিয়া অনেক বেশি নিরাপদ হ'ত। কি করবে বাবা?"

"উপস্থিত বাড়িটা আমায় বাঁধা দিয়েই হাইকোর্টে গিয়ে আবার বসতে হবে। কিন্তু পুরনো মক্কেলদের আর বোধহয় পাওয়া যাবে না।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, "এসেই, যখন পড়েছ তখন দাদুর সঙ্গে একটু দেখা করে যাও। একলা ঘরে পড়ে থাকেন, দেখবার কেউ নেই। অনীতা কেবল মাঝে মাঝে আসে।"

বাবা বললেন, "দীপু, অনীতার জন্য একটি ভাল ছেলে চাই।"

"হাঁ বাবা। অনীতাকে দু'চার দিনের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দাও। ইলেকশন শেষ হ'লে বিয়ে দেওয়ার আর টাকা থাকবে না।"

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'একজন ভাল ছেলের নাম করতে পারিস?"

"আমার মনে হয় মামার শালা হরিপ্রসাদের সংগে বিয়ে দিলে খুবই ভাল হয়।"

"হরিপ্রসাদ? কি কাজ করে সে?"

"এখন কিছু করে না। তবে তুমি একটু চেষ্টা করলে হরিপ্রসাদ সহজেই একটা চাকরি পেতে পারে। বিধানবাবুর সংগে তোমার এত খাতির! একবার বলে দেখ না তাঁকে? অনীতার সংগে বিয়ে হচ্ছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন।"

"কথাটা মন্দ বলিস নি। হরিপ্রসাদ কি পাস?"

"পাস? বি.এ. পর্যন্ত পড়েছে। অতটা না পড়লেও পারত।"

"বলিস কি দীপু। মাত্র আই. এ. পাস?"

"বাবা, কোন কিছু পাস না করে কেউ কি চাকরি পায় না? দু'দশজন লোক পাস না করেও মন্ত্রী হয়েছেন। হরিপ্রসাদ তো মন্ত্রী হ'তে চাইছে না। কেবল একটা চাকরি চাইছে।"

"আমি ভেবে দেখব।"

"মা এবং অনীতাকে না জানিয়ে বিয়েটা যদি পাকা করতে পার তা হ'লে দু'দিনের মধ্যে আমি সব বন্দোবস্ত করতে পারি বাবা। যা করবার সব ইলেকশনের আগেই শেষ করে ফেল।"

"আচ্ছা, একটা দিন আমায় ভাবতে দে।"

বাবা চলে গেলেন।

রাত আটটার পর সিমেনসের সংগে দেখা করতে গেলাম। আজ দু'দিন হ'ল তিনি কলকাতায় এসেছেন। কৃষ্ণান আমায় নিয়ে এলেন থিয়েটার রোডে। বাড়ির সামনে এসে বললেন, "আপনি দু'তলায় উঠে যান। সিঁড়ির ওপরেই তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন। এখন আটটা বেজে পনরো মিনিট।"

ঘড়ির কাঁটা চৌদ্দ থেকে পনরো মিনিটে ঠেকবার সংগে সংগে আমি সিঁড়ির নীচের থেকেই দেখলাম সিমেনস দাঁড়িয়ে আছেন। ওপরে উঠতেই তিনি মৃদু হেসে আমার করমর্দন করলেন। আমরা ঘরে এসে বসলাম। শোবার ঘর। তিনি যথারীতি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হুইস্কির বোতল সামনেই ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছো চৌধুরী?"

"ভাল আছি।"

"এবার কাজে নেমে পড়া যাক...।" বলেই তিনি খানিকটা হুইস্কি পান করলেন। তারপর বললেন, "গত ছ'মাসের কাজ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আলোচনা করা যাক।"

বললাম, "ইলেকশনের ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে আমরা খুব খারাপ করিনি। দুটো কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত আমাদের হাতে সময় খুব কম ছিল। দ্বিতীয়ত আমাদের কমরেডরা অনেকেই জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন ইলেকসনের কয়েকদিন আগে। এখন পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে যাঁরা গেছেন তাঁদের মুখের লাগামগুলো পেছন থেকে ভাল করে টানতে পারলে সভ্য-ঘোড়া ছুটবে ভাল। অন্তত নেহেরুর কংগ্রেসী সভ্যদের চাইতে ভাল ছুটবে।" সিমেনস জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ সুরু হবে তখন এই ঘোড়াগুলো কাজে লাগবে কি চৌধুরী? বিদ্রোহ তো পার্লামেণ্টে আসবে না।"

"না, তা আসবে না। বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরি করতে মাটির তলায় যে-সব পোকা আমরা ঢুকিয়েছি এগুলোকে দিয়েও সেই পোকার কাজ করাতে হবে। দাঁতের ধার যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কাটবে।"

"দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও চৌধুরী।"

আমি বললাম, "কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সত্যিকারের দোষক্রটি এবং কাল্পনিক ভুলভ্রান্তিগুলোকে পার্লামেণ্টে খুব বড় গলায় এঁরা প্রচার করবেন। তারপর খবরের কাগজের মারফৎ জনসাধারণের কাছে সেগুলো পৌছে দিতে হবে। প্রত্যেকটা দোষক্রটি একটু একটু করে প্রত্যেকটা মানুষের মনে তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড মটকে দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয় সিমেনস।"

"কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের সমূহ কোন ব্যবস্থা করা যায় কি?"

"নিশ্চয়ই। পার্লামেণ্টে বাজেট পেশ করবার সময় দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর নিয়ে এঁরা সমবেত কণ্ঠে আপত্তি জানাবেন। এঁরা দাবি করবেন, সৈন্য ছাঁটাই এবং তাদের মাইনে কমানো। ব্রিটিশ আমলের সুখসুবিধেগুলো ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেওয়া। এইসব দাবির পেছনে জনমতের সমর্থন আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পিপলস্ আর্মি নয়। বল্লভভাই বেঁচে থাকলে আমাদের খুব সুবিধা হ'ত।"

"কি রকম?"

"তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দু ধর্ম ঢোকাতে। যেমন, তাদের কাছ থেকে মদ্যপানের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ভাল করে হিন্দু ধর্মের নেংটি পরাতে পারলে, কামান বন্দুকগুলো আমাদের হাতে সমর্পণ করে ওরা নিশ্চিন্ত মনে সোমনাথের সামনে হত্যে দিত। আমরা তাঁরই প্ল্যান অনুসরণ করব।"

মনে হ'ল আমার কথাগুলো সিমেনস গভীর ভাবে ভেবে দেখছেন। আমি

একটা সিগারেট ধরালাম। সিমেনস ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতাকে সরিয়ে ফেলা যায় না?" ভেতরের ভয় লুকিয়ে রেখে বললাম, "ভারতবর্ষে এমন কে আছে যাকে আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি না? পারি, অবশ্যই পারি।"

"ভেরি গুড্।" এই পর্যন্ত বলে সিমেনস আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "সব দিকের রিপোর্ট পড়ে মনে হচ্ছে অনীতা কোনদিনও পার্টিতে আসবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনীতা টের পেয়েছে তুমি আর ন্তকু পাকা কম্যুনিষ্ট।"

"আমারও তাই বিশ্বাস সিমেনস।"

সিমেনস এবার একটু ছটফট করতে লাগলেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম ওঁর চোখের দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসছে। অনীতাকে গলা টিপে মারবার জন্য যেন তিনি আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন। আমার চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। মনের উত্তেজনা বাড়লে সিগারেট খাওয়ার আগ্রহ হয় বেশি। আমি কিন্তু সিগারেটটা একটু টেনেই খানিকক্ষণ হাতে নিয়ে বসে রইলাম। তারপর দু'একটা টান দিয়ে ছাইদানিতে ফেলে দিলাম। দ্বিতীয় সিগারেট আর ধরালাম না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতাকে তুমি পার্টিতে আনতে পারো?"

"আমি পারি। কিন্তু আমি নিজে থেকে আনতে চাই না। তাতে ফল ভাল হবে না।"

"তা হ'লে অনীতাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তুমি কি মনে কর?"

"আমার মনে হয় ন্তকু এবং বিনয়প্রকাশের কাছে অনীতা আত্মসমর্পণ করবে।"

"কত দিনের মধ্যে?"

"আমার মস্কো যাওয়ার আগেই। ন্তকু এখন কোথায়?"

সিমেনস বললেন, "গাড়োয়াল।"

"ওকে ডেকে পাঠাও।"

"পাঠাচ্ছি। কিন্তু মস্কো যাওয়ার আগে সময় নির্দিষ্ট রইল চৌধুরী।" এবার সিমেনস ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করলেন। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। সিমেনসের হাত থেকে অনীতার আয়ু কয়েকটা দিনের জন্য আমি কেড়ে নিয়ে এলাম। অনেকটা হুইস্কি খেয়ে নিয়ে সিমেনস বললেন, "তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকেই তুমি অকেজো করে ফেলেছ। তোমার বাবার কি খবর?"

"বাড়ি বাঁধা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করছেন। সব শক্তি তাঁর নিঃশেষিত। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি হাইকোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন।"

"কৃষাণ শ্রমিক হরিজন সংঘের পেছনে আমাদের খানিকটা সময় নষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের কি কি লাভ হ'ল তাতে?"

"লাভ হয়েছে। অন্ততঃ পাঁচটি কেন্দ্র থেকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি। বাবার দলকে যদি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ও-সব জায়গায় দাঁড় করাতে না পারতাম তা হ'লে কংগ্রেসের কাছে আমরা হেরে যেতাম। রাজনৈতিক জীবনে বাবাকে পঙ্গু করে দেওয়া দ্বিতীয় লাভ। বিনয়প্রকাশ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তছরুপ করেছে। সেটাও আমাদের লাভ। এইবার চৌধুরী পরিবারের সব ক'টি বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেল।"

"অতি উত্তম, অতি উত্তম।" সিমেনস রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। একটু পরে সিমেনস বললেন, "রুসিয়ায় গিয়ে যদি সময় পাও তা হ'লে খারখোভের টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট দেখে এসো।"

"আমায় সেখানে ক'মাস থাকতে হবে সিমেনস?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না। ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করলে তোমার যোগাযোগ থাকবে একেবারে কমরেড সেলেনকভের সংগে। তোমার সব কিছু দায়িত্ব তিনিই নেবেন। এত বড় খাতির দুনিয়ার কোন কম্যুনিষ্ট পেয়েছে

বলে আমি জানি না। চৌধুরী, লণ্ডন রওনা হওয়ার আগে কেবল আর একদিন তুমি আমার সংগে দেখা করবে।"

"করব।"

"করবে এই জন্যে যে অনীতা সম্বন্ধে শেষ কথা তুমি আমায় জানিয়ে যাবে।"

"সিমেনস, আমার মনে হয় অনীতাকে নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।"

"কেন? কেন? বিনয়প্রকাশের রিপোর্ট তবে সত্যি নয়?"

"সত্যি। কিন্তু অনীতার মধ্যে কি আছে? আছে ওর ভগবান। কেবল ওর ভগবানকে মারবার জন্য অনীতাকে সরিয়ে দেওয়ার দরকার কি?"

সিমেনস আমার দিকে একটু সরে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কি কারণে দরকার নেই?"

"কারণগুলো আমি সব ভেবে তোমায় বলব। যদি এই ক'টা দিনের মধ্যে আমি ভেবে উঠতে না পারি তা হ'লে কমরেড সেলেনকভের কাছে আমি সব কারণগুলো বলব।"

এই সময় কৃষ্ণান এলেন। আমরা দু'জনে শোবার ঘর থেকে বসবার ঘরে এলাম। কৃষ্ণান বললেন, "আমি কেওড়াতলা থেকে আসছি। সব ভস্ম হয়ে গেছে।"

"ভেরি গুড, ভেরি গুড।" সিমেনস যেন খুব খুসি হয়েছেন বলে মনে হ'ল। আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু কাউকে কোন প্রশ্ন করলাম না। আমি কৃষ্ণানের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কৃষ্ণান বললেন, "আজ দুপুর বেলা লক্ষ্মী মারা গেছে মিঃ চৌধুরী।" সিমেনস বললেন, "লক্ষ্মী নিজেই বেঁচে থাকতে চায় নি। প্রায় ছ'মাস আগে লক্ষ্মী তার ডায়ারিতে লিখেছিল, 'দাদা যতই কেন রাগ করুক সিমেনসকে আমার সন্দেহ হয়। ইয়োরোপের পুরো দলটাই ভারতবর্ষে কাজ করছে। সিমেনসের সংগে ওদের যোগাযোগ নেই তো?' চৌধুরী, তুমি হ'লে কি করতে?"

বললাম, "লক্ষ্মী মরত। এই ছ'মাস ওকে বাঁচিয়ে রাখতাম না। গুড নাইট, সিমেনস।"

"এ ভেরী ভেরী গুড্ নাইট চৌধুরী।"

ফস করে কৃষ্ণান জিজ্ঞাসা করলেন, "অনীতা সম্বন্ধে কি ঠিক হ'ল?"

"অনীতা বেঁচে থাকবে যতদিন না আমি মস্কো থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু স্তুকুকে আমি চাই কলকাতায়। সম্ভব হ'লে কাল কিংবা পরশু।"

থিয়েটার রোড থেকে বেরিয়ে আমি ময়দানের দিকে চলে এলাম। মাঘ মাস বলে ঠাণ্ডায় এদিকটায় লোকজন কেউ আসে না। আমি খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে গির্জাটার বাঁ পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলাম। একটু পরে আমি হরিশ মুখার্জি রোড ধরে দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছিলাম। হয়তো আমার উদ্দেশ্য ছিল কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি শ্মশানেই এলাম। লক্ষ্মীর চিতা নিভে গেছে। সেই একই চিতায় অন্য একজন স্ত্রীলোকের শবদেহ তোলা হবে একটু পরে। সবাই অপেক্ষা করছেন, তার স্বামী এখনো এসে পৌছতে পারেননি। লক্ষ্মী হয়তো জানতে পারবে না আমি এসেছিলাম। লক্ষ্মীর কোন চিহ্ন রইল না আমার কাছে। অজন্তার গুহা-গাত্রে রবীন্দ্রনাথের ভারতলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেওড়া-তলার চিতায় লক্ষ্মীর দেহ পুড়েছে কিন্তু সৌন্দর্য পোড়েনি। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য শাশ্বত, তাই দগ্ধ নয়।

আমি মাথা নীচু করলাম। আমার আন্তরিকতায় কোন ক্লেদ ছিল না।

•

বাবা হেরে গেছেন। হাইকোর্টে যাওয়া আসা আরম্ভ করেছেন। বাবার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সবাই জানে। বাড়িটা বাঁধা দিয়েছেন। বাবা মাকে নিজেই সে-খবর জানিয়েছেন। পুরনো দিনের মত কুইনস পার্ক আবার নিস্তব্ধ হয়েছে। কেউ আসে না বাবার কাছে। আসে না তার সব চেয়ে বড় কারণ, বাবার রাজনীতি নেই এবং টাকাও নেই। সকাল থেকে বাবা তাঁর অফিস

ঘরে বসে থাকেন। ডানদিকের জানলা দিয়ে রাস্তার ফটকটা দেখা যায়। তিনি বার বার করে চেয়ে দেখেন কোন মক্কেল এলো কি না। মক্কেলের পদধ্বনি বাবা অনেক দূর থেকে শুনলেও চিনতে পারতেন। কিন্তু আজকের সব চেয়ে বড় অভাব মক্কেলের। আইনের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি চলে যান অনেকগুলো বছর পেছনে। মামার কথা স্মরণ করেন। তিনিই তো তাঁকে রাজনীতির সিংহ-দরজায় পৌছে দিয়েছিলেন। হয়তো মামার কথা মত চললে তাঁর এমন সাংঘাতিক ব্যর্থতা আসত না। কিন্তু মামাও আজ ভগ্ন। দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে এলো। ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি আমার গোপন হস্ত দেখতে পেলেন না।

বাবার ঘরের পাশ দিয়েই আমি চলে গেলাম। আমি ভাবছিলাম বাবা আমায় ডাকবেন। একটু অপেক্ষা করলাম। তিনি আমায় ডাকলেন না। হয়তো তাঁর বেকার জীবনের লজ্জা তিনি কাউকে দেখতে দেবেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবলাম ভারতবর্ষের কত সহস্র সহস্র পরিবারের আর্থিক শেকড় আমি এমনি করে কেটে দিয়েছি। কেবল আর্থিক নয়, পারিবারিক জীবনের স্নেহভালবাসার মূল কেটে দিয়ে সেখানে ঢুকিয়েছি অশান্তি আর অরাজকতা। আমরা গোড়া থেকে কাটি। বাবা তাই আজও বুঝতে পারেন নি কেমন করে কোথায় এবং কখন তাঁর সর্বনাশের সুরু হ'ল। আমি জানি তিনি পরোক্ষভাবে মামাকেই দায়ী করছিলেন।

কিন্তু আমিই বা কি করব? শ্রেণী-সংগ্রামের শত্রু আমাদের চতুর্দিকে। আমরা যদি কঠিন হতে না পারি তা হ'লে আমাদের চিরবাঞ্ছিত রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমরা সর্বস্ব পণ করেছি। নিজেদের স্বার্থ এতে কাণাকড়িও নেই। থাকলে লক্ষ্মী আমার বৌ হতে পারত। অতএব আমরা যুদ্ধ করছি। পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে যদি দু'দশ লক্ষ জীবন নষ্ট হয় তাতে আফসোস্ করবার কিছুই নেই। কারণ দু'দশ কোটি লোকের তাতে বাঁচবার পথ তৈরি হবে। আমাদের

উদ্দেশ্য মহৎ। সুতরাং যেনতেন প্রকারেণ আমরা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করবই।

দু'তলার ঘরে অনীতা ছিল। বসে বসে একটা ছেঁড়া ব্লাউজ সেলাই করছিল। কুইনস্ পার্কে দারিদ্র্য এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত তাড়াতাড়ি সবগুলো ব্লাউজই ছিঁড়ে গেল নাকি রে অনীতা?"

"আমার তো বেশি জামাকাপড় ছিল না দাদা। আমার ঠিক চলে যাবে।" ব্লাউজটা কোলের ওপর ফেলে রেখে অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নাকি বিলেত যাচ্ছ?"

"হাঁ।"

"ব্যবসা তা হ'লে তোমার ভালই চলছে।"

"ভাল চলছে না বলেই বিলেত যাচ্ছি। দু'চারটে আরও বেশি নতুন জিনিসের এজেন্সি নিলে তবে হয়তো ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে। নইলে ডুবলাম।"

"উন্নতি হ'লেও ডুববে।" এই বলে অনীতা আবার ব্লাউজ সেলাই করতে আরম্ভ করল। আমি আজ ঠিক করে এসেছি অনীতার সংগে তর্ক করব না। সুতরাং অনীতার কথার জবাব না দিয়ে আমি অত্যন্ত নম্র গলায় বললাম, "আমার একটা অনুরোধ রাখবি?"

"কি অনুরোধ দাদা?" অনীতা উঠে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল।

"তুই বিয়ে কর। আমার লুকনো কিছু টাকা আছে। তাই দিয়ে বিয়ের খরচা সব মিটে যাবে। মা-বাবার মনে শান্তি আসবে অনি।"

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাকে বিয়ে করতে বলো?"

"আমি কিছু বলব না। তোর যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করে ফেল্। আমি আপত্তি করব না। এমন কি কমলকে বিয়ে করতে চাইলেও আমি বাধা দেব না।" অনীতা কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথা কইল না। মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "দাদা, আমার সন্দেহ হয় কমল তোমাদেরই মত একজন কম্যুনিষ্ট।"

"স্বীকার করলাম কমল কম্যুনিষ্ট। কিন্তু তুই ভালবেসেছিস কমলকে, কম্যুনিষ্টকে নয়। আচ্ছা অনীতা, তুই কি কেবল তোর ভালবাসার জন্য কম্যুনিষ্ট কমলকে বিয়ে করতে পারিস না?" আমার এই শেষের প্রশ্নটা নুকু দরজার ওপাশ থেকেই শুনল। নুকু বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, আসব?"

অনীতা বলল, "কে রে? নুকু? আয়। কলকাতায় কবে এলি?"

"কাল।"

"বড্ড রোগা হয়ে গেছিস রে নুকু। দাদা, আমি ভাবছি তুমি বিলেত চলে গেলে আমি গিয়ে গোয়াবাগানে থাকব। দাদু এবং নুকু দু'জনকেই তবে আমি সেবা করতে পারব।"

"কি মজাই না হবে দিদি! বিছানায় শুয়ে শুয়ে তুমি আমায় 'গল্‌গোথা'র অমর কাহিনী শোনাবে। আমার অসুখ বোধহয় তাতেই সারবে। হাঁ, এবার তুমি দিদির বিয়ের কথাই বলো দীপুদা।"

"অনীতাকে আমি বলছিলাম কমলকে বিয়ে করবার জন্য।"

অনীতার বদলে নুকু যেন লাফিয়ে উঠল আনন্দে। "ওমা—দিদিকে আমি নিজে হাতে সাজিয়ে দেব। দীপুদা, বিয়েতে তোমার বেশি খরচ হবে না। কমলবাবুর বেশি দাবি-দাওয়া নেই।"

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "তুই কি করে জানিস নুকু?"

"ওমা! এই যে দীপুদা বলছিল কমলবাবু কম্যুনিষ্ট? কম্যুনিষ্টরা কেবল বৌকেই চায়, দানসামগ্রী চায় না। দীপুদা, তোমার বিলেত যাওয়ার আরও ছ'দিন বাকি। জ্যেঠাইমা এবং জ্যেঠামশাইকে এ-বিয়েতে রাজি করাতে ছ'মাস লাগবে। এক কাজ করলে হয় না দিদি? ধরো গোপনে বিয়েটা তোমার এখন হয়ে থাক। তারপর দীপুদা বিলেত থেকে ফিরলে আমরা ক্রমশ ক্রমশ বিয়ের খবরটা ওঁদের কানে তুলে দেব? দীপুদা, শ'পাঁচেক টাকা দাও। দু'চার-

খানা সাড়ি কিনব। সোনার দাম বেশি। গয়না এখন থাক। কালই কেন. বিয়েটা হয়ে যাক না দিদি?"

অনীতা আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "দাদা, তোমরা একটা সত্যি কথা বলবে?"

"ওমা, বল কি দিদি? সত্যি কথা ছাড়া আমরা আবার মিথ্যা কথা কবে বললাম! কমলবাবু কি মিথ্যে? তুমি তাঁকে ভালবাস তাও মিথ্যে নয়। অতএব বিয়েটাই বা মিথ্যে হবে কেন? আমরা দুটিতে মিলে তোমার বিয়ে দিতে চাই। তোমার প্রেম যে কত বড় সত্য, দীপুদা না জানুক, সে-কথা আমি জানি। দিদি, প্রশ্ন তুমি আমাকেই করো।"

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, "কমল কি কম্যুনিষ্ট? তোরা তাকে চিনিস কি?"

নুকু স্পষ্ট গলায় জবাব দিল, "কমলবাবু কম্যুনিষ্ট এবং আমরা তাঁকে চিনি।"

অনীতা হঠাৎ একটা খুব বড় রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আমি জানি এত বড রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যথা অনীতা নিঃশব্দে বহন করে যাবে। অনীতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেঁড়া ব্লাউজটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অনীতা কাঁদে না বলেই ওর ব্যথার পরিমাণ ও গভীরতা যে কত আমি তা বুঝলাম। নুকু অনীতার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, "তুমি খুব ব্যথা পেয়েছ জানি। কি করলে তুমি সুখী হবে বল। আমি কেবল তাই করব। আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।"

"আমার সংগে কারসিয়ং যাবি?"

"যাব। কিন্তু কেন?"

"আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যে-স্বর্গ গড়তে পারিনি তোরা ভগবানকে বিশ্বাস না করে সে-স্বর্গ গড়তে পারবি না। কারণ মানুষের সুখদুঃখ চিরদিন থাকবে। তুই নিজে একবার রাসিয়ায় যা। জনসাধারণের বুকে কান পেতে শুনে আয় তাদের আত্মার আর্তনাদ! তাছাড়া ঐতিহাসিক বস্তু-তন্ত্রবাদের মধ্যে সত্যিই কোন ইতিহাস নেই। রাসিয়ার মানুষ হাত

বাড়িয়েছিল পাওয়ার জন্যই। কিন্তু পেয়েছে আংশিক, জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা মাত্র তাদের মিটেছে। নুকু, কেবল এতটুকু পাওয়ার জন্য জীবন ও জগতের সব চেয়ে বড় সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সত্য সব সময়ই সত্য। তুই কলকাতার সংসর্গ ছেড়ে চল্ আমার সংগে কারসিয়ং। তারপর আমরা দু'জনে মিলে কমলকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনব। নুকু, কমল যত বড় কম্যুনিষ্টই হোক আমি ওকে ভালবাসি। কিন্তু ভগবানের চেয়ে বেশি নয়।"

নুকু অসহায় ভাবে আমার দিকে চাইল। এরই মধ্যে নুকুর হাত শিথিল হয়ে এসেছে। সে অনীতার হাত ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জানি নুকু আমার আদেশ চাইছে। আমি ভাবলাম, অনীতাকে যদি ছ'মাসের জন্য সেখানে রেখে দেওয়া যায় তা হ'লে মস্কো থেকে ফিরে এসে ওর জীবন আমি হয়তো রক্ষা করতে পারব। নুকু সংগে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। গতরাত্রিতে অনীতার কথা ভেবে আমি ঘুমতে পারিনি। নুকুরও ঘুম আসেনি জানি। ঘুমতে পারলে ওর চোখের নীচে কালি পড়ত না।

আমি বললাম, "বেশ তাই হবে অনীতা। নুকু তোর সংগে যাবে। আমায় কেবল কথা দে আমি যতদিন বিলেত থেকে ফিরে না আসব ততদিন তুই ওখানেই থাকবি। দরকার হয় কমল তোর সংগে কারসিয়ং গিয়ে দেখা করবে।"

"কথা দিলাম দাদা। কিন্তু কলকাতায় যদি ফিরেই আসি তাতে আমার তো কোন ভয় নেই।"

"কথা যখন দিয়েছিস তখন এ-সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় আলোচনার প্রয়োজন কি?"

আমি অনীতার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মার ঘরে চুপি দিয়ে দেখলাম তিনি সেখানে নেই। তিনতলার ছাদে গেলাম। মা পূজো

করছিলেন। গত ছ'মাসে জগদ্ধাত্রীরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করলাম। দু'হাজার টাকা খরচ করে মা জগদ্ধাত্রীর জন্য একটা সোনার হার গড়িয়েছিলেন। উপস্থিত সেই হারটা নেই। বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে বাজারের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য জগদ্ধাত্রীর হারটাও নিয়ে গেছেন। জগদ্ধাত্রীর হাতের বালা দুটোও প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মীবাবুর দোকানে।

মার পাশে গিয়ে বসলাম। এত কাছে বসবার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম। তিনি একটুও রাগ করলেন না। মা বললেন, "দীপু, জগদ্ধাত্রীর রূপ আরও বেড়েছে।"

"সর্বস্ব হারিয়ে রূপ বাড়ল কি করে মা?"

"পূজারীর মনের রূপ দিয়েই তো দেবতার রূপ আমরা কল্পনা করি। সোনার জিনিসগুলো তো উপলক্ষ্য।"

আমি আজ তর্ক করব না। তর্ক করতে আসিনি। মাকে বললাম, "আমি রবিবার বিলেত রওনা হব মা।"

"শুনেছি। কাল রাত্রিতে ঠাকুরপো এসেছিলেন। তিনি বললেন তোদের ব্যবসায় নাকি কেবল লোকসান হচ্ছে। দীপু, আমি তোর কল্যাণের জন্য জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করব, পূজো দেব।"

"মা, আমি তাহ'লে ভীমনাগের দোকান থেকে দশ টাকার ভাল সন্দেশ নিয়ে আসব?"

"কিছু দরকার নেই। চার পয়সার বাতাসা দিয়েই আমি আজকাল আমার নৈবেদ্য সাজাই। তাও যদি না জোটে দীপু, আমার ভক্তির নৈবেদ্য জগদ্ধাত্রী গ্রহণ করবেন। হাঁ রে, কতদিন পরে ফিরবি?"

"ছ'মাস। বাবার দিকে একটু দৃষ্টি রেখ মা।" এই বলে পাঁচখানা এক-শ' টাকার নোট আমি মার বাতাসার রেকাবির উপর রেখে দিলাম। মা তা দেখতে পেলেন না। মার পায়ের ধূলো নিয়ে আমি উঠে পড়লাম। আবার

আসব বলে খুব দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি রাস্তায় চলে এলাম। ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকে চাইলাম না। সোজা বিড়লা পার্কের কাছে এসে ট্রামে চেপে বসলাম।

রাত্রিতে বিনয়প্রকাশ আর কমরেড রাও এলেন। দু'জনের হাতেই দুটো ফোলিও ব্যাগ ছিল। আমি ওঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ঘরের জানলা দরজা সব আগে থেকেই বন্ধ করা ছিল। ওঁরা নিজেরাই সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ব্যাগ থেকে ফাইল বার করলেন।

কমরেড রাও বললেন, "সেণ্ট্রাল কমিটির একজন সভ্য পার্টির নিয়মকানুন অমান্য করেছেন। তিনি একজন ইনটেলেকচুয়াল। পিপলস্ কোর্টে তাঁর বিচার হবে। কিন্তু তিনি বলছেন আমাদের আদালতের আইনানুমোদিত অস্তিত্ব নেই। তা'ছাড়া আদালত কেবল বিচারই করছে না, আদালত নিজেই অভিযোগকারী। 'পার্জ' করবার আদেশ আপনি নিজেই দিয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এত বড় বিশ্বাসঘাতক এতগুলো কথা বলবার সাহস পেল কি করে? এর পরও আপনারা তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান নাকি?"

"চাই না। তবু ঐ ইংগ-মার্কিনের গুপ্তচরটাকে সরিয়ে দেওয়ার আগে আমরা ওকে আমাদের আদালতের আইনানুমোদিত অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিতে চাই।"

আমি বললাম, "চিরদিনই আদালত শাসক-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্বর যুগে অপরাধীকে হয়তো বল্লম কিংবা বর্শা দিয়ে মেরে ফেলত। সভ্য যুগে বল্লমের জায়গায় এলো রাইফেল। সভ্যতম যুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা রাইফেলের বদলে সৃষ্টি করলাম আদালত-অস্ত্র। আমাদের বিচারক তাই

সবার আগে একজন রাজনীতিজ্ঞ। রাজনৈতিক কর্মী। অতএব আমাদের আদালত্ প্রলিটারিয়েটের নিরাপত্তা রক্ষা করবার প্রতিষ্ঠান, ক্লাস-ইনষ্টিটিউসন, গভর্ণমেণ্টের হাতের অস্ত্র। আদালতকেও আমাদের পার্টি লাইন মত চলতে হবে। কারণ ফৌজদারি দণ্ডবিধির যাবতীয় আইনকানুন এবং এমন কি আদালতের সমগ্র অস্তিত্ব কম্যুনিষ্ট রাজনীতির বহির্ভূত নয়, অন্তর্গত। শ্রেণী সংগ্রামকে কার্যকরী করবার জন্য এরা সব সাহায্য করছে মাত্র। বিচার করবে পার্টি। শাস্তি দেবে আদালত। আমাদের ডায়লেকটিক্যাল যুক্তিবাদের মধ্যে সক্রেটিসের ফর্মাল লজিক নেই। আশা করি আপনি সোভিয়েট জুরিসপ্রুডেন্স বুঝতে পেরেছেন কমরেড রাও।"

"বুঝেছি।"

এবার আমি বললাম, "পার্টি লাইনের দিক থেকে কতগুলো কথা আমি আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সামরিক কায়দায় আমাদের পার্টি গঠিত হয়েছে। স্লোগানসর্বস্ব পার্টি নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা বিশ্বজয়ের যুদ্ধ করছি। গণ্ডগ্রাম থেকে সুরু করে দিল্লি সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জমিতে এবং প্রত্যেকটি মানুষের মনের মধ্যে আমরা একটা করে ফ্রন্ট খুলব। আমাদের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ দখল করা। কংগ্রেসী নেতৃত্বের সংগে জনসাধারণের নৈতিক যোগাযোগ যেদিন আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারব সেদিন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।"

কমরেড রাও তাঁর কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি বললাম, "নেপালে আমাদের কাজ খুব ভাল হচ্ছে না। সেখানে ভাল কর্মী পাঠানো দরকার। বিশেষ করে উত্তর নেপাল আমাদের কাজের পক্ষে খুব ভাল। কারণ, নেপাল গভর্ণমেণ্টের শাসনক্ষমতা সে-অঞ্চলে এক রকম নেই বললেই চলে।"

কমরেড রাও বললেন, "কয়েকজন দক্ষ নেপালী কম্যুনিষ্ট পশ্চিম তিব্বতে দোভাষীর কাজ করছেন। নতুবা চীনা-ফৌজদের খুবই অসুবিধা হ'ত।"

আমি বললাম, "ভারতবর্ষের সীমান্তের ঠিক বাইরে তাখ্লাকোট বলে একটা জায়গা আছে। চীনা ফৌজরা সেখানে একটা ছোট্ট দুর্গ তৈরি করেছেন। তাখ্লাকোট পুরংগ্ উপত্যকায় অবস্থিত। এই উপত্যকায় উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে খুবই কর্মের অনুপ্রেরণা এসেছে। আপনারা তাদের সংগে যোগাযোগ রাখবেন।"

"যোগাযোগ আছে। চীনা ফৌজদের প্রথমত খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। সীমান্তবর্তী স্থানসমূহের মানচিত্র ওদের কাছে ছিল না। আমরা সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার কতগুলো মানচিত্র তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি মিঃ চৌধুরী।"

"খুব ভাল করেছেন কমরেড রাও। রাস্তাঘাট নেই বলে প্রথম প্রথম কাজের একটু অসুবিধা হবে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আমলে নির্বোধ লামাগুলো নাকে তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিল। চীনা কমরেডরা এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক উন্নতি করেছেন। তুর্কীস্থান থেকে পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী ঘারটোক পর্যন্ত রাস্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাচ টনের মোটর লরি অনায়াসেই রুডোক পর্যন্ত যাতায়াত করছে। কৈলাস পর্বতের পূর্ব দিকে গৌরীকুণ্ড নামে একটা হ্রদ ছিল। কতগুলো অশিক্ষিত হিন্দু প্রতি বছর ঐ জায়গায় তীর্থ করতে যেত। চীনা কমরেডরা পাম্প লাগিয়ে হ্রদের পবিত্র জলের শেষ বিন্দু পর্যন্ত তুলে ফেলেছেন। সেখানে ট্রাকটর লাগিয়ে মাটি চাষ হচ্ছে। ফসল জন্মাবে। কৈলাসের পশ্চিম দিকেও কাজ সুরু হয়েছে। আপনারা যোগাযোগ রাখবেন। হাঁ, আর একটা কথা আছে কমরেড রাও। অক্টোবরের মধ্যে তেলেংগানার কিছু অকেজো অস্ত্রশস্ত্র হায়দরাবাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করবেন।" কমরেড রাও চলে যাওয়ার পর আমি একটা সিগারেট ধরালাম। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে এসে বিনয়প্রকাশকে বললাম, "অনীতাকে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমি আজ শেষ চেষ্টা করে দেখেছি। অনীতা এখন বিয়ে করতে চায় না। অনীতার সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা ওর ধর্ম-জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ। যেমন করে একটা দেশের প্রাচীন কৃষ্টি

আমরা সমূলে নষ্ট করে দেই অনীতাকেও তেমনি করে নষ্ট করে দিতে হবে। অনীতার চার দিকে তাই আমি একটা ব্যূহ রচনা করে গেলাম। তোমরা ওকে সব সময় ঘিরে রাখবে। দরকার হয়, তুমি নিজেও ছ'মাসের জন্য কারসিয়ংএ গিয়ে বসবাস করবে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই ওকে বিয়ে করতে চাও বিনয় ?"

"হাঁ। বিয়ে যদি আমি আদৌ কোনদিন করি তবে অনীতাকেই করব।"

"তা হ'লে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার অনীতার দিকটাও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাবে। নুকু এবার থেকে কমরেড রাও-এর সংগে কাজ করবে। তোমার ফাইলটা রেখে যাও। রাত্রিতে দেখে রাখব। কা সন্ধ্যা ছ'টার সময় তুমি একবার এসো। ট্রেড ইউনিয়নের ফ্রণ্টে কাজ খুব ভাল হচ্ছে না। সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে আরও বেশি। ভাল কথা মনে পড়েছে। রমেন বটব্যালের লেখা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ও সাহিত্য ফ্রণ্টে রমেন খুব সুবিধা করে উঠতে পারছে না। কারণ কি ?"

"রমেন বলে, প্রেরণা পাচ্ছে না।"

"ননসেন্স! রমেন তাহ'লে বুর্জোয়া রোগে ভুগছে। আমাদের এত বড় আদর্শ রয়েছে, তার প্রেরণার অভাব কি? মেয়েছেলে পাশে নিয়ে লেকের ধারে গিয়ে বসতে চায় বুঝি? আমি মনে করি রমেনকে পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে দাও। কৃষাণদের মধ্যে কিছুদিন কাজ করে আসুক। রমেনকে বলে দিও পার্টি কোনদিনও অসুস্থ লোকের বোঝা বইবে না। আমরা ইচ্ছা করলে দু'একটা ছোটখাটো গোর্কি সৃষ্টি করতে পারি।"

"তোমার কাছে না হয় রমেনকে একবার পাঠিয়ে দেই ?"

"কেন? কেন? কেন? যদি বাগে না আনতে পার পার্টি থেকে ওকে বার করে দাও। ওর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দাও। সাহিত্যজগৎ থেকে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাক। সবার ওপরে পার্টি সত্য এ-বোধ যার হয়নি তাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে বিনয় ?"

"কিছু হবে বলে মনে হয় না।"

"তা হ'লে ডেসট্রয় হিম্‌...... ।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। বিনয় গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে এলো। একটা সিগারেট টানতে টানতে ঘরে প্রবেশ করল মুকু। মুকু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কাজ শেষ হয়নি দীপুদা? রাত এখন একটা।" মুকু বিনয়প্রকাশের দিকে পেছন ফিরে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল। আমি বললাম, "হাঁ, হয়ে গেছে।" বিনয়প্রকাশ যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। আমি বললাম, "মুকু, বিনয়প্রকাশের সংগে তোর আর কোন সম্পর্ক রইল না।"

"সম্পর্ক? কোন্ সম্পর্ক দীপুদা?"

"সব রকম সম্পর্ক। এখন থেকে তোর কেবল কমরেড রাও-এর সংগে যোগাযোগ থাকবে। তাছাড়া তোদের প্রেমের ত্রিভুজ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অবসর আমাদের নেই।"

"দীপুদা, অতীতের দু'চারটে কথা ভেবে যদি একটু সৌখিনতা করি?"

"কি কথা?"

"যে ক'টা কথার মধ্যে আমার জীবনের অর্ধেক অংশ লুকনো আছে। বিনয়প্রকাশের অতীত না থাকতে পারে, আমার তো আছে?"

আমি একটু জোরে জোরেই বললাম, "কম্যুনিষ্টের কাছে অতীত বলে কিচ্ছু নেই।"

"কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বিনয়প্রকাশ যে আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কেড়ে নিয়েছে দীপুদা? অন্তত আমার অতীতটা আমায় ফিরিয়ে দাও?"

"না, না, না......বাঙালীগুনোর ন্যাকামি আমার আর সহ্য হচ্ছে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের কতগুলো উচ্ছিষ্ট প্যারাসাইট পার্টির মধ্যে ঢুকে গীতগোবিন্দের রস খুঁজে বেড়াচ্ছে! আমি শেষ বারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। এখানে কেউ কোনদিনও যেন ব্যক্তিগত জীবনের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে তামাসা করতে না আসে। মুকু, তোর কোন অতীত নেই। রবিঠাকুর কিংবা শরৎ

চাটুজ্জের নায়িকা হওয়ার জন্য পার্টি তোকে কোনদিনও ডাকবে না। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি কমরেড।"

নুকু তার দুটো হাত দিয়ে দু'পাশের কান চেপে ধরল। চোখ দুটো নীচু করে রাখল টেবিলের দিকে। আমি বললাম, "অনীতাকে বিনয়প্রকাশের সংগে বিয়ে দেওয়ার ভার আমি তোর ওপর দিয়ে গেলাম। আমার আদেশ।"

"না, না দীপুদা। অমন কাজ আমায় তুমি দিও না।"

"চুপ কর্! এতগুলো বছর পর পার্টি তোকে কি মনে করবে? একটা বুর্জোয়া মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষের যে-কোন নর্দমায় ফেলে দিলেও পার্টির কোন ক্ষতি হবে না।"

"তাই দাও দীপুদা। আমি এতটুকু আপত্তি করব না। তবু বিয়ে দেওয়ার অংগীকার তুমি আমার কাছ থেকে নিও না। আমি পারব না।"

"তা হ'লে......" আমি চাইলাম বিনয়প্রকাশের দিকে। বললাম, "অনীতাকে এমনি করে আমাদের মধ্যে ভাসিয়ে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিনয়, অনীতাকে সরিয়ে ফেল চিরদিনের জন্য। এবং খুব তাড়াতাড়ি।"

নুকু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। হু-হু করে কাঁদতে লাগল। বিনয়প্রকাশের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে বলতে লাগল, "না, না, দিদিকে খুন ক'র না।" আমার দিকে ঘুরে বসে বলল, "আমি আমার অতীত ভুলে যাব। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি দীপুদা। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দিদিকে বিনয়প্রকাশের হাতে তুলে দেব।" আমি বললাম, "কাজটা অত সহজ হবে না। চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, নাক দিয়ে গন্ধ নেওয়া যায় না, জিভ দিয়ে চাটতে গেলে কতগুলো মাটি আর কাঁচা রং-এর স্বাদ পাওয়া যায় তার নাম ভগবান। জগদ্ধাত্রী নাম নিয়ে অনেকদিন থেকে তিনতলার ছাদে অধিষ্ঠান করছে। মানৎ, মানৎ আর কেবল মানৎ। মানুষগুনোকে আফিম খাইয়ে একেবারে বুঁদ করে

রেখেছে। অনীতার জীবনে ভগবানের ভিন্ন অভিব্যক্তি। তার শেকড় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। উপড়ে ফেলতে সময় নেবে। অতএব অনীতার চারদিকে আমি ব্যূহ রচনা করে গেলাম। বিলেত থেকে ফিরে এর একটা মীমাংসা আমি করব। সব চেয়ে কঠিন মীমাংসা। কারণ ভগবান সব চেয়ে কঠিন শত্রু। অনীতার ভগবানকে আমি ভাঙব। কথা দিলাম।"

বিনয়প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার পর নুকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটিতেই বসে রইল। বুঝলাম নতুন করে ও শক্তি সংগ্রহ করছে। করাই উচিত। অনেকদিন পর্যন্ত সহ্য করেছি। নুকু শেষ পর্যন্ত মাটি থেকে উঠল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "দীপুদা, তুমি ভগবানকে এত ভয় পাও কেন?"

"ভয়? আমি ভয় পাই?"

"হাঁ। নইলে তুমি সব সময়েই কেবল ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে হুংকার দিতে না। যাকে গ্রাহ্য করি না তাকে নিয়ে মানুষ তো খুব বেশি মাথা ঘামায় না দীপুদা?" আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগল। বুকের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত টিক্‌টিক্ আওয়াজ হতে লাগল। মনে হ'ল নুকু আমার সব কিছুই দেখতে পেয়েছে। পার্টি লাইনের পুরো-দাগ ওষুধ খেয়েও আমার রোগ বোধহয় সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করেনি। নুকুর প্রশ্ন খুব অবান্তর বলে মনে হ'ল না। নুকুর মাথায় হাত রেখে বললাম, "পার্টিকে আমরা সব দিয়েছি নুকু। তাই বিনয়প্রকাশও চলে গেল! তুই না দিলে ও যেতে পারত না।" গুলি-খাওয়া বাঘিনীর মত নুকু পা টেনে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর মনের গর্জন আমি শুনতে পেলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে বেশ বেলা করেই উঠলাম। অনীতা আমার সংগে দেখা করবে বলে সকাল থেকে এসে বসে আছে। আমার সংগে অনীতা কোনদিনই দেখা করতে আসে না। আজ এই প্রথম। আমি দরজা খুলতেই অনীতা এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে অনীতা?" অনীতা বলল,

"সকালে না এলে তো তোমার সংগে দেখা হবে না। তাই একটু আগেই এসেছি।"

"ব্যাপার কি ?"

"কাল তুমি ঠাকুরঘরে পাঁচ-শ' টাকা রেখে এসেছিলে ?"

"হাঁ।"

"মা বাবাকে টাকাগুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

"কেন ?"

"উপস্থিত তাঁর টাকার দরকার নেই দাদা।"

"পরে লাগতে পারে তো ?"

"বাবা বলেছেন পরেও লাগবে না।"

"বাবার কাছে মক্কেল আসে না। অনীতা, তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে আমি জানি।"

"বাবাকে সে-কথা বোঝানো যাবে না দাদা। তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও।" এই বলে অনীতা পাঁচখানা নোট আমার সামনে তুলে ধরল। আমি না নিয়েই বললাম, "তোর কাছে থাক না। তুই খরচ করিস।"

"না দাদা, তুমি তাহ'লে নুকুর কাছে রেখে যাও। ওর তো সাড়ি কাপড় কিনতে হয়, নুকুর দরকার হবে।" আমি হাত বাড়ালাম না বলে অনীতা নোট ক'খানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চলে গেল।

অনীতা চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণান এলেন। আমার পাসপোর্ট আর টিকিট তিনি সংগে করে নিয়ে এসেছেন। বললেন, "এই পাসপোর্ট বিলেত পর্যন্ত। বিলেতে দু'দিন থাকবেন। বিলেত থেকে ফ্রান্সে আসতে কোন অসুবিধা নেই। ফ্রান্সে আপনি দ্বিতীয় একটি জাল পাসপোর্ট পাবেন। তাই নিয়ে সোজা ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত লম্বা পাড়ি। তারপর সেখান থেকে মস্কো যাওয়ার অতি উত্তম ব্যবস্থা আছে। লোভ হচ্ছে, আপনার সংগে আবার একবার মক্কা দর্শন করে আসি।"

"অসুবিধা না থাকলে চলুন না?"

"অসুবিধা অনেক। সে যাক। পুরনো কথা ভেবে আর লাভ নেই; কৃষ্ণসাগরের তীরে ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমফারপোলের কথা মনে পড়ে। বড় বড় স্বাস্থ্যনিবাস। শ্রমিকরা সব ছুটির দিনে সেখানে আসে। ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে যায়। একদা জারদের মজা লুটবার জায়গা ছিল ক্রিমিয়া। আমিও কিছুদিন ওখানে ছিলাম স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্য। একটি পয়সা লাগেনি। সব খরচা ছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রের। প্রকৃত পক্ষে ঐখান থেকেই আমি নাম বদলে মধ্য-প্রাচ্যে সরে পড়ি। কৃষ্ণসাগরের ওপর দিয়ে মধ্য-প্রাচ্যের সংগে যে-সব ব্যবসা বাণিজ্য হয় তার প্রবেশদ্বার এই সিমফারপোল। বহু রকমের লোক এখানে আসে। লম্বা আচকান পরা পারসীক, বাজপাখীর ঠোঁটের মত নাক-ওয়ালা আর্মেনী সাহেব, লম্বা দাড়িওয়ালা তাতার বণিক, বস্তার মত ঢোলা প্যাণ্ট পরা তুর্কী এবং বোরকায় আবৃত মুসলিম সুন্দরী সবই আপনি সে-অঞ্চলে দেখতে পাবেন। ওহো! কি মজাই না করতাম আমি কমরেড সলোকভের বাড়িতে। গুপ্তচরবৃত্তি শিখতাম আমি তাঁর কাছে। ত্রিসগিরাই বুলোভার্দে তাঁর মনোরম ভিলার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। এই যাঃ। ক'টা বাজল? চলুন মিঃ চৌধুরী। ছু'মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন।"

আমি বললাম, "ছু'মিনিট কেন? আমি তো তৈরি।" গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। মনে হ'ল ক্রিমিয়ার সীমান্ত গোয়াবাগান থেকে খুব বেশি দূর নয়। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সামনে এসে তিনি বললেন, "আন্দ্রিয়েভ বাহান্ন নম্বর কামরায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আধ ঘণ্টা পর আবার আসব।" কৃষ্ণান 'ভয়েড এণ্ড ভয়েড' লেখা ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে ওয়াটারলু স্ট্রিটের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

বাহান্ন নম্বর কামরায় আন্দ্রিয়েভ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞাসা করল, "টিকিট আর পাসপোর্ট পেয়ে গেছেন তো?" বললাম, "হাঁ, পেয়েছি।"

"লণ্ডনে মিঃ নারায়ণ আপনাকে রাস্তাঘাট বাৎলে দেবেন। আপনার লণ্ডনের ঠিকানা তিনি জানেন। লণ্ডনে পৌঁছবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে আপনার সংগে দেখা করবেন। মিঃ নারায়ণ ভারত সরকারের কর্মচারী। অতএব কোন ভয় নেই। প্যারিসে আপনার সাহায্যের জন্য আছেন গুরুনারায়ণ সিং। ফিনল্যাণ্ডে আমাদের স্বাধীনতা খুবই বেশি। প্যারিস থেকে যে-উড়োজাহাজে আপনি যাবেন তার ক্যাপটেন হচ্ছেন কমরেড হাইড, অষ্ট্রেলিয়ান্। আশা করি আপনার কোন অসুবিধা হবে না। মস্কোর বিমানঘাঁটিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের লোক থাকবে। মস্কোতে কত দিন থাকতে হবে সে-কথা আমরা কেউ জানি না। আমরা অবিশ্যি দু'মাস আগেই খবর পাব। যাওয়ার আগে আপনার যদি কোন আদেশ থাকে তা হ'লে আমি কিংবা ওল্‌গা তা সর্বান্তঃকরণে পালন করব।"

আমি বললাম, "অনীতা আর ক্রুং কারসিয়ংএ থাকবে। ওল্‌গা কাকীমার ওপর আদেশ রইল তিনি যেন ওদের দেখাশুনা করেন।"

"মিঃ চৌধুরী, আমরা সিমেনসের কাছ থেকেও আদেশ পেয়েছি। হাঁ, আর একটা কথা। প্যারিসে আপনি দীপক চৌধুরী বলেই প্লেন থেকে নামবেন। ফিনল্যাণ্ডে যাওয়ার মুখে আপনি নাম নেবেন কিশেনলাল। কিশেনলাল দেখতে ঠিক আপনার মতই ছিল। বেচারী মারা গেছে স্পেন দেশের বার্সিলোনাতে। আর ক'দিন পরে পিকিং দিয়ে যাওয়া আসার আরও সুবিধা হবে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।" এই বলে আন্দ্রিয়েভ আমায় সামরিক কায়দায় স্যালুট করল।

বিলেত রওনা হবার দিন ঠাকুরদাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন, "ভগবান তোর মঙ্গল করুন। দীপু, ফিরে এসে আমায় যদি না দেখিস, তা হ'লে জানবি, আমি আর্ট-গেলারিতেই আছি। তোর দিকে চেয়ে থাকব অনেক আশা নিয়ে। সব চেয়ে বড় আশা, চৌধুরী পরিবারকে তুই এক-দিন মহিমান্বিত করবি। তোর সন্তান-সন্ততিরা যেন গোয়াবাগানের প্রাচীন

মাটিতে নতুন করে সার ফেলতে পারে। বেদ বেদান্তের মাটি, একটু উল্টে-পাল্টে দিতে পারলে এইখানেই আবার মহামহীরুহের জন্ম হবে। তোর ছোট-কাকার মত বিদেশী পণ্য নিয়ে দেশে ফিরিস না। দীপু, আমি তোর বাবাকে বলে রেখেছি, জ্ঞানশংকর যেন আমার মুখাগ্নি না করে।"

আমি বললাম, "দাদু, আমি ফিরে এসেও তোমায় দেখতে চাই, আর্ট-গেলারিতে নয়, এই ঘরে।" ঠাকুরদার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "যদি মরিই তা হ'লে গোয়াবাগানের আভিজাত্য নিয়েই মরব। দুঃখ কি ভাই? গোয়াবাগান তো রইল। তোর সযত্ন পরিচর্যায় এর প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হোক। কাছে আয় দীপু।" আমি এগিয়ে গেলাম ঠাকুরদার কাছে। চিৎ হয়ে শুয়ে ঠাকুরদা আমায় তাঁর বুকের ওপর চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, "ভগবান আমায় রক্ষে করেছেন। জ্ঞানশংকর গোয়াবাগানের মাটিতে হাত দিতে পারেনি!"

আমি সরে এলাম। দমদম্ বিমানঘাঁটিতে আমার বড্ড একা একা লাগছিল। কেউ আসেনি আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। আমি জানি লক্ষ্মী বেঁচে থাকলে আসত। তারপর উড়োজাহাজ গর্জন করতে করতে আকাশে উড়ল। কলকাতার আকাশ শেষ হতে বেশি সময় নিল না। জানলার পর্দা টেনে দিলাম। আমি ট্যুরিষ্ট নই; কম্যুনিষ্ট। ভারতের ফাঁকা আকাশে দেখবার কিছুই নেই। আমি বই খুলে বসলাম, 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া।'

মস্কোর শেল্‌কোভিস্কি বিমানঘাঁটিতে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি। পররাষ্ট্র দফতরের কমরেড খিরভ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সংগে তাঁর কচি কলাপাতা রং-এর একখানা ক্যাডিলাক্ গাড়ি। গাড়িতে উঠেই আমি বললাম, "আমায় আগে লেনিনের সমাধি-মন্দিরে নিয়ে চলুন। ফুলের মালা কোথায় পাওয়া যাবে?"

ক্যাডিলাক্ রাস্তার মোড় ঘুরল। আমরা মস্কোর সেণ্ট্রাল মার্কেটে এলাম। শহরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে কিছু দক্ষিণে এই বাজারটি অবস্থিত। মস্ত বড় বাজার, বেশ কয়েক বিঘা এর আয়তন বলে মনে হ'ল। কলকাতার নিউমার্কেটের মত সাজানো গোছানো নয় বটে, তবে লোকের ভিড় খুব বেশি। ড্রাইভারের পাশে একজন লোক বসে ছিলেন। আমি জানি তিনি ওগ্‌পু পুলিসের একজন বড় কর্মচারী। কমরেড খিরভ আমার সংগে পরিচয় করাননি। সেণ্ট্রাল মার্কেটে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াতেই পুলিসের কর্মচারীটি আগেই নেমে পড়লেন। আমরা দু'জন তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমি লক্ষ্য করলাম ওগ্‌পুর কর্মচারীকে অনেকেই চেনে। যারা চেঁচামেচি করে দু'দিকের দোকান থেকে সওদা করছিল তারা নিমেষের মধ্যেই চুপ হয়ে গেল। প্রত্যেকের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। এই গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্তার নাম লরেণ্টি বেরিয়া।

ফুল কিনে নিয়ে আমরা সেই রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে এলাম। জনসাধারণের আলাপ আলোচনা শুনতে পেলাম না। শহুরে বাবুদের মত তাদের জামা কাপড়ে চাকচিক্য নেই। বিলাতি গ্যাবার্ডিনের মত জামা কাপড়ের বুননি তেমন ভাল নয়। ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তেরাও এই ধরণের জামা কাপড় পরলে খুসি মনে পরে না। টাকার অভাবের জন্য তাদের পরতে হয়। বাজারের অন্যদিকটা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেই কমরেড খিরভ বললেন, "আমাদের হাতে বেশি উদ্বৃত্ত সময় নেই।" অতএব বাজারের অন্যদিকটা দেখতে পারলাম না।

রেড স্কোয়ারে সময় মত এসে পৌছলাম। লেনিনের স্মৃতিমন্দির এইখানে। আমি দেখলাম রুসিয়ার কৃষাণ ও শ্রমিকরা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে লেনিনের মরা-দেহ দর্শন করবার জন্য। লম্বা লাইনটা দেখে আমি অনুমান করলাম, এক মাইলের চেয়ে বেশি লম্বা। শহুরে বাবুদের সংখ্যা তাতে খুবই কম বলে মনে হ'ল। কৃষাণ এবং শ্রমিকরা এমন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে যেন ওরা সব তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছে। তীর্থের বড় বিগ্রহ কমরেড লেনিন। রুসিয়ার জনসাধারণেরা লেনিনকে কেবল বিশ্ববিপ্লবের পুরোহিত বলে মনে করে না; তিনি ওদের কাছে সেণ্ট লেনিন। খৃষ্টীয় ভক্তি শ্রদ্ধার স্পষ্ট ছবি দেখলাম বিশ্বাসীদের ভাবভংগিতে। শুনেছি রুসিয়ার জনসাধারণ চিরদিনই অত্যন্ত গভীর ধর্মবিশ্বাসী। গির্জের দরজা বন্ধ বলে কি ওরা ওদের লুকনো ভক্তি সব লেনিনের কাছে নিয়ে এসেছে? লেনিনের স্মৃতিমন্দির হয়তো বা কেবল উপলক্ষ্য। তা যদি হয় তবে গত পঁয়ত্রিশ বছরে জনসাধারণের মন থেকে ভগবানকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। আমার মনে আবার খোঁচা লাগল। সমাধি-মন্দিরের ছোট্ট ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম, জনসাধারণ কস্মিন্‌কালেও শিক্ষিত হবে না। ধর্মের আফিম তারা প্রকাশ্যে না খেলেও লুকিয়ে লুকিয়ে খাবেই। মার্কসবাদের মূল নিয়ে এরাও টানাটানি করছে। কমরেড খিরভ অত্যন্ত গর্বের সংগেই ঘোষণা করলেন, "এর চাইতেও বেশি ভিড় হয়।" আমি বললাম, "তাতে আমার ভয় আরও বাড়ল।"

"কেন?"

"সন্দেহ হচ্ছে এদের ভক্তির সবটুকুই মৃত লেনিন পাচ্ছেন না।"

"তবে?"

"বেশির ভাগই বেথেল্‌হেমের মাটিতে গিয়ে পড়ছে। ভক্তির স্রোত রুদ্ধ বলেই রেড স্কোয়ারের বাঁধে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু বাঁধ যেদিন ভাঙবে সেদিন শেষ বিন্দু পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ দিকেই যাবে। এদের দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে কমরেড খিরভ।"

সে-মন্দিরে সব চেয়ে বেশি চেঁচামেচি সে-মন্দিরে সব চেয়ে বেশি গলদ।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে সমাধি-মন্দিরের ছোট্ট দরজার সামনে দাঁড়াতেই লালফৌজের দু'জন সৈনিক এসে রাস্তার ভিড় সরিয়ে দিল। লম্বা লাইনটা একেবারে ক্রেমলিনের প্রাচীরের পেছন দিক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। রেড স্কোয়ার থেকে ক্রেমলিন এক দৌড়ের রাস্তা। ক্রেমলিনের রক্ষিদলের সৈনিকরাই লেনিনের সমাধি-মন্দিরে চব্বিশঘণ্টা পাহারা দেয়। ফটক দিয়ে আমরা ভেতরে গেলাম। সমাধি-মন্দিরটি লাল এবং কালো পাথর দিয়ে তৈরি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মদাতা একটা কাচের বাক্সে উপস্থিত চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন। লক্ষ্য করলাম, একটি অতি সাধারণ খাকি গেবার্ডিনের পোষাক তখনও লেনিনের মৃতদেহে পরিয়ে রাখা হয়েছে। মনে মনে রাগ হ'ল। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ল্যাঙ্কেশায়ার কিংবা ইয়র্কশায়ারের মত বস্ত্রশিল্প এখনও উন্নতি লাভ করেনি। তোমরা বিদেশ থেকে ক্যাডিলাক্ গাড়ি আনাতে পেরেছ আর সাড়ে তিনগজ ডবল বহরের গেবার্ডিন আমদানি করতে পারনি কেন? আমাদের ক্যালিকো মিলের কাপড়ও এর চেয়ে অনেক ভাল।

কাচের বাক্সটার মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর ফুল সাজানো রয়েছে। অনেক রকমের ফুল। কাগজের নয়, সত্যিকারের ফুল। আমি ফুলের তোড়াটি ঐ খানেই রাখলাম। পাঁচ মিনিট চেয়ে রইলাম লেনিনের মুখের দিকে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল জগতের কোটি কোটি মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান-স্বপ্ন লেনিনের চোখের চারদিকে কোথাও নেই। তিনি যেন চেয়ে আছেন সৃষ্টি-রহস্যের দিকে। রুসিয়ার মাটিতে কেমন করে এমন সুন্দর সুন্দর ফুল জন্মাল তাই হয়তো তিনি ভাবছিলেন। সোভিয়েট রুসিয়ার ফুলগুলোর কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্ববিপ্লবের আগুনে একটি পাপড়ি পর্যন্ত পুড়তে পারেনি। তবে কি চিরন্তন সত্য বলে কোন সত্য আজও বেঁচে আছে? সত্য যদি চিরন্তন হয় তা হ'লে সেই সত্যের সৃষ্টিকর্তাও কি তবে চিরন্তন? কি জানি, গমগাছের বস্ত্র দিয়ে জীবনের সবটুকু ক্ষিধেই হয়তো মেটে না। আমি বললাম, "কমরেড চলুন।"

আমরা 'মস্কোভা' হোটেলে এলাম। মস্কোর তিনটে বড় হোটেলের মধ্যে এটাও একটা। হোটেল মেট্রোপোল কিংবা 'ন্যাশনালে' বেশি ভিড় বলেই সম্ভবত আমায় এখানে নিয়ে এলেন কমরেড খিরভ। আমায় বললেন, "আপনি একটু কফি খেয়ে নিন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি তো এখানেই থাকব?"

"কথা তাই ছিল। কিন্তু বোধহয় শেষ মুহূর্তে ব্যবস্থার একটু অদল বদল হয়েছে।"

তিনি চলে গেলেন। হোটেলের দরজায় ম্যানেজার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার মনে হ'ল তিনি যেন কমরেড খিরভকে গোপনে একটা সংবাদ দিলেন।

আমি নিঃশব্দে কফি পান করতে লাগলাম। টেবিলের ওপর দৈনিক 'প্রাভদা' পড়েছিল। আমি তাই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। কফি খাওয়ার জন্য সেই সময়ে লাউঞ্জে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। আমি জানি উপস্থিত আমি এখন ওগ্‌পু-রাজ্যের বিশেষ অতিথি। বাইরের জগৎ থেকে আমাকে তাই বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে কমরেড খিরভ ফিরে এলেন। বললেন, "এখানে বাইরের লোকের বড্ড বেশি আনাগোনা। আপনাকে আমরা অন্য হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি এসে উঠলাম 'মস্কোভা'র চাইতে ছোট একটা হোটেলে। হোটেলের নাম 'সিলেক্ট'। পররাষ্ট্র দফতরের সন্নিকটে এই হোটেলের অবস্থান। জায়গাটার নাম 'স্ট্রেটেংকা'। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম সিলেক্ট হোটেল জনসাধারণের থাকবার জায়গা নয়। ওগ্‌পু পুলিসের বড় বড় কর্মচারীরাই এখানে থাকেন। কমরেড খিরভ বললেন, "আশা করি আপনার কোন অসুবিধা হবে না এখানে।" আমি বললাম, "না, না। অতি সুন্দর জায়গা। আমার খুব ভালই লাগছে।"

"তা হ'লে এবার চলুন আমরা ক্রেম্‌লিনে যাই। যাওয়ার সময় হয়েছে কমরেড।"

আমি কাপড় বদলে নিলাম। বাইরে সেই ক্যাডিলাক্ দাঁড়িয়ে ছিল। ওগ্‌পু পুলিসের কর্মচারীটিও ছিলেন। কমরেড খিরভ এবার তাঁর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর নাম কমরেড কারাজোভ, পররাষ্ট্র দফতরে কাজ করেন বলে তিনি উল্লেখ করলেন।

রেড স্কোয়ারের সংলগ্ন ক্রেমলিনের বিরাট অট্টালিকা। আমরা ক্রেমলিনের 'আইভারস্কি-গেট' দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এই গেট দিয়ে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা কমরেড স্টালিনের বিশেষ বন্ধু স্থানীয় লোক। গেটের সামনে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দু'জন সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল। একজন অফিসার এসে পাস্ দেখতে চাইলেন। কমরেড খিরভ দুটো পাস্ বার করে অফিসারের হাতে দিলেন। কমরেড কারাজোভের পাসও তিনি নিয়ে নিলেন। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে তিনি টেলিফোন করতে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে তিনি নিজেই আমাদের নিয়ে চললেন। একটা লিফ্‌টের সামনে এসে অফিসারটি বললেন, "সেণ্ট্রাল কমিটির অফিসে সোজা চলে যান।"

আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। ক'তলা পর্যন্ত উঠলাম আমি তা আন্দাজ করতে পারলাম না। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে একটা করিডোর দিয়ে আমরা ডান দিকে হাঁটতে লাগলাম। কমরেড সেলেনকভের সেক্রেটারি আমাকে মাঝপথেই অভ্যর্থনা করলেন। কমরেড খিরভ আর কারাজোভ ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেক্রেটারির সংগে আমি একটা ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করলাম। আমাদের বসতে বলে তিনি নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের আসবাব। মাঝখানে একটা সেণ্টার-টেবিল আছে। আসবাবগুলোতে খুব রুচির পরিচয় পাওয়া গেল না। একটু পরে সেক্রেটারি ফিরে এসে বললেন, "কমরেড সেলেনকভ গেছেন কমরেড স্টালিনের সংগে দেখা করতে। একটু অপেক্ষা করুন। চার মিনিট। এর ওপর তলাতেই কমরেড স্টালিনের কামরা। কামরাটির নাম 'কর্নার'। সেখানে তিনি বিশ্রাম করেন। আপনি

খুব ভাগ্যবান। মনে হয় কমরেড স্টালিন ওখানেই আপনাকে ডাকবেন।" উনিশ-শ' বাহান্ন সালে কমরেড স্টালিন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর। আর আমি গোয়াবাগানের দীপক চৌধুরী এসেছি সেই অধীশ্বরের সংগে দেখা করতে! এমন করে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করতে কেউ পেরেছে বলে আমার স্মরণ হ'ল না। আমি ভেতরে ভেতরে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বাইরে কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করলাম না।

চার মিনিট পরে আমি কমরেড সেলেনকভের সংগে করমর্দন করলাম। সেক্রেটারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরখানা খুব বেশি বড় নয়। টেবিলে একটি মাত্র ফাইল রয়েছে। লেনিন ও স্টালিনের ছবি টাঙানো আছে দেওয়ালে। স্টালিনের পর সেলেনকভ যদি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর নির্বাচিত হন সেদিন অবিশ্যি তাঁরও ছবি টাঙানো হবে। টেবিলের ওপর রং বেরংএর পাঁচটি টেলিফোন। এই পাঁচটি টেলিফোনের মধ্যে দিয়েই তিনি দুনিয়ার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ঘরের একদিকে একটা 'ডিভান' রয়েছে। শুনেছি সেলেনকভের পারিবারিক জীবন বলে আলাদা কোন জীবন নেই। বাইশ ঘণ্টা কাজ করবার পর তিনি এই ডিভানে শুয়ে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন। তাতে রক্তের চাপের কোন তারতম্য হয় নি। ট্রাক্টরের কলকব্জা নড়েচড়ে যেতে পারে কিন্তু সেলেনকভের স্বাস্থ্য কখনও ঢিলেঢালা হয় না। মানুষ-মেসিনের মধ্যে সেলেনকভ শ্রেষ্ঠ মেসিন। চেয়ারে বসবার সংগে সংগে তিনি ফাইল খুলে বসলেন। ফাইলের দিকে চোখ রেখে বললেন, "তোমাকে আমরা ডেকে এনেছি এই জন্য যে, ভারতবর্ষের 'ইনসারেকশান' তোমার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের দক্ষতার উপর বিশ্বাসী। পাকা বুর্জোয়া যদি করিতকর্মা লোক হয় তবে তার প্রলিটারিয়েট বংশোদ্ভূত হওয়ার দরকার নেই। শ্রেণী সংগ্রামকে যদি বুর্জোয়ারাই জয়ী করে তুলতে পারে তবে বুর্জোয়ারাই নমস্য। অতএব আমি চাই কেবল কাজের ক্ষমতা। এবং কাজ বলতে আমি বুঝি ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থাকে একেবারে ধুলোর

মত উড়িয়ে দেওয়া। মার্কসবাদের বিশ্ববিপ্লব কেবল থিওরি নয়, প্রত্যক্ষ প্রলয়। পুঁজিবাদী ইংগ-মার্কিনের সাম্রাজ্যবাদের যমদূত এই কম্যুনিজম। কমরেড চৌধুরী, আমাদের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নাম হবে বিশ্বরাষ্ট্র। ডলার সাম্রাজ্যে শোষণ আছে, রুবল সাম্রাজ্যে শোষণ নেই। দুনিয়ার তিন-শ' কোটি মানুষের রুটির সংস্থান আমরা করব। সেই জন্য মন্দির, মসজিদ কিংবা গির্জাতে গিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার হবে না। আমাদের কাজের প্রোগ্রাম—ভারতবর্ষের সামরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর জানতে চাই। ইংগ-মার্কিনের সামরিক ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের মাটিতে কতটা দানা বেঁধেছে আমরা তার প্রতিটি খবর জানব। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আমেরিকা কোটি কোটি ডলার ফেলেছে সেকথা অস্বীকার করব না। আমাদের উদ্বৃত্ত টাকা থাকলে আমরাও দিতাম। কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য নয়। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আমার এবং তোমার শেষ উদ্দেশ্য। অতএব আমেরিকার ডলার যাতে ভারতবর্ষের শ্রমিক কিংবা কৃষকদের হাতে না আসে তার একটা প্ল্যান তোমাকেই দিতে হবে। তোমার ফাইল দেখে মনে হচ্ছে সেই ফ্রণ্টে কোন কাজ তুমি করতে পারনি।"

আমি হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। বললাম, "খানিকটা কাজ হয়েছে। আমার হিসাব মত ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথম কিস্তিতে যে-টাকাটা ধার এনেছিল তার শতকরা সত্তর ভাগ টাকা সত্যিকারের কোন কাজে লাগে নি। এ-হাত ও-হাত হয়ে অন্যদিকে চলে গেছে। কৃষকদের কোন কাজে আসেনি। অতএব কৃষির কোন উন্নতি হওয়া অসম্ভব।"

সেলেনকভ বললেন, "ডোব্রো, ডোব্রো। (ভালো, ভালো।) প্রোগ্রামের তৃতীয় নম্বর আইটেম, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মাটিতে কম্যুনিজমের চারাগাছ আরও বেশি করে এবং ঘন ঘন ভাবে লাগাতে হবে। আমার বিশ্বাস, এই ফ্রণ্টে ভারতবাসীর প্রতিরোধ ক্ষমতা সব চেয়ে কম। প্লেখানভ এই সম্বন্ধে অতি

গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞান রাখতেন।" এই বলে তিনি বাঁ দিকের ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করলেন। দশ মিনিট পর্যন্ত অনেকগুলো পাতায় চোখ বুলতে লাগলেন। তারপর বললেন, "প্লেখানভ হরপ্পা এবং মহেন-জো-দরোর সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, হিন্দুর সমাজজীবনে এত বেশি ভাঙ্গন ধরেছে যে, কম্যুনিজমের মত এত বড় প্রবল আক্রমণ তারা কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না। অস্ত্রের প্রতিরোধ কোনদিনই কার্যকরী হয় না যদি অস্ত্রের পেছনে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ না থাকে। প্রতিরোধের সেই স্পৃহাটাকে যদি আমরা ভেতর থেকে ভেঙ্গে দিতে পারি তা হ'লে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থ আইটেম, ভারতবর্ষের রাজনীতির মরা নদীতে কম্যুনিজমের বালি ফেলতে হবে আরও কোটি কোটি টন। অর্থাৎ কংগ্রেস যে-রাজনীতি করছে তার প্রতি জনসাধারণের মনে কেবল বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করলেই চলবে না, রাজনীতির প্রতি তীব্র অবিশ্বাস ও ঘৃণা জন্মিয়ে দিতে হবে। নেতৃত্বের সব চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মানো। এই বিশ্বাস সব সময়ই নীতিগত। ভারতবর্ষের যা অবস্থা তাতে একাগ্নভাগ লোকের মন থেকে বিশ্বাসের শেকড় কেটে দেওয়া খুব অসম্ভব নয়। মূলহীন গাছ যেমন বাঁচে না, নীতিহীন মনুষ্য-সমাজও তেমন মরে যায়। মরবার পূর্ব-মুহূর্তটা আমাদের প্রয়োজন। কারণ সেই মুহূর্তেই বিপ্লবের সুরু। ইনসারেকৃসন!!"

সেলেনকভ প্লেখানভের ফাইলটা একরকম ছুঁড়েই ফেলে দিলেন মাটিতে। ঘড়িতে সময় দেখলেন। তারপর বললেন, "সামরিক বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় কথা শত্রুপক্ষের আসল শক্তির মূল খুঁজে বার করা। সেখানে যদি কোন ভুল না হয় তা হ'লে বাকিটুকু অপেক্ষাকৃত অনেক সোজা। চলো এবার যাই। কমরেড স্টালিন খুবই ব্যস্ত। তবু তিনি তাঁর প্রাইভেট কামরায় তোমার সংগে দু'মিনিটের জন্য দেখা করতে সম্মত হয়েছেন।"

আমরা ওপরের তলায় উঠলাম। সামনেই 'কর্নার'। সর্ব শরীরে আমার

রোমাঞ্চের ঢেউ বইতে লাগল। আমরা দু'জনেই কামরায় প্রবেশ করলাম। একটা আরামকেদারায় কমরেড স্টালিন শুয়ে ছিলেন। কমরেড সেলেনকভ বললেন, "কমরেড দীপক চৌধুরী—।" একটু হেসে কমরেড স্টালিন বললেন, "আশা করি আমার পরিচয়ের দরকার হবে না?" তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি করমর্দন করতে পারলাম না। হাতখানা সোজাসুজি চেপে ধরলাম। নির্ভরযোগ্য হাত! দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা হাত! মনে হ'ল তাঁর হাতের চেটোয় বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ঘরখানা খুবই ছোট। আসবাব ক'খানা জারদের আমলের। সোভিয়েট রাষ্ট্রের তৈরি নতুন আসবাব নয়। কমরেড স্টালিন বললেন, "তোমার কাজের খবর কিছু কিছু আমি রাখি।" তারপর একটু হেসে, কমরেড সেলেনকভের দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, "আমাদের সময় সোজাসুজি ডাকাতি করে পার্টির জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হ'ত। কিন্তু আজকাল টাকা সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো খুবই সায়ানটিফিক্, বিজ্ঞানসম্মত। কমরেড চৌধুরীর বিশ লক্ষ টাকার ইতিহাস চমকপ্রদ নয়, অথচ সবাইকে চমৎকৃত করেছে।" আরও দু'একটা কথা হ'ল। তিনি আমার শুভ কামনা করলেন। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সামনেই কমরেড খিরভ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে আমায় তুলে দিয়ে কমরেড সেলেনকভ বিদায় নিলেন। বললেন, "সোমবার দিন আবার দেখা হবে সকাল সাড়ে দশটায়।"

কমরেড খিরভ গাড়িতে বসে বললেন, "চলুন, আপনাকে আমাদের লুবিয়াংকা দেখিয়ে নিয়ে আসি। ওগ্‌পু পুলিসের হেড অফিস। আমাদের গুপ্ত পুলিস অন্যান্য দেশের মত আদর্শহীন একদল ভাড়াটিয়া উৎপীড়কের প্রতিষ্ঠান নয়। শ্রেণী সংগ্রামের শত্রু আমাদের চতুর্দিকে। অতএব সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ওগ্‌পু পুলিস দৃষ্টি রাখে পৃথিবীর সর্বত্র। সোভিয়েট রাষ্ট্র বলতে আমি এখানে কমিউনিষ্ট বিশ্বের পিতৃভূমি বলেই গণ্য করেছি।"

লুবিয়াংকা স্কোয়ারের সামনেই দেখলাম বিরাট এক অট্টালিকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই অট্টালিকা কেবল চোখ বুজে দাঁড়িয়ে নেই। শ্রেণীসংগ্রামের যারা শত্রু তাদের দিকে চেয়ে প্রতিনিয়ত পাহারা দিচ্ছে। এর দৃষ্টি কেবল রুসিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়। এর দৃষ্টি ছেয়ে আছে সমগ্র বিশ্বে।

কমরেড খিরভের সংগে লুবিয়াংকায় প্রবেশ করলাম। লিফ্‌টে করে তিন তলায় উঠলাম। লম্বা করিডোর। তার দু'দিকে ঘর। দশ গজ দূরে দূরে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম বাঁ পাশের ঘর থেকে কমরেড প্লেখানভ বেরিয়ে এলেন। সাদা আর নীল রং-এর কয়েদি-পোষাক পরা! তাও জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। মুখে দাড়ি গজিয়েছে। খুবই রুগ্ন বলে মনে হ'ল। আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই প্লেখানভও দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমায় চিনতে পেরেছেন। আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসতেই একজন প্রহরী তাঁকে বন্দুকের গোড়া দিয়ে গুতো মারল। ধাক্কা খেয়ে প্লেখানভ পড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লুবিয়াংকার প্রাচীরে হাত ঠেকিয়ে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। কমরেড খিরভ বললেন, "মৃত ট্রটস্কির গুপ্তচর ছিল ঐ প্লেখানভ। অনেক দিন পর্যন্ত আমরা ওকে ধরতে পারিনি।" নিজের মতামত ব্যক্ত করলাম না। নিঃশব্দে খিরভকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলাম।

একটা কামরায় আমরা প্রবেশ করলাম। কমরেড কারাজোভ উঠে এসে আমায় স্বাগত জানালেন। টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল ছিল। কমরেড খিরভ বললেন, "কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডোসিয়ার।" আমার নিজের হাতে লেখা একটা ডোসিয়ার তুলে নিলাম। আমার জীবন-চরিত লুবিয়াংকায় সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে দেখে খুসি হয়েছি। কমরেড কারাজোভ একটা ডোসিয়ার আমার হাতে দিয়ে বললেন, "কমরেড জ্ঞানশংকর চৌধুরী আপনার কাকা?"

"হাঁ।"

"তাঁর সম্বন্ধে বোধহয় সব কথা জানা নেই।"

"না। তবে তিনি যে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে আপনাদের সংগে যোগাযোগ রাখেন তা আমি জানি।"

কমরেড খিরভ এবার বললেন, "আপনি সব ডোসিয়ারগুলো পড়ুন। আমরা এক ঘণ্টা পরে আসব।" ওঁরা দু'জনে চলে যাওয়ার পর আমি মুহূর্ত কয়েক অভিভূতের মত বসে রইলাম। প্লেখানভের চেহারাটা বার বার করে মনে পড়তে লাগল। কমরেড লোপোনের বাড়িতে আমি তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু লুবিয়াংকার কারাগার থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আজ আর কেউ নেই। হয়তো তিনি রক্ষা পেতে চাইছেন না। মুহূর্তের জন্যও তিনি মুক্তি পেতে চাইছেন না। ভাষাবিদ প্লেখানভ স্বীকার করেছেন তিনি দোষী। পশমবিক্রেতা প্লেখানভ পার্টির জন্য মৃত্যু বরণ করাটাই চরম গৌরবের বলে মনে করেন। পার্টি কখনও ভুল করতে পারে না। তিনি হয়তো সত্যসত্যই বিশ্বাস করছেন যে, তিনি মৃত ট্রটস্কির গুপ্তচর ছিলেন। কনফেসনের মধ্যে প্লেখানভ নিজেকে হত্যা করলেন বটে কিন্তু কম্যুনিষ্ট জীবনের আদর্শকে তিনি অকলঙ্ক রেখে গেলেন। লুবিয়াংকার কারাপ্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে এখন যদি তিনি মরতে পারেন তবে তাতে বীর্যবান কম্যুনিষ্ট জীবনের জয় ঘোষণাই থাকবে।

ঘরখানায় একটা সোফা ছিল। আমি সোফাতে অর্ধশায়িত হয়ে ছোটকাকার সব খুঁটিনাটি জীবনবৃত্তান্ত পড়তে লাগলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে বহু বিশিষ্ট ভারতীয়দের পুরো আলেখ্য দেখতে পেলাম এই সব ডোসিয়ারে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি কলকাতায় ফিরে গেছি। ঝুকুর লেখা বিনয়প্রকাশ সম্বন্ধে গুপ্ত রিপোর্টও দেখলাম। বিনয়প্রকাশ সম্বন্ধে কোন কথা বাদ নেই। তারপর ঝুকুর ডোসিয়ার পড়তে গিয়ে দেখি সবটাই বিনয়প্রকাশের লেখা। লম্বা ইতিহাস। আমাদের পরিবারের অতি গোপন খবরও আছে। মনে পড়ল সিমেনস আমায় বলেছিলেন, "পার্টি আমাদের মনোলিথিক, এক প্রস্তর স্তম্ভ।" লুবিয়াংকার এক নির্জন কামরায় বসে ভারতবর্ষের এমন

ঘটনাবহুল নিখুঁত ইতিহাস পড়তে ভালই লাগছিল। প্রতিটি মানুষ যেন স্পষ্ট ও পরিচিত। দেশে থাকতে এঁদের কাউকে আমি চিনতাম না। লুবিয়াংকায় বসে প্রত্যেকটি ভারতীয়কে আমি চিনলাম। এক ঘণ্টা পর কমরেড খিরভ এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কমরেড গুহকে চেনো?"

"না।"

"আজ দু'মাস থেকে তিনি মস্কোতেই আছেন। অসুস্থ।"

"কি অসুখ?"

"তুমি নিজেই একবার তাঁর সংগে দেখা কর। তিনি স্যানাটোরিয়ামে আছেন। অসুখ তাঁর গুরুতর।"

আমি কোন প্রশ্ন করলাম না। তিনিই এবার একটু হেসে বললেন, "অসুখের লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক। বলকানসের প্রায় সবগুলো দেশই তিনি দেখে এসেছেন। তাঁর ধারণা, কোথাও তিনি মার্কসবাদের চিহ্ন দেখতে পাননি।"

আমি বললাম, "তা হ'লে আমার সেখানে গিয়ে কোন লাভ হবে না।"

"হবে। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।"

হোটেলে ফিরে এলাম। কমরেড খিরভ যাওয়ার সময় বলে গেলেন তিনি সন্ধ্যার দিকেই আবার আসবেন।

খাওয়ার টেবিলে আমি একলাই বসলাম। কমরেড গোরীন হোটেলের ম্যানেজার বলে নিজের পরিচয় দিলেন। প্রচুর খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতার যে-কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের চাইতে ভাল। ম্যানেজার বললেন, "এই মাছটার নাম 'কেফাল', খুব সুস্বাদু। কৃষ্ণসাগর ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।" এক টুকরো মুখে দিয়ে বললাম, "সত্যিই ভাল।"

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বড্ড পরিশ্রান্ত লাগছিল। ভাবপ্রবণ বাঙালীর পক্ষে এত উত্তেজনা স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ভোরবেলাই কমরেড খিরভ দরজায় উপস্থিত। ভেবেছিলাম নিজেই আজ মস্কো দেখতে বার হব। কিন্তু হ'ল না। তিনি বললেন, "চলুন, দু'একটা কারখানা দেখবেন।" আমি বললাম, "আমি কম্যুনিষ্ট, ট্যুরিস্ট নই।' আগে আমার কাজ শেষ করতে হবে কমরেড খিরভ।, আজকের কাজের প্রোগ্রাম বলুন।"

"আপনাকে আজ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি ও. শিক্ষাপদ্ধতি দেখতে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, দি ইউনিভার্সিটি অব্ দি পিপলস্ অব্ দি ইস্ট।"

চা পান শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রধানত এসিয়াবাসীদের জন্যই খোলা হয়েছে। সাধারণ লেখাপড়ার ব্যবস্থা এতে নেই। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। গুপ্তচরবৃত্তি, গুপ্ত বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে খবর পাঠানো, সাবোটাজ, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য, সাহিত্যের মাধ্যমে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার এবং গৃহযুদ্ধের টেকনিক ইত্যাদি সম্বন্ধে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েকজন ভারতীয়দের সংগে এখানে পরিচয় হ'ল।' সবশুদ্ধ সাত হাজার ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছেন। মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। বিশ্ববিপ্লবের মহান আদর্শের জন্য এঁরাই তো সব ছড়িয়ে পড়বেন এসিয়ার বিভিন্ন দেশে। এঁদের শিক্ষার সমস্ত খরচ বহন করছে সোভিয়েট দেশ। সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। এমন নিঃস্বার্থ পরিকল্পনার পেছনে মামা নাকি সোভিয়েট রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়েছেন! দৃষ্টিহীন বৃদ্ধের চোখে যৌবনের মহাসত্য কোনদিনও ধরা পড়বে না।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল কাজের মধ্যে দিয়ে। অফুরন্ত কাজ। বড় বড় শিল্পকারখানা দেখবার আমার সময় হ'ল না। মেহনতকারীর রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মারপ্যাচ নেই। অতএব শিল্পকারখানার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বিড়লা ডালমিয়ার পদতলে ভারত রাষ্ট্রের উন্নতি হবে বলে প্রধান মন্ত্রী দিবারাত্র আশ্বাস দিচ্ছেন। হাজার হাজার টন কাগজ খরচ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রচার কার্য চলছে কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত। অথচ গুটিকয়েক কাগজের কারখানায় নাকি তেমন কোন আশাপ্রদ মুনাফা হচ্ছে না! পরিকল্পনা থেকে মুনাফা না এলেও কাগজ বেচে মিল্ মালিকদের প্রচুর লাভ হওয়া উচিত ছিল।

সন্ধ্যার সময় আজ 'আরাগভি' রেস্তোঁরায়ে চা খেলাম। গোর্কি স্ট্রিটে এই রেস্তোঁরা। কমরেড খিরভ নতুন একজন অফিসারের সংগে পরিচয় করালেন। মনে হ'ল তিনি আমাদের জন্যই এই রেস্তোঁরায় অপেক্ষা করছিলেন। অফিসারটির নাম আকুটভ। চা পানের পর কমরেড খিরভ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কমরেড আকুটভ বললেন, "চলুন, আপনাকে একটা ভাষা শিক্ষার নাইট স্কুলে নিয়ে যাই।" প্রত্যেকটা অক্ষর তিনি বাংলা ভাষায় বললেন। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন চমৎকার বাংলা শিখলেন কোথায়?"

"আমাদের নাইট স্কুলে। কমরেড খিরভ আর কমরেড কারাজোভ আমার চাইতেও ভাল বলেন।"

নাইট স্কুলে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কেবল বাঙলা নয় ভারতবর্ষের সব কয়টি প্রধান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কমরেড কারাজোভও ছিলেন। তিনি উপস্থিত তামিল ভাষা শিখছিলেন। শিক্ষক একজন তামিলনাদেরই লোক। শুনলাম তিনি প্রায় দশ বছর ধরে মস্কোতে আছেন। তামিল ক্লাস শেষ হওয়ার পর কমরেড আকুটভ আমায় অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার জন্য। সেল্ফে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বইগুলোই সাজানো আছে। সঞ্চয়িতা থেকে আমি ভারততীর্থ পড়িয়ে শোনালাম।

দু'দিন পর কমরেড গুহর সংগে দেখা করতে গেলাম। তিনি শুয়ে শুয়ে প্রাভদা পড়ছিলেন। নিজের পরিচয় দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন

আছেন আজ?” কমরেড গুহ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন যে ঘরে কেউ আছে কি না। তারপর বললেন, “আমি কোনদিনই অসুস্থ ছিলাম না। আজও নেই।”

“তবে কেন স্যানাটোরিয়ামে আছেন?”

“আমি বন্দী কমরেড চৌধুরী।”

আমি যেন এ-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “বন্দী কেন?”

কমরেড গুহ নির্বিকার ভাবে বলে ফেললেন, “এদের বিশ্ব-কম্যুনিজমের ধাপ্পা আমি ধরে ফেলেছি তাই। আপনি রুসিয়ায় এসে কি দেখলেন কমরেড চৌধুরী? মস্কো আর রুসিয়া কিন্তু একদেশ নয়।”

আমি বললাম, “আমি দেশ দেখতে আসিনি। আমি এসেছি রাজনীতির কাজ নিয়ে।”

একটু হেসে তিনি বললেন, “দেশ আপনি দেখতে পাবেন না। আমি দেখবার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম বলেই তো ওরা আমায় বন্দী করেছে।” জিজ্ঞাসা করলাম, “একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন কি?”

“খুব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার সময় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এই ঘরের চারদিকে গুপ্ত পুলিসের লোক লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছে। অন্তত শুনবার চেষ্টা করছে। তা করুক। আমি যখন আর দেশে ফিরতে পারব না তখন আসল সত্যটা আপনাকে আমি জানিয়েই মরব।”

“বলুন।”

তিনি পুনরায় চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে অতি নীচু-গলায় বললেন, “বিশ্ব-কম্যুনিজম আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব-গ্রাস করা। ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে সবাইকে এই কথাটাই জানিয়ে দেবেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এই ধারণা আপনার কি করে হ'ল কমরেড গুহ?”

"বলকানসের দেশগুলো দেখে। কেবল তাই নয় এদের গোপন পরিকল্পনার ব্লু-প্রিণ্ট আমি দেখেছি। পোল্যাণ্ডের খবর রাখেন? সেখানে কেউ যদি বিনা অনুমতিতে একটা বন্দুক কিংবা টাইপরাইটার রাখে তা হ'লে সে ফৌজদারি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়। বিদেশে কারো কাছে একখানা চিঠি লেখাও অপরাধ। ব্রিটিশ আমলেও ভারতবর্ষে এমন কঠিন ব্যবস্থা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি স্লান্স্কি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম। তিনিও আমার সংগে একমত ছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্লান্স্কি নিজেই আমার সব গোপন কথা ওগ্‌পু পুলিসের কানে তুলে দেয়! আমার ধারণা, স্লান্স্কি একদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনীতি থেকে সরে যেতে বাধ্য হবে। কমরেড চৌধুরী, মস্কোর নাইট স্কুলের খবর রাখেন?"

"রাখি।"

"এদের পরিকল্পনার বাহাদুরি আছে স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষ যদি কখনও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে এদের দখলে আসে তা হ'লে কলকাতা কিংবা দিল্লির কোন্ রাস্তায় কোন্ সেপাই দাঁড়াবে তাও এদের ঠিক করা আছে। কমরেড, লৌহ-যবনিকা বলতে কেবল এই বোঝায় না যে, কতগুলো দেশকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের প্রতিটি কম্যুনিষ্টের মনেও একটা আদর্শগত সীমান্ত টানা হয়েছে। সেই সীমান্তের বাইরে আপনার কিংবা আমার যাওয়ার কোন উপায় নেই। যাওয়ার চেষ্টা করলে বিপদ হবে। আমারও হয়েছে। কম্যুনিষ্ট-মনের এই লৌহ-যবনিকা পৃথিবীর নতুন আশ্চর্য। ইতিহাসে এর কোন পূর্ব-আভাস নেই। শুনলে আপনি অবাক হবেন যে, হাজার বার চেষ্টা করেও আমি রুসিয়া দেখতে পেলাম না।"

"কেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"লৌহ-যবনিকা কেবল বল্‌কানসের সীমান্ত ধরে টানা হয়নি। রুসিয়ার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-যবনিকার কঠিন ব্যবস্থা রয়েছে। গুটিকয়েক 'রেজিম্-

টাউন্' ছাড়া অন্য কোথাও বসবাস করা অসম্ভব। জোঁকের মত ওগ্পু পুলিস আপনার সংগে লেগে থাকবে। নির্দিষ্ট রাস্তার বাইরে পা দিতে গেলে আপনাকে আসতে হবে স্যানাটোরিয়ামে।"

যাওয়ার জন্য এবার আমি উঠে পড়লাম। কমরেড গুহ তাড়াতাড়ি বালিসের তলা থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফস করে আমার প্যান্টের পকেটে গলিয়ে দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখবেন। আর হয়তো আমার সংগে আপনার দেখা হবে না। লুবিয়াংকার বধ্যভূমিতে আমার শেষ বিচার হবে। পুঁজিবাদ-সর্বস্ব কংগ্রেস-শাসনের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমি কামনা করেছিলাম। এখনও করি। কিন্তু ভারতবর্ষকে বাঁধা দিয়ে কংগ্রেস শাসন থেকে মুক্ত হতে আমরা অস্বীকার করছি। আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের মানুষ দিয়েই তৈরি। কমিনফর্ম কিংবা মস্কোর পলিটব্যুরো ভারতীয়দের দ্বারা সংগঠিত নয়।"

আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। করমর্দন কিংবা নমস্কারও একটা করলাম না। বাইরে কমরেড খিরভ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ক্যাডিলাক গাড়িখানা যাট মাইল বেগে বেরিয়ে এলো শহরতলী থেকে। সংগে কমরেড কারাজোভও ছিলেন। গাড়ি এসে একেবারে এক নিশ্বাসে কাজান রেল স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কমরেড কারাজোভ নামলেন। তিনি বাইরে কোথায় কাজে যাচ্ছেন। বলে গেলেন, দু'দিন পরে তিনি মস্কোতে ফিরে আসবেন।

আমরা দু'জনে চলে এলাম লুবিয়াংকার দফতরে। কমরেড খিরভ এসেই শেল্ফ থেকে একটা ডোসিয়ার টেনে বার করলেন। বললেন, "কমরেড গুহর ডোসিয়ার পড়ে দেখুন।" আমি সবটাই অতি দ্রুত গতিতে পড়ে গেলাম। মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারলাম না। পকেটের কাগজটার কথা স্মরণ করে নিজের মনে শঙ্কা এলো। এরা যদি কেউ দেখে থাকে! একটু পরে দু'জন প্রহরীবেষ্টিত হয়ে কমরেড গুহ ঘরে ঢুকলেন। কমরেড খিরভ আমায় বললেন, "বিচার আপনাকেই করতে হবে।"

কমরেড গুহ একটু হেসে বললেন, "জানেন কমরেড চৌধুরী, লুবিয়াংকার এই বাড়িটা জারদের আমলে একটা জীবনবীমার অফিস ছিল?"

আমি বললাম, "আমার জেনে লাভ কি?"

"না, লাভ কিছু নেই। একটা তুলনামূলক কথা মনে পড়ল।"

আমি ধমকে উঠলাম, "রসিকতা শোনবার সময় নেই। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ।"

"জানি। নইলে লুবিয়াংকায় আসব কেন? জীবনবীমার অফিস হলে হয়তো মৃত আত্মীয়ের ওয়ারিস হিসেবে টাকার দাবি নিয়ে আসতাম। উপস্থিত লুবিয়াংকায় কেউ টাকা নিতে আসে না। আসে শবদেহ নিতে। বুখারিনের শবদেহের পচাগন্ধ পাচ্ছি কমরেড চৌধুরী। কেউ কি তাঁর মরা দেহের দাবি নিয়ে আজও আসে নি?"

কমরেড খিরভ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। আপনি এবার শাস্তি দিন।"

আমি বললাম, "ফায়ারিং স্কোয়াড!"

দু'জন প্রহরী সংগে সংগে জুতোয় জুতো ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর গুহকে একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। লুবিয়াংকার বধ্যভূমিতে পৌছতে হয়তো আর দু'চার মিনিট লাগবে। আমি হয়তো গুলির আওয়াজ শোনবার জন্য কান পেতে চুপ করে বসেছিলাম। সহসা কমরেড খিরভ বললেন, "উপযুক্ত বিচারই হয়েছে। চলুন, বল্‌শাই থিয়েটারে আজ একটা ভাল নাটক হচ্ছে দেখবেন।" মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি কমরেড খিরভকে অনুসরণ করলাম। নাটকের হীরো? হয়তো বা আমি নিজেই।

রাত্রিতে শোবার আগে দরজা জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। চান-ঘরের কোথাও কোন ছিদ্র আছে কি না তাও পরখ করে দেখলাম। রাত তখন অনেক। মনে হ'ল সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার আমি পকেট

থেকে কাগজখানা বার করলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, ঘরে এত রাত অবধি বাতি জ্বলছে কেউ যদি টের পায় তা হ'লে বিপদ আসা অসম্ভব নয়। বাতি নিভিয়ে দিলাম। তারপর চান-ঘরে গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে কমরেড গুহর চিঠিখানা পড়তে লাগলাম।

'আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এই চিঠিখানা আমি ভারতবর্ষের সহকর্মীদের কাছে লিখে গেলাম। চিঠির বিষয়বস্তু কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রতিটি অক্ষর আমার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।

'মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই দেখতে পাই মানুষ তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য অবিরাম যুদ্ধ করে এসেছে। স্বাতন্ত্র্যের মূল প্রেরণা তার চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। পরিবেশ তার যত ক্ষুদ্রই হোক, চিন্তার স্বাধীনতার মর্যাদা তার ব্যক্তিজীবনের অমূল্য সম্পদ ছিল। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও স্টালিনবাদের খণ্ডাকার আদর্শের সমষ্টিগত সমন্বয় থেকে এটাই বোঝা গেল যে, এই স্বাধীন-চিন্তাপ্রয়াসী মানুষটিকে সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সরিয়ে ফেলা হ'ল। যারা রইল তাদের এবার নতুন করে শিক্ষা দেওয়ার কাজ সুরু হ'ল। স্বাধীনচিন্তাপ্রয়াসী ব্যক্তির চতুর্দিকে যে-সব বিধিব্যবস্থা ছিল সেগুলোকে গোড়াতেই তাই ভাঙতে হয়েছে। তারপর পরিবার-জীবনের স্নেহ ও ভাল-বাসার শেকড়টি উপড়ে ফেলে সমাজজীবনের প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য-বোধ, বিভিন্ন কৃষ্টিগত জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সহজ সম্পর্ক ইত্যাদির মূলে বলসেভিক কাস্তে চালাবার এক বিরাট আয়োজন হ'ল। কাস্তের আঘাতে কত কোটি মানুষকে যে মরতে হয়েছে তার হিসাব একমাত্র কমরেড স্টালিন জানেন। কারণ তাঁর প্রাক্-বিপ্লবী যুগের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই। তিনি বাঁচতে দেননি। যে দুটি মানুষকে দিয়ে তিনি প্রধানত এই বিরাট উচ্ছেদের কাজ করিয়েছিলেন তিনি তাদের দু'জনকেও আবার উচ্ছেদ করলেন। আপনি নিশ্চয়ই ইয়াগোডা ও ইয়েজহোভের নাম জানেন। এঁরা দু'জনেই ওগ্‌পু পুলিসের বড়কর্তা ছিলেন।

'এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের পর এবার নতুন সমাজ গড়বার কাজ স্থুরু হ'ল। সনাতন নৈতিক বিধিনিয়মগুলোর পরিবর্তে নতুন শাসন ব্যবস্থায় একটা নীতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল বটে কিন্তু নৈতিকতা রইল না। ওঁরা ঘোষণা করলেন, এইটাই দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা নীতি। বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। কারণ 'ব্যক্তি'কে পূর্বেই হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যার প্রেরণা মার্কসবাদ থেকে আসেনি; এটা সম্পূর্ণ ই স্টালিনবাদের মাধ্যাকর্ষণ। ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং তার চৈতন্যের সামগ্রিক পরিশুদ্ধতা পর্যন্ত এক একটি পাকা ফলের মত ঝুলতে লাগল কেবল স্টালিনবাদের গর্তে স্খলিত হওয়ার জন্য। অতএব সোভিয়েট রাষ্ট্রে স্বাধিকার বঞ্চিত মানুষ বিরোধিতা করতে পারল না।

'জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় কঠিন সমস্যাগুলোর সহজ সমাধানের জন্য ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদের ক্ষেত্রটি আরও সংকুচিত করা হ'ল। ডায়লেকটিক্যাল জড়বাদের মধ্যে অনেকাংশে যুক্তির উপহাস থাকলেও হেগেলীয় দর্শনের শেষ পরিণতির দিকচক্রবালে আধ্যাত্মিকতার একটা প্রয়াস ছিল। প্রয়াসটিকে লোকোত্তরিত জীবনের প্রতিভূ বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদে সে-প্রয়াস কেবল লৌকিক জীবনে সীমাবদ্ধ রইল। লেনিনবাদের মধ্যে সীমার কোন প্রশ্নই উঠল না। কারণ যে-প্রাণধর্মের থেকে প্রয়াসের সূত্রপাত সেই প্রাণধর্মের ন্যূনতম বিকাশের মধ্যে তিনি বুর্জোয়া ভূত দেখতে পেলেন। ফলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বের শেষবিন্দুটুকু নিংড়ে নিয়ে মানুষকে সোভিয়েট রাষ্ট্র-মেসিনের এক একটি কলকব্জায় তিনি পরিণত করলেন। ব্যক্তি আর ব্যক্তি রইল না। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রাক্তন সংযোগ চিরদিনের জন্য ছিন্ন হ'ল।

'স্টালিনবাদের স্থুরু এই ছিন্ন-সংযোগ থেকে। এই সব কলকব্জাগুলোর দীর্ঘতম এবং কঠিনতম ব্যবহারের মধ্যে কমরেড স্টালিন দেখলেন ভবিষ্যৎ রাজ্যবিস্তারের প্রশস্ত পথ। ব্যক্তি যখন মরল তখন বিরুদ্ধ মতবাদ কিংবা প্রতিরোধের কোন প্রশ্নই রইল না। মেসিন তো প্রতিবাদ করতে পারে না,

ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে যায়। স্ক্র্যাপ আয়রনের যেমন একটা বাজার দর আছে এই সব ক্ষয়ে-যাওয়া মানুষগুনোরও একটা বাজার দর রইল। এদের দিয়ে স্লেভ-লেবার ক্যাম্পগুলো চালানোর উপায় তিনি আবিষ্কার করলেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৩১ সালে বাল্টিক সাগর ও শ্বেত সাগরের মধ্যে একটা খাল কাটা হয়। এক-শ' বিয়াল্লিশ মাইল দুর্গম বনজংগল ও পাহাড়পর্বত কেটে পাঁচ লক্ষ দাস-মজুর খাল তৈরি করল মাত্র আঠার মাসে! অর্ধেক দাস-মজুর মরে গেল বটে কিন্তু কম্যুনিষ্ট অর্থনীতির ভিৎ শক্ত করবার জন্য খালটার প্রয়োজন ছিল। কমরেড, আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে, ব্যক্তি-জীবন ধ্বংসের মূলে অর্থনীতির একটা অবিসম্বাদী উন্নতির প্রয়াস রয়েছে। মানুষের চাইতে অর্থনীতি বড়। কিন্তু অর্থনীতিকে হঠাৎ রাতারাতি বড় করবার প্রয়োজন হ'ল কেন? অনেক-গুলো প্রয়োজনের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল বিশ্বজয়ের রসদ তৈরি করবার কড়া তাগিদ।

'অতএব মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ স্টালিনবাদের আগুনে পুড়তে পুড়তে এসে একটা অতি সহজ ফরমূলায় পরিণত হতে প্রায় ছাব্বিশ বছর লেগেছে। ফরমূলাটি কি? গোটা দুনিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ যদি সমূলে বিনষ্ট করা যায় তবে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা কমরেড স্টালিনের জীবিতকালেই সুসম্পূর্ণ হবে। হতেই হবে এই জন্য যে, পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোকে এমন সুনিপুণ ও সুদক্ষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ওরাই বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ রোপণের গুপ্ত-অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

'উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সোভিয়েট-সভ্যতায় মানুষ তার পৃথক অস্তিত্ব খুইয়ে বসল। আসলে মানুষটা তো গোটা মেসিনটার অংশ বিশেষ। সুতরাং যা-কিছু আইনকানুন তৈরি হ'ল সবই ঐ মেসিনটাকে চালু রাখবার জন্য। অংশ বিশেষের জন্য আলাদা আইন থাকতেই পারে না। ক্ষয়ে গেলে ফেলে দিতে হবে। মানুষের সুখ-দুঃখ মাপবার আলাদা কোন যন্ত্র নেই। কেবল নজর রাখতে হবে, মানুষগুনো কোন্ মুহূর্তে ক্ষয়ে গেল।

সেটা দেখবার জন্য ওগ.পু পুলিস চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। ঠিক এই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আপনারা সোভিয়েট-রাষ্ট্রের ওপর দৃষ্টিপাত করুন। তিনটে রাস্তা আপাতত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রথম রাস্তাটা হচ্ছে মরালিটি ও জাস্টিসের রাস্তা। কি দেখছি আমরা? সোভিয়েট বিচারদণ্ডের সামনে কেউ আর ব্যক্তিগতভাবে বিচারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে না। হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সংগে রাষ্ট্রের সম্পর্কের মূলগত অর্থ একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তির সুখ-সুবিধা কিংবা অভাব-অভিযোগের জন্য কোন জাস্টিস অথবা মরাল-কোডের দরকার নেই। কেননা ওরা মেসিনের ভাল মন্দ দেখবে, কোন অংশবিশেষের ভাল মন্দ দেখবে না। প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা কেবল মেসিনের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখতে হবে। মানুষের জন্য নয়, গোষ্ঠীর জন্য। মার্কসবাদে উল্লিখিত আছে, এইটাই উন্নতির পথ। অতএব নির্ভুল পথ। আমরা কেবল চোখ বুজে সেই পথ ধরে চলব। ধোঁকা লাগলেই স্টালিনবাদের গর্তে গিয়ে সোজাসুজি পড়তে হবে। মনের কথা জানবার জন্য আপনার শয্যায় ওগ.পু পুলিস শুয়ে রয়েছে, হয়তো আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নিজেই।

'দ্বিতীয় নম্বর রাস্তা এবার দেখুন। পথ যখন নির্ভুল, বলসেভিক পার্টির কর্মসূচীও নির্ভুল। অর্থাৎ রুসিয়ার বলসেভিক পার্টি যাঁরা চালাচ্ছেন কেবল সেই ক'টি মানুষ। নির্ভুল মানুষ। অতএব জীবন ও জগতের একমাত্র মুক্তির পথ রয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীতে। সোজাভাবে বলতে গেলে এইটাই ওঁরা ঘোষণা করছেন যে, সমগ্র জগতের কল্যাণ বলতে যা বোঝায় তার সবটুকু এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যসূচীর সবটুকু ঠিক একই বস্তু। উপরোক্ত কার্যসূচীর কষ্টিপাথরে সোভিয়েট সভ্যতা খাঁটি সোনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা বলতে সোভিয়েট সভ্যতাই বোঝায়। এইখান থেকে আমরা তৃতীয় পথটি দেখতে পাচ্ছি।

'বিশ্বজয়ের পথ। ডায়লেকটিক্যালি সোভিয়েট সভ্যতার বাইরে যে-সব দেশ আছে সে-সব দেশে সভ্যতা নেই। অতএব অসভ্য মানুষদের নির্ভুল পথের নির্দেশ কে দেবে? দেবে রুসিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি। সেই জন্যই ওঁরা মনে করেন ওঁদের ফৌজ কেবল লাল ফৌজ নয়, মুক্তি ফৌজ। কমরেড, এই মুক্তি ফৌজের আসল উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবিস্তার।'

চিঠিখানা পড়তে গিয়ে দেশলাইটা সব ফুরিয়ে গেল। শেষ কাঠিটার শেষ আগুন দিয়ে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেললাম। এতক্ষণে কমরেড গুহর শবদেহও নিশ্চয়ই পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে আমার মুহূর্তের জন্যও ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি।

আমি কম্যুনিষ্ট, ট্যুরিস্ট নই। দু'মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে আমি ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। কম্যুনিষ্ট মানচিত্রে ভারতবর্ষের আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান আমার মন থেকে মুছে গেল।

কলকাতায় ফিরে এলাম। ফিরবার পথে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছি। ওপর থেকে দেখতে সেই আগের মতই আছে, কিন্তু ভেতরের আলোড়ন আমি অনুভব করছি প্রতি পলে পলে। মস্কো থেকে আমি নতুন দৃষ্টি নিয়ে ফিরেছি। কেবল নতুন বললে ভুল হবে। বিশ্বগ্রাসের অংগীকার রয়েছে আমার দৃষ্টিতে। সেই অংগীকারের একটা ক্ষুদ্র অংশ কেবল এই ভারতবর্ষ।

পুলিস আমার পাসপোর্ট দেখেছে। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য নেই, ত্রুটি নেই। ডাক্তার আমার মধ্যে কোন রোগ দেখতে পায়নি। আমি বেরিয়ে এলাম সোজা বাইরের বারান্দায়। ট্যাক্সি ডেকে তাতে চেপে বসলাম। কত বড় সংক্রামক রোগ নিয়ে আমি ভারতবর্ষে প্রবেশ করলাম তার কোন ইঙ্গিতই কারো চোখে ধরা পড়ল না।

আমি সোজা চলে এলাম গোয়াবাগানে। ঠাকুরদা ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে আছেন। তাঁর চোখে আর এক রত্তি দৃষ্টিশক্তি নেই।

আমার গলার আওয়াজ শুনে বললেন, "কে রে? দীপু? দীপু ফিরে এসেছিস?"

"এসেছি দাদু। পায়ের ধুলো দাও।"

লেপের তলা থেকে তিনি ডান পা-টা বার করলেন। পায়ে কেবল চামড়া আর হাড় আছে, মাংস নেই। আধ্যাত্মিক ভারতের শেষ অবস্থা!

"দীপু, ভাল আছিস তো দাদা?"

"স্বাস্থ্য আমার খুবই ভাল আছে। ব্যবসাও ভাল হয়েছে দাদু।"

"কিন্তু জ্ঞানশংকর নাকি বলে ব্যবসাতে কেবল লোকসানই হচ্ছে। দীপু, রোজগার যদি ভাল হয় তবে তোর বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করিস। গৌরীশংকর টাকার অভাবে কষ্ট পাবে এইটা দেখবার জন্যই বোধহয় ভগবান আমায় বাঁচিয়ে রাখলেন।"

"ইচ্ছা করেই তো বাবা নিজের সর্বনাশ নিজে করেছেন।"

"তা জানি। তবু আমি তার বাপ হয়ে এক মুহূর্তের জন্যও অকল্যাণ কামনা করতে পারি না। ভাবছি, গৌরীশংকরকে বলব গোয়াবাগানে ফিরে আসতে। শুনলাম কুইনস পার্কের বাড়ি বাঁধা দিয়েছে?"

"দাদু, বাঁধা যখন তিনি দিয়েছেন প্রতিদিনই সুদের অঙ্ক বাড়ছে। বাড়িটা বেচে দিলে কিছু উদ্বৃত্ত টাকা হয়তো তিনি পাবেন। কিছু টাকা হাতে নিয়ে এ-বাড়িতে এলে সুবিধা হয় না?"

"কেন, বাবাকে খাওয়াতে পারবি না? গোয়াবাগানে সবাই আশ্রয় পাবে দীপু। এখানে স্বার্থের কোন নামগন্ধ নেই। কেউ কিছু দিতে পারল না বলে তারা তো উপোষ করতে পারে না!"

"কিন্তু গোয়াবাগানেই বা এত সংস্থান কোথায় দাদু?"

"চৌধুরী পরিবারের বাস্তুতে সংস্থান একটা হবেই। ভগবানের আশীর্বাদ রয়েছে এইখানে। তাই তো গোয়াবাগানের এক ইঞ্চি জমি কারো কাছে বাঁধা দিতে হয়নি। ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে এ সম্ভব হ'ল কি করে?"

আলোচনাটা যেন উলটো রাস্তায় চলতে লাগল। মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "সুকু কোথায়?"

"সুকু অনীতার সংগে কারসিয়ং গেছে অনেক দিন হ'ল।"

"আমি এবার কুইনস্ পার্কে যাই দাদু?"

"এখনো দেখা করিস নি?"

"না।"

"তা হ'লে দেখা করে আয়।"

"বাবাকে কি গোয়াবাগানে আসবার জন্য অনুরোধ করব?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "অনুরোধ করলেও সে আসবে না। দীপু, মানুষের মতিভ্রম হ'লে সে তো সত্য পথ দেখতে চায় না। তাই এখান থেকে যে একবার চলে গেল সে আর ফিরে এলো না। গৌরীশংকর, ভবশংকর আর জ্ঞানশংকর তিনজনেই চলে গেল। যাওয়ার কারণগুলো হয়তো এক নয়, কিন্তু গেল তা তো ঠিক। গোয়াবাগান তো কারো কাছে কিছু চায় নি; তবু ওরা রইল না। হয়তো অতীতের সংগে আর কারো নাড়ির সম্পর্ক নেই। বাড়িতে একটা কুকুর পুষলে তার জন্য মানুষের মায়া হয়, দয়া হয়। মরে গেলে কুকুরের জন্যও মানুষ কাঁদে। অথচ এখানে ওরা অর্ধেক জীবন কাটিয়ে গেছে তবু গোয়াবাগানের জন্য কেউ ওরা এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না! দীপু, আমি ওদের ক্ষমা করলেও ভবিষ্যতের ইতিহাস ওদের কাউকে ক্ষমা করবে না। জগতের শেষ ইতিহাসের নতুন নাম হবে আধ্যাত্মিক ইতিহাস। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির মূলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা না থাকলে মানুষের সমস্যা কোনদিনই মিটবে না। রুসিয়ায় মেটে নি, চীনদেশেও মিটবে না। বস্তুতন্ত্রবাদকে যতই তোমরা ঐতিহাসিক বলে ঘোষণা করো না কেন, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওটা একটা শবদেহের মত এরই মধ্যে বনবাদাড়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। রুসিয়ার শকুনদের সংগে দুনিয়ার অনেক শকুন উড়ে এসে বসেছে। শবদেহের

গলিত মাংসে ওদের মহোৎসব হচ্ছে। দীপু, আমরা জানি রুসিয়ার জনসাধারণ আজও গলিত মাংস স্ব-ইচ্ছায় গলাধঃকরণ করতে চাইছে না।"

"তুমি কি করে জানলে দাদু?"

"তোর বড়কাকা জানিয়েছে।"

"বড়কাকা ফিরে এসেছেন না কি?"

"না। ভবশংকর আমার কাছে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। কোথা থেকে পাঠিয়েছে জানি না।"

"চিঠিখানা দাও তো দাদু।"

ঠাকুরদা বালিসের তলা থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার করে আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরদা বললেন, "খবরের কাগজে ছাপাবার জন্য সে অনুরোধ করেছিল। আমি দু'চার জায়গায় পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই ফেরৎ পাঠিয়েছেন।"

"সবাই ফেরৎ পাঠালেন কেন? কলকাতার প্রায় সবগুলো খবরের কাগজই তো কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লেখে?"

"আমি তাই খুবই আশ্চর্যবোধ করছিলাম। গৌরীশংকরকে আমি পাঠিয়েছিলাম একজন সম্পাদকের কাছে। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের নীতি নিয়ে আমরা সমালোচনা করি, কারণ জনসাধারণ তাই চায়। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের আমরা আঘাত দিতে চাই না। কারণ কাগজের মালিকরা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেও বড়লোক থাকতে চান। মালিকরা যেন ভেবেই রেখেছেন ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র হ'তে আর কয়েকটা দিন বাকি। অনেকে আঙুল গুণছেন।' দীপু, তুই এটা নিয়ে যা। যদি পারিস তবে ছাপিয়ে দিস।"

"আচ্ছা, আমি নিয়েই যাচ্ছি।" পাণ্ডুলিপিখানা সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম।

ঠাকুরদা বললেন, "ভারতবর্ষের সত্যিকারের জ্ঞানীলোকরা দেখছি ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করছেন। লক্ষণটা খুব ভাল নয় দীপু। মাঠ ফাঁকা থাকলে শত্রুপক্ষ খুব নিরাপদে তাঁবু ফেলতে পারবে।"

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

কুইনস্ পার্কে এলাম বেলা দশটার সময়। বাড়ির ফটক দিয়ে আমাদের পন্‌টিয়াকখানা বেরিয়ে আসছিল। ভাবলাম বাবা বোধহয় হাইকোর্টে যাচ্ছেন। গাড়িখানা কাছে আসতেই দেখলাম গাড়িতে একজন মাড়োয়ারী বসে আছেন। ড্রাইভার আমাদের বাবু সিং নয়। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে অন্য লোকের নাম লেখা। ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল। আমাদের নীচের তলায় ভাড়াটে এসেছে এবং গাড়িখানা ভাড়াটের কাছেই বিক্রি হয়ে গেছে। কোন্ দিক দিয়ে যে দু'তলায় উঠব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ক্রেমলিনের গেট খুঁজে বার করার চাইতেও কঠিন বলে মনে হ'ল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলাম। এমন সময় মাড়োয়ারীর একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে আমায় বললেন, "ডান দিকে একটা দরজা আছে। অফিসঘরের পেছন দিক দিয়ে যান। যাঁরা জানেন না তাঁরা সবাই ভুল করেন।"

মাড়োয়ারীর মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে বলে মনে হ'ল। মাড়োয়ারী ভাড়াটে দেখে আমি মনে মনে যতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম মেয়েটিকে দেখে খানিকটা উত্তেজনা কমল। বোধহয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়েই ছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "সামনের বাগানটাও কি বাবা ভাড়া দিয়েছেন?"

"হাঁ। গৌরীশংকরবাবু আপনার বাবা?"

"আজ্ঞে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে।"

"তা হ'লে ভেতরে আসুন। এই রাস্তা দিয়ে যান। আপনি বিলেত থেকে কবে ফিরলেন?"

"চার ঘণ্টা আগে। আপনি সব জানেন দেখছি।"

"আপনার বাবাকে আমরা মেসোমশাই ডাকি।"

"কবে থেকে ?"

"তিনি যখন দিল্লিতে মন্ত্রী ছিলেন। বাবা একটা মস্তবড় কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছিলেন তাঁর কাছে।"

"মস্তবড় মানে কি, ক'কোটি টাকার ?"

"তা তো বলতে পারব না। আপনি এই রাস্তায়ই আসুন।"

"না। ধন্যবাদ। বাগান থেকে দুটো ফুল নেব ?"

"বলেন কি! নিশ্চয়ই নেবেন। ভাড়া আমরা দেই বটে, কিন্তু সম্পত্তি আপনাদেরই।"

আমি দু'পা হেঁটে গিয়ে গোলাপগাছের সামনে দাঁড়ালাম। মেয়েটিও রোয়াক থেকে নীচে নেমে এলো। আমার পাশেই দাড়াল এসে। আমি গাছ থেকে দুটো গোলাপ ছিঁড়ে নিলাম। তারপর দুটো রক্ত করবীও ছিঁড়লাম। চারটে ফুল যখন এক সংগে করে বেঁধে নিয়ে ফিরে দাড়ালাম যাওয়ার জন্য, মেয়েটি ফস করে হাত বাড়িয়ে বসল। আমি বললাম, "হাতে দেওয়ার চাইতে খোঁপায় পরিয়ে দিলে ভাল হ'ত। কিন্তু এ-ফুল জগদ্ধাত্রীর জন্য।" মেয়েটির গালে গোলাপি রং ম্লান হয়ে এলো।

আমি পেছনের দরজা দিয়ে তিনতলায় সোজা উঠে এলাম। মা পূজো করছিলেন। ঠাকুরঘরের দেওয়ালগুলোতে নোনা ধরেছে। দু'তলায় স্থান সংকুলান হয়নি ব'লে একতলার কিছু কিছু আসবাব ঠাকুরঘরে এনে রাখা হয়েছে। তাই ঘরখানা একটু ছোট বলে মনে হচ্ছিল। জগদ্ধাত্রীর রং চটে গেছে অনেক জায়গায়। কালিঘাটের কারিগররা সস্তার দেশী রং ব্যবহার করেছে। জেন্‌সন্ এণ্ড নিকলসন্ কোম্পানির রং হ'লে আরও বেশিদিন চকচকে থাকত। জগদ্ধাত্রীর গলায় শোলার ফুলের মালা। বাগানটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বলে মা হয়তো প্রতিদিন বাগান থেকে অতগুলো করে ফুল তুলতে

লজ্জা পান। অবশ্য মা বলবেন ভক্তি থাকলে শোলার ফুল আর বাগানের ফুলের মধ্যে কোন তফাৎই থাকে না।

আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "মা—।"

পেছন ফিরে তিনি চাইলেন। বললেন, "জুতো খুলে ভেতরে আয়।" নৈবেদ্যের রেকাবির ওপর আমি ফুল চারটে রাখলাম। মা বললেন, "জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করলি না?"

"করেছি, মনে মনে।"

"মনে মনে কেন?"

"ঘাড়ের রগে ভীষণ ব্যথা।"

"তা হ'লে বালিসটা রোদে দিয়ে দিস্ দীপু।"

"তোমরা কেমন আছ মা?"

"জগদ্ধাত্রীর কৃপায় খুবই ভাল আছি।"

"মাড়োয়ারীর কাছে বাড়ি ভাড়া দিলে অথচ বলছ ভাল আছ?"

"চিরদিন তো মানুষের একরকম যায় না দীপু। জগদ্ধাত্রীর মহাকৃপা যে ভাড়াটে আমরা খুব ভাল পেয়েছি।"

"পয়লা তারিখে ভাড়া দেয় বুঝি?"

"কোন্ তারিখে দেয় আমি জানি না। তবে দেয় নিশ্চয়ই।"

"দিতে আর অসুবিধা কি? বাবাই তো ওদের কোটি টাকার কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন কিনা! গৌরীসেনের টাকা থেকেই বাবার কাছে ভাড়া আসছে। হাজার হ'লেও মাড়োয়ারী।"

"দীপু, ওরা তো মাড়োয়ারী নয়।"

"তবে?"

"যুক্ত প্রদেশের লোক। তাছাড়া ওরা খুব বড়লোকও নয়। ছোটখাটো কারবারী। কোটি টাকা উচ্চারণ করতে এক সেকেণ্ডও লাগে না। কিন্তু গুণতে অনেক সময় নেয় দীপু। যাক—তুই ক'কোটি রোজকার করে আনলি?"

"রোজকার করিনি, তবে ব্যবস্থা করে এসেছি। বাবা কোথায় মা?"

"তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। ঠাকুরের আজ জন্ম উৎসব আছে। সেখান থেকে তিনি বেলুড় হয়ে বাড়ি ফিরবেন।"

"এত বড় লম্বা পাড়ি দিলেন কি করে? গাড়ি বোধহয় বেচে ফেলেছেন?"

"ভালই হয়েছে দীপু। একটু হাঁটাহাঁটি করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের বাসগুলো তো যাতায়াতের পক্ষে খুবই ভাল।"

"ক'দিন আর ভাল থাকবে মা? হয়তো উঠেই যাবে।"

"কেন রে দীপু?"

"তোমাদের খবরের কাগজেই তো দেখলাম পঁয়ষট্টি লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। মা গো! পঁয়ষট্টি লাখ! গভর্ণমেণ্টের খাস ব্যবসা। যারা একটা বাস-কোম্পানিতে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা লোকসান দিতে পারে তারা একটা রাষ্ট্র চালাতে কত টাকা লোকসান দেবে মা? আর ব্যবসাটা কত সহজ ভেবে দেখ। লোক উঠবেই এবং বাকি বকেয়া নেই। আমাদের উচিত যার সংগে দেখা হবে তাকেই ডেকে ডেকে বলে দেওয়া যে যারা বাস-কোম্পানি চালাতে পারে না তারা রাষ্ট্রও চালাতে পারবে না। মা, তোমার জগদ্ধাত্রী বোধহয় রাগ করছেন?"

"কেন?"

"তোমার ঠাকুরঘরে বসে রাজনীতির কথা বলছি তাই।"

"দীপু, ঠাকুরঘরের সবটুকুই রাজনীতি নয় বটে তবে রাজনীতির সবটুকুই ঠাকুরঘর হ'লে সমস্যা অনেক মিটে যেত। জগদ্ধাত্রীর কাছে আমি দিনরাত কাঁদি আর বলি, ভারতবর্ষ যাঁরা শাসন করছেন তাঁদের মনে প্রবেশ করো। নইলে ওঁরা যে মানুষের মনে নীতিবোধ ফিরিয়ে আনতে পারছেন না।"

"মা, আমার এখনও খাওয়া হয়নি। এখানে একটু কিছু প্রসাদ পাওয়া যাবে না? রেকাবিতে মাত্র দু'খানা বাতাসা আছে। ভেবেছিলাম ভীম-নাগের দোকান থেকে কিছু সন্দেশ নিয়ে আসব।"

"না এনে ভালই করেছিস দীপু। অনর্থক তোর ব্যবসার পয়সা নষ্ট করবি কেন? নীচে চল্, দু'খানা লুচি করে দেব।"

"না থাক। তোমার পূজোর আবার ক্ষতি হয়ে যাবে।"

"কিছু ক্ষতি হবে না। মানুষ পূজো করলে কি সন্তানকে খেতে দিতে পারে না?"

আমরা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশে সেই ছোট্ট ঘরটায় তালা দেওয়া রয়েছে দেখলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছোটকাকা কোথায়?"

"কাল সমস্ত রাতই তো এই ঘরে কাটিয়েছেন। আজ নাকি তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা। তোর বাবা বলছিলেন ঠাকুরপোকে আর এ-বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।"

"কেন?"

"তিনি সন্দেহ করছেন তোর ছোটকাকা রুসিয়ার গুপ্তচর।"

"ওঃ। সন্দেহ করছেন! সন্দেহ তো সত্যি নাও হতে পারে। শুধু শুধু একজনকে অমন সাংঘাতিক দোষ দেওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া বাবার কথা মতই আমি ছোটকাকার সংগে ব্যবসায় যোগ দিয়েছি। ছোটকাকাকে রুসিয়ার গুপ্তচর বলা মানে আমাকেও বিপদে ফেলা।"

মা বারান্দায় বসে ময়দা মাখতে লাগলেন। বারান্দার এক কোণায় একটা ছোট টেবিলের ওপরে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ রয়েছে। মা নিজে হাতেই দু'একটা রান্না ওখানে সেরে নেন। রান্নার জন্য আলাদা লোক নেই। গোরাচাঁদকে এখন সবরকমের কাজই করতে হয়। তার জন্য বিশেষ কোন কাজ বরাদ্দ করা নেই। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত টাকা ভাড়া দেয় ওরা?"

"চার-শ'। এর থেকে আবার ট্যাক্স বেরিয়ে যায়। তোর বাবা হাইকোর্ট থেকে যা রোজগার করেন তা সব তাঁর ঋণ শোধ করতে খরচ হয়। ভোটের ঋণ এখনও শেষ হয় নি দীপু।"

"শেষ হয় নি, অথচ হাইকোর্ট ফেলে বাবা দক্ষিণেশ্বর গিয়ে বসে আছেন কেন? বাবা ভুল করেও তো বেলুড়ে গিয়ে আগে কখনও চুপি দিয়ে দেখে আসেন নি সেখানে কি হচ্ছে। অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠে যা হচ্ছে তা চুপি দিয়ে দেখলেও চোখে পীড়া লাগে। বেশিক্ষণ চোখ খুলে দেখলে হয়তো ছানি পড়ত। মা, সমস্ত দেশ জুড়ে এ-সব হচ্ছে কি? তোমাকে অবশ্য প্রশ্ন করার মানে হয় না। কারণ, কি হচ্ছে আমি তা সবই জানি।"

"কি হচ্ছে বলে তোর মনে হয়?"

"আর যাই হোক অন্তত বেদান্ত হচ্ছে না।"

"কেন?"

"বেদান্তের নাম গন্ধ যদি থাকত তা হ'লে তোমাদের ভগবানও তার ধারে কাছে থাকত। উপস্থিত যা আছে তার মধ্যে আমেরিকার সেই বিধবা মহিলাটির কয়েক লক্ষ টাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর টাকায় বাবাজিদের থাকবার একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। বাবা যদি ভগবানকে পেতে চান তা হ'লে বড়কাকার মত তাঁর উচিত হিমালয়ের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া।"

"দীপু, গরম লুচি ক'খানা খেয়ে নে।"

কথা বলতে বলতে মা লুচি ভেজে ফেললেন। গোরাচাঁদ বেগুন ভেজে আগেই রেখে গিয়েছিল। মা বললেন, "সবাই যদি ভগবানকে পাওয়ার জন্য হিমালয়ের দিকে চলে যায় তা হ'লে তোদের খুব সুবিধা হয়, না রে? তোর বাবার কাছে শুনেছি কম্যুনিষ্টরা নাকি বেলুড়মঠে শ্রমিকদের জন্য একটা নাইট স্কুল খুলবে।"

"আমার তাতে কোন সুবিধা-অসুবিধা হবে না। বাবার মত সব লোক হিমালয়ে চলে গেলে নেহেরুর শত্রুসংখ্যা কমবে। ও-সব গিরিগহ্বরের লোকদের তিনি ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন আগেই। নেহেরু ভগবান বিশ্বাস করেন না।"

"তাই বলে তুই কেন অবিশ্বাস করবি? ভগবানের সব ক'টি ছেলেই তো শান্ত নয়। দুরন্ত ছেলেও আছে। দীপু, অমানুষিক গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে যখন আমার প্রথম সন্তান হ'ল তখনই জানতাম ভগবানের করুণা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি।"

"তোমার প্রথম সন্তান বুঝি মারা যায়?"

"না। —দীপু, দীপু……।"

আমি এক রকম দৌড়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলাম। বারান্দার রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ে মা যখন তৃতীয় বার ডাকলেন আমায় আমি তখন ট্রাম লাইনে পৌঁছে গেছি।

নেবুবাগানে এলাম প্রায় বেলা বারটায়। মামা তাঁর নিজের অংশের নীচের তলায়ও ভাড়াটে বসিয়েছেন। আমি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সিঁড়ির সংলগ্ন ঘরটা বন্ধ। বাইরে থেকে তালা লাগানো। আমি পা টিপে টিপে ওপরে উঠলাম। মামা চোখে চশমা লাগিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে এখনও কপি লিখছেন। বেশ খানিকটা বুড়িয়ে গেছেন। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। জীবনীশক্তি ক্ষয়ে গেছে প্রচুর। আমি ঘরে ঢুকেই তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। আমার দিকে না চেয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? স্টালিনের বিশ্বগ্রাসের প্ল্যানটা প্রায় শেষ করে এনেছি। তিব্বত থেকে ক'ক্রোশ রাস্তাই বা হবে। বসুন।"

"মামা, আমি দীপক।"

"দীপক?" মামা কলম ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলেন।

"হাঁ রে, বিলেত থেকে কবে ফিরলি?"

"এই তো প্রায় ছ'ঘণ্টা আগে। তোমার হার্টের অবস্থা কি?"

"ভাল না। কিন্তু আমার সন্দেহ সত্যি হয়েছে দীপু।"

"কি সন্দেহ? টি-বি নাকি?"

"এই দেখ্ পাগলা, বইগুলো একবার দেখ্। তোকে পড়তে দেব। স্টালিন এণ্ড কোম্পানির আসল মতলব কি এবার পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

বলি নি, মরা জাররা কবরে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে! কেবল আফগানিস্তানের সীমান্ত নয়, পুরো বিশ্বটাই লাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হতে চলেছে। পাঁচ-শ' পৃষ্ঠার বই ওরা এক টাকা আট আনায় বেচে! ওরা মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের নেড়া নেড়ী নয়। বুঝলি?"

"বুঝেছি মামু। কিন্তু তোমার সাপ্তাহিক আস্তাবল কি বেরোয়নি?"

"সাপ্তাহিক এখনও হয়নি। উপস্থিত সাময়িক কাগজ বলেই চালাচ্ছি। এই দেখ প্রথম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংখ্যার কপি লিখছি। এক-শ' ছাপিয়েছিলাম।"

"কিন্তু ছাপাটা বড্ড খারাপ হয়েছে মামু।"

"দেশী মেশিনে এর চেয়ে ভাল হয় না। প্রতিটি অক্ষর নিজের লেখা, প্রতিটি টাইপ আমি নিজে কম্পোজ করেছি। কালি লাগিয়েছি আমি, ছেপেছি আমি। মন্ত্রীদের কাছে পোস্ট করেছি আমি। কমল বিশ লক্ষ টাকা চুরি করল বলে কাজ বন্ধ থাকবে কেন? দীপু, এত করেও বোধহয় থামাতে পারলাম না।" এই বলে মামা বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। চিৎ হয়ে শুয়ে বললেন, "কেউ আমায় সাহায্য করল না। তোর বড়কাকার মত এক ডজন মানুষ থাকলে আজ আমি সারা ভারতবর্ষকে শিক্ষিত করতে পারতাম। কী বিরাট অজ্ঞতার ষড়যন্ত্র চলেছে চারদিকে! আমি একা আর কি করব বল্?"

"আমার মাথায় ব্যবসার বোঝা চাপিয়ে দিলেন বাবা। নইলে—"

"ব্যবসা করে টাকা রাখবি কোথায়? ব্যাঙ্কে? নেহেরুর দেনা কম্যুনিষ্টরা শোধ দেবে না। হাঁ রে দীপু, গৌরীশংকর শুনলাম সর্বস্ব খুইয়েছে?"

"হাঁ মামা, সর্বস্ব খুইয়ে আবার সর্বস্ব পেয়েছেন।" মামা উঠে বসলেন।

"বলিস কি? কোথায় পেল রে?"

"বেলুড় মঠে।"

"মিথ্যা বলিস নি। কিন্তু ওঁরাও যে বুঝতে পারছেন না সব গেল। দীপু, এই যে আমার সামনে শ'দুয়েক বই পড়ে রয়েছে। এর প্রতিটি লেখক কম্যুনিষ্ট ছিলেন। সাধারণ কম্যুনিষ্ট নয়, ইউরোপ আর আমেরিকার উচ্চপদীয় নেতা।

প্রত্যেকটা অক্ষর এঁদের খুঁচিয়ে দেখ, স্টালিনবাদের কি বীভৎস চেহারা! মিথ্যার এত বড় চক্রান্ত আর এত বেশি পরমায়ু পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশ পেল। এখন মা-কালী রক্ষা না করলে আর বোধহয় ওদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। কলুটোলার হেবো গুণ্ডার মধ্যেও কখন কখন ধর্মভাব হ'ত। কিন্তু আমাদের হরিপ্রসাদ একেবারে সলিড্। মাথা এবং মনে কোথাও একটু নরম জায়গা নেই। কম্যুনিজমের নিখুঁত প্রতিভূ এই হরিপ্রসাদ।"

"আচ্ছা মামা, তুমি তো কম্যুনিজম সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়লে। কোথাও কি দু'একটা ভাল জিনিস পাও নি?"

"পেলেই বা, বলবার স্বাধীনতা কই দীপু?"

"কেন?"

"সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে মানুষ দুটো জিনিসের প্রতি সব চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। প্রথম তার ধর্মজীবনের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় তার ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা। এই দুটো জিনিসের জন্য মানুষ তার সব কিছু দিয়েছে। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা কিংবা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা না থাকলে আমাদের বাঁচবার কোন অর্থ হয় না। কম্যুনিজম এই দুটো স্বাধীনতাই কেড়ে নিয়েছে। দীপু, রাষ্ট্র কিংবা মেসিন যত বড়ই হোক মানুষের চেয়ে বড় হতে পারে না। কিন্তু কম্যুনিজম বলছে, 'মানুষের চেয়ে রাষ্ট্র বড়, মেসিন বড়। এবং সব চেয়ে বড় রাষ্ট্রের কর্ণধার, ডিক্টেটর।' অস্বীকার করতে পারবি? ডিক্টেটর কেবল সব চেয়ে বড় নয়, বুর্জোয়াদের ভগবানের চেয়েও বড়। তাই তো জগৎ জুড়ে সব কম্যুনিষ্টরাই বলছে, 'স্টালিন কখনও ভুল করতে পারেন না।' কারণ কি জানিস? আমরা আমাদের ভগবানকে যেমন করে সর্বশক্তিমান বলি ওরাও তেমনি স্টালিনকে বলে অল্‌মাইটি! পুরো বিশ্ব যেদিন তাঁর দখলে আসবে সেদিন তুই দেখিস তিনি নিজেই ঘোষণা করবেন, 'আমি স্টালিন। আমি জগতের অধীশ্বর। আমি মস্কোর বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরুল্লেখ করছি, আমি অল্‌মাইটি। আমি স্টালিন।'

"দীপু, স্টালিন মানে তো ইস্পাত? কিন্তু হিন্দু, মুসলমান এবং ক্রিশ্চিয়ানদের ভগবান তো ইস্পাতের তৈরি নয়! তবে এ কোন্ অল্‌মাইটি? এরপর কম্যুনিজমের মধ্যে যেটুকু ভাল রইল সেটুকু কেবল ডাল ভাতের ব্যবস্থা। তার মধ্যেও কি বিরাট ধাপ্পা রয়েছে দেখ্। মস্কোর দশ মাইল ব্যাসার্ধের বাইরে থেকে স্থরু করে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে হাজার হাজার স্লেভ-লেবার ক্যাম্প। কুষ্ঠ রোগের মত রুসিয়ার সর্বাংগে এই ক্যাম্পগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। দু'কোটি দাস-মজুর দিয়ে জবরদস্তি কলকারখানা চালাচ্ছে। মাইনে দিতে হয় না। আরো শুনবি? আমার দ্বিতীয় সংখ্যা 'আস্তাবলে'র জন্য কপি রেডি করছি।"

আমি বললাম, "আমি দেড়টা পর্যন্ত থাকব। এর মধ্যে যতটা পার বলে নাও।"

মামা দু'খানা লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বালিসের তলা থেকে টেনে বার করলেন। কাগজগুলোর সংগে রুসিয়ার একটা বড় মানচিত্র ছিল। মামা মানচিত্রটা তেরছাভাবে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "মস্কোর আশে পাশে দু'চারটে মডেল কয়েদখানা রাখা হয়েছে। ডাক্তার কিচ্‌লুর মত মহাজ্ঞানীরা যখন মস্কো ভ্রমণে যান তখন তাঁদের এগুলো দেখানো হয়। এই দু'চারটে কয়েদখানা এমন সুন্দরভাবে সাজান-গোছান আছে যে তাঁরা কয়েদিদের স্বাস্থ্য আর সম্পদ দেখে এসে ভারতবর্ষের মাঠে ময়দানে আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। রুসিয়ার প্রশংসায় এঁরা সাময়িক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন।

"এবার মস্কোর দশ মাইল বাইরে চলে আয়। এইখান থেকে স্থরু করে সমস্ত সাইবেরিয়া ঘিরে একেবারে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত অসংখ্য স্লেভ-লেবার ক্যাম্পের পত্তন হয়েছে। এ এক আলাদা রাজ্য। ওগ্‌পু পুলিশের সাম্রাজ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই আয়তনের মধ্যে ইউরোপের গোটা দশ বারো রাষ্ট্রকে ভরে দেওয়া যায়। দু'কোটি বন্দী মানুষের আর্তনাদ রুসিয়ার সীমা অতিক্রম করে আমাদের কানে পৌছয় না। বরফাবৃত সুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে এই সব দাস-মজুরদের

দৈহিক এবং মানসিক কষ্টের কথা ভাবতে পারিস ? উত্তর সাইবেরিয়ায় কুইবিসভ অঞ্চলের বিরাট জায়গা নিয়ে কোমি সাধারণতন্ত্রের পুরোটা এবং কাজাকস্তানের অনেক স্থান জুড়ে এই সব দাস-মজুরদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, একেবারে আর্কেন্‌জেল্‌ পর্যন্ত। এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ক্যাম্পের নাম নোভায়া জেম্‌লায়া। ভোলোগ্‌দা-কিরোয়া থেকে ইউরাল পর্যন্ত যে-রেলরাস্তা গেছে এবং তার দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মহাসাগর হয়ে সুদূর প্রাচ্যের কোলায়মা নদীর বরাবর ধরে কামচ্‌কাটকা, সাখালিন, এবং ভ্লাডিভোস্টক পর্যন্ত এই যে বিরাট রাজ্য তার মধ্যে কোন মানুষ বাস করে না, একমাত্র লক্ষ লক্ষ দাস-মজুর ছাড়া। এক হাজার গজ দূরে দূরে কেবল কাঁটাতারের বেড়া আর ওগ্‌পু পুলিসের বন্দুকধারী রক্ষীদল। এই অঞ্চলের সব চেয়ে ভয়াবহ ক্যাম্পের নাম কোয়লামা। এই সব কোটি কোটি দাস-মজুররা কারা? নব্বই ভাগ সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাগরিক। বাকি দশভাগ বিদেশী লোক। গত মহাযুদ্ধের দু'লক্ষ জাপানী-বন্দীর হিসাব স্টালিন এখনও দিতে পারেন নি। কিন্তু নব্বই ভাগ রাসিয়ান দাস-মজুরদের এই অবস্থা হ'ল কেন ? তারা কি করে ইংগ-মার্কিনের সংগে ষড়যন্ত্র করল ? বিশ্ববিপ্লবের দু'কোটি খড়কুটো স্লেভ-লেবার ক্যাম্পে পুড়ে মরছে। এরা সব কি করছে এখানে দীপু ? তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে দুর্গম জায়গায় রেললাইন বসানো, খাল খনন করা, রাস্তাঘাট তৈরি, কারখানা নির্মাণ, বন্দর তৈরি করা, খনি থেকে কাঁচা মাল উত্তোলন, বনজংগল সাফ করা, সুমেরুবৃত্তের সন্নিকটের বন্দরে জাহাজ থেকে মাল নামানো, এবং জাহাজে মাল ওঠানো। এদের মাইনে দিতে হয় না। এদের আয়ুষ্কাল খুব কম। সংখ্যা যখন খুব কমে যায়, তখন রুসিয়ায় পার্জিং সুরু হয়। এখন রুসিয়ার সাম্রাজ্য বড় হয়েছে। বল্‌কানস থেকে যাবে। যাবে মংগোলিয়া থেকে। কম্যুনিষ্ট অর্থনীতির ম্যাজিক আমরা বুঝে ফেলেছি দীপু। আমি ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছি তোদেরও একদিন যেতে হবে। লাল-সাম্রাজ্যে মানুষ কোন প্রশ্ন করে না, মুখ বুজে ষোল ঘণ্টা কাজ করবে। কি রে, চুপ করে রইলি যে ? জবাব দে ?"

"আমি তো কম্যুনিষ্ট নই মামু। তা ছাড়া দেড়টা বেজে গেছে, আমি এবার উঠব।"

"আবার কবে আসবি দীপু?"

"সময় পেলেই আসব।"

"আসিস দীপু। ভেতরে বড্ড জ্বালা। তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে একটা লোকও আসে না আমার কাছে।"

"আমার মনে হয় এই বুড়ো বয়সে ভেতরে আর জ্বালাটালার সৃষ্টি ক'রো না মামা। তার উপরে হার্ট খারাপ।"

"কি করি বল্? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওদের ভারত-গ্রাসের পরিকল্পনা। কাউকে যদি কথাটাও না বলে যাই তবে ভগবানের কাছে গিয়ে জবাবদিহি করব কি দীপু?"

"আচ্ছা মামু, আমাদের ভগবানই বা কি করছেন? তুমি এখানে বসে যা দেখতে পাচ্ছ তিনি তার একাংশও দেখতে পাচ্ছেন না কেন? ওদের ধ্বংস করা তো আসলে তাঁরই কাজ?"

"ভগবানের উদ্দেশ্য আমরা কি করে বুঝব? আমার তো এখন ভগবান ভরসা! নেহেরু-ভরসায় আর জোর পাচ্ছি না।"

"আমিও তাই সবাইকে বলি। নেহেরু-ভরসা যারা করবে তারা মরবে। তুমিও এই কথাটা পথেঘাটে সবাইকে বলো মামু। ভগবান খুসি হবেন। এবার আমি চলি। পাঁচ মিনিট বেশি বসে গেলাম।"

রাত্রিবেলাতে কৃষ্ণান এলেন। আমি বললাম, "দিল্লিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করুন।"

"ব্যবস্থা আছে।"

"আন্দ্রিয়েভ কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"কমরেড রাও ?"

"কলকাতায়।"

"ছোটকাকা ?"

"আজ তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। যেতে দেই নি।"

"ভাল করেছেন। ছোটকাকা উপস্থিত কলকাতায়ই থাক। ন্থকু আর অনীতা ফিরে আস্থক। নেপালের রিপোর্ট কি ?"

"পূর্ব আর উত্তর নেপালে আমাদের কাজ খুবই ভাল হচ্ছে।"

"কিন্তু কাগজে দেখতে পাচ্ছি কৈরালা ভাইদের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ?"

"মিঃ চৌধুরী, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মীমাংসা হবে না। হ'লেও তা ক্ষণস্থায়ী হবে।"

"এক কাজ করুন। ন্থকুর জন্য রাস্তা সাফ করে দিন। ন্থকু নেপালে যাক। রাজ-পরিবারের মধ্যে ন্থকু কাজ করুক। কমরেড লোপোনকে কলকাতা ডেকে পাঠান।"

"তিনি উপস্থিত আছেন, ব্রডওয়ে হোটেলে।"

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। কৃষ্ণান আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, "আমাদের হাতে দু'বছরের বেশি আর সময় নেই। দু'বছর মানে সাত-শ' তিরিশ দিন। অর্থাৎ দশ লক্ষ একান্ন হাজার দু-শ' মিনিট। প্রত্যেকটি মিনিট গুণে আমাদের কাজ করতে হবে। ভারত রাষ্ট্র হাতে এলে আমরা বিশ্রাম করব। সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যদের চাবুক মারুন। আমি কাজ চাই। উনপঞ্চাশ ভাগ লোকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিন।"

কৃষ্ণান বললেন, "আপনি আদেশ দিন।"

"রাজনীতির মধ্যে আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে আমেরিকা-ভীতি ঢুকিয়ে দেওয়া। বলুন, আমেরিকা তার অর্থবল এবং অস্ত্র-

বল দিয়ে ভারতবর্ষ অধিকার করতে চায়। ওরা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সংগে ষড়যন্ত্র করছে। বুঝলেন?"

"বুঝেছি।"

"কলকাতার চীনা স্কুলগুলোর খবর কি?"

"ছেলেমেয়েরা দিনরাত মার্চ করছে।"

"খুব ভাল। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কমরেড মুনির আহ্‌মদের আসবার কথা ছিল। এসেছেন তিনি?"

"হাঁ।"

"তাঁকে বলুন, পাকিস্তানের জন্য আমাদের আলাদা কোন পরিকল্পনা নেই। চারদিকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমাদের চাপে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাভাবিক ভাবেই নিউট্রেলাইজড্‌ হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। ওদের মনের জ্বালা আমি জানি। হরিপ্রসাদকে বলুন, কলকাতার মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে যেন প্রচারের কাজ খুব ভাল হয়। ওদের আশ্বাস দিতে বলুন, কম্যুনিষ্ট পার্টি ওদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেবে। পশ্চিম বাংলা আমরা পূর্ব-পাকিস্তানকে দান করে দেব। ওদের সংঘবদ্ধ করুন মিঃ কৃষ্ণান। আমরা গল্প করে এরই মধ্যে তিরিশ মিনিট নষ্ট করে ফেলেছি। আমাদের হাতে সময় নেই। পার্টি-মেসিন ঝিমিয়ে আসছে। এর পর থেকে মিনিট গুণব। প্রতি মিনিটের রিপোর্ট চাই। যারা হাঁফিয়ে পড়বে তাদের নর্দমায় বর্জন করবেন। মায়া দয়ার বুর্জোয়া মোহ পার্টির সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। একান্ন ভাগ লোকের ভবিষ্যতের জন্য উনপঞ্চাশ ভাগ লোক যদি খুন হয় তো হোক।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে কৃষ্ণান বললেন, "কমরেড লোপোন গেটের বাইরে অপেক্ষা করছেন। ডাকব?"

"ডাকুন।"

একটু পরে কৃষ্ণান লোপোনকে নিয়ে ফিরে এলেন। লোপোনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "কমরেড, আমাদের হাতে আর দুটি বছর সময়। বিশ্ববিপ্লবের আগুন আমাদের জ্বালতেই হবে। হয় জ্বালাতে হবে, নয় তো নেতৃত্ব থেকে আমাদের সরে দাঁড়াতে হবে।' অতএব আপনি হিমালয়-ফ্রণ্টে প্রতি ইঞ্চি জমিতে মিনিট গুণে গুণে অস্ত্রাগার সৃষ্টি করুন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি অস্ত্রের অভাব হবে না। মনিপুর আর ত্রিপুরা অঞ্চলে আমাদের অস্ত্র রাখবার সুবিধা আছে?"

কমরেড লোপোন বললেন, "না। ও-দিকটায় আর জায়গা নেই। প্রকৃতপক্ষে লাড্‌কা থেকে সুরু করে কেরেনদের সীমান্ত পর্যন্ত আমরা তৈরি হয়ে আছি।"

"ডোব্রো, ডোব্রো··· "

কমরেড লোপোন আর কৃষ্ণান চলে যাওয়ার পর পিসেমশাই এলেন। তিনি এসে খবর দিলেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আন্দ্রিয়েভ আর ওল্‌গা এসে পৌঁছে যাবে। পিসেমশাইকে রাস্তার ফটকে অপেক্ষা করতে বলে আমি ঠাকুরদাকে দেখতে গেলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আওয়াজ করলাম। কোন সাড়া পেলাম না। বুঝলাম তিনি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমচ্ছেন। ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাওয়ার পর দু'তলায় উঠবার মুখে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। অন্ধকার সিঁড়ির নীচ থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম পিসেমশাই ওল্‌গা কাকীমার কোমর জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠছেন। আন্দ্রিয়েভ রয়েছেন ওঁদের সামনে। মনে মনে ভাবলাম, সময় বুঝে সবগুনোকে ছোবল দেব। ভারতবর্ষ রাসলীলার দেশ হ'লেও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কেউ রাসলীলা করতে আসে না। আমরা নতুন সভ্যতা নিয়ে এসেছি কেবল পাঁচ হাজার বছরের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধূলিসাৎ করবার জন্য। এত বড় কঠিন কাজ যাঁরা হাতে নিয়েছেন তাঁরা মেয়েমানুষের কোমরে হাত রাখেন কি করে?

আমি ঘরে প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। পিসেমশাই ও ওল্‌গা কাকীমাকে আমি নতুন করে দেখলাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম দু'জনের চোখেই ভয়ের চিহ্ন রয়েছে। প্রথমেই আমি ধমকে উঠলাম, "আপনাদের কাজে অত্যন্ত শৈথিল্য এসেছে। আপনাদের আমি শেষ বারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি যে আমরা কাজ চাই। গিলঘিট এবং কালাত স্টেটে আমেরিকানরা সামরিক বিমানঘাঁটি তৈরি করেছে ছ'মাসের উপর। তার পুরো খবর আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি। কাজের শৈথিল্য আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

আন্দ্রিয়েভ বললেন, "দুটো জায়গাই পাকিস্তানে। অতএব খবর পেতে দেরি হচ্ছে।"

"পাকিস্তান? কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন রাষ্ট্রের ব্যবধান স্বীকার করে না। আমাদের খবর দরকার। অতএব সেটা চাই। ওজুহাত শুনতে গেলে আমরা কাজ করব কখন? আমাদের হাতে ঠিক আর সাত-শ' সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় আছে। আমাদের জন্য ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকবে না। আন্দ্রিয়েভ, ভারতীয় সেনাবাহিনী আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি পদক্ষেপের সংবাদ আমি চাই। ওদের সৈন্য চলাচল করবার আগেই আমরা জানতে চাই যে ওরা চলবে। আমরা যদি একটু এগিয়ে থাকতে না পারি তবে আমাদের বিপ্লব তো জয়ী হবে না। সুতরাং এখন থেকে আমি মিনিট গুণব। প্রতি মিনিটের রিপোর্ট আমি চাই। হয় আপনাকে আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, নয় তো আপনাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারতবর্ষ বলতে আমি পাকিস্তানও বুঝি। বিশ্বাসঘাতক টিটোর দেহ-রক্ষীর কাজ এ নয়।"

আন্দ্রিয়েভ বললেন, "আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। কাজে নিশ্চয়ই আমার শৈথিল্য এসেছে।"

"ডোব্রো, ডোব্রো।" তারপর পিসেমশাইকে সম্বোধন করে বললাম, "তোমাকে আমার অনেক কথাই বলার ছিল। একটা কথা তোমাকে আমি

বলতে চাই যে যদিও তুমি বুর্জোয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি করছ তবুও তোমার মনে রাখতে হবে যে পার্টির কাজ সব চেয়ে বড়। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে তুমি কমরেড বেরিয়ার স্থান অধিকার করবে। অতএব তোমার দায়িত্ব সম্বন্ধে তোমার অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডাক্তার কাট্জু আর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কমিসার রণদা ব্যানার্জি এক লোক নয়। আমাদের বিপ্লব কিছুতেই জয়ী হবে না যদি তোমরা কাজে কোন রকম ঢিলে দাও।"

পিসেমশাই বললেন, "কোথাও ঢিলে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

ধমকে উঠলাম, "মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য পার্টিতে কোন আলাদা লোক নেই। কম্যুনিষ্ট পার্টি ছেলেখেলা করতে বসে নি। গত ছ'মাসে দিল্লি, বোম্বে এবং মাদ্রাজে পুলিস বিভাগ থেকে ক'জন লোক পার্টিতে যোগ দিয়েছে? মাদ্রাজে কাজ ভাল হয়েছে বটে কিন্তু দিল্লি আর বোম্বেতে কেন ভাল হয়নি? আমি তোমায় শেষ বারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি, আমরা কাজ চাই।"

পিসেমশাই তবু বললেন, "আমি যথাসাধ্য করেছি।"

চেঁচিয়ে উঠলাম, "না, না। যথাসাধ্য কথাটা নেহেরু কিংবা কাটজু ব্যবহার করেন। আমাদের কাজ করতে হবে যথাসাধ্যের চেয়ে বেশি। আমাদের জীবনে চব্বিশ ঘণ্টাই ওয়ার্কিং আওয়ার্স। আমি চাই সমস্ত আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা এবং দার্জিলিংএর সীমান্তবর্তী স্থানে তোমার গুপ্তচররা আমাদের পার্টির নিরাপত্তা রক্ষা করবে। যারা পার্টির সভ্য তাদের তুমি সেই অঞ্চলে বদলি করে দাও। আর যথাসাধ্য যদি করেই থাকো তার প্রমাণ দাও।"

"কি প্রমাণ?"

"মাদ্রাজ-পুলিসের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করো। ওরা ধর্মঘট করুক। আমাদের শক্তি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

এবার আমি আন্দ্রিয়েভকে বললাম, "আপনাকে যাওয়ার আগে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের হাতে আর সময় বেশি নেই। এই ক'টা

২৮

দিনের মধ্যে নতুন ইতিহাসের গোড়াপত্তন করতে হবে। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতাবাসের ওপর সতর্ক নজর রাখবেন। ওদের অভিসন্ধির প্রত্যেকটা বিষয় আমরা জানতে চাই। আমাদের আসল সংগ্রাম কংগ্রেসের সংগে নয়, আমেরিকার সংগে। ভারতবর্ষের ওপর সমগ্র জগতের ভাগ্য নির্ভর করছে এটা আপনারা মনে রাখবেন। কমরেড, আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে বিশ্ববিপ্লব জয়ী হবেই। আমরা জিতবই। কমরেড স্টালিন কখনও ভুল করেন না।" ওল্‌গা কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নুকু আর অনীতা কেমন আছে?"

"নুকু ভাল নেই। অনীতার মন এবং স্বাস্থ্য খুবই ভাল।"

"নুকু ভাল নেই কেন?"

"ও-সব মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাপার।"

"ও বুঝেছি। বিনয়প্রকাশ কি অনীতাকে এখনও বুঝিয়ে উঠতে পারেনি?"

"অনীতা মনে করে বিনয়প্রকাশ এখন আর কম্যুনিষ্ট নয়। সে তাকে গির্জাতে নিয়ে যায়।"

এবার আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। সবাইকে সিগারেট দিলাম। সাক্ষাতের শেষ মুহূর্ত ক'টা আমি ইচ্ছা করেই একটু উচ্ছ্বাসময় করে তুললাম। মেসিনের মধ্যেও মাঝে মাঝে একটু আধটু তেলগ্রিজ লাগাতে হয়। ওঁরা উঠলেন। পিসেমশাই বললেন, "মাদ্রাজ-পুলিসদের দিয়ে ধর্মঘট আমি করাতে পারবই।"

"মুখের কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কাজ দিয়েই দেখাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক লোকের চাকরি যাবে।"

"যাক। পঞ্চাশ এক-শ' লোকের জীবন নষ্ট করতে ভয় পেলে তুমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিসার হবে কি করে? ভারতবর্ষের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ লোককে হত্যা করার অধিকার তোমায় আমি দিলাম। হাত তোলবার জন্য আমাদের একান্নভাগ লোক থাকলেই হবে।"

কম্যুনিষ্ট ভারতের কমিসার হওয়ার অংগীকার পেলেন পিসেমশাই। ভারী মন ক্রমশই হালকা হয়ে আসছিল তাঁর। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আমি বললাম, "আন্দ্রিয়েভ, ছোটকাকা যেন কুইনস্ পার্ক এক্ষুনি ত্যাগ করেন।" পিসেমশাই ওল্গা কাকীমার কোমর জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর কমরেড রাও এলেন। আমার নরম স্বর আবার গরম হয়ে উঠল। কমরেড রাও বললেন, "আগামী কাল সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং।"

"মিটিংএর চেয়ে কাজ বড়, এ-কথা কি আপনি ওদের সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কমরেড রাও? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না যে আমেরিকা তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে ভারতবর্ষের মাটিতে? আমাদের হাতে আর সময় নেই। ইতিহাসের রাস্তা দিয়ে বিপ্লব এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়। দরজা খুলতে দেরি হ'লে কংগ্রেস আর আমেরিকা বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেবে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করুন যে আমেরিকা তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজন করছে আমাদের মাটিতে। তিরিশ কোটি লোককে বিশ্বাস করাতে ক'হাজার টন কাগজ লাগবে কমরেড রাও?"

কমরেড রাও জবাব দিলেন, "কাগজ আমাদের আছে।"

"তা হ'লে ছাপতে অসুবিধা হচ্ছে কেন? সত্যি কথা বলতে কি পার্লামেন্টে আমাদের কাজ ভাল হচ্ছে না। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে যে সব উচ্চপদীয় কর্মচারীরা আমাদের কাগজে নাম সই করেছেন তাঁরা কি করছেন? গভর্ণমেন্টের প্রত্যেকটা কল্পনা যাতে কার্যকরী না হয় তার জন্য ওঁরা কি করছেন? কমরেড রাও, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি করুন। বেকার মধ্যবিত্ত, বেকার শ্রমিক এবং বেকার কৃষাণ। বিক্ষোভের বাষ্পে হিন্দুস্থানের বাতাস দূষিত হয়ে উঠুক। নেহেরুকে কোয়ালিসন গভর্ণমেন্ট তৈরি করতে বাধ্য করতে হবে। তিনি বাধ্য হবেন। কোয়ালিসনে

কোন্ কোন্ লোক যাবেন তার লিস্ট তৈরি করে ফেলুন। কমরেড রাও আমাদের হাতে সময় অতি অল্প। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভাল নয়। আমেরিকা যুদ্ধ করবার জন্য তড়পাচ্ছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় আমরা প্রস্তুত নই। অতএব আমাদের আরও বেশি কাজ করতে হবে। আরও বেশি সংঘবদ্ধ হতে হবে। ভবিষ্যৎ ভারতের আপনি একজন নির্বাচিত কমিসার। আপনার দায়িত্ব এবার বুঝে নিন।"

কমরেড রাও তাঁর কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বললেন, "কাল সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিংএর পর আপনার কাছে আসব। আপনি যা বললেন তার গুরুত্ব ওঁদের আমি বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দেব।"

"সাত দিনের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের পার্টি-মেসিন পুরো দমে চালু করতে হবে। কংগ্রেস-শাসনতন্ত্র একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দিন।"

আমার শেষ হুংকার শুনবার পর কমরেড রাও গোয়াবাগান ত্যাগ করলেন।

তারপর আরও ছ'মাস কেটে গেছে। দিল্লিতে সিমেনসের সংগে দেখা করে আমি প্রায় তিন মাসের ওপর দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে এসেছি। মাদ্রাজে রাজা গোপালাচারিয়া কম্যুনিষ্টদের ধ্বংস করবার যে-সব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তার কোনটাই কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাজাজি আবার তাঁর মহাভারত নিয়ে মত্ত হয়ে রইলেন। মামা ঠিকই বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকরা ক্রমশই লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করছেন। তার ফলে শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অযোগ্য লোকদের ভিড় ক্রমশই বাড়তে লাগল। আমাদের কাজের তাতে সুবিধা হ'ল। কম্যুনিজম-সংস্কৃতির গন্ধমাদন ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমাদের রাজত্ব বিস্তারের

সুযোগ হ'ল প্রচুর। উনিশ-শ' চুয়ান্ন সালের শেষ দিকে কংগ্রেসের নেতারাও যেন জ্ঞানী লোকদের মত দিল্লির মসনদ ছেড়ে দিয়ে বনে জংগলে পালিয়ে যেতে চাইলেন। জনসাধারণের মধ্যে যত বেশি উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়তে লাগল এঁরা তত বেশি দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে যে নৈতিক সাঁকো দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় সেই সাঁকোটাও ভেঙ্গে গেল। নেহেরুকে সামনে দাঁড়ানো দেখলেও যেন কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পাকা ধান পচে উঠল। এবার কেবল বিপ্লবের মই লাগাতে পারলে সমস্যা মেটে। আমি মিনিট গুণতে লাগলাম।

নুকুর সংগে আজও আমার দেখা হয়নি। নেপালে সে কাজ করছে প্রচুর। নুকু জানিয়েছে আরও কিছুদিন তার ওখানে থাকা উচিত। আমি জানি, নুকু কলকাতায় আসতে চায় না। ওর জীবনের বড় স্বপ্নটা কলকাতার মাঠেই মারা গেছে। অনীতা আর বিনয়প্রকাশের জগতে নুকুর জন্য এক ইঞ্চি জায়গা নেই। নেপালের অরণ্যে নুকুও বুঝি তাই লুকিয়ে থাকতে চায়।

কলকাতায় ফিরে এসে এবার আমি বাবার সংগে দেখা করবার জন্য কয়েক বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা হয় না। তিনি বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করে বেলুড় মঠে দিন কাটাতে লাগলেন। রাত্রিতে ফিরে আসেন। অনেক দিনই মার সংগে দেখা হয় না। তিন তলার ঘর খালি হয়ে গেছে। ছোটকাকা তাঁর জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিয়ে গেছেন। মা এখন সেই ঘরটাতেই থাকেন। মা আর অনীতা এক খাটেই পাশাপাশি শুয়ে রাত্রি যাপন করেন। দু'তলাটাও বাবা কোন্ এক মাদ্রাজির কাছে ভাড়া দিয়েছেন। বাঙালীরা আজকাল বাঙালীকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। তিন তলার ছাদে বাবারও থাকবার জায়গা হয়েছে। তবে পাকা ঘর নয়। দু'খানা ছ'ফুটের পুরনো টিন কিনে এনে তিনি একটা ছাপ্‌রা তৈরি করেছেন। একটা তক্তাপোষ কোত্থেকে যেন গোরাচাঁদ যোগাড় করে এনেছে। সে প্রতিদিন বাবার জন্য এই তক্তাপোষে শয্যা রচনা করে। রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে বাবা ভোর রাত্রিতে পালিয়ে যান

বেলুড় মঠে। বেলুড় মঠের আকর্ষণের চাইতে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর অনেক বেশি। বাবা মহাজ্ঞানী নন। তবে ভাল লোক। অতএব তাঁকে পালাতে হবে। পালাবার পক্ষে বেলুড় মঠ খারাপ জায়গা নয়। অনীতার সংগেও অনেকদিন্ দেখা হয় না। বিনয়প্রকাশকে নিয়ে সে গির্জাতে গেছে সে-খবর আমি জানি। অনীতার সংগেও আমার দেখা হওয়া দরকার। এই সব ভাবতে ভাবতেই আমি কুইনস্ পার্কের দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এসপ্লানেডে ট্রাম বদ্‌লে গড়িয়াহাটার ট্রামে চেপে বসলাম। ট্রাম সব আটকে গেছে। সামনে বেকার ধর্মঘটকারী শ্রমিকরা এক বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে ময়দান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে হিসাব করে দেখলাম আগামী তিন মাসের মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যা হবে এক হাজারের ওপর। বিলেতি কোম্পানির সাহেবরাও আমাদের পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করলেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই সব বিদেশী কোম্পানিগুলো সাধু এবং অসাধু উপায়ে বিদেশে টাকা রপ্তানির অংশ বাড়িয়ে দিতে লাগল। তার উপর বিদেশ থেকে লোক আমদানি করতে লাগল অনেক বেশি। ভারতীয়দের ঘাড়ের ওপর বড় বড় চাকরি নিয়ে তাঁরা চেপে বসলেন। ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে লাগল। অনেকে আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। ভারত সরকার বিদেশী কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করলেন বটে কিন্তু ফল হ'ল না। ফল হওয়ার কথাও নয়। আমরাই তাঁদের ডেকে এনেছি। হিন্দুস্থানে মূলধন নেই বলে বাইরের মূলধন দিয়ে এ-দেশকে শিল্পায়িত করবার আহ্বান জানিয়েছি আমরাই। মুনাফা টেনে নিয়ে যাওয়ার অধিকার না দিলে কেউ আসত না। সুতরাং ওরাও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে লাগল। ফলে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ বাড়তে লাগল প্রতিদিন। বিষের স্রোত মন্থর গতিতে সারা দেশকে ঘিরে ফেলতে লাগল

ক্রমে ক্রমে। স্টার্লিং ব্যালান্সের ঋণ যখন ওরা শোধ করছে লোকসান ওরা পুষিয়ে নেবেই।

উনিশ-শ' চুয়ান্ন সালে পাট এবং চা-এর ব্যবসায় সত্যি সত্যি লোকসান হতে লাগল। কেবল তাই নয়, একজন সাধারণ দোকানদারও মাল বেচে মুনাফা করতে পারল না। লোকসান, লোকসান, লোকসান! চতুর্দিকে কেবল লোকসানের ঢাক বাজছে। শিল্পপতিরা সনাতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তৃতীয় মহাযুদ্ধ না বাধলে ব্যবসা থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শ্রমিকদের ঐ বিরাট শোভাযাত্রা দেখে আমার মনে হ'ল ওরাই এঁদের ষড়যন্ত্র ভাঙবে।

কুইনস্ পার্কের বাড়ি আর নীরব নয়। নীচে হিন্দি, দু'তলায় তামিল ভাষার কলরব চলেছে। কিছুদিনের মধ্যে এখানে সর্বভারতীয় কলরব হয়তো শোনা অসম্ভব হবে না। বাংলা ভাষা রবি ঠাকুরকে নিয়ে পালিয়ে যাবে গুহাগহ্বরে। বড়কাকার পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তেমন ইংগিত ছিল। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, বাংলা দেশ ভারতবর্ষ-পাহাড় থেকে স্খলিত ভূখণ্ডের মত ভেঙ্গে পড়ছে। সেই জন্য তিনি দুঃখ করেছেন। ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বর খুঁড়ে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, অতীতে বড় বড় সভ্যতাও নষ্ট হয়েছে। মানুষ তা চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হয়েছে। ইতিহাসে তা লেখা থাকলেও মানুষ সে-সব আর পড়তে চায় না। সেদিনের নীল নদের তীরবর্তী সভ্য মানুষরা আজকের ইসলামধর্মী মিসরবাসী নয়। শতবর্ষ পরে বাঙালীকেও হয়তো চেনা যাবে না। বড়কাকার দুঃখ বাংলার মহাজ্ঞানীদের দুঃখ। তাঁরা তো সব আত্মগোপন করে রইলেন। দুর্দিনের দুঃখ বহনের বোঝা কেবল সাধারণ বাঙালীকে বইতে হবে। কম্যুনিজম তাই আজ দরজায় সমুপস্থিত। হাত বাড়িয়েছে বোঝা নামাবার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলাম। আশপাশে চাইতে যেন লজ্জা হচ্ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে বাগানটা আছে কি না তাও যেন আমি দেখলাম না। দু'তলার সিঁড়ির মোড়ে মাদ্রাজী ভদ্রলোকের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা 'মুরুক্কু' খাচ্ছে। কটমট করে আওয়াজ হচ্ছিল। কান দিয়ে আওয়াজ শুনলাম, চোখ

দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে দেখলাম না। চোরের মত পা টিপে টিপে যেন আমি তিন তলায় উঠতে লাগলাম। তিন তলার সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে অনীতার কামরাটা দেখা যায়। অনীতাকেও এ-ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ভোটের ঋণ আজও বাবার শোধ হয় নি। কেবল প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বাবা তাঁর শেষ অবলম্বনটুকুও বাঁধা দিয়েছেন। ভারতবর্ষের কোন নেতাই তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। বাবাই কেবল অরণ্যে রোদন করে মরছেন। সব হারাতে পারেন তিনি, নীতি হারাতে পারেন না।

ছাদের ওপরে মার সংসার জগদ্ধাত্রীর সংসারের সংগে একেবারে মিলে মিশে গেছে। ভেবেছিলাম মস্তবড় হাহাকার ফাঁকা আকাশে প্রতিধ্বনি তুলবে। মা-বাবার সংগে সংগে জগদ্ধাত্রীও নড়েচড়ে উঠবেন। কিন্তু ছাদের ওপরে হাহাকারের বদলে প্রশান্তির স্পর্শ পেলাম। মা এবং অনীতা বিন্দুমাত্র উদ্বেলিত হয় নি। ওরা যেন ভগবানের আরো কাছে এগিয়ে গেছে বলে মনে হ'ল। পরম প্রশান্তি নিয়ে মা জগদ্ধাত্রীকে বরণ করছেন। ঠাকুরঘরে দু'তলার আসবাবগুলো সব স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। জগদ্ধাত্রীর চারপাশে জায়গা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু মায়ের আধ্যাত্মিক পরিধি বিস্তৃত হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। পরিধি না বাড়লে হাহাকার নিশ্চয়ই উঠত। বস্তুতন্ত্রবাদের প্রতিটি বস্তু নিরর্থক অহংকার নিয়ে যেন তিন তলার ছাদ থেকে পালিয়ে গেছে অনেক দূরে। যে-আদর্শ আমি আজ সারা ভারতে প্রচার করবার আয়োজন করেছি সে-আদর্শ পালিয়ে গেলে তো চলবে না। ধরে রাখবার দায়িত্ব আমার। মা এবং অনীতার ভগবানকে ভেঙ্গে দিতে না পারলে আমাদের আদর্শের চারাগাছ বড় হতে পারবে না।

অনীতার কাছে এলাম। বই পড়ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই বইটা বন্ধ করে সে আমার পায়ের ধুলো নিল। ধুলোর সবটুকুই যে কত বড় মিথ্যে অনীতা তা আজও টের পায় নি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছিস ?"

"ভাল আছি দাদা। চলো, বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ছাদে যাই।"

"ছাদে কেন রে ?"

"অনর্থক বাতি জ্বালিয়ে লাভ কি ? তাতে কেবল খরচ বাড়বে।"

"কতটুকুই বা খরচ, দশ ঘণ্টায় তিন আনা বিল্ উঠবে।"

"তিন আনাই বা নষ্ট করে লাভ কি ?"

ছাদের এক কোণায় এলাম আমরা। অনীতা বলল, "শুনলাম তোমার ব্যবসা নাকি ভাল হচ্ছে না দাদা ?"

"বর্তমানে ভাল হচ্ছে না। পরে নিশ্চয়ই হবে। হাঁ রে অনীতা, বাবা এ-সব কি করছেন ?"

"কেন ?"

"হাইকোর্ট ছেড়ে দিয়ে বেলুড়ে গিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন কেন ?"

"গঙ্গার ওপরে বেলুড় ; তাই তাঁর গায়ে হাওয়া লাগে। বাবাই বা কি করে হাওয়াটা তাড়িয়ে দেবেন বলো ? বেলুড়ে কেবল হাওয়াই দেখলে, আর কিছু দেখলে না দাদা ?"

"দেখব না কেন ! ডলার দিয়ে তৈরি মঠও দেখেছি।"

"আমার মনে হয় বাবা ডলারও দেখেন নি, মঠও দেখেন নি।"

"তবে ?"

"তবে বোধহয় এমন কিছু দেখতে যান যা কম্যুনিজমের দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না।"

"তেমন দেখা তো শুনেছি জগদ্ধাত্রীর মধ্যে দিয়েও দেখা যায়। তবে আর অতদূরে তিনি যান কেন ?"

"বাবা হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন দাদা।"

"সেইটাই স্বাভাবিক। জগদ্ধাত্রীর রং সব চটে গেছে। মনে হয় সর্ব অঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখ খারাপ হবে। হাজার হ'লেও বাবা তো শিক্ষিত লোক।"

"শিক্ষিত ঠিকই। তবে তোমার চেয়ে বেশি নয় নিশ্চয়ই।"

"না, তা নয়। ঠিকই বলেছিস। হাঁ রে অনীতা, কমলকে সৎপথে আনতে পারলি না?"

"ক্রমে ক্রমে আসছে। সবাইকেই আসতে হবে। এমন কি তোমাদের স্টালিনকেও। দুনিয়ার তিন-শ' কোটি লোককে মেরে ফেলবার ক্ষমতা তাঁর নেই। থাকলেও, আমি ভেবে দেখলাম প্রথম মানুষের আবার যখন জন্ম হবে তাঁর নাম হবে আদম আর প্রথম মেয়েমানুষের নাম হবে ইভ। কিন্তু স্টালিন আর জন্মাবে না।"

"তা না জন্মাক। এখন কমলের সংগে তোর বিয়ে হচ্ছে কবে?"

"হবে না।"

আমি যেন চমকে উঠেছি তেমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন রে? কমল কি এখনও কম্যুনিষ্ট?"

অনীতা স্পষ্ট গলায় জবাব দিল, "কম্যুনিষ্ট হ'লেও বিয়ে করতাম। একটা জীবন দিয়ে যদি এক-শ'টা জীবন রক্ষা করতে পারতাম দাদা, তাহ'লে এক বছর আগেই বিয়ে হয়ে যেত।"

"শহিদ হতে চেয়েছিলি বুঝি? এ-সব ভণ্ডামি ছেড়ে দিয়ে এবার ওকে বিয়ে কর। খরচ যা লাগে আমি দেব।"

"না, খরচ যা লাগবে বাবাই দেবেন। কমলের কোন দাবি-দাওয়া নেই। তাছাড়া গুচ্ছের আসবাবপত্র নিয়ে কমল রাখবেই বা কোথায়? বস্তিতে স্থান সংকুলান হবে না।"

"ভগবান তো বস্তিতেও থাকেন। বস্তিতে থাকতে হবে বলে বুঝি কমলকে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিস?"

"না। সন্দেহ হচ্ছে ঝুকু কমলকে ভালবাসে। যদি সত্যি তাই-ই হয় তবে ঝুকুর ভালবাসার তল আমি দেখতে পেয়েছি। ঝুকু কাউকে যে ভালবাসে সে-কথা মিথ্যা নয় দাদা।"

"এ-সম্বন্ধে কমল কিছু বলে না?"

"সে অস্বীকার করে। এযাবৎকাল আমি ভেবে এসেছি তোমাদের দুটো করে চেহারা আছে। এখন ভাবছি দুটো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যা। দাদা, আমি নিজে সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখ সইতে পারব, কিন্তু মুকু পারবে না। দরকার হয়, আমি সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারি। মুকু পারবে না। মুকু আমার ছোট বোন এ-কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু কমল বড্ড দুঃখ পাবে। সেও তোকে ভুলতে পারবে না। অনীতা, তোকে বোধহয় আমিও বাঁচাতে পারলাম না।"

অনীতা আমার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "এ কথা কেন বলছ দাদা?"

"ভারতের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে প্রতি ইঞ্চি জমির হিসেব থাকবে। পালিয়ে যাবার জন্য কোন আশ্রম কিংবা গির্জা আমরা রাখব না। যারা পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে তাদের চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে।"

"তা হোক। তারপর আবার একদিন ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। দাদা, মরবার ভয় তো আমার নেই। মরণের মধ্যেও দেখবে ভগবানের জয়পতাকা উড়ছে। আমার জন্য তুমি দুঃখ করো না। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। আছি এই জন্যে যে, ভারতবর্ষ তোমরা দখল করবেই।"

"আমার মনে হয় তার চাইতে কমলকে বিয়ে করা ভাল ছিল। মাকে বলিস আমি এসেছিলাম।"

"দেখা করবে না?"

"পূজো করছেন, থাক। আমি পরশুদিন একটু কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।"

"এই তো ছ'মাস পর কলকাতায় ফিরলে। সবাই বলছেন তোমার ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে অথচ তুমি দেখছি লম্বা লম্বা গাড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছ! দাদা, ব্যবসা করছ, না পার্টির কাজ করছ?"

আমি ভাবলাম অনীতার মুখ থেকে লাগাম খসে গেছে। সিমেনস যদি এর একটি কথা শুনতে পায় তা হ'লে অনীতার অকালমৃত্যু আমি আর ঠেকাতে পারব না। আমি বললাম, "অনীতা, তুই কি আমায় বিপদে ফেলতে চাস? সমস্ত দেশ জুড়ে ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে। কাগজ পড়িস না?"

"পড়ি আর হাসি। যে-সব কম্যুনিষ্টকে নেহেরু-সরকার ধরছে তারা সব বোধহয় ধরা পড়বার জন্যই বসে ছিল। আসল কম্যুনিষ্টদের খবর ওরা রাখে না।"

"অনীতা, তুই কি আমাদের ধরিয়ে দিবি নাকি?" এই মুহূর্তে হাতের কাছে একটা পিস্তল থাকলে কি হ'ত বলতে পারি না। আমার মনে হ'ল অনীতা ইচ্ছা করেই মরতে চাইছে। বললাম, "অনীতা, নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনিস না।"

অনীতা বলল, "আমার সর্বনাশ কোনদিনই হবে না। এমন কি তোমাদের রাষ্ট্রেও হবে না। কিন্তু দাদা, তোমার নিজের জন্য ভয় হয় না?"

"আমি আর এমন কি লোক যে ভয় পাব?"

"আমি বুঝতে পেরেছি, কম্যুনিষ্ট পার্টির তুমিই সব চেয়ে বড় নেতা।"

মা একটু আগেই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে অনি? দীপু আমার কম্যুনিষ্ট পার্টির সব চেয়ে বড় নেতা? আহা, এমন সোনার চাঁদ আমি গর্ভে ধরেছিলাম! দীপক, তোকে আমরা চিনি না। এ-বাড়িতে বিনা অনুমতিতে ঢোকবার অধিকার তোর নেই। ঢুকলে চোর বলে ধরিয়ে দেব। আমরা তোকে কখনও কম্যুনিষ্ট বলে ধরিয়ে দেব না। আমরা কথা দিলাম, তুই বিশ্বাস করিস।"

"তোমরা কথা দিলে যে রাখবে আমি তা জানি। কিন্তু অনীতার বিয়েটা পাকা করে বাড়ি থেকে বেরলে ভালই হ'ত। ভাল হ'ত তোমার এবং তোমার মেয়ে অনীতার।"

"না, অনীতার বিয়ে আমি দেব না।"

"দিলে তোমরা সুখেস্বচ্ছন্দে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারতে। তিন তলার ছাদে তাঁবু খাটিয়ে এমন রহস্যজনক ভাবে জীবন কাটানোর মানে হয় না। জগদ্ধাত্রীর মধ্যে যত রহস্যই থাক তোমাদের তো ভাল করে খেয়েদেয়ে ঘুমনো দরকার মা?"

মা বললেন, "দীপু, তুই ছাদে এলে চারদিক থেকে নর্দমার গন্ধ বেরয়।"

"তা হ'লে সম্ভবত জগদ্ধাত্রীর কাদা-মাটিতে পচন ধরেছে। সস্তার জগদ্ধাত্রী কতদিন আর টিকবে বল? পুরাণের যুগে বোধহয় জগদ্ধাত্রীর জন্ম। না মা? কালিঘাটে এসে ভোল বদলেছে।"

"দীপক, এর পরও তোকে আমি ক্ষমা করলাম। আমরা আর তোর মুখদর্শন করতে চাই না। তুই যা।"

"যাচ্ছি। কিন্তু অনীতার সংগে কমলের বিয়ের কি হবে?"

"অনি, আমায় এতদিন বলিসনি কেন রে?"

অনীতা মুখ নীচু করে জবাব দিল, "বিয়ে হবে না বলেই বলিনি মা।"

"কেন?"

"কমলকে নুকু তার সমস্ত জীবন দিয়ে ভালবেসেছে। নুকু তার হাতে কিছুই রাখেনি। আমি জানতাম না মা।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "নকুর নামে যা তা বলিস না। নুকুর চরিত্র কেবল সাদা নয়, গাধার দুধের মত সাদা, নিষ্কলঙ্ক।"

"দাদা, তুমি সব জেনেশুনে কেন যে আমাদের সর্বনাশ করতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।"

"তা তো তুই বলবিই অনীতা। উপকারীকে বাঘে খায়। তোকে আমি একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম। যাক্, সে-সব কথা তোর জেনে লাভ নেই। নুকু কমলকে ভালবাসে এ-কথা তোকে কে বলেছে? নিশ্চয়ই নুকু নয়?"

"না। সন্দেহ হচ্ছে, কমলের আসল নাম কমল নয়।"

"তবে ?"

"তবে কি সে হয়তো তুমি আর নুকু বলতে পারবে। মহাপাপ থেকে ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন।"

"ভগবান যখন এতটাই করেছেন তা হ'লে কমলের আসল নামটা তিনিই তো জানিয়ে দিতে পারেন ?"

"না দাদা। তার বোধহয় দরকার হবে না। মা যদি অনুমতি দেন তা হ'লে আমি কাসিয়ং চ'লে যাব চিরদিনের জন্য।"

"শুনলে মা, শুনলে ? অনীতা জাতজন্ম সব খোয়াতে বসেছে ?"

আমার কথায় কান না দিয়ে মা বললেন, "আমি অনুমতি দিলাম অনীতা।"

ঠিক এই সময় দু'তলার রেডিওতে খবর প্রচার হচ্ছিল। প্রথম খবর—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বিভিন্ন দলের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে স্বীকৃত হয়েছেন। আগামীকল্য ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনের পর বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে কোন্ তারিখে ভেঙ্গে দেওয়া হবে সে-সম্বন্ধে সঠিক ভাবে জানা যাবে।

দ্বিতীয় খবর—টাটানগরে আজ সন্ধ্যা ছ'টার সময় একদল ধর্মঘটকারীদের উপর পুলিস গুলি চালায়। হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কানপুরে আরও বত্রিশটি কারখানায় ধর্মঘট সুরু হয়েছে।

তৃতীয় খবর—উত্তর নেপালে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি লুঠ করে। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে এই সব লুঠতরাজের পেছনে কম্যুনিষ্টদের গোপন হস্ত কাজ করছে।

চতুর্থ খবর—বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতায় আজ মোট পঞ্চাশজন কম্যুনিষ্ট নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। এবার বৈদেশিক খবর। প্রথম খবর—আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী চীন সাধারণতন্ত্রের উপকূলে তিনটি তেল-বোঝাই জাহাজ গ্রেফতার করে। মার্কিন সরকারের এই আক্রমণাত্মক নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বহুবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার

কথা উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিতীয় খবর—তিব্বত ও উত্তর নেপালে বহু-সংখ্যক চীনা লাল ফৌজের আনাগোনা সম্বন্ধে ভারত সরকার প্রকৃত খবর জানবার জন্য পররাষ্ট্র বিভাগের শ্রীরাজাক আলি ও শ্রীটনটনিয়াকে লাসায় প্রেরণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পিকিং সরকারের অনুমতি পেলেই ওঁরা বিমানযোগে রওনা হবেন।

খবর বলা যখন শেষ হ'ল আকাশের দিকে চেয়ে বললাম, "ইংরেজরা এই সব লোকের হাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল। ভগবান রক্ষা করেছেন, বাবা আজ মন্ত্রী নেই।" এই বলে আমি মায়ের পায়ে প্রণাম করে ঘোষণা করলাম, "হাতের মুঠোর মধ্যে যদি ভারত রাষ্ট্রকে সংগ্রহ করে না আনতে পারি তা হ'লে কুইনস পার্কে আর সত্যিই ফিরব না। অনীতা, কমলের সংগে দেখা করার আর চেষ্টা করিস না। মনে করিস কমল মরে গেছে। মা, তোমাদের আমি আঘাত দিয়েছি সত্যি। কিন্তু পনরো বছর বয়স থেকে বাঙালী ছেলে দীপক চৌধুরীর বুকে যে কান্না জমে আছে তা তোমরা শুনতে পাওনি। আসলে তোমাদের আমি আঘাত দিতে চাইনি। আজ দু-শ' বছর থেকে বাংলার বুকে, ভারতের বুকে যারা প্রতি মুহূর্তে পদাঘাত করেছে তাদের সংগে আজও আমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়নি বলে মা-বোনের কাছে কেবল অভিযোগ জানিয়েছি। আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করো না। করলে তোমাদের ক্ষতি হবে। আমারও হবে। বিপ্লবের আগুন যখন জ্বলেছে ময়লা সব সাফ হয়ে যাক। একদা পঞ্চাশ লক্ষ লোক 'একটু ফেন দাও গো' বলে চিৎকার করতে করতে মরে গিয়েছিল, স্মরণ হয়? সব চেয়ে দুঃখ এই, অ-বাঙালীদের সংগে সংগে তোমরাও সে-কথা ভুলে গেছ। কিন্তু আমি ভুলি নি। অনীতা, তুই মার কাছে থাক। কার্সিয়ং না গেলে হয়তো তোদের আমি বাঁচাতে পারব।"

"দাদা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। কার্সিয়ং ছাড়া আমার আর গতি নেই।"

মা এবং অনীতার দিকে ভাল করে চাইতে পারলাম না। নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতগতিতে। ওঁরা দু'জন আমার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে আমি যেন মনের ভেতর দুর্বল বোধ করতে থাকি। এ-দুর্বলতা আমার নতুন নয়। বহু দিনের পুরনো ব্যাধি। ব্যাধি? একদিন অতি বড় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অনীতার চারদিকে কম্যুনিজমের ব্যূহ রচনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম আফিমের নেশা ওর কেটে যাবে। আজ ভাবছি কত ছেলেমানুষি করেছিলাম!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতে দেখি কৃষ্ণান আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কমরেড যশোবন্ত সিং তার ট্যাক্সি নিয়ে উপস্থিত। কৃষ্ণান বললেন, "পুলিস পলিটব্যুরোর সভ্যদের খোঁজ করছে।"

আমি বললাম, "সে-কথা পরে হবে। নেহেরুর নতুন মন্ত্রীসভায় যোগ্য ব্যক্তি কে কে যাচ্ছেন?"

"সে-সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু স্বরাষ্ট্র বিভাগ আমাদের চাই।"

"নেহেরু তাতে রাজি। তিনি তো কল্পনা করতে পারছেন না যে যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন কম্যুনিষ্ট পার্টির নুন খেয়েছেন।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। পলিটব্যুরোর মধ্যে কমরেড রাওকে পুলিস নিশ্চয়ই চেনে না?"

"না।"

"তাহ'লে আর সবাইকে লুকিয়ে পড়তে বলুন। কমরেড রাও কেবল পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থাকবেন। বিনয়প্রকাশ কোথায়?"

"কানপুরে।"

"পুলিস তার সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখে কি?"

"না।"

"অতি উত্তম। হরিপ্রসাদ কোথায়?"

"চা-বাগানে, আসাম। সেখানে তার কোন ভয় নেই। ওদিককার পুলিস আমাদের সহযোগিতা করছে।"

"কমরেড লোপোনকে খবর পাঠান যে দারজিলিং চা-বাগানে যেন কোন ধর্মঘট না হয়। ওদিকটায় গভর্ণমেন্টের যেন কোন দৃষ্টি না পড়ে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ হাতে এলে তারপর বোঝা যাবে। আমি কালই মাদ্রাজ যাব। আমার টিকিট দিয়ে যাবেন। হাঁ, ভাল কথা। নেপাল থেকে নুকুকে ফিরিয়ে আনুন। মিঃ কৃষ্ণান, আর তিন মাস সময় আছে। মানে একানব্বই দিন। কাউকে এক মিনিটও বসতে দেবেন না। আমি খবর পেয়েছি কমরেড সেলেনকভ ঘড়ি ধরে বসে আছেন। বুঝলেন?"

"হাঁ, বুঝেছি।"

"মিঃ কৃষ্ণান ...।"

"বলুন, আমি শুনছি মিঃ চৌধুরী।"

ট্যাক্সি তখন মন্থর গতিতে রেড রোড ধরে চলেছে। বাঙালীবাবুরা দু'চার জন সস্ত্রীক হাওয়া খাচ্ছিলেন। মনে হ'ল তাঁদের মধ্যে কে একজন যেন নেহেরুকে গালাগালি দিচ্ছেন। অপর একজন প্রতিজ্ঞাও বুঝি করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আর নেহেরুকে ভোট দেবেন না। বাঙালীবাবুর প্রতিজ্ঞা শুনে আমার হাসি পেল। বদহজমে ভুগে ভুগে এঁদের অনেকদিন থেকে রাত্রে সুনিদ্রা হচ্ছিল না। আজ বাড়ি ফিরলে জানতে পারবেন দিল্লির মসনদ টলেছে। তোমাদের আর কোনদিনও ঘুম আসবে না। কারণ তোমাদের বদহজমটাই সত্যি। যোয়ান মর্দ ছেলেগুলোর খাবার কেড়ে নিয়ে তোমরা খেয়েছ, হজম করতে পারনি। গিলে-করা পাঞ্জাবি আর লম্বা ধুতির কুষ্টি মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে ক'ঘণ্টা সময় নেয় তার হিসাব নিও তখন। আমি আবার ডাকলাম, "মিঃ কৃষ্ণান।"

"বলুন, আমি শুনছি।"

"পুলিস যদি কোনরকমে আমার সন্ধান করতে পারে?"

"অসম্ভব।"

"যদি কোনরকমে সম্ভব হয়?"

"তা হ'লে আপনাকে আমরা লুকিয়ে রাখব। অন্তত তিন মাসের জন্য লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমাদের আছে।"

"কিন্তু লুকবার জায়গাটা আমায় জানিয়ে রাখুন।"

"দিল্লিতে। সিমেনসের বাংলোয়।"

"ওদিককার পুলিসের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে?"

"একদম পাকা। মিঃ চৌধুরী, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?"

"না।"

"তবে এত ভাবছেন কেন?"

"ভাবছি সিমেনসের উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত হয় নি।"

"কোন্ উপদেশ?"

"অনীতাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।"

"যদি দরকার বোধ করেন তা হ'লে বলুন। আজই একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"না, অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে।"

"আদেশ দিন, মিঃ চৌধুরী।"

"না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আপনি এক কাজ করুন। অনীতাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখবার জন্য গুপ্তচর মোতায়েন করুন।"

"তাই করব মিঃ চৌধুরী। —ডক্টর গুহ খবর পাঠিয়েছেন।"

"কি খবর?"

"ডক্টর গুহ জানতে চেয়েছেন ও-সব কারখানায় কবে থেকে ধর্মঘট সুরু হবে।"

"নেহেরুর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পর তারিখ জানাব। মিঃ কৃষ্ণান···।"

"বলুন, আমি শুনছি।"

"কমরেড খিরভ জানতে চেয়েছেন কবে তিনি দিল্লি আসবেন। কি বলি বলুন তো?"

"ঘড়ির কাঁটা তিনি একটু এগিয়ে দিলেন না কি? বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে না?"

"মিঃ কৃষ্ণান, আমেরিকা তার বিপুল রণসম্ভার নিয়ে এগুচ্ছে। আন্দ্রিয়েভ জানিয়েছে আমেরিকার মতলব ভাল নয়। তারা নেহেরুকে আর বিশ্বাস করে না। যে-কোন মুহূর্তে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার ওজুহাত নিয়ে এখানে জবরদস্তি চেপে বসতে পারে।"

"তা হ'লে নেহেরুর বৈদেশিক নীতির প্রশংসা করে দুনিয়াশুদ্ধ সবাই কাগজে প্রবন্ধ ছাপছে কেন? গত কালও তো কাগজে দেখেছি যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ!"

"কিন্তু সমস্যা তা নয়।"

"তবে সমস্যাটা কি?"

"আন্দ্রিয়েভ জানিয়েছে যে আগামীকাল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রথম সেক্রেটারি ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। মিঃ কৃষ্ণান, ঘাটের কাছে নৌকো এসে সব না ডোবে। আমেরিকা কোনরকমে এখানে কিছু সৈন্য নামাতে পারলে সব ভেস্তে যাবে। মুন্সি আর প্যাটেলরা নেহেরুকে দিনরাত তাই বোঝাচ্ছেন।"

"তা হ'লে কিছু একটা উপায় করতে হবে তো মিঃ চৌধুরী?"

"একমাত্র উপায় নেহেরু। মুন্সির দলকে তিনি বিশ্বাস করেন না। আমাদের জয়পরাজয়ের মাঝখানে মাত্র একটা সরু সুতোর ব্যবধান।"

"সেই সুতোটা কি?"

"নেহেরুর সোস্যালিজম্।"

"মিঃ চৌধুরী, যদি কোনক্রমে তিনি হঠাৎ সোস্যালিস্ট না থাকেন? আমেরিকার কাছে যদি সাহায্য চেয়ে বসেন?"

"সেই জন্যই ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তে মার্শাল সোকোনোভিস্কি আগে থেকেই লাল ফৌজ পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটা মাত্র ডিভিসন।"

"তা হোক। সংগে তো চীনা ডিভিসন আছে গোটা কুড়ি। মিঃ চৌধুরী, খোলাখুলিভাবে বিপ্লব সুরু করে দিতে আর তিন মাস বিলম্ব কেন? এক মাস পরে অসুবিধা কি?"

"বোধহয় আর অসুবিধা নেই। আমি কাল মাদ্রাজ যাব। টিকিট কাটতে ভুলবেন না যেন।"

"কাল তো আপনার মাদ্রাজ যাওয়া হয় না।"

"কেন?"

"আপনার বড়কাকা ফিরে এসেছেন একগাল দাড়ি নিয়ে।"

আমি বললাম, "কমরেড সিং, গোয়াবাগানে আমাকে পৌছে দিন এক্ষুনি।"

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়ার পর কৃষ্ণান বললেন, "ভাল করে খোঁজ নিন তিনি এত বছর কোথায় ছিলেন। হঠাৎ কেন ফিরে এলেন। হিমালয়ের কোন গুহায় যদি বসবাস করে থাকেন, জানবার চেষ্টা করবেন, কোন্ গুহায় তিনি ছিলেন। মিঃ চৌধুরী, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি যে তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্য আমরা হিমালয়ে শেয়ালের গর্তে পর্যন্ত খোঁচা মেরে দেখে এসেছি। কিন্তু পাই নি। আমেরিকার হয়ে গুপ্তচরের কাজ করছেন কিনা সেটা একবার যাচাই করে নেবেন। কমরেড সিং, গাড়িটা একটু থামান। আমি এইখানে নেমে যাই। ভাল কথা মিঃ চৌধুরী, পামির এণ্ড কোম্পানি ফেল হয়ে গেছে। আজ থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। মিস্ মার্গারেট মার্কিন রাষ্ট্রদূতাবাসে গত একমাস থেকে কাজ করছেন। কাল আমি বেলা এগারটায় আসব।"

গোয়াবাগানের সামনে আমায় নামিয়ে দিয়ে কমরেড যশোবন্ত সিং নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন।

ঠাকুরদার ঘরে সোজা চলে এলাম। রেডিওটা ঠাকুরদার বিছানার সংগে

লাগান রয়েছে। হাত বাড়িয়ে তিনি নিজেই যেন সেটা খুলতে এবং বন্ধ করতে পারেন। ঘরের জিনিসপত্র যেন খানিকটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। নেহেরুর সম্মিলিত দলের মন্ত্রীমণ্ডলীর সংগে সংগে অন্ধ ঠাকুরদার ঘরেও পরিবর্তন হয়েছে। আমার দুঃখ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের পরিবর্তন তিনি চোখে দেখতে পাবেন না। ঘরে ঢুকবার আওয়াজ পেয়েই ঠাকুরদা বললেন, "দীপু, দীপু, ভবশংকর ফিরে এসেছে!"

"তাই শুনেই তো ছুটে এলাম দেখা করতে। কিন্তু বড়কাকা কোন্ রাস্তায় এলেন দাদু?"

"ভক্তিবাদের রাস্তায়। শংকরাচার্যের কর্মযোগের সংগে অদ্ভুত সমন্বয় এনেছে। ভবশংকরের কাছে জগৎ মিথ্যা নয়। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে ভক্তির রাস্তায়। শংকরাচার্য ও রামানুজের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে ভবশংকর।"

"তুমি কোন্ ভারতের কথা বলছ, ভবিষ্যৎ না অতীত ভারত? সমস্ত ভারতের একান্নটা কাগজ বড়কাকার প্রবন্ধটা ছাপতে পর্যন্ত চায়নি, উপরন্তু ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে চেয়েছিল! রেডিওটা বন্ধ কেন দাদু?"

"রাত দশটায় আবার খবর প্রচারিত হবে। নেহেরুর মন্ত্রিসভা যদি সত্যিই ভেঙ্গে যায় তা হ'লে ভারতবর্ষ ডুবল।"

"কিংবা উঠল। সম্ভাবনা দু'দিকেই আছে। কি বল দাদু?"

বড়কাকা একগাল দাড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি যথারীতি পায়ের ধুলো নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় ছিলে এত দিন?"

"ভারতবর্ষের বহু জায়গায়। হিমালয়েও কয়েকটা বছর কাটিয়েছি।"

"কি নিয়ে এলে আমাদের জন্য কাকা?"

"নতুন কিছু আনতে পারি নি। প্রাচীন ভারতের সত্য আবার নতুন করে বলবার দীক্ষা নিয়ে এসেছি।"

"কাকা, চারদিকে মানুষের মধ্যে হাহাকার উঠেছে। তোমার বেদ-বেদান্তের কথা কে শুনবে?"

"একজন লোকও তো পাওয়া যাবে দীপু। প্রথমে না হয় তোকেই শোনাব। তোর মধ্যে তো কোন হাহাকার নেই।"

"তা নেই। তবে দিল্লিতে যা ব্যাপার ঘটেছে তাতে মনের শান্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে কাকা।"

"শান্তি ফিরে আসবে যদি আমরা সত্য পথ ধরে চলি।"

"কিন্তু ভারতবর্ষে বোধহয় দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না। একমাত্র একটা পথ ছাড়া।"

বড়কাকা ঠাকুরদার বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "পথটা কম্যুনিজমের তা আমি জানি। কিন্তু এও জানি পথটা সাময়িক। অনেকটা বর্মা রোডের মত। যুদ্ধকালীন উদ্বেগের মুখে কোনরকমে তৈরি করেছিল, তারপর যুদ্ধের পর সে-রাস্তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। কিন্তু সত্যের পথ ভগবানের সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রথম প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত এতটুকু বদলায় নি। মানুষের দোষ, অনেক সময় তাদের দৃষ্টিবিভ্রম হয়। ভুল করে অসত্যের পথ ধরে। দীপু, কংগ্রেসের কোন ভুল হয় নি; ভুল হয়েছে মানুষের। যাঁরা কংগ্রেসকে পরিচালনা করেছেন। আমি জানি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্টদের শাসন আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই।"

"কি করে বুঝলে কাকা?"

"বুঝলাম মানুষ তার কৃষ্টি হারিয়েছে। শিক্ষা এবং সভ্যতার মূল গেছে কেটে। অতএব কম্যুনিজমের মধ্যে গিয়ে সবাই আশ্রয় নেবে সে তো জানা কথা।"

"এতটা জানার পর লোকালয়ে আবার ফিরে এলে কেন কাকা?"

"জগৎ মিথ্যা নয় তাই। সত্য প্রচারের দীক্ষা নিয়েছি তাই।"

"তোমার জন্য আমার বড্ড ভয় করছে কাকা।"

"কেন রে?"

"তোমার মত লোকদের কম্যুনিষ্টরা মেরে ফেলবে।"

"এযাবৎকাল মরণের ভয় করেই তো সত্য প্রচার করিনি। কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রেও আমি সত্য প্রচার করব।"

"তোমার কথা শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে। দাদু, তোমার কাঁপছে না?"

ঠাকুরদা বললেন, "না, একটুও না। মানুষকে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলতে পারবে ওরা কিন্তু আত্মার মরণ নেই। ভবশংকর, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার থিসিস লেখা ব্যর্থ হয়নি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ-সোনা কম্যুনিজমের আগুনে পুড়ে আবার সাচ্চা হয়ে বেরুবে।"

ঠাকুরদা কথাটা শেষ করার সংগে সংগে রেডিওর বোতামটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন। ঘড়িতে দশটা বাজল। দিল্লি বেতার-কেন্দ্র থেকে খবর বলা স্রুরু হ'ল: অদ্য ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে নতুন মন্ত্রি-সভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়েই নতুন মন্ত্রি-সভা গঠন করা হবে। প্রধান মন্ত্রী এবার দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাচ্ছেন যে তাঁরা যেন তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করেন এবং তাঁর সংগে সহযোগিতা করেন।

বড়কাকা বললেন, "কেবল সহযোগিতার অভাবেই এমন পরাজয় ঘটল তাঁর। মহাত্মাজি বেঁচে থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রি-সভা গঠনের মধ্যে আমি তো কোন দুর্ঘটনা দেখতে পাচ্ছি না।"

"দীপু, আমি দেখতে পাচ্ছি। এইটাই ভাসমান লোকের হাতে শেষ কুটো। কম্যুনিষ্টরা তাও সরিয়ে দেবে। এই তো বিপ্লবের স্রুরু। নেতৃবৃন্দের দিশাহারা হওয়া মানেই জনসাধারণের পায়ের তলা থেকে বিশ্বাস এবং নির্ভরতার মাটি সরে গেল। এবার ওদের শান্ত করতে গেলে ওরা নতুন নেতা

চাইবে। নেতারা যখন কম্যুনিষ্টদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেননি তখন জনসাধারণের পক্ষে সত্যপথ চেনা তো সহজ নয়।"

"কাকা, এখনও সময় আছে, তুমি হিমালয়ের গুহায় ফিরে যাও। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে।"

"বোধহয় মরবার জন্যই আমি ফিরে এসেছি দীপু।"

সাতদিন পর্যন্ত বড়কাকা গোয়াবাগান থেকে বাইরে বেরলেন না। এর মধ্যে আমি মাদ্রাজ থেকে ঘুরে এসেছি। কমরেড আয়েংগার পামির কোম্পানির দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাদ্রাজে কাজ করছেন। চারদিকে অস্ত্র বিতরণ করা হয়ে গেছে। ভারতীয় লাল ফৌজের শিক্ষা সমাপ্ত। ক্যাপটেন মালহোত্রা জানিয়েছেন তিনি প্রস্তুত আছেন। পিসেমশাই খবর পাঠিয়েছেন অনতিবিলম্বে খোলাখুলি ভাবে বিপ্লব সুরু না হ'লে সব কিছু ভেস্তে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের গুপ্ত পুলিস তাঁকে সন্দেহ করছে।

কৃষ্ণান খবর দিলেন, "কমরেড রাওকে পুলিস খোঁজ করছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি কোথায়?"

"সরিয়ে দিয়েছি তাঁকে দিল্লিতে। বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসে তিনি স্থান পেয়েছেন।"

"সিমেনস কোথায়?"

"কলকাতায়। আজই তাঁর সংগে দেখা করুন। আদেশ দিন মিঃ চৌধুরী, আর দেরী করবেন না। ওয়াশিংটন থেকে লোক এসেছে নেহেরুকে বোঝাবার জন্য। নেহেরু দু'একদিনের মধ্যে প্রত্যেক সহরে সৈন্য মোতায়েন করবার আদেশ দেবেন বলে ভাবছেন। আপনি আর ভাববেন না মিঃ চৌধুরী।"

"মিঃ কৃষ্ণান, পিসেমশাইকে কালই একবার আসতে বলুন। ওল্গা কাকীমা কোথায়?"

"আপনার পিসেমশাইর কাছেই আছেন।"

"কেন? পিসিমা?"

"তিনি মারা গেছেন তিন দিন আগে। ভারতবর্ষের বিপ্লব দেখবার জন্য আপনার পিসিমার বেঁচে থেকে লাভ কি মিঃ চৌধুরী? কমরেড খিরভ কলকাতায় এসেছেন আপনি জানেন?"

চমকে উঠলাম। বললাম, "না, আমি তো জানি না!"

"কমরেড কারাজোভও এসেছেন।"

সন্ধ্যার পর আমি সিমেনসের সংগে দেখা করলাম। ঘরে ঢুকে চমকে গেলাম। মস্কোর ওগ্‌পু পুলিসের পাঁচজন পরিচিত বিশেষজ্ঞ সিমেনসের চারদিকে বসে আছেন। মনে হ'ল বোম্বে, মাদ্রাজ এবং দিল্লিতে ওগ্‌পুর অন্যান্য কর্মচারীরাও সবাই উপস্থিত আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করলেন আমায়। সবার পেছনে আন্দ্রিয়েভও ছিল। কমরেড খিরভ জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কতদিন অপেক্ষা করবেন?"

বললাম, "সাত দিন।"

আন্দ্রিয়েভ বলল, "এক ঘণ্টা আগে ন্নকু খবর পাঠিয়েছে নেপালে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে রুখে রাখা গেল না। রাজপ্রাসাদ অবরোধ করা হয়েছে। রাজা ত্রিভুবন পালিয়েছেন। কিন্তু ন্নকুর জীবন বিপন্ন।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "বিপন্ন? এ হ'তেই পারে না। ন্নকুকে বাঁচাতেই হবে। মালহোত্রা আর্মি-প্লেন পাঠিয়ে ন্নকুকে উদ্ধার করুক। এত বড় কর্মীকে আমরা কিছুতেই হারাতে পারব না।"

সিমেনস বললেন, "আমরা চেষ্টা করব।"

কমরেড খিরভ একটু ব্যগ্র ভাবেই যেন বললেন, "কমরেড সেলেনকভ জানিয়েছেন যে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই।"

বললাম, "খোলাখুলি বিপ্লব সুরু করবার আদেশ আমি দিতে পারি। কিন্তু দায়িত্ব আমি একা নেব না।"

কমরেড খিরভ বললেন, "দায়িত্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রের।"

আমার সারা বুক জুড়ে একটা বিরাট মোচড় দিয়ে উঠল। কমরেড গুহর সতর্কবাণী যেন সিমেনসের ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল। দায়িত্ব আমার নয়, দায়িত্ব লক্ষ লক্ষ কম্যুনিষ্ট কর্মীর নয়। দায়িত্ব আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের!

বললাম, "বেশ, আর সাত দিন সময় নিচ্ছি। আসছে রবিবার মাদ্রাজ, বোম্বে, কলকাতা এবং নাগপুর আমরা দখল করব।"

কমরেড খিরভ জিজ্ঞাসা করলেন, "দিল্লি নয় কেন?"

"দিল্লিতে আমরা উপস্থিত কিছু করতে চাই না। কারণ নেহেরু শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব অপর মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবেন। অতএব অনর্থক লোকক্ষয় করে কোন লাভ হবে না।"

সিমেনস বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব।"

কমরেড খিরভ বললেন, "আপনি বোধহয় জানেন না কমরেড চৌধুরী, ভারতবর্ষের বেশির ভাগ কোটিপতি এবং লক্ষপতিরা সব প্রতিদিন পালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের সোনা সব লুট হয়ে গেল। আমরা কি দিয়ে রাষ্ট্র গড়ব? আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত টাকা থাকলে আমরা ভারত সরকারকে আমেরিকার মত টাকা ধার দিতে পারতাম। যত দেরি করবেন ততই সোনা লুট হয়ে যাবে। গতকাল নিজাম পালিয়েছেন। বারোখানা প্লেন ভর্তি সোনা আর মণিমুক্তা নিয়ে গেছেন। প্রতিদিন বারোখানা করে প্লেন যাবে আর আসবে।"

"কমরেড খিরভ, নবভারতের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সোনা আমরা আবার তৈরি করব। নিজামের সোনাদানা পাওয়ার লোভে পঞ্চাশ লক্ষ কম্যুনিষ্ট আজ জীবন পণ করতে বসে নি।"

কমরেড কারাজোভ এবার কথা বললেন, "কমরেড বেরিয়ার আদেশ মত আমি পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ব-পাকিস্তানের পুলিস বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছি। আপনি অনুমোদন করুন।"

কমরেড কারাজোভের হাতে বেরিয়ার নিয়োগপত্র ছিল। কাগজটা

টেনে নিলাম। চোখ ফেটে জল বেরচ্ছিল। অতিকষ্টে চেপে রাখলাম। কমরেড খিরভ তাঁর কলমটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন। অনুমোদন পত্রের নীচে সই দিলাম। হাত কাঁপল না। কারাজোভ এবার তাঁর বাঁ পাশের কমরেডকে পরিচয় করালেন, "ইনি কমরেড আখ্‌মেদ ইয়েসমিন্। পূর্ব-পাকিস্তানে আমার দক্ষিণ হস্ত হিসাবে পুলিস বিভাগের দায়িত্ব নেবেন। ইনি মুসলমান।"

আমি উঠে পড়লাম। সিমেনসকে বললাম, "আমি পরশু একবার দিল্লি যাচ্ছি। তোমার বাংলোতেই থাকব। আন্দ্রিয়েভ, নুকুকে রক্ষা করতেই হবে।"

আন্দ্রিয়েভ আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি রক্সৌলে লোক পাঠিয়েছি। কাঠমুণ্ডুর বাইরে যদি সে বেরতে পারে তবে আর ভয় নেই।"

সিমেনস বললেন, "বিনয়প্রকাশ রক্সৌলে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার মনে হয় নুকু রানীদের সংগে একই প্লেনে পালিয়ে আসবে। যাই হোক, বিনয়-প্রকাশ নুকুকে বাঁচাবার জন্য জীবন দেবে আমি জানি। চৌধুরী, রবিবার বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ঠিক করে রেখেছি শুক্রবার। আপত্তি আছে?"

ধীরে ধীরে মাটির দিকে মুখ নীচু করে বললাম, "না, আপত্তি নেই।"

"ডোব্রো, ডোব্রো!" বলে সিমেনস আমার করমর্দন করলেন। সিমেনস নিশ্চয়ই অনুভব করলেন যে আমার হাতে বোধহয় কিছুমাত্র রক্ত ছিল না। থাকলে হাতটা আমার বরফের মত ঠাণ্ডা কেন? কৃষ্ণান দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। দু'পা হেঁটে গিয়ে বললাম, "শুক্রবার রাত দশটা। সময় জ্ঞাপন। বুঝলেন?"

"বুঝেছি।"

"কিন্তু তার আগে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দিতে হবে। বুধবার দিন সমগ্র ভারতে জেনারেল স্ট্রাইক ঘোষণা করুন। গভর্ণমেণ্টের অফিস থেকে

সুরু করে রিক্সওয়ালা পর্যন্ত কেউ যেন কোন কাজ না করে। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। শোভাযাত্রা বার করবার আদেশ দিন। পুলিসদের দিয়ে প্রত্যেকটা সহরে অন্তত হাজার পাঁচেক করে লোক মারতে হবে। নইলে শুক্রবারের ঝড়টা প্রবল হবে না। আসলে বুধবারটাই খুব কঠিন দিন। পুলিসের বীভৎসতা যত বেশি হবে বিপ্লবের জোর হবে তত বেশি। স্লোগান দেবেন কি?"

কৃষ্ণানের মত লোকও আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, "নেহেরু-রাষ্ট্র ধ্বংস হোক। কেমন শোনাচ্ছে মিঃ কৃষ্ণান?"

"খুব ভাল। অতি শ্রুতিমধুর।"

"তা হ'লে আজ রাত্রের মধ্যে পলিটব্যুরোর মিটিং ডাকা সম্ভব হবে কি?"

কৃষ্ণান বললেন, "হবে।"

"কোথায় করবেন? ক'জন মেম্বার আছেন এখানে?"

"চারজন। কিন্তু কোন জায়গায় মিটিং করা সম্ভব হবে না। নিরাপদ নয়।"

"তবে?"

"কমরেড যশোবন্ত সিং-এর ট্যাক্সিতে বসেই মিটিং হবে। তারপর আমাদের মিটিং হবে দিল্লিতে। পার্লামেণ্ট হাউসে। কি বলেন মিঃ চৌধুরী?"

"ঠিকই বলেছেন। আজকের মিটিংটা একটু কষ্ট করে চালিয়ে নিতে বলুন। এমন কষ্ট করে দুনিয়ার কোন পার্টিই বোধহয় মিটিং করেনি। বাংলায় একটা কথা আছে, কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। কেষ্টর চেহারা প্রায় দেখা যাচ্ছে, তাই না?"

কৃষ্ণান রাস্তায় নেমে ট্যাক্সিতে উঠলেন। কমরেড যশোবন্ত সিং সামনেই খাড়া ছিলেন। নেতাজি সুভাষ রোড দিয়ে আমি স্ট্রাণ্ড রোডের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম। রাস্তায় আর একটিও লোক নেই। বড় বড় সাহেব-কোম্পানির সামনে খাটিয়া ফেলে দু'একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান শুয়ে আছে। বিশ্রাম করছে। 'ভয়েড্ এণ্ড ভয়েড্' কোম্পানির দরোয়ান তোলা-

উহুনে রুটি সেঁকছিল আর চিৎকার করে গান করছিল, "রামা হো, রামা হো—।" শুক্রবারের পর ভারতবর্ষের রাম কত শতাব্দীর জন্য যে বনে গমন করবেন তার হিসাব আমি নিজেও জানি না। আজ একটু আগে সিমেনসের কামরায় বসে যেন সঠিক ভাবে বুঝে এলাম যে, আমাকেও যেতে হবে। এক বছর পরে না হোক দু'বছর পরে তো নিশ্চয়ই। লাল সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করলাম আমি, আমি দীপক চৌধুরী। ক্ষমা আমি কারো কাছেই চাইব না। ক্ষমা চাইবে সমগ্র ভারতবাসী। আমার কাছে নয়, ভগবানের কাছে। ওদের অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্যই তো শুনেছি ওদের ভগবান লাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছেন।

সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। চেপে বসলাম। বললাম, "বেলুড়।" বাবার সংগে দেখা করবার জন্য মনটা ছটফট্ করছিল।

শঙ্খ-ঘণ্টা থেমে গেছে সম্ভবত অনেকক্ষণ আগে। আরতির সমারোহ আজকের মত শেষ। মন্দিরের সামনে বাবা জোড়-আসন কেটে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করছেন। ডান দিকে চেয়ে দেখি বড়কাকাও ধ্যানস্থ। বেলুড়ের ভগবান নীরব! খুবই বিস্ময় বোধ করলাম। পালিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে। অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে জলের কিনার পর্যন্ত। দক্ষিণের বাতাসে প্রশান্তি ছিল। আমি জানি বাবার মন আজ অশান্ত। মুদ্রিত চোখের মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজছেন। দুঃখের বোঝা তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এত অশান্ত আর বিষণ্ণ মন নিয়ে ধ্যান করা কি সম্ভব? দুরন্ত স্ফূর্তি যেমন মনকে চঞ্চল করে তোলে, বিষণ্ণতাও তেমনি মনের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। প্রশান্ত মন নিয়ে ধ্যানস্থ হওয়াকেই তো শংকরাচার্য বলেছেন তিতিক্ষা। হয়তো বাবার এই অভাবটা বড়কাকা পূরণ করেছেন। বড়কাকা ফিরে এসেছেন রামানুজের ভক্তিবাদের রাস্তায়। তাঁর মুদ্রিত চোখে অন্ধ অনুরাগ কিংবা ভালবাসা থাকতে পারে না। জ্ঞানের আলোয়

ভগবানের স্বরূপ ক্রমশই প্রতিভাত হওয়া চাই। তাই তো রামানুজ বলেছেন, জ্ঞানের আলো নিয়ে রাস্তা দেখে দেখে এগুতে হবে, ভক্তির রাস্তায়। তবেই আমাদের অনুধ্যানরত মনে উপলব্ধি আসবে যে আমরা ভগবানের সৃষ্ট। আমরা ভগবানের মধ্যে বাস করছি এবং ভগবানের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। ভ্রান্ত মানুষ ভগবান থেকে সরে গেছে। আবার তাকে ফিরে আসতে হবে তাঁরই কাছে। আসতে হবে সেই তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে, ধ্যানের মধ্য দিয়ে। ভাবপ্রবণতার অংশ এতে কম, জ্ঞানের উপলব্ধি বেশি। আমার মনে হ'ল বাবা শংকরাচার্যের জগৎকে ভুলবার ধ্যান করছেন। আর বড়কাকা ভগবানের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও কর্মের আলোয় সেই জগৎকেই কেবল জগৎ বলেই দেখবার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ মনে হ'ল আগামী শুক্রবার রাত দশটায় ভারতমাতার বেদ-বেদান্তের অবগুণ্ঠন খসে পড়বে। মানুষ দেখেও দেখতে চাইছে না, বুঝেও বুঝতে চাইছে না। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরাও আজ অন্ধ। চোখ বুজে রইলেন বলে বাস্তব তো আর পালিয়ে যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বেঁচে থাকলে বাস্তবের ভয়াবহতা দেখতে পেতেন। হয়তো বা লাল সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য আমিও ব্যাকুল হয়ে উঠতাম না। আমি গঙ্গার ধার থেকে সরে এলাম। মাঠটা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। সিঁড়ি ধরে আবার উঠতে লাগলাম ওপরে। আমাদের ক্রেমলিনের মত বেলুড় মঠ উঁচু নয়। দেখলাম বেকার মন্ত্রী গৌরীশংকর চৌধুরী ও বেকার দার্শনিক ভবশংকর চৌধুরী তখন পর্যন্ত ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। আমাদের জাগ্রত ধ্যানের পরিকল্পনার কথা সঠিক করে জানতে পারলে ওঁরা হয়তো বাকি ক'টা দিন কষ্ট করে আর বেলুড় পর্যন্ত ছুটে আসতেন না। আমি চলে এলাম। বড় রাস্তায় বেরিয়ে বাস ধরলাম। বাবাকে হয়তো একবার কেবল দেখতেই এসেছিলাম। তাঁর সংগে কথা বলার হয়তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

গোয়াবাগানের সামনে আসতে দেখি বিনয়প্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, "মুকু নিরাপদে ফিরেছে।"

"ফিরেছে? কি করে?"

"অতি কষ্টে আমি রক্ষা করেছি। সে অনেক কাহিনী। কিন্তু নুকু বোধহয় বাঁচবে না।"

"নিশ্চয়ই বাঁচবে। নুকু না বাঁচলে বিপ্লবও বাঁচবে না।" এই বলে আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

বিনয়প্রকাশ বলল, "নুকু এখানে নেই।"

"কেন?"

"পুলিস টের পেয়েছে। ওকে খুঁজছে।"

"নুকু তাহ'লে এখন কোথায় আছে?"

"আমার ঘরে, বস্তিতে যাবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

আমি কোনদিনই বিনয়প্রকাশের বস্তি চোখে দেখিনি। অনীতার কাছে থেকেই শুনেছিলাম যে বিনয়প্রকাশ বস্তিতে থাকে।

বিনয়প্রকাশের ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেছি! এ কোন্ নুকু? সত্যি-সত্যি নুকু তো? গায়ে এক রত্তি মাংস নেই, ক'খানা হাড় পড়ে রয়েছে বিনয়প্রকাশের বিছানায়। বিশ্ববিপ্লবের আগুনে নুকু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলতেই চেয়েছিল। বিনয়প্রকাশ উদ্ধার না করলে নুকু বাঁচত না। বললাম, "ওকে দুধ দিও না। অনেকদিন খায়নি। তাই একটু একটু করে খাওয়াতে হবে। তোমার ঘরে ফলটল কিছু নেই?"

বিনয়প্রকাশ বলল, "অনীতা গেছে বাজারে। সবই সে কিনে আনবে।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "অনীতা? অনীতা খবর পেল কি করে?"

"আমি ডেকে এনেছি। অনীতা কাছে না থাকলে নুকু তো বাঁচবে না।"

নুকু চোখ খুলল। হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকল আমায়। আমি ওর বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম। বলল, "দীপুদা, নেপাল আমাদের হাতে আসতে আর দু'দিন লাগবে। রানীগুলোকে নিয়ে রাজাটা পালিয়েছে।"

"কি করে পালাল ?"

"আমি সাহায্য করেছিলাম দীপুদা। রানীগুলোকে আর রাজাটাকে দেখে আমার বড্ড মায়া হ'ত। সামনে আগুন জ্বলছে দেখেও ওরা বিশ্বাস করত না যে ওটা সত্যি-সত্যি আগুন।"

"ভগ্ন-সভ্যতার শেষ অবস্থায় মানুষ সত্য পথ দেখতে পায় না নুকু।"

নুকু আমার হাতটা টেনে নিয়ে ওর বুকের ওপর রাখল। শুকনো হাড়ের জ্বালা আমি অনুভব করলাম। এর মধ্যে অনীতা এসে গেছে। মুখ নীচু করে সে আমার হাতে একটা গেলাস দিয়ে গেল। গেলাসে কমলানেবুর রস ছিল। নির্বাক অনীতা গেল হরলিকস্ তৈরি করতে। বিনয় হতভম্বের মত একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসে ছিল। পা দুটো চেয়ারের ওপর তুলে বসেছে। আমি দেখলাম পা দুটো ভীষণভাবে ফুলেছে। একটা পায়ের আঙুলের গোড়া থেকে পুঁজ পড়ছে।

"দীপুদা, ভারতবর্ষ আমাদের হাতে কবে আসবে ?"

"আমাদের হাতে ? বোধহয় আর এলো না।"

"কেন ? কেন ?" নুকু প্রায় উঠে বসল।

"আমাদের হাতের ওপর দিয়ে অনেকগুলো হাত আজ এগিয়ে এসেছে।"

বিনয়প্রকাশ দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল। অনীতা একটা গরম জলের ডেকচি নিয়ে এলো। খানিকটা তুলো গরম জলে ভিজিয়ে বিনয়-প্রকাশের পা থেকে পুঁজ পরিষ্কার করতে লাগল। বিনয়প্রকাশ আপত্তি করল না। লক্ষ্য করলাম অনীতার ঠোঁট দুটো নড়ছে। আমি জানি অনীতা কাঁদবার মেয়ে নয়, তবে ঠোঁট দুটো নড়ছে কেন? হয়তো ভগবানের মন্ত্র পড়ছে অনীতা। একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছে। বিনয়প্রকাশের পৃথক অস্তিত্ব হয়তো সে ভুলেই গেছে। বিনয়প্রকাশের বদলে অন্য মানুষের পায়ের পুঁজও অনীতা নিজের হাতে ধুয়ে মুছে দিত। আমি অনুভব করলাম, বিনয়প্রকাশের জন্য ওর আর আলাদা কোন প্রেমের রাজ্য

নেই। ওর সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র রাজ্য এই মুহূর্তে বুঝি অনন্ত রাজ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম অনীতা হাত বাড়িয়েছে বিনয়প্রকাশের পায়ের দিকে নয়, সর্বশক্তিমানের সন্নিকটে। সারা বিশ্বের কুষ্ঠরোগ অনীতাই পারবে সারিয়ে দিতে। অনীতা পা দুটো পরিষ্কার করে দিয়ে নোংরা তুলো আর ডেক্‌চিটা নিয়ে বাইরে চলে গেল। যখন ফিরে এলো তখন দেখলাম ওর হাতে একটা গরম জলের বোতল আর একটা ফ্লাস্ক রয়েছে। গরম জলের বোতলটা বিনয়প্রকাশের পা-এর কাছে রাখল। বস্তিতে নিশ্চয়ই গরম জলের ব্যাগ পাওয়া যায়নি। তারপর সহসা নিজের আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে বিছানার ওপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনীতা। বিনয় অনীতাকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিন্তু কোন কথাই সে বলল না। সুকুর দিকে চাইতেই দেখি ওর চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ছে।

সুকু বলল, "দীপুদা, আমি মরতেই চেয়েছিলাম। নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বিনয়প্রকাশ কেন যে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে এলো তা আমি আজও জানি না। দুঃখ হচ্ছে, বিনয় বোধহয় আমাকেও পাবে না।"

"কেন রে?"

"আমি বাঁচব না দীপুদা। কেবল ভারতবর্ষের বিপ্লব দেখবার জন্য আমি বিনয়প্রকাশের শয্যায় শুয়ে রইলাম। ধর্ম-অধর্মের সীমান্ত আমার জানা নেই।"

আমি যাওয়ার জন্য উঠলাম। অনেক রাত হয়ে গেছে। পুলিস যখন সুকুর সন্ধান পেয়েছে তখন আমাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হবে না। গোয়া-বাগানে ফিরে যেতে একটু শংকা এলো। দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সুকু বলল, "দীপুদা, তুমি একদিন বলেছিলে কম্যুনিষ্ট মরলেও কম্যুনিষ্ট থাকে।"

"মিথ্যা বলিনি সুকু। তুই নিজেই তো তার প্রমাণ।"

সুকু উঠে বসল। আমার দিকে সোজা ভাবে চেয়ে বলল, "দীপুদা, তোমার সংগে আমার কবে দেখা হবে জানি না। সেই জন্যই তোমায় আজ জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি মরলে কম্যুনিষ্ট থাকব না।"

বিনয়প্রকাশ জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে বুঝলাম না। ছ'হাঁটুর মধ্যে থেকে মুখ সে তুলল না। গরম জলের বোতলটা তেমনি ভাবেই পড়ে রইল। ওর হাতের দিকে চেয়ে দেখলাম অনীতার দেওয়া আংটিটা বিনয়প্রকাশ তখনও আঙুল থেকে খুলে ফেলেনি। কম্যুনিষ্ট-কাব্যে আংটির বাজার দর আছে, প্রেমের উপলব্ধি নেই। লক্ষ্মীবাবুর দোকানে কম্যুনিষ্ট-কাব্যের দাম পঞ্চাশ টাকা তো বটেই!

দিল্লি এলাম মঙ্গলবার দিন। কলকাতার চাইতে দিল্লি অনেক নিরাপদ বলে মনে হ'ল। বুধবার দিন সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মঘট সুরু হ'ল। পার্লামেণ্টে বৃহস্পতিবার একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটবে বলে সবাই মনে করছেন। গতকাল মন্ত্রিসভার জরুরি অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোন কিছুতেই আর অংশ গ্রহণ করবেন না বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এযাবৎকাল কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কাছে তিনি যা কিছু দাবি করেছেন সবই পেয়ে এসেছেন। অন্য দেশের ডিক্টেটারদের যা ক্ষমতা থাকে তাঁরও তাই ছিল। কিন্তু ক্ষমতার চূড়ায় বসেও তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নি। ভদ্রলোক বলেই তাঁর লজ্জা এসেছে প্রতি পদক্ষেপে। বাইরের হুংকার যতটা সত্য ভেতরের নম্রতাও তাঁর ততখানি সত্য। সব চেয়ে বড় সত্য তিনি ডিক্টেটার হতে চান নি। চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলতে লাগলেন। তিনি সোস্যালিস্ট। ভারতবর্ষের মঙ্গল তিনি চেয়েছিলেন। নিজের স্বার্থ তাতে এক কাণা কড়িও ছিল না। স্বার্থহীন নেতা ভারতবর্ষের বাজারে খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এক পয়সা মুনাফা না রেখে কেউ সেদিন সওদা বেচতে চায় নি। নেহেরু চেয়েছিলেন। নতুন ইতিহাসেও সে-কথা উল্লেখ থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সওদা তাঁর সবই লুঠ হয়ে গেল। সবাই তাঁকে ঠকালো। যাঁদের

ঘাড়ে তিনি হাত রেখে ঘুরে বেড়ালেন তাঁদের ঘাড়ের পেছনেই লুটের মাল থলির মধ্যে বোঝাই করা ছিল। তাঁর শিক্ষা এবং কৃষ্টি নিজের বন্ধুদের সন্দেহ করতে শেখায় নি। গুপ্ত ঘাতকের ভয়ে তাঁর সুনিদ্রার অভাব হয় নি।

পার্লামেণ্টে আমিও উপস্থিত ছিলাম। প্রধান মন্ত্রী এলেন। মুখে কোন বিষাদের চিহ্ন ছিল না। শংকরাচার্যের তিতিক্ষা প্রধান মন্ত্রীর আজ শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে মনে হ'ল। ভারতবর্ষের অনাদি অতীত প্রধান মন্ত্রীর মনে আজ সত্যের ঝংকার তুলেছে।

সেই অতীতের রাস্তা ধরেই তিনি আজ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করলেন। প্রধান মন্ত্রী আজ বক্তৃতা দিলেন না। তিনি কেবল বললেন, "আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।"

পার্লামেণ্টের মধ্যে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি হতে লাগল। গুপ্ত ঘাতকদের নগণ্য সংখ্যার সংগে কংগ্রেসের ভালমানুষরাও মিশে গেল। আমি জানি সেই মুহূর্তে সারা দেশ জুড়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতার শোভাযাত্রা চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে চলেছে। আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেখলাম প্রধান মন্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। কোন সমারোহ নেই, কোন্ আয়োজন নেই। ওপাশ থেকে উড়ে মালী একটা গোলাপ ফুল তুলে প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিল। বহু বছর চেষ্টা করেও উড়ে মালী তাঁর হাতে একটা ফুলও পৌছতে পারেনি। আজ পারল। একটু হেসে তিনি উপহার গ্রহণ করলেন। কোটের ওপর জয়পতাকার মত ফুলটা লাগিয়ে প্রধান মন্ত্রী মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগলেন। অতীত ভারতের শেষ কীর্তি দেখবার জন্য সেই মুহূর্তে আমি উপস্থিত ছিলাম। উড়ে মালী আর জহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের সনাতন সত্য। আত্মার মর্যাদায় সবাই সমান। মালীর ঘাড়ে হাত রাখলেন প্রধান মন্ত্রী। ভালবাসার হাত, আত্মীয়তার হাত, নীচের মানুষকে উপরে টেনে তুলবার হাত। তারপর দু'জনে হাঁটতে লাগলেন এক সংগে। পার্লামেণ্ট হাউসের ফটক দিয়ে ভারতবর্ষের সনাতন সত্য নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফিরে আসবার মহামুহূর্তে আমি আর উপস্থিত থাকব না।

সেই দিনই ফিরে এলাম কলকাতায়। সিমেনসের সংগে শেষ দেখা হ'ল তাঁর বাড়িতেই। মস্কোর পুরো 'নাইট স্কুল'টি আজ দিল্লিতে উপস্থিত আছে। দু'দিনের মধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। ছড়িয়ে পড়বে আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা ছড়িয়ে পড়বে আমি তা ভাবতে পারিনি। আমার পরিকল্পনা ছিল অন্য রকমের। কিন্তু ওরা আমার চেয়েও বুদ্ধিমান। আমিও যেন হেরে গেছি বলে নিশ্চিত হলাম। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মাও-সে-তুঙ সৃষ্টির বিরুদ্ধে কমরেড স্টালিন বহু আগেই সতর্ক করেছিলেন। উপনিবেশ চালাবার জন্য দ্বিতীয় মাও-সে-তুঙএর প্রয়োজন কোন দিনই হবে না। চীন দেশের ভুল ওঁরা ভারতবর্ষে শুধরে নিলেন।

কলকাতার রাস্তায় রক্তের চিহ্ন এখনও উড়ে কুলীরা ধুয়ে সাফ করতে পারেনি। লাঠিধারী পুলিসরা গলির মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে খৈনি খাচ্ছে। সৈনিকরা রাইফেল উঁচু করে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। খবর পেলাম আজও শোভা-যাত্রা বেরবে। হরিপ্রসাদ শ্রমিকদের রক্তে আগুন জ্বালিয়েছে। চৌরংগির আশপাশে দোকানগুলোতে তালা লাগান নেই। গত দু'দিনের মধ্যে সব লুঠ হয়ে গেছে; ভারতীয় সৈনিকদের গুলি খেয়ে কলকাতায় মানুষ মরেছে পাঁচ হাজারের ওপর। ব্রিগেডিয়ার সিং কলকাতায় মোতায়েন আছেন।

আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনীর একটা অংশ চীনের উপকূল থেকে ভারতবর্ষের দিকে আসছিল। ওরা আশা করেছিল নেহেরু শেষ পর্যন্ত সাহায্য চাইবেন। কিন্তু চাইলেন না। ওরা হয়তো সিংগাপুরের বন্দরে বসে 'লাকি স্ট্রাইক্' ফুঁকছে।

রাত দুটোর পর গোলা-গুলির আওয়াজ অনেক কমল। আমি সমস্তদিন গোয়াবাগানে যেতে পারিনি। আমাদের লাল ফৌজের ইউনিফর্ম দেখলে এবার জনসাধারণ চিনতে পারে। দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে আমি জিপ গাড়ি করে রাত দুটোর পর রাস্তায় বেরলাম। জিপ গাড়ির সামনে লাল পতাকা। রাইফেলধারী সৈনিকরা রাস্তা থেকে সরে গেছে। লাল ফৌজের

আত্মপ্রকাশ সহরের চতুর্দিকে আতংক সৃষ্টি করেছে। কার্জন পার্কের কাছে আসতেই দেখি বিরাট জনতা। বিনয়প্রকাশ বক্তৃতা দিচ্ছে। কৃষ্ণানকেও মঞ্চের ওপর উপবিষ্ট দেখলাম।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমি নেবুবাগানের দিকে রওনা হলাম। হঠাৎ কেন যেন মামার কথা মনে পড়ল। জিপ গাড়ি গলির ভেতর ঢুকতেই দু'দিকের বাড়ির খড়খড়ি আর জানলা সব বন্ধ হয়ে গেল। কারো চোখে আজ ঘুম নেই। সবাই আতংকে অস্থির। আমাদের লাল ফৌজের দেহরক্ষী দু'জন রাস্তায় টহল দিতে লাগল। একজন আমার সংগে ভেতরে আসতে চাইল। বললাম, "ভয় নেই। এটা আমার মামাবাড়ি।"

'ডিউক কোর্টের' অভ্যন্তরে বাতি তখনও জ্বলছিল। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে আমি ঢোকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটাতে যেন আওয়াজ শুনলাম বলে মনে হ'ল। এইটাই মামার ছাপাখানা ছিল। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম মামা পা দিয়ে ট্রেড্‌ল-মেসিন চালাচ্ছেন। তাঁর সাময়িক কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হচ্ছে! চশমাটা নাকের উপর ঝুলে পড়েছে। সমস্ত কপাল আর মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ঘাম পড়ছে। মামার শেষ আমি দেখলাম।

ঘরের দরজাটা ধাক্কা দিতেই মামা বাঘের মত লাফিয়ে এলেন আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? কে?" তিনি তাঁর পিস্তল তাক্‌ করলেন আমার দিকে। আমি বললাম, "আমি, মামা আমি।"

"ওঃ, দীপু!"

"কি করছ মামা?"

"আস্তাবলের শেষ সংখ্যা ছাপছি।"

"কে পড়বে?"

"কেউ না।"

"তবে রাত জেগে এ-সব ছাপছ কেন?"

"সংগে নিয়ে যাব দীপু।"

"তুমি পালাচ্ছ নাকি ?"

"হাঁ।"

"কোথায় ?"

"নরকে রে নরকে। হাঁ রে দীপু, ফারপোতে এখন কি হচ্ছে রে ?"

"বোধহয় পলিটব্যুরোর মিটিং হচ্ছে।"

"আমায় এক বোতল মদ এনে দিতে পারিস ?"

"কেন, বোতলটাও নরকে নিয়ে যাবে নাকি মামু ?"

"না রে। যাওয়ার আগে গলা পর্যন্ত ভর্তি করে নেব। ভেতরটা সব শুকিয়ে গেছে। কাঠ, কাঠের মত খরখরে। টোকা মেরে দেখ্।"

"এই বাড়িঘরের সব কি ব্যবস্থা হবে ? মামীমার কথা মত হরিপ্রসাদকে লিখেটিখে দিয়ে যাও। হরিপ্রসাদ তোমার যোগ্য ওয়ারিস মামু।"

ঘরটার সংলগ্ন একটা চান-ঘর ছিল। ঐ চান-ঘরটার মধ্যে হরিপ্রসাদ ডিউকের বুকেপেটে ছুরি দিয়ে বত্রিশটা আঘাত করেছিল। হঠাৎ ঐ দিকটায় নজর পড়তেই দেখি মেঝেতে অনেকটা রক্তের দাগ। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কাগজ কি কালি দিয়ে ছাপছ মামু ?"

"লাল কালি।" শান্তভাবে মামা জবাব দিলেন, "ভারতবর্ষ থেকে কালো কালি উঠে গেল রে দীপু।" এবার আমি যেন একটু ভয় পেলাম। মনে হ'ল মামা পিস্তলটা টেবিলের উপর থেকে চট করে তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি একটু অসতর্ক হ'লেই যেন তিনি তুলবেন বলে আমার বিশ্বাস জন্মাল। সহসা মামা পিস্তলটা ধরতে গেলেন। আমি সংগে সংগে লাথি মেরে টেবিলটা উল্টে দিলাম। মামা লাফিয়ে এসে আমায় আক্রমণ করলেন। আমি পা দিয়ে পিস্তলটা চেপে ধরলাম। জোরে ধাক্কা মারতেই মামা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি পিস্তলটা তুলে নিয়ে মামাকে বললাম, "মহাত্মাজি কিন্তু অহিংস ছিলেন মামু।" ঘরের মধ্যে

আওয়াজ শুনে একজন দেহরক্ষী রাইফেল বাগিয়ে ছুটে এলো বাড়ির মধ্যে। আমার হাতে পিস্তল দেখে সে প্রায় তক্ষুনি মামাকে গুলি করতে যাচ্ছিল। আমি হাত দিয়ে ইশারা করতেই সে থেমে গেল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "হরিপ্রসাদ কোথায়?"

"নরকে। সম্পত্তি নেওয়ার জন্য একটু আগেই এসেছিল।"

আমি লাথি মেরে চান-ঘরের দরজাটা খুলে ফেললাম। হরিপ্রসাদের শবদেহ চিনতে আমার দেরি হ'ল না। মস্তবড় একটা ভোজালি বুকের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। মামা বললেন, "প্রথম গুলি খেয়েই গড়িয়ে পড়ল, বুঝলি দীপু? তারপর বাকি-টুকু সহজ হ'ল। ভেবেছিলাম আমার দ্বিতীয় সংখ্যা কাগজটা তোদের দু'জনের রক্ত দিয়ে ছাপব। একটু ভুল হয়ে গেল। তোকে প্রথমেই ঘায়েল করা উচিত ছিল। আমার ভেতরে একটু মায়া দয়া এখনও আছে, এ-যাত্রায় বেঁচে গেলি। পরের যাত্রায় স্লেভ লেবার ক্যাম্পে তোকে পাওয়া যাবে। চল্, এবার কোথায় নিয়ে যাবি চল্।"

"উপস্থিত তোমায় এখানে তালা বন্ধ করে রেখে যাচ্ছি। বাইরে একজন পাহারা রেখে গেলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের পুলিস আসবে। তোমাকে আমরা বিচারের পর মারব। বিচার হবে ময়দানে, পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে।"

"আমি চোখ বুজে থাকব রে। তোদের দেখলেও আমার লজ্জা করে। চলে যাচ্ছিস দীপু?"

"হ্যাঁ মামু। কিছু বলবে?"

"একটা অন্তিম বাসনা রইল আমার।"

"বলে ফেল।"

"তোর সংগে আমার আবার কোথায় দেখা হবে?"

"কোথায় দেখা হ'লে তোমার সুবিধা হয় মামু?"

"নরকে। তাড়াতাড়ি আসিস ভাই। কেবল তোর সংগে দেখা করবার

জন্ম আমি নরকে যাচ্ছি। সেদিন আমার ভুল হবে না। যাচ্ছিস দীপু ?"

"হাঁ মামু।"

"একটা ধ্বনি দিয়ে যা—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

ঘরের তালা বন্ধ করে আমি তাড়াতাড়ি জিপ গাড়িতে এসে উঠলাম।

গোয়াবাগানে ফিরে এলাম একটু পরে। রাত তখন তিনটে। সোজা ঠাকুরদার ঘরের দিকে ছুটলাম। বারান্দা থেকে দেখলাম ঠাকুরদা শুয়ে আছেন। বড়কাকা ঠাকুরদার পাশে জোড়-আসন কেটে বসে আছেন। গায়ে জামা নেই। চওড়া বুকটা দূর থেকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগছিল। রেডিওটা খোলা রয়েছে। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর কর্ণধাররাও এই মুহূর্তে রেডিওর পাশে স্তব্ধভাবে বসে আছেন। আমার নিরাপত্তার জন্য আজ গোয়াবাগানের ফটকে লাল ফৌজ পাহারা দিচ্ছে। লাল ফৌজের উচ্ছৃঙ্খলতা আজ আমার কোথাও নজরে পড়ল না। ছোটকাকা বড়কাকার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুরদা বললেন, "জ্ঞানশংকর, এ-বাড়িতে প্রবেশের অধিকার তোমার নেই।"

"কেন ?"

"এ-বাড়ি পূর্বপুরুষের। আমরা তোমায় গোয়াবাগানের লোক বলে স্বীকার করি না।"

"এ-বাড়ি আমার। দীপক সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে আমার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছে অনেক বছর আগে।"

ঠাকুরদা হঠাৎ উঠে বসলেন। ঠোঁট দুটো তাঁর কাঁপতে লাগল। কথা বলতে গেলেন, পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সর্বাংগে কাঁপুনি উঠল। বড়কাকা বললেন, "জ্ঞানশংকর, বিপ্লব সুরু হয়েছে বলে এতটা উদ্ধত হওয়ার তো কারণ দেখছি না। যে সব চেয়ে বড় সে সব চেয়ে বিনয়ী।"

ছোটকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, "হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আত্মা' নিয়ে

অনেক ধাপ্পাবাজি করে এসেছ। আমরা নীরবে তা সহ্য করেছি। ভারতবর্ষে ফিরে এসেও অত্যাচার কম করনি। ভগবান সওদা নিযে আর দোকান-দারি চলবে না। দোকান এবার বন্ধ কর। নইলে আমরা জোর করে বন্ধ করব।"

"জ্ঞানশংকর, আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করে যা করতে পারলাম না তোমরা ভগবানকে বিশ্বাস না করে আর কতটুকুই বা করতে পারবে?"

"সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে নিতে আসিনি। স্বীকার করো যে, হেরে গেছ।"

"বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে কোনদিনই হার হবে না।"

"তোমাদের মত ধাপ্পাবাজ লোকগুলোকে একেবারে ভস্ম করে দিতে না পারলে আমাদের নতুন সভ্যতার চারা গাছ কোন দিনও বড হবে না।"

"নতুন সভ্যতা নয়, নতুন অসভ্যতা বলতে পারো।"

সংগে সংগে ছোটকাকা পকেট থেকে পিস্তল বার করে বডকাকার বুকে গুলি ছুঁডলেন। চওডা বুকটা রক্তে ছেয়ে গেল। আমি ছোটকাকার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁডে ফেলে দিলাম। নস্যিমাখা রুমালটা পকেট থেকে বার করে ছোটকাকা নাক ঝাডতে লাগলেন। ঠাকুরদা অতি অস্ফুট স্বরে বললেন, "আমি তো চোখে দেখতে পাই না! ভবশংকর মরে গেল।।" ঠাকুরদা হাত দিয়ে বিছানার চারদিকে হাতড়াতে লাগলেন। বডকাকা ঝুপ করে মেঝেতে পডে গেলেন। তারপর তিনি মরবার পূর্ব মুহূর্তে ঘোষণা করে গেলেন, "জ্ঞানশংকর, তবু আমার পরাজয় হ'ল না। দেহটা মরল বটে কিন্তু আত্মার মরণ নেই। সত্যের জয় একদিন হবেই।" তারপর মিনিট দুয়েকের ভয়াবহ নৈঃশব্দ যেন আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আসছিল। ঠাকুরদা শয্যা থেকে সহসা উঠে দাঁড়ালেন। হাতড়াতে হাতডাতে সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে গেলেন। তবু আমার উপস্থিতি কিছুতেই ঘোষণা করতে পারলাম না।

ঠাকুরদা বললেন, "জ্ঞানশংকর, এ মহাপাপ হ'ল। মহাপাপ! মহাত্মাজিকে হত্যা করার মত মহাপাপ! আজ আমার আশি বছর বয়স হয়েছে। আশি বছর আগে এই দিনে আমি জন্মেছিলাম। আজ আমার জন্মদিন জ্ঞানশংকর।"

ছোটকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "যাচ্ছ কোথায়?"

"সত্যের রাস্তায়, ভবশংকরের কাছে। আমার পূর্বপুরুষরা সবাই যে পালিয়ে গেলেন! ছি, ছি, ছি; এও আমায় সহ্য করতে হ'ল! চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু থাকতেও পারছি না। দীপক, আমার দীপুও শেষ পর্যন্ত গোয়াবাগানকে অপবিত্র করেছে! ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

ঠাকুরদা পা টেনে টেনে খোলা দরজার দিকে এগুতে লাগলেন। আমা হাত-পা চঞ্চল হয়ে উঠল। তবু যেন ঠাকুরদাকে গিয়ে ধরতে পারলাম না, আশি বছরের জন্মদিনে তাঁকে আর শেষ মুহূর্তে অপবিত্র করব না।

দরজার দিকে গিয়ে ঠাকুরদা একটু থামলেন। পেছন দিকে সহসা মু ফিরিয়ে বললেন, "কে? কে ডাকল আমায়? আমার পিতা মহাশয়ের ডা শুনলাম যেন? আসছি, আসছি।" খুব লম্বাভাবে চৌকাঠের ও-পাশে পা ফেলতে গিয়ে ঠাকুরদা হুমড়ি খেয়ে ঘরের বাইরে পড়ে গেলেন। তারপ সব শেষ। আমি কোন কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ছোটকাক নাকে নস্যি দিয়ে ঘন ঘন নাক ঝাড়তে লাগলেন। বাগান থেকেও আমি তাঁ শব্দ পেলাম।

চৌধুরীবাড়ির পুরনো ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। ভোর পাঁচটা। ঢং ঢং করে আওয়াজ হ'ল। আকাশে তখনও প্রভাতের আগমন বোঝা যাচ্ছে না। পুরোপুরি অন্ধকার রয়েছে। উড়ে কুলিরা ভয়ে কেউ আর রাস্তায় জল দিতে আসেনি। এলেও রাস্তা সাফ করা ওদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। অসংখ্য শবদেহ রাস্তায় এখনও স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

কি করব ভাবছিলাম। এখানে আর যেন তিষ্ঠতে পারছিলাম না ঠাকুরদা আশি বছর বয়সে মারা গেলেন। প্রায় একটা শতাব্দী। হঠাৎ

যেন মনে হ'ল শতাব্দী নয়, একটা গোটা সভ্যতাকেই বুঝি আমি আর ছোট-কাকা গোয়াবাগানের অন্ধকারে গলা টিপে মেরে ফেললাম !

জিপ গাড়িতে ছ'জন দেহরক্ষী আমাকে ঘিরে বসল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। গাড়ি যে চালাচ্ছিল তাকে বললাম কুইনস্ পার্কে যাওয়ার জন্য।

কুইনস্ পার্কে প্রবেশ করতেই বুঝলাম সবগুলো বাড়িতেই সবাই জেগে রয়েছে। কোন কোন মাড়োয়ারী বড়লোক দারওয়ানের হাতে বন্দুক দিয়ে ছাদের ওপর থেকে চুপি দিচ্ছিল। লাল আতংকে সবাই মুহ্যমান।

বাগানের মধ্যে জিপ গাড়ি ঢুকতেই একতলা দু'তলার সবগুলো দরজা এক গ বন্ধ হয়ে গেল। নীচের তলার মেয়েটি জানলার ফাঁক দিয়ে আমায় .খছে। দেহরক্ষীরা দরজায় দু'চারটে লাথি মারতেই দরজা খুলে দিয়ে ল, "আসুন।"

আমার সংগে সংগে চারজন দেহরক্ষীও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। আমি নাম, "কমরেড, এখানে আমার মা-বাবা আছেন।"

দু'তলার সিঁড়িতে উঠবার মুখে মেয়েটি বলল, "একটু আগে অনীতা চলে গেল। একটা এম্বুলেন্স এসেছিল।"

আমি খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় গেল ? রাস্তায় বেরনো ; এখন খুবই বিপজ্জনক। কেন ওকে যেতে দিলেন ?" মেয়েটি বলল, "মি বারণ করেছিলাম, কিন্তু অনীতা কোন জবাব দেয়নি। কার সংগে চ্ছে তাও সে বলল না। আচ্ছা, আমাদের কি আপনারা মেরে ফেলবেন ?" বাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

দু'তলার সিঁড়ি শেষ হ'ল। মাদ্রাজী পরিবারের সবাই বারান্দা এবং ঘর ক আমায় দেখছিলেন। ওঁদের চোখেমুখে ভয় ছাড়া আর কিছুই লেখা : না। ধীরে ধীরে তিনতলায় উঠতে লাগলাম। ছাদের ওপরে এসে লাম এখানে কোন উদ্বেগ নেই, আতংক নেই। শোবার ঘরের দরজা লা পড়ে রয়েছে। অনীতা যাবার সময় বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যায়নি।

খাটিতে পড়ে গোরাচাঁদ ঘুমচ্ছে। টেবিলের ওপরে দু'খানা কাচের ডিসে ভাত রয়েছে। টিফিন-কেরিয়ারের খোলা বাটিতে তরকারি আছে, কেউ ছোঁয়নি। বুঝলাম, মা কিংবা অনীতা কেউ আর কাল থেকে খাওয়াদাওয়া করে নি। বাবা বাড়ি নেই। হয়তো বেলুড়েই রাত্রিবাস করছেন। হঠাৎ ঠাকুরঘর থেকে গুণ্‌গুণ্‌ গানের শব্দ কানে এলো। আমরা বড় হওয়ার পর মা কখনও গান করতেন না। বহু বছর পর আজ ভোররাত্রে মায়ের কণ্ঠ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর লাগছিল। আমি ঠাকুরঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। মা ফুলের মালা গাঁথছেন আর চাপা কণ্ঠে গান করছেন—'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

মা গান করছেন আর মালা গাঁথছেন। মা যেন তাঁর গানের কথা ও সুর দিয়ে আমার সমস্ত দিনের শ্রান্তি দূর করে দিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছিল না। সারা ভারতবর্ষের মহাপ্রলয় মার ঠাকুরঘরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। মনে হ'ল কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনের এত বড় পরিকল্পনা যেন মার ঠাকুরঘরের সামনে একটা সামান্য ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

মার সংগে দেখা না করেই চলে এলাম। তখনও মায়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি—'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

একতলার দরজার সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। হাতে তার একটা লাল গোলাপ। আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আপনার জন্য একটা লাল গোলাপ তুলে এনেছি।"

"কেন?"

"নতুন ভারতে লাল গোলাপ ছাড়া তো বড় পূজো হবে না।"

"নতুন ভারতে পূজো আমরা তুলে দেব।"

"তা হ'লেও পুরুষমানুষ চিরদিন মেয়েদের কাছে পূজো চাইবে। যে বীরশ্রেষ্ঠ তার পায়েই তো আজ আমরা ভারতবর্ষ-গোলাপটিকে নিবেদন করে দিলাম। দীপকবাবু, দেওয়ার আগে আমরা একটু রাঙিয়ে দিলাম। লাল ভারতবর্ষ। ফুলটা যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তা হ'লে মস্কো পাঠিয়ে দেব।"

বললাম, "ফুলটা আমি নিতে পারি কিন্তু আপনাদের রক্ষা করবার অংগীকার এতে রইল না।"

মেয়েটি হি-হি করে হেসে উঠল। আমি বড্ড অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। লাল-ভারতবর্ষ তো হাসবার ব্যাপার নয়! জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছেন যে?"

হাসতে হাসতেই মেয়েটি বলল, "আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।"

"কেন?"

"আপনি রক্ষা করবার কে?"

এই বলে সে আধ-ডজন রেড গার্ডের সামনেই পুনরায় পাগলের মত হেসে উঠল। যুক্তপ্রদেশের একটি তরুণীর হাসির আঘাতে আমি বিক্ষত হতে লাগলাম। খানিকটা নিরুপায় হয়েই যেন বললাম, "রক্ষে করতে পারলে আমিই পারব। ভগবানের কেলেংকারী সব ধরা পড়েছে। বাবা বিশ্বনাথকে ন্যাড়া ক'রে বেলতলায় রেখে এসেছি।'

"আমার বাবাকেও তো ন্যাড়া করতে পারতেন। এমন কষ্ট দিয়ে মারলেন কেন? টেনে টেনে মাথার চুল সব উপড়ে ফেলেছে! দেহটা কোথায় জানি না। মাথাটা মাঝরাত্রে পৌঁছে দিয়ে গেছে আমাদের ফটকের সামনে। সেখানে পড়ে ছিল। আমাদের ড্রাইভার তুলে এনেছে। কমরেড চৌধুরী, লাল গোলাপ তো গ্রহণ করলেন না। এবার আমি তাঁর খণ্ডিত মস্তকটি আপনার চরণকমলে পৌঁছে দেব কি? বুর্জোয়া-মস্তকের নৈবেদ্য আপনি গ্রহণ করুন কমরেড।"

মেয়েটির চোখ শুকনো। ভোরের বাতাসে দু'চারটা রুক্ষ চুল ওর আমার নাকের সামনে উড়তে লাগল। ক'দিন থেকে হয়তো মাথায় তেল দেয়নি। গৌরীসেনের টাকা আর সি. কে. সেনের জবাকুসুম কুইনস্ পার্ক থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

নতমস্তকে জিপ গাড়িতে উঠে বসলাম।

তিনতলার ছাদের দিকে আবার একবার চাইলাম। মনে হ'ল স্বর্গময় ছেয়ে মায়ের কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনি তুলেছে—

'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

পুনশ্চ ঃ

কমরেড, অনীতা কোথায় বলতে পারো? তুমি সেদিন বলোনি বটে, কিন্তু পরে আমি সবই জেনেছিলাম। সে-কাহিনী তোমায় আমি পরে লিখব।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥